সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন

পরিবার ও সমাজ ধ্বংসের নীলনকশা

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

স্বত্ব: লেখক
প্রচ্ছদ © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৪৬ হিজরি, জানুয়ারি ২০২৫

ISBN: 978-984-99803-0-8

MRP: ৳ ৭৫০ মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শরিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব-আইন লঙ্ঘন করে তার সে-অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে-নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শরিয়ার সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে-প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ-অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহিহ আল-জামি আস-সাগির, হাদিস: ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শরিয়ার সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]

সূচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান.....৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....৯

বইটির নেপথ্যে কিছু কথা.....১০

পার্ট-১ সমকামিতার বৈশ্বিক এজেন্ডা

উল্টো যাত্রা.....১৫

এলজিবিটি ইতিহাস: বার্লিন থেকে ব্র্যাক.....৩১

| কার্ল হাইনরিখ উলরিখস: সমকামী পরিচয়ের অগ্রদূত.....৩৩

| ম্যাগনাস হার্শফিল্ড: সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ.....৩৬

| এলজিবিটি বয়ান তৈরীর নেপথ্যে অ্যাক্টিভিস্ট প্রফেসর.....৪১

| আলফ্রেড কিনসি: যৌন বিপ্লবের জনক.....৪৩

| প্রফেসর জন মানি: জেন্ডার তত্ত্বের জনক.....৫০

| কুইয়ার থিউরি: মিশেল ফুকো এবং জুডিথ বাটলার.....৫৯

| ব্র্যাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের সূচনা.....৬৬

সমকামী আচরণ কি অধিকারের বিষয়?.....৬৯

| সমকামীরা কি বৈষম্যের শিকার বা অধিকার বঞ্চিত?.....৭৪

| লিবারেল নৈতিকতায় যেকোনো বিকৃত আচরণকে

| অধিকার বানানো যাবে.....৭৫

অপরাধ থেকে অধিকার: সমকামিতার আইনি রূপান্তর.....৮০

এলজিবিটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন.....৮৪

সূচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান.....৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....৯

বইটির নেপথ্যে কিছু কথা.....১০

পার্ট-১ সমকামিতার বৈশ্বিক এজেন্ডা

উল্টো যাত্রা.....১৫

এলজিবিটি ইতিহাস: বার্লিন থেকে ব্র্যাক.....৩১

| কার্ল হাইনরিখ উলরিখস: সমকামী পরিচয়ের অগ্রদূত.....৩৩

| ম্যাগনাস হার্শফিল্ড: সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ.....৩৬

| এলজিবিটি বয়ান তৈরীর নেপথ্যে অ্যাক্টিভিস্ট প্রফেসর.....৪১

| আলফ্রেড কিনসি: যৌন বিপ্লবের জনক.....৪৩

| প্রফেসর জন মানি: জেন্ডার তত্ত্বের জনক.....৫০

| কুইয়ার থিউরি: মিশেল ফুকো এবং জুডিথ বাটলার.....৫৯

| ব্র্যাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের সূচনা.....৬৬

সমকামী আচরণ কি অধিকারের বিষয়?.....৬৯

| সমকামীরা কি বৈষম্যের শিকার বা অধিকার বঞ্চিত?.....৭৪

| লিবারেল নৈতিকতায় যেকোনো বিকৃত আচরণকে

| অধিকার বানানো যাবে.....৭৫

অপরাধ থেকে অধিকার: সমকামিতার আইনি রূপান্তর.....৮০

এলজিবিটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন.....৮৪

শব্দের মারপ্যাঁচ : সেক্স, জেন্ডার, ট্রান্সজেন্ডার ১১০
শব্দ বিভ্রাট—হিজড়া, লিঙ্গ প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ ১৩৩
| ইন্টারসেক্স (জন্মগত হিজড়া) ১৪৮
সমকামী আন্দোলনের বৈপ্লবিক উত্থান: ট্রান্সজেন্ডারবাদ ১৬১
সমকামিতা প্রতিষ্ঠার কৌশল: গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রভাব বিস্তার ১৭৯
এলজিবিটি অর্থায়ন এবং নেপথ্যের কারণ ১৯৪
সমকামিতা বিশ্বায়নে জাতিসংঘ ২১২
সমাজ-বিধ্বংসী জেনেও সমকামিতাকে এত সমর্থন কেন.....২৩৪

পার্ট-২ বাংলাদেশে সমকামিতা মিশন

সমকামিতার 'ব্র্যাক মডেল' ২৪৭
| এইডস প্রতিরোধের আড়ালে যৌন স্বাস্থ্যসেবা এবং সচেতনতা.....২৬৮
| বাংলাদেশে ব্র্যাকের সমকামী অধিকার দাবী ২৭২
| বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামিতা নিয়ে অ্যাক্টিভিসম.....৩০১
| হিজড়ার আড়ালে ট্রান্সজেন্ডারবাদের উত্থান.....৩১৫
বাংলাদেশের মিডিয়া এবং ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি প্রকল্প ৩৪৭
ব্র্যাকের সমকামিতা বান্ধব যৌনশিক্ষা মিশন ৩৬৯
যৌনশিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের অনীহা: ব্র্যাকের বিকল্প পদ্ধতি.....৪০৭
যৌনশিক্ষার সংস্কৃতি গড়তে ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রম ৪১৮
ব্র্যাকের প্রস্তাবিত যৌনশিক্ষা: চলো ভুল ধারণাগুলো ভেঙে ফেলি ৪৩৩
এলজিবিটির নতুন ফাঁদ- জেন্ডার ট্রান্সফোর্মেটিভ এডুকেশন ৪৫৭
এনজিওদের এত মরিয়া হওয়ার নেপথ্যে.....৪৬৬
ব্র্যাকে সমকামিতা বান্ধব জেন্ডার পলিসি ও বাস্তবায়ন ৪৮০
বাংলাদেশে যেসব এনজিও এলজিবিটি নিয়ে কাজ করে ৪৯৮

পার্ট-৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকি, বৈশ্বিক জনরোষ এবং সমকামিতা প্রতিরোধের কৌশল

সমকামিতায় ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপরাধ প্রবনতা.....৫০৪

শিশুদের মাঝে লিঙ্গ সংশয় হঠাৎ এত বাড়ছে কেন ৫১৫

বাংলাদেশ ভয়ংকর সামাজিক বিপর্যয়ের অপেক্ষায় ৫২৭

জনরোষে LGBTQ+ আন্দোলন বিপাকে.....৫৩৪

বাংলাদেশে সমকামিতা প্রতিরোধ কৌশল ৫৪১

| সমকামিতা নিয়ে বিষয়গুলোতে সচেতনতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে .৫৪৫

| সমকামিতা প্রতিরোধে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ৫৫৬

চেকলিস্ট.....৫৫৯

| চেকলিস্ট-১-গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও রেফারেন্স ৫৫৮

| চেকলিস্ট-২- কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্সের পিডিএফ ৫৫৯

| চেকলিস্ট ৩- শব্দের মারপ্যাঁচ বুঝতে লিস্ট ৫৬০

| চেকলিস্ট ৪- কিছু পরিভাষার সহজ ব্যাখ্যা ৫৬০

| লেখক পরিচিতি ৫৬৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

তথ্যবহুল এবং শ্রমসাধ্য এই বইটি প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনিই আমাকে এই কাজে মনোনিবেশ করার জন্য জ্ঞান, ধৈর্য, এবং শক্তি দান করেছেন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আসিফ মাহতাব উৎস-কে, যিনি সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে শরীফার গল্পের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইস্যুটিকে জনপরিসরে নিয়ে আসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জনসাধারণের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে কিছু এনজিও এবং নাগরিক সমাজের লবিংয়ের ফলে 'ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন' পাস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল। তবে আসিফ মাহতাবের সাহসী অবস্থানের কারণে এই উদ্যোগ আপাতত স্থবির রয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার এই প্রচেষ্টাকে প্রশংসা না করে, বরং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে চাকরিচ্যুত করেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বইটি লেখার দীর্ঘ সময়ে আমার সহধর্মিনী (শামীমা ফেরদৌস) নিরন্তর পাশে ছিলেন। তিনি আমাকে সাহস জুগিয়েছেন এবং জটিল ধারণাগুলোকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

বইটির আইন সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছেন মুনায়েম খান (আইনজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক)।

আব্দুল্লাহ আল-রায়হান এবং আফসানা মুবিন ইংরেজিতে প্রকাশিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বইয়ের অংশ বিশেষ অনুবাদে সহায়তা করেছেন, যা বইটি তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

সবশেষে, অসংখ্য অনলাইন আর্টিকেল এবং লেখকের গবেষণাপত্র পড়ার মাধ্যমে আমি এই বইটির বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। যাঁদের লেখার মাধ্যমে আমার চিন্তাভাবনা পরিপক্ক হয়েছে, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইটির নেপথ্যে কিছু কথা

আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছিলাম। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল—একটা অশুভ সংকেত। বললাম ক্লাস শেষে আসবো, কিন্তু অন্য পাশ থেকে জানানো হলো, এটা খুব জরুরি, এখনই আসতে হবে। অজানা শঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে তেজগাঁর দিকে রওনা হলাম। মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন ঘুরছিল—কেন এই জরুরি মিটিং? কী অপেক্ষা করছে? আমি কি আর ক্লাসে ফিরতে পারবো? প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল চরম উৎকণ্ঠায়।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে এক সেমিনারে বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেখানে ব্র্যাকের তৎকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাবকে শেষ মুহূর্তে স্পিকার হিসেবে যুক্ত করি এবং নিজের জন্য নির্ধারিত সময় সংক্ষিপ্ত করি যাতে সে বক্তব্য দিতে পারে। আমার বক্তব্যের পর, আসিফ মাহতাব ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক শরীফার গল্পের পাতা ছিঁড়ে অভিনব প্রতিবাদ জানায়।

সেই সেমিনার থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফেসবুকে সেই অনুষ্ঠানের লাইভ স্ট্রিম করা ভিডিওটি আসিফকে শেয়ার করেছিলাম, যেখান থেকে সে নিজের অংশটুকু আপলোড করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যায়! আমার বক্তব্যও ভাইরাল হয়। রাত ১২টার দিকে ঘুমাতে যাচ্ছি, তখনই আসিফ মাহতাব ফোন করে জানালো, তাকে ক্লাস নিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর সবকিছু ইতিহাস হয়ে গেল।

সমকামিতা ইস্যুতে বাংলাদেশের মতো শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম দেশের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করল—একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ব্র্যাকের শিক্ষার্থীরা তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে, যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা ঘটে শনিবারে। পরের দিন রবিবার (২২ জানুয়ারি, ২০২৪) আমার ওপর খড়্গ নেমে আসে।

ক্লাস থেকে সরাসরি ট্রাস্টি বোর্ড প্রধানের অফিসে পৌঁছালাম। তাঁর চোখে-মুখে ছিল দুশ্চিন্তার ছাপ। ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ

থেকে আমাকে জঙ্গি যোগসাজশের অভিযোগ করা হলো। জানানো হলো, সরকারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব (পরে জানতে পারলাম তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী) আমাকে চাকরিচ্যুত করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কথা বলছিলেন এবং একটি কাগজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সম্ভবত এটি আমার টার্মিনেশন লেটার ছিল, এবং তিন মাসের বেতন নিয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো। বিস্মিত ও হতভম্ব হলেও, আমার মনে এক ধরনের সাহস অনুভূত হচ্ছিল।

আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, প্রতিবাদে বললাম। আমার চেষ্টা ছিল আপনাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ড প্রধানের চেহারায় ছিল অসহায়ত্বের ছায়া।

তিনি আমাকে সাহস দিতে সক্রেটিসের কাহিনি শুনালেন এবং তাঁর অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন। প্রাচীন গ্রীসের সেই দার্শনিক, যাকে সত্য বলার জন্য হেমলক বিষ পানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সত্য এবং ন্যায়ের জন্য সক্রেটিস জীবন দিয়েছিলেন, যদিও সবাই জানত তিনি নির্দোষ। এই গল্প শুনিয়ে তিনি আমাকে মানসিক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

আমি কখনোই পদত্যাগ করবো না, দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। বরখাস্ত করতে পারেন, কিন্তু আমি কোনো অন্যায় করিনি। সক্রেটিস যেমন নিজের বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তেমনই আমার ক্যারিয়ার শেষ হলেও, এমনকি জেলে যেতে হলেও, আমাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমি লড়াই চালিয়ে যাবো। এটি শুধু আমার একার লড়াই নয়; এটি মূল্যবোধ রক্ষার্থে প্রত্যেক মানুষের লড়াই।

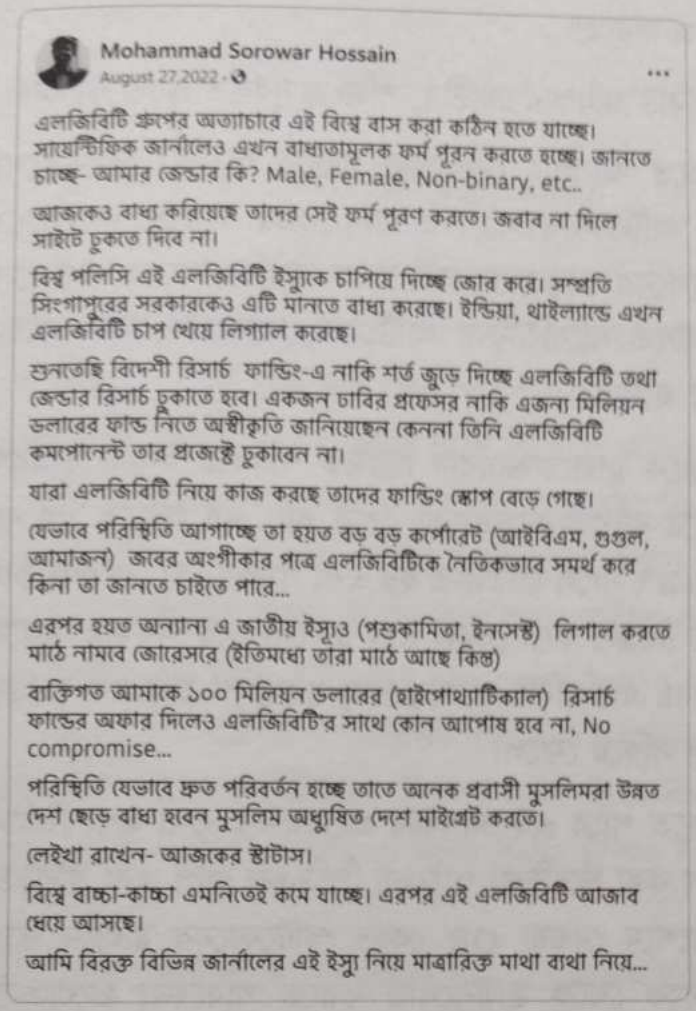
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'ইতিহাসে লিখিত আছে যে সক্রেটিসের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছিল। সেই ইতিহাস থেকে আপনারা কি কোনো শিক্ষা নেবেন না?' তারাও অবশেষে কিছুটা আবেগতাড়িত হলেন। জঙ্গি-সংক্রান্ত ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে আমি দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের কাছে নতি স্বীকার করে তারা আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিলেন। পরবর্তীতে ডিজিএফআই-এর এক কর্মকর্তা আইইউবি কর্তৃপক্ষকে জঙ্গি বিষয়ে ক্লিন সার্টিফিকেট প্রদান করেন। আইইউবির শিক্ষার্থীরাও প্রথমবারের মতো কোনো শিক্ষকের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

এই ঘটনার প্রায় দেড় বছর আগে বাংলাদেশে LGBTQ+-এর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ঘটনাক্রমে অবগত হই। বিষয়টি শুরু হয় একটি ফেসবুক

পোস্টকে কেন্দ্র করে (২০২২ সালের ২৭ আগস্ট)। সায়েন্টিফিক জার্নালে জমা দেওয়া একটি রিসার্চ ম্যানুস্ক্রিপ্টের স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে দেখি, আমাকে তাদের সাইটে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। LGBTQ পরিচয় নিয়ে জার্নালের পরিচালিত সমীক্ষায় অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক; অংশ না নিলে সাইটে প্রবেশাধিকার নেই। এইভাবে সমীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্য করা এক ধরনের অনৈতিক আচরণ। জার্নালের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে ফেসবুকে পোস্টটি শেয়ার করি এবং লক্ষ্য করলাম, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর বাংলাদেশী সমকামী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একের পর এক আক্রমণ আসতে থাকে, যা আমাকে রীতিমতো বিস্মিত করে। এরপর অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ সহযোগী প্রফেসর টনি ওকলির একটি ইমেল দেখতে পাই, যেখানে ইউনিভার্সিটি অব ওলংগং-এর এইচআর আমাকে নিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশী সমকামী গোষ্ঠী ধারণা করেছিল যে, আমি অস্ট্রেলিয়ায় ফুল-টাইম চাকরি করি, তাই তারা আমাকে চাকরিচ্যুত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। বলে রাখা ভালো, ইউনিভার্সিটি অব ওলংগং-এ আমার পজিশন অনারারি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে। বাংলাদেশী সমকামী গোষ্ঠী এতটাই বেপরোয়া ছিল যে, তারা অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার বিষয়ে চাপে ফেলা যায়।

পশ্চিমা যৌনবিকৃতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় পড়লে আগে হাসি পেত, মনে হতো তারা পাগলের মতো কথা বলছে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে মাছের সেক্স চেঞ্জ বা লিঙ্গ রূপান্তর নিয়ে আমার পিএইচডি প্রজেক্ট ছিল, যেখানে মলিকিউলার ও হরমোনগত বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। জেব্রাফিশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জন্মের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সব মাছই মেয়ে হিসেবে বড় হয়। কয়েক সপ্তাহ পর প্রায় ৫০ ভাগ লার্ভা মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়। আণবিক পর্যায়ে কিভাবে মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়, তা-ই ছিল মূলত আমার গবেষণার বিষয়বস্তু।

২০১২ সালে দেশে ফিরে জনস্বাস্থ্য (যেমন- থ্যালাসেমিয়া, ডেঙ্গু, শিশুদের স্থূলতা এবং কোভিড) নিয়ে গবেষণায় মনোযোগ দিই। বাংলাদেশের সমকামী সমর্থক গোষ্ঠীর আক্রমণের পর এলজিবিটি বিষয়ে জানার আগ্রহ তৈরি হয় এবং তখন থেকেই এ বিষয়ে জানার জন্য দিন-রাত পড়াশোনা শুরু করি। লিঙ্গ রূপান্তর এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতার কারণে LGBTQ+ কার্যক্রম বুঝতে সহজ হয়েছে।



Mohammad Sorowar Hossain
August 27,2022 ·

এলজিবিটি গ্রুপের অত্যাচারে এই বিশ্বে বাস করা কঠিন হতে যাচ্ছে। সায়েন্টিফিক জার্নালেও এখন বাধ্যতামূলক ফর্ম পূরন করতে হচ্ছে। জানতে চাচ্ছে- আমার জেন্ডার কি? Male, Female, Non-binary, etc..

আজকেও বাধ্য করিয়েছে তাদের সেই ফর্ম পূরণ করতে। জবাব না দিলে সাইটে ঢুকতে দিবে না।

বিশ্ব পলিসি এই এলজিবিটি ইস্যুকে চাপিয়ে দিচ্ছে জোর করে। সম্প্রতি সিংগাপুরের সরকারকেও এটি মানতে বাধ্য করেছে। ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ডে এখন এলজিবিটি চাপ খেয়ে লিগ্যাল করেছে।

শুনতেছি বিদেশী রিসার্চ ফান্ডিং-এ নাকি শর্ত জুড়ে দিচ্ছে এলজিবিটি তথা জেন্ডার রিসার্চ ঢুকাতে হবে। একজন চাবির প্রফেসর নাকি এজন্য মিলিয়ন ডলারের ফান্ড নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন কেননা তিনি এলজিবিটি কমপোনেন্ট তার প্রজেক্টে ঢুকাবেন না।

যারা এলজিবিটি নিয়ে কাজ করছে তাদের ফান্ডিং স্কোপ বেড়ে গেছে।

যেভাবে পরিস্থিতি আগাচ্ছে তা হয়ত বড় বড় কর্পোরেট (আইবিএম, গুগল, আমাজন) জবের অংগীকার পত্রে এলজিবিটিকে নৈতিকভাবে সমর্থ করে কিনা তা জানতে চাইতে পারে...

এরপর হয়ত অন্যান্য এ জাতীয় ইস্যুও (পশুকামিতা, ইনসেস্ট) লিগাল করতে মাঠে নামবে জোরেসরে (ইতিমধ্যে তারা মাঠে আছে কিন্তু)

ব্যক্তিগত আমাকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের (হাইপোথ্যাটিক্যাল) রিসার্চ ফান্ডের অফার দিলেও এলজিবিটি'র সাথে কোন আপোষ হবে না, No compromise...

পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে তাতে অনেক প্রবাসী মুসলিমরা উন্নত দেশ ছেড়ে বাধ্য হবেন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মাইগ্রেট করতে।

লেইখা রাখেন- আজকের স্টাটাস।

বিশ্ব বাচ্চা-কাচ্চা এমনিতেই কমে যাচ্ছে। এরপর এই এলজিবিটি আজাব ধেয়ে আসছে।

আমি বিরক্ত বিভিন্ন জার্নালের এই ইস্যু নিয়ে মাত্রারিক্ত মাথা ব্যথা নিয়ে...

আমাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে দেশের নীতি-নির্ধারক, কমিউনিটি লিডার এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করতেই বই লেখার মতো শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। বইটি নিয়ে কাজের শুরুতেই কিছু প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে, এবং সেগুলোর উত্তর বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রশ্ন হলো:

* পশ্চিমা যৌনবিকৃতি এলজিবিটির সামাজিকীকরণ কীভাবে এবং কতটুকু বিস্তৃত হয়েছে?
* সমকামিতা তথা এলজিবিটি কীভাবে এবং কেন বৈশ্বিক এজেন্ডায় পরিণত হলো?
* একটি সমকামিতা-বান্ধব বিশ্ব গড়তে কারা বুদ্ধি, পরামর্শ, অর্থায়ন এবং সহযোগিতা করছে?
* পরিবার ও সমাজবিরোধী এবং স্বাস্থ্যগত ক্ষতিকর জেনেও সমকামিতাবাদ কেন সমর্থন করা হচ্ছে?
* বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের শুরু কবে থেকে, কারা এটির নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এ আন্দোলন কতটুকু সফল?
* নারীর ক্ষমতায়নের মোড়কে ব্র্যাক কিভাবে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে সমকামী

অধিকার নিয়ে কাজ করছে?

* বাংলাদেশে এলজিবিটি অধিকার গোষ্ঠীর, শক্তি ও দুর্বলতাগুলো কী কী?

এই বইটি প্রস্তুত করতে অগণিত রেফারেন্স ঘাটতে হয়েছে। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে প্রকাশিত জার্নাল আর্টিকেলগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের প্রমাণগুলো তাদের প্রকাশিত সায়েন্টিফিক আর্টিকেল, মনোগ্রাফ, এবং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ভিত্তিক শরীফার ইস্যুটি ভাইরাল হওয়ার কারণে এই বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি হয়। এই ঘটনার পর বন্ধু সোশ্যাল এনজিও (যা ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমকামিতা কেন্দ্রিক কাজ করে) তাদের ওয়েবসাইট নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং এখনো সেই অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এলজিবিটি সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ভিডিও তাদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলে।

এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ভিডিও ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পাঠকরা পিডিএফ কপি এবং ইউটিউব লিংকগুলো বইয়ের পরিশেষে দেওয়া QR কোড স্মার্টফোনের মাধ্যমে স্ক্যান করে গুগল ড্রাইভের লিংক থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় ভিডিওগুলোর QR কোড প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বইটি জুড়ে রেফারেন্স হিসেবে যুক্ত স্ক্রিনশট এবং প্রতিবেদনের শিরোনাম (বাংলা এবং ইংরেজি) থেকেও গুগল সার্চ করে রেফারেন্স বের করা যাবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে চ্যাটজিপিটি এবং গুগল সার্চের মাধ্যমে আরও বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকে।

সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বইতে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

উল্টো যাত্রা

ব্রিটেনের সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, *'কেউ চাইলেও লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না,'* এবং *'পুরুষ পুরুষই, নারী নারীই'*—এই মন্তব্য নিয়ে বিশ্বে আলোড়ন তৈরী হয়। আমেরিকার আইন প্রণেতাদের সংসদের আলোচনা—'পুরুষরা কি গর্ভবতী হতে পারে?' বিশ্বের প্রভাবশালী পত্রিকা গার্ডিয়ান শিরোনাম ছাপে—*'যে বাবা সন্তান জন্ম দিয়েছেন: 'গর্ভধারণ করায় আমার ট্রান্স পুরুষ পরিচয় পরিবর্তিত হয় না'* ('The dad who gave birth: 'Being pregnant doesn't change me being a trans man')। অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করে—"গর্ভবতী পুরুষ: নতুন পরিসংখ্যানে অস্ট্রেলিয়ার পুরুষরা ৫৪টি শিশু জন্ম দিয়েছেন (Pregnant men: New statistics reveal men have given birth to 54 babies in Australia)!

ব্রিটেনের এক ট্রান্সজেন্ডার নারী Channel 4-এর লাইভ অনুষ্ঠানে হঠাৎ বিবস্ত্র হয়ে পুরুষাঙ্গ দিয়ে গিটার বাজানো শুরু করে ('Moment transgender singer strips NAKED live on Channel 4 and plays the keyboard with her PENIS')! পুরুষাঙ্গওয়ালা মানুষ এখন আইনত নারী! এই বিষয়গুলো এখন গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে!

পুরুষাঙ্গওয়ালা এক ট্রান্সজেন্ডার নারীর ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। স্কুলের পাঠ্যক্রমে LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে কানাডার মতো লিবারেল দেশে লক্ষ লক্ষ (মিলিয়ন মার্চ) পিতামাতা রাস্তায় নেমে আসেন (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩)। ২০২৪ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু হয়ে উঠে। তুরস্কের নির্বাচনে (২০২৩) বিজয়ী হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত বিজয়ী বক্তব্যে এরদোগান বলেন, 'এই বিজয় LGBTQ+ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়।'

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে এলজিবিটির

বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন; সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে এলজিবিটিকে চরমপন্থী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। চীনের অবস্থানও একই; এলজিবিটি গোষ্ঠীর প্রাইড মাসে রঙধনু পতাকা বহনের অপরাধে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো এলজিবিটির বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। উগান্ডার মতো দেশ পশ্চিমা ভিসা নিষেধাজ্ঞা, বিশ্বব্যাংকের ঋণ স্থগিত করার মতো অর্থনৈতিক ব্যাপারকেও উপেক্ষা করেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে। জেন্ডার আইডেন্টিটি ইতালির নির্বাচনে সরকারের পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি হাঙ্গেরী ট্রান্সজেন্ডারদের লিগালাইজেশন বন্ধ ঘোষণা করেছে।

এসব ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায় যে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি এজেন্ডা। গত ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল; এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে একাডেমিশিয়ান, ক্লিনিসিয়ান, রিসার্চার যারা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছেন তাদেরকে চাকুরিচ্যুতিসহ হুমকি-দামকি দেয়া হয়েছে। এমনকি কানাডায় সন্তানের পিতা এবং স্কুলের শিক্ষককেও (আয়ারল্যান্ড) গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে।

ইংল্যান্ডে লিঙ্গ সংশয়ে (জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া) ভোগা শিশু-কিশোরদের চিকিৎসার জন্য লম্বা লাইন। জেন্ডার ক্লিনিকে প্রথমবারের মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পাঁচ বছর বা তারও বেশি; যেখানে সর্বোচ্চ অপেক্ষমান থাকার কথা ছিল মাত্র ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত১। ২০২৩ সাল জুড়ে এই অপেক্ষার সময় আরও বেড়েছে। এনএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর ২০২৩-এ প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসা রোগীদের গড়ে ৭ বছর ৩ মাস আগে রেফার করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের শেষ দিকে, ইংল্যান্ডে প্রায় ৩১,০০০ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি প্রথম বারের মতো অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষমান তালিকায় ছিলেন। গত পাঁচ বছরে ব্রিটেনে জেন্ডার সেবায় বিনিয়োগ প্রায় ১৩০% বৃদ্ধি করা হয় এবং জেন্ডার ক্লিনিকের সংখ্যা সাতটি থেকে বাড়িয়ে বারোটি করা হয়[১]।

ইংল্যান্ডের ট্যাভিস্টক এবং পোর্টম্যান এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুসারে, ১০ বছর আগে এখানে ২৫০ টির কম রেফারেল কেইস আসত, যারা নিজেদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে মানসিক

চাপে (জেন্ডার ডিসফোরিয়া, এটা অসুস্থতা বলে স্বীকার করা হয় না) ভুগছে এবং এদের বেশিরভাগই ছেলে। কিন্তু ২০২১ সালে বিস্ময়করভাবে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০০ এর বেশী কেইস, যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। সবচেয়ে শংকার বিষয় হচ্ছে, এদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মেয়ে, যারা তাদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান[২]। গত এক দশকেরও কম সময়ে ছেলেদের রেফারেল কেইস বেড়ে হয়েছে ১৪৬০%, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে ৫৩৩৭% [৩]। ইদানীং কম-বয়সী মেয়েদের মধ্যে এই বৃদ্ধি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্রিটেনের Z Generation-এর ৪০ শতাংশ নিজেদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান বা বিশ্বাসী নন। আরো ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, এই প্রজন্মের মাত্র ৫৩ শতাংশ নিজেদের প্রচলিত নারী-পুরুষ মনে করে[৪]।

২০২৪ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনজি জেনারেশনের (১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ২৮% নিজেদেরকে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার অথবা কুইয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে[৫]। গবেষকরা ১৩ থেকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ৬,৬০০ জনের বেশি মানুষের জরিপ করেন, যেখানে ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেনজি প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোরদের ওপর অতিরিক্ত নমুনা নেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রায় ১৬% মিলেনিয়াল এবং ৭% বেবি বুমার LGBTQ+ হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে।

ফার্মাসিউটিক্যাল ও টেক জায়ান্টদের ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম নিয়ে এত বেশী উদ্বিগ্ন হওয়ার ঘটনা হতবাক করে। জনসন অ্যান্ড জনসনের স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এবং বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর মধ্যে জ্যানসেন থেরাপিউটিকস, ভিভ, ফাইজার, অ্যাবট ল্যাবরেটরিজ, ব্রিস্টল-মায়ার্স স্কুইব এবং বোয়েরিঙ্গার ইনগেলহাইম এই প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। পাশাপাশি গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, ইন্টেল, ডেল এবং আইবিএম-এর মতো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোও এতে সমর্থন দিচ্ছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অ্যাপল, মাইক্রোসফট, গুগল, আইবিএম, ইয়েল্প, পেপ্যাল এবং আরও ৫৩টি প্রযুক্তি কোম্পানি ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম ইস্যুতে আইনি নথিতে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ জানায়, যাতে স্কুলগুলোতে বায়োলজিক্যাল সেক্স অনুযায়ী পৃথক সুবিধা রাখার নিয়ম নিষিদ্ধ করা হয়।[৬]

ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণ

অসচেতন মানুষের কাছে মনে হতে পারে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও এলজিবিটি নিয়ে এত উদ্বেগের কারণ কী? প্রকৃতিতে যেমন বৈচিত্র্যতা রয়েছে, সমাজেও এমন কিছু মানুষ থাকতে পারে—এটা তো স্বাভাবিক। তাছাড়া তাদের সংখ্যা-ই বা কত? বাউল সম্প্রদায় বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতো তারাও সমাজে থাকতে পারে। তারা তো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। তারা তাদের মতো থাকুক, আমরা আমাদের মতো থাকি—নো প্রবলেম! মাত্র কয়েক বছর আগেও আমেরিকার সমাজে এমন ধারণা প্রোথিত ছিল। অনেকে তাদের মূল লক্ষ্য অনুধাবন না করেই নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে।

এলজিবিটি পরিচয়ধারী মানুষের সংখ্যা অনেক কম হলেও (সারা বিশ্বে সম্ভবত ১% এর মতো হতে পারে) তারা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ভেঙে-চুরে নতুন করে গড়ে তুলছে 'মানবাধিকার', 'ইনক্লুসিভনেস', 'ডাইভার্সিটি' এবং 'ইক্যুয়ালিটি'-এর মোড়কে। এলজিবিটি মুভমেন্টের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমলিঙ্গের বিবাহের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও সমকামীদের ৯০% বিবাহ করে না। এখানে বিয়ে মুখ্য বিষয় নয়; এটি তাদের সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপার; কোন নৈতিক ইস্যুতে সংখ্যা বিবেচ্য নয়।

লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষার মাধ্যমে এলজিবিটি সামাজিকীকরণ

LGBTQ+ সামাজিকীকরণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। 'লিঙ্গ সমতা' প্রতিষ্ঠার নামে নারী ও পুরুষের জন্মগত পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তথা সমকামিতা-বান্ধব বিশ্ব গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। এই উদ্দেশ্যে অভিধানে নারী ও পুরুষের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে একাডেমিক জার্নাল, পাঠ্যপুস্তক, মেডিকেল অনুষদ এবং মিডিয়ায় জন্মগত ছেলে-মেয়ের পরিচিতির বদলে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে, যা জৈবিক সেক্সের স্বীকৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণকে সমর্থন করে New England Journal of Medicine প্রস্তাব করেছে যে, জন্ম সনদে লিঙ্গ পরিচয়ের বদলে জেন্ডার পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

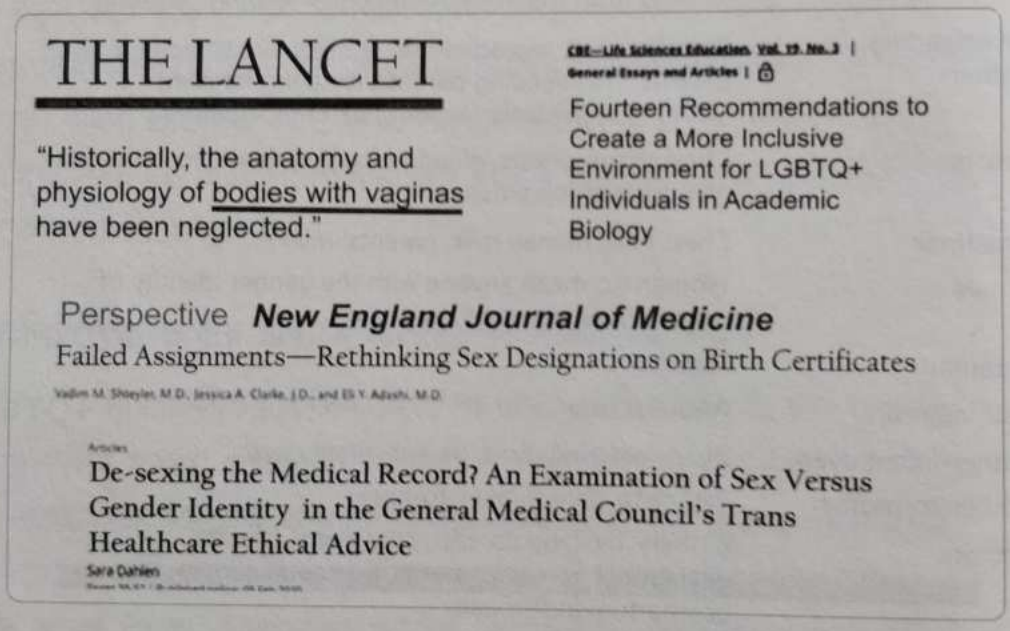
'লেডিস এবং জেন্টেলম্যান' বা 'বয়েজ" এবং গার্লস' শব্দের জায়গায় এখন

ব্যবহার করা হচ্ছে 'Hello everyone' বা 'Hi folks'-এর মতো সম্বোধন। নতুন নতুন লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দও প্রচলন করা হচ্ছে—যেমন, 'Birthing people' (mother), 'People with vaginas' (female), 'People with testes' (male), 'Breastfeeding' (Chestfeeding), 'Pibling' (Aunt/Uncle) এবং 'Nibling' (Nephew/Niece)।

মেডিকেল সেক্টরে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাষা চিকিৎসকদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে (নীচের টেবিল দেখুন)[৭]।

Sexed terms	Replacement desexed terms
Birthing women	Birth givers, birth persons, birthers, birthing bodies, birthing families, birthing parents, birthing people, laborers
Breastfeeding	Body feeding, breastfeeding/chestfeeding, chestfeeding, feeding from the body, human milk feeding. lactating
Breastfeeding mothers	Breastfeeders, breastfeeding families, breastfeeding parents, chestfeeding parents, lactating families, lactating individuals, lactating parents, lactators
Breasts	Chest tissue, chests, glands, lactating tissue, mammary glands, mammary tissue
Breastmilk	Chest milk, human milk, parents' milk
Female	Woman (to mean anyone with the gender identity of woman irrespective of their sex)
Maternal	Parental
Maternity care	Perinatal care
Mother-infant dyad	Dyad, lactating dyad, parent-infant dyad
Mother-to-mother	Parent-to-parent, peer-to-peer
Mothers	Birthers, birthing parents, caregivers, families, gestational parents, parents, postnatal people, postpartum individuals
Non-pregnant women	Non-pregnant people, non-pregnant persons
Pregnant women	Birth givers, childbearing person, expectant parents, expectant persons, gestational carriers, gestators, pregnant families, pregnant patients, pregnant people, pregnant persons, service users
Sex	Gender, sex/gender
Women	Birth people, bodies with vaginas, cervix havers, menstruators, non-males, non-men, people, people with a cervix, people with vaginas, uterus havers, vulva owners

বিখ্যাত Harry Potter বইয়ের লেখিকা জে. কে. রোলিং, ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের কারণে ভাষায় পরিবর্তন নিয়ে মতামত দেওয়ার পর থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'মাসিক' (menstruation) তো শুধু মেয়েদেরই হয়, তাহলে এখানে 'people' শব্দটি কেন ব্যবহার হচ্ছে?" এক টুইটে তিনি লিখেছিলেন: "'People who menstruate.' I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?" এই টুইটের পর থেকে গত দুই বছর ধরে রোলিংকে ট্রান্সফোবিক বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন: "If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased," অর্থাৎ, "যদি সেক্স (জন্মগত লিঙ্গ) সত্যিকারের কিছু না হয়, তাহলে নারীদের বাস্তবতা মুছে যায়, এবং 'নারী' বলে কিছুই আর থাকবে না।"


THE LANCET

"Historically, the anatomy and physiology of bodies with vaginas have been neglected."

CBE—Life Sciences Education Vol. 19, No. 3 | General Essays and Articles

Fourteen Recommendations to Create a More Inclusive Environment for LGBTQ+ Individuals in Academic Biology

Perspective **New England Journal of Medicine**

Failed Assignments—Rethinking Sex Designations on Birth Certificates

Vadim M. Shteyler, M.D., Jessica A. Clarke, J.D., and Eli Y. Adashi, M.D.

Articles

De-sexing the Medical Record? An Examination of Sex Versus Gender Identity in the General Medical Council's Trans Healthcare Ethical Advice

Sara Dahlen

ছবিতে- জার্নালে প্রকাশিত শিরোনামের স্ক্রিনশট



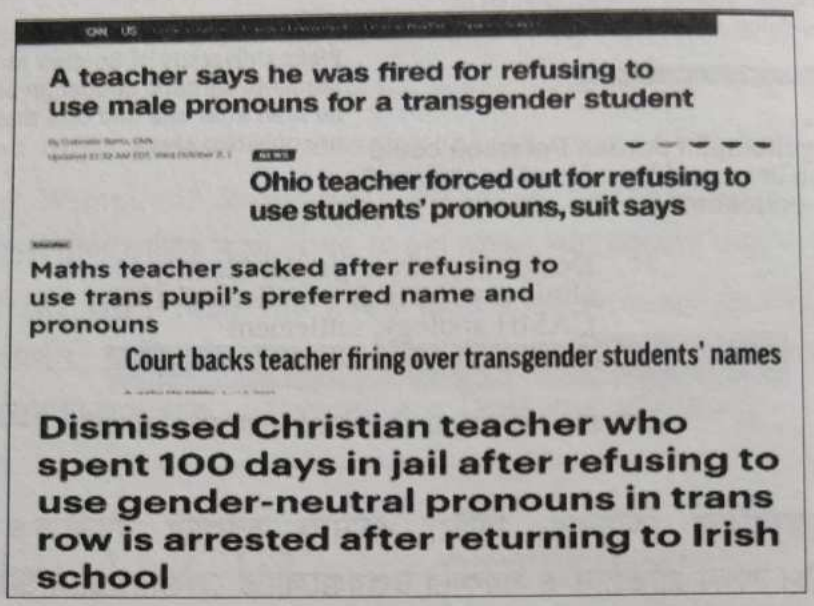
ছবিতে- বিশ্বমিডিয়ায় প্রকাশিত শিরোনামের স্ক্রিনশট

আন্তর্জাতিক সেমিনার, মিটিং, এমনকি সরকারি নীতিতেও পরিবর্তন আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরগুলোতে জেন্ডার প্রোনাউন (gender pronouns) ব্যবহারে যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তাতে স্বাভাবিক আলোচনাও ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়বে। লিংকডইনে নতুন আইডেন্টিটি অপশন চালু করে 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' গড়ার ব্যানারে সবাইকে এটি ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু এই 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' নির্মাণের নামে সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে গিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ পরিচয়কে মুছে ফেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যারা যৌক্তিকভাবে ট্রান্সজেন্ডার রাজনীতির প্রতিবাদ করছেন, তাদেরকে ট্রান্সফোবিক বলে আখ্যা দিয়ে থামিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাদের চাকরির নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ছে। এমনকি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার করার মতো ঘটনাও ঘটছে।

জেন্ডার প্রোনাউন্স (সর্বনাম) ইস্যুতে চাকুরিচ্যুতি, জেল

ট্রান্সজেন্ডাররা নিজেদের সঠিক পরিচয় প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার প্রোনাউন (he/she/they ইত্যাদি) ভুলভাবে ব্যবহার করাকে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অসম্মানজনক বলে মনে করেন। কারও পছন্দমতো প্রোনাউন ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার না করা, ভুল জেন্ডার ভাষা ব্যবহার করা বা 'ডেডনেম' (ট্রান্স হওয়ার আগের নাম) দিয়ে সম্বোধন করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা,

ওহাইও, ভার্জিনিয়া এবং ইংল্যান্ডের আয়ারল্যান্ড ও সুইডেনে জেন্ডার প্রোনাউন ব্যবহারের ভুলের কারণে ৫টি চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে।



ছবিতে- বিশ্বমিডিয়ায় প্রকাশিত শিরোনামের স্ক্রিনশট

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার নারী-কর্তৃক জন্মগত নারীদের স্থান দখল

নারী অধিকার নিয়ে সবসময় সোচ্চার থাকা পশ্চিমা বিশ্ব, ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নারীদের অধিকার হরণ করার নীতি বাস্তবায়ন করছে। অলিম্পিক কমিটি তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে ট্রান্সজেন্ডারদের অংশগ্রহণ সহজ করতে নারী ও পুরুষের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো পুরুষ নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী ঘোষণা করলেই নারীদের ইভেন্টে অংশ নিতে পারে; শুধু শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে আনলেই চলবে। তবে, হরমোনের মাত্রা কমালেও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য—যেমন ফুসফুসের আকার, পেশির শক্তি ও হাড়ের ঘনত্ব পরিবর্তিত হয় না, যা একজন ট্রান্সজেন্ডার নারীকে প্রতিযোগিতায় প্রকৃত নারীদের তুলনায় শারীরিক সুবিধা দেয় [৮]।

নিউজিল্যান্ডের ট্রান্স নারী (জন্মগত পুরুষ), Laurel Hubbard ভার-উত্তোলনে (ওয়েটলিফটিং) কলেজ পর্যায়ে পুরুষ হিসেবে রেকর্ডও করেছিল স্থানীয়

প্রতিযোগিতায়; কিন্তু ২০১২-তে সে মেয়ে হিসেবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে কয়েকটি পদক জিতে নেয় মহিলা ইভেন্টে[৯]। ক্রিকেটার ম্যাক্সিন ব্লিথিন কেন্ট কাউন্টির টিমে প্রথম ট্রান্স মহিলা হিসেবে অংশ নেয়া তার ব্যাটিং গড় ছিল ১২৪ রান। কিন্তু পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে ব্যাটিং গড় ছিল মাত্র ১৫ রান! [১০] টোকিও অলিম্পিকে ট্রান্স মেয়ে Quinn (আদতে পুরুষ) সেরা খেলোয়াড় হিসেবে কানাডার মহিলা ফুটবল দলকে টুর্নামেন্টের গোল্ড মেডেল জিতিয়ে আনতে ভূমিকা রাখেন[৮]।

ট্রান্সজেন্ডার কয়েদী নিয়ে জেলখানা বিপাকে এবং স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ !

আমেরিকায় ডেমি মাইনর নামে একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগতভাবে পুরুষ) জেলখানায় তার সেলের দুজন প্রকৃত নারীকে গর্ভবতী করে ফেলে[১১]। অন্যদিকে ক্যারেন ওয়াইট নামে ৫২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে শিশুকামিতা, নারী ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়[১২]। জেলে যাওয়ার আগে সে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঘোষণা করে। যেহেতু ট্রান্সজেন্ডার প্রমাণের জন্য কোনো মেডিকেল পরীক্ষা নেই, তাই তার ঘোষণাই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। জেলে কিছুদিন পর দেখা যায়, ক্যারেন দুজন নারীকেও যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ করেছে।

স্কটল্যান্ডেও একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। ধর্ষণ মামলার আসামি আইলা ব্রাইসন জেলে যাওয়ার আগে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঘোষণা করে, এবং নিয়ম অনুযায়ী তাকে নারীদের জেলে রাখা হয়। পরে অভিযোগ ওঠে যে, সে তার সেলের নারী সঙ্গীকে ধর্ষণ করেছে। এই ঘটনা নিয়ে স্কটল্যান্ডের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, কারণ তখনকার প্রধানমন্ত্রী নিকোলা স্টারজেন ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আইন পরিবর্তনের জন্য কাজ করছিলেন, যাতে ১৬ বছরের যে-কেউ মৌখিক ঘোষণা দিয়েই ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। পরবর্তীতে, ২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, এই ইস্যুতে সৃষ্ট বিতর্কের জেরে নিকোলা স্টারজেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন[১৩]।

বাথরুম নিয়ে মারাত্মক বিড়ম্বনা

ট্রান্সজেন্ডাররা পাবলিক প্লেসে কে কোন টয়লেট ব্যবহার করবে, তা নিয়ে তৈরী হয়েছে বিশাল বিতর্ক; যেমন- ৭০ বয়সী একজন পুরুষ যিনি ৩ সন্তানের পিতা বুড়ো বয়সে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী ঘোষণা দেন। তিনি নিজেকে নারী মনে করে জন্মগত নারীদের টয়লেট-লকার রুম ব্যবহার করেন, এতে প্রাইভেসি নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে প্রকৃত মেয়েরা[১৪]।

সুবিধা আদায়ে পুরুষ পুলিশদের ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় ধারণ!

এটি স্পেনের ঘটনা। পুরুষ পুলিশ সদস্যরা প্রতি বছর $২৫৫৪ ডলারের পোশাক ভাতা পান। অন্যদিকে, একজন জেন্ডার-নিউট্রাল বা নন-বাইনারি কর্মী স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীদের পোশাক ভাতা পান, যা পুরুষদের তুলনায় প্রায় $১১০০ বেশি। ২০২২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেদেরকে নারী বা পুরুষ বলে মনে না করে ভিন্ন কিছু মনে করেন। অতিরিক্ত ভাতা সুবিধা পেতে আরও ১১১ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেদেরকে জেন্ডার-নিউট্রাল বা নন-বাইনারি হিসেবে ঘোষণা করেছেন[১৫]।

মেয়েদের জব ফেয়ারে ছেলেদের হানা!

আমেরিকার ফ্লোরিডায় (৩ অক্টোবর ২০২৩) নারীদের জন্য অনুষ্ঠিত জব ফেয়ারে (আইটি) ছেলেরা নিজেদের নন-বাইনারী (যারা নিজেদের প্রচলিত নারী বা পুরুষ মনে করে না) পরিচয় দিয়ে ইন্টারভিউ দিতে লাইনে দাঁড়ায়। পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় অবশেষে সেই জব ফেয়ার পন্ড হয়ে যায়! এটা নিয়ে Newsweek শিরোনাম করে—"Men Flood Women's Job Fair After 'Lying' About Being Nonbinary"[১৬]। মিডিয়া ব্যাপারটি এমনভাবে উপস্থাপন করছে যেন বিষয়টি তাদের অজানা! এতদিন তারাই নন-বাইনারি ধারণা প্রচার করে এসেছে। এখানে শুধু মুখে ঘোষণা (self-identified) দিয়ে নারীকে ভিন্ন লিঙ্গের পরিচয় দিতে পারে, কোনো মেডিকেল পরীক্ষারও প্রয়োজন নেই।

মেয়ের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে এক মায়ের খোলা চিঠি

এই আবেগঘন খোলা চিঠি নিউ ইয়র্ক পোস্ট পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এই শিরোনামে—"'Justice' for Trans Athletes Is Unfair to Girls Like My Daughter." আমার মেয়ে অ্যালানা, একজন মেধাবী দৌড়বিদ, যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যের হাইস্কুল টিমের নেতৃত্ব দিয়ে ১০০, ২০০ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে স্থানীয় রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অ্যালানা দিন-রাত, এমনকি ছুটির দিনেও প্রশিক্ষণ নিয়েছে। সে দ্রুত দৌড়ানোর জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়ে প্র্যাকটিস করেছে, প্রতিটি সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পর্যন্ত সময় কমানোর লক্ষ্যে।

২০১৭ সাল থেকে আমাদের রাজ্যের হাইস্কুল অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ট্রান্স মেয়েদের (জন্মগতভাবে ছেলে) প্রকৃত মেয়েদের ইভেন্টে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে দুজন ট্রান্স মেয়ে ১৫টি পদক জিতে নিয়েছে। কিন্তু অনুমতির আগের বছর, অর্থাৎ ২০১৬ সালে, ৯ জন প্রকৃত মেয়ে এই খেতাবগুলো পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দুজন ট্রান্সজেন্ডার ৫০ জন মেয়ের সুযোগ হরণ করেছে, যার ফলে বেদনার সাথে তাদের প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসেবে থাকতে হয়েছে। একজন মা হিসেবে, এটা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আমার মেয়ে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যতই কঠোর পরিশ্রম করুক না কেন, সে একটি ভয়ানক জেন্ডার মতাদর্শের কাছে অ্যাথলেটিক সুযোগ হারাচ্ছে। এই অবিচার যদি বন্ধ না করা হয়, তবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েরা শুধু অন্যায্যভাবে বঞ্চিত হতে থাকবে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সাক্ষী হওয়া আমার জন্য অসহ্য।

আমেরিকার বিখ্যাত আমেরিকান টিভি হোস্ট এবং কমেডিয়ান বিল মাহের আক্ষেপ করে বলেন, আগে যখন শিশুদের জিজ্ঞাসা করা হতো—'বড় হয়ে কী হতে চাও?', তারা সাধারণত কোনো পেশা বা ক্যারিয়ারের কথা বলত। কিন্তু এখন সেই প্রশ্নের জবাব অনেক সময় জেন্ডার ভাবনার দিকে চলে যাচ্ছে[১৭]।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ সমকামিতার একটি চরমপন্থী রূপ

এলজিবিটি ছাতার অন্তর্গত ট্রান্সজেন্ডারবাদ সমকামিতা মতবাদের চরমপন্থী একটি শাখা। সমলিঙ্গ বা উভয় লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণের কারণে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়, যা হতে পারে বেশভূষা বা মেডিকেল চিকিৎসার মাধ্যমে। একজন পুরুষ নিজেকে নারী বা একজন নারী নিজেকে পুরুষ হিসেবে দাবি

করতে পারে এবং এটি কোনো মেডিকেল পরীক্ষার প্রয়োজন ছাড়াই, শুধুমাত্র আত্ম-অনুভূতির ভিত্তিতে হতে পারে। অন্যদিকে, লেসবিয়ান (নারী সমকামী), গে (পুরুষ সমকামী), এবং বাইসেক্সুয়াল (উভয়কামী) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মনের ইচ্ছামতো নিজেকে নারী বা পুরুষ দাবি করা এবং সমাজকে তা মেনে নেওয়ার ধারণা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ, যা একটি অতি বৈপ্লবিক আদর্শ। এই মতবাদ যে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে, তা সহজেই অনুমেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে সমকামী অ্যাক্টিভিস্টদের কেউ কেউ ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। কট্টর ট্রান্সজেন্ডার-বিরোধী হিসেবে পরিচিত প্রফেসর ক্যাথলিন স্টক (যিনি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে পদত্যাগে বাধ্য হন) এবং বিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ব্যক্তিগতভাবে লেসবিয়ান, অর্থাৎ নারী সমকামী। নারীবাদী হিসেবে তারা মনে করেন যে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ নারীদের অস্তিত্ব মুছে দিতে চায়।

LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম অধ্যাপক রবার্ট উইন্টেমুট (Robert Wintemute, কিংস কলেজ লন্ডন) ইদানীংকালে ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন[১৮]। ইন্দোনেশিয়ার এক দ্বীপে ২০০৬ সালে সমকামীদের মানবাধিকার আইনের নীতিমালা তৈরীর জন্য আয়োজিত সম্মেলনে রবার্ট উইন্টেমুটের আমন্ত্রণে শেষ মুহূর্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্টিফেন হুইটল, যিনি ট্রান্সজেন্ডার আইনজীবী হিসেবে পরিচিত। যোগ্যাকার্তা নীতিমালায় (Yogyakarta Principles) ট্রান্সজেন্ডার বিষয়টি (Gender Identity) অন্তর্ভুক্ত করতে হুইটলের ভূমিকা ছিল[১৯]। যে রবার্ট উইন্টেমুট LGBTQ+ মানবাধিকার নীতিমালা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনিই এখন ট্রান্সজেন্ডার আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু আপত্তি উপস্থাপন করছেন। বিশেষত, নারীদের অধিকার এবং কেবলমাত্র নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এই অবস্থানের কারণে তিনি LGBTQ+ কর্মীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে রাখছি, ব্লাস্ট নামক এনজিও (মানবাধিকার আইন নিয়ে কাজ করে)-এর আমন্ত্রণে অধ্যাপক রবার্ট উইন্টেমুট বাংলাদেশে এসেছিলেন সমকামী অধিকার ইস্যুতে। ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশে সমকামী অধিকার বাস্তবায়নে ব্র্যাকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্লাস্ট কাজ করছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিষয়টি উপমার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাক। ইসলামিক বা বাম আদর্শে বিশ্বাসী যেকোনো গ্রুপ চরমপন্থার আশ্রয় নিতে পারে (যেমন- আইসিস বা সর্বহারা কমিউনিস্ট পার্টি) LGBTQ+ ছাতায় অন্তর্ভুক্ত ট্রান্সজেন্ডারবাদও তেমনি একটি চরমপন্থী ধারণা, যা সমাজের নারী, পুরুষ, মাতৃত্ব, পিতৃত্বের সংগাগুলোকেই চ্যালেঞ্জ করে।

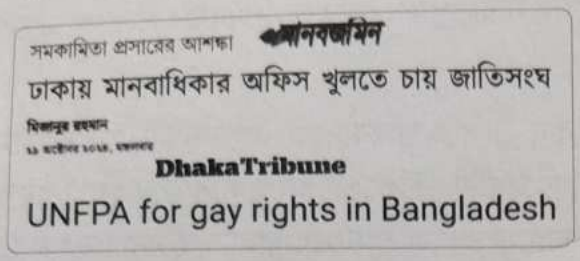
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কেন ট্রান্সজেন্ডারবাদকে এলজিবিটি আন্দোলনের অগ্রভাগে রাখা হলো? এটিকে সুদূরপ্রসারী কৌশলের অংশ বলে মনে হয়। চরমপন্থী ভার্সন প্রচারের মাধ্যমে সমকামিতার স্বাভাবিক ভার্সনের সামাজিকীকরণ সহজ হতে পারে। উল্লেখ্য যে, ট্রাম্প ২০২৪ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। খেয়াল করলে দেখা যায়, ট্রাম্প এবং ইলন মাস্ক ১৮ বছরের নিচে শিশুদের জেন্ডার ডিসফোরিয়া নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন এবং পিতামাতার অনুমতি ছাড়া যেন শিশুরা পিউবার্টি ব্লকার নিতে না পারে, এই বিষয়ে কথা বলছেন; কিন্তু তারা সমকামিতার বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না। যদিও আমেরিকার রিপাবলিকান রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল, তারা জনপরিসরে এলজিবিটিকে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে, ধর্মীয় ইস্যু হিসেবে নয়। কিন্তু মুসলিমদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈমানিক বিষয়।

এলজিবিটি বৈশ্বিক সিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে

জাতিসংঘ নামক আন্তঃদেশীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে; এবং এটি করা হচ্ছে মানবাধিকারের মোড়কে অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে। শব্দের কারসাজিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রকল্পে এলজিবিটি এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যেমন- 'কাউকে বাদ না দিয়ে' বা 'Leaving no one behind'—এমন স্লোগানের আড়ালে এলজিবিটি বিষয়কে প্রচার করা হচ্ছে। এখন এটি আর যৌন আচরণগত বিষয় নয়; এটি বিশ্ব সিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে, এবং সবকিছু এলজিবিটি ফ্রেমওয়ার্কে বেঁধে ফেলা হচ্ছে।

সম্প্রতি ১৬০০+ ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ গড়ার প্রস্তাব নিয়ে পশ্চিমা দেশের প্রতিনিধিরা দৌড়ঝাঁপ এবং লবিং করছে। ইতিমধ্যে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের অফিস খোলার বিষয়টিও অনেক দূর

এগিয়েছে। এই সংস্থার অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হলো সমকামী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের সংস্থা UNFPA বাংলাদেশে সমকামী অধিকার বাস্তবায়নে সরকারকে চাপ দেয়। পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা এবং সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিলেও জাতিসংঘ অনেকদিন ধরেই সোচ্চার রয়েছে।


সমকামিতা প্রসারের আশঙ্কা মানবজমিন
ঢাকায় মানবাধিকার অফিস খুলতে চায় জাতিসংঘ
DhakaTribune
UNFPA for gay rights in Bangladesh

২০১৫ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তি সূচক (Inclusion Index) তৈরির কাজ শুরু করে, যার লক্ষ্য হচ্ছে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো সহজভাবে তুলে ধরে সমাধান করা[২০]। জাতিসংঘের ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই LGBTQI সূচকটি তৈরি করা হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সবাইকে উন্নয়নের আওতায় আনা।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের জন্য LGBTQI সূচক তৈরির প্রকল্প (Mobilising for a Research Revolution to Ensure LGBTQ Inclusion in Asia: A High-Impact, Transformative International Partnership - MFARR-ASIA) ২০১৯ সাল থেকে কাজ করছে[২১]। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পরিবার, সহিংসতা/নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ— এই ছয়টি ক্ষেত্রে LGBTQI অন্তর্ভুক্তির পরিমাপ এবং পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

এই বইয়ের সামনের পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা দেখতে পাব জাতিসংঘসহ পশ্চিমা দাতা সংস্থাগুলো কীভাবে সমতা ও মানবাধিকার আড়ালে বাংলাদেশে LGBTQ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে।

References

1. Life on an NHS transgender waiting list. https://www.bbc.com/news/uk-england-68588724.

2. 'An explosion': what is behind the rise in girls questioning their gender identity? | Transgender | The Guardian. https://www.theguardian.com/society/2022/nov/24/an-explosion-what-is-behind-the-rise-in-girls-questioning-their-gender-identity.

3. The Surge in Referral Rates of Girls to the Tavistock Continues to Rise - Transgender Trend. https://www.transgendertrend.com/surge-referral-rates-girls-tavistock-continues-rise/.

4. Rainbow Britain Report (2022). Stonewall https://www.stonewall.org.uk/resources/rainbow-britain-report-2022 (2022).

5. Chavez, N. Gen Z adults identify as LGBTQ at much higher rates than older Americans, report shows. CNN https://www.cnn.com/2024/01/25/us/gen-z-adults-lgbtq-identity-reaj/index.html (2024).

6. Apple, Microsoft, PayPal join legal fight for transgender rights. https://money.cnn.com/2017/02/24/technology/tech-transgender-amicus-brief/index.html.

7. Frontiers | Effective Communication About Pregnancy, Birth, Lactation, Breastfeeding and Newborn Care: The Importance of Sexed Language. https://www.frontiersin.org/journals/global-womens-health/articles/10.3389/fgwh.2022.818856/full.

8. Canada's Quinn Makes History As First Openly Transgender And Nonbinary Athlete To Win Olympic Medal. https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/08/06/canadas-quinn-makes-history-as-first-openly-transgender-and-nonbinary-athlete-to-win-olympic-medal/?sh=4d0e4a3ad61e.

9. Trans Athletes Are Posting Victories and Shaking Up Sports | WIRED. https://www.wired.com/story/the-glorious-victories-of-trans-athletes-are-shaking-up-sports/.

10. Kent transgender cricketer reignites row over who should be allowed to play women's sports | Daily Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7369619/Kent-transgender-cricketer-reignites-row-allowed-play-womens-sports.html.

11. Millward, D. Trans inmate impregnates two other prisoners. The Telegraph (2022).

12. Evans, M. & Davies, G. Transgender prisoner born a male who sexually assaulted female inmates after being jailed for rape is sentenced to life. The Telegraph (2018).

13. Archive, V. A. & feed, G. author R. Scotland's Nicola Sturgeon quits amid anger at transgender law. https://nypost.com/2023/02/15/scotlands-nicola-sturgeon-quits-amid-anger-at-transgender-law/ (2023).

14. It's REALLY Happening (Trans enters female bathroom and this happened) -YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oCdKKco1tRs.

15. Victoria police investigate allegations officers are describing themselves

as gender neutral to claim higher pay | Sky News Australia. https://www.skynews.com.au/australia-news/crime/victoria-police-investigate-allegations-officers-are-describing-themselves-as-gender-neutral-to-claim-higher-pay/news-story/d297e79c334b5d718db54e158b905594.

16. Men Flood Women's Job Fair After 'Lying' About Being Nonbinary - Newsweek. https://www.newsweek.com/men-attend-women-job-fair-lie-about-being-nonbinary-1832042.

17. (279) New Rule: Along for the Pride | Real Time with Bill Maher (HBO) - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mMBzfUj5zsg.

18. The trans rights that trump all | Julie Bindel and Melanie Newman. The Critic Magazine https://thecritic.co.uk/issues/april-2021/the-trans-rights-that-trump-all/ (2021).

19. Stephen Whittle: "The Yogyakarta Principles provide guidance and are a constant reference point" | Heinrich Böll Stiftung. https://www.boell.de/en/2016/07/20/yogyakarta-principles-provide-guidance-and-are-constant-reference-point.

20. 2024 LGBTI Inclusion Index: Report on the Pilot Implementation. UNDP https://www.undp.org/publications/2024-lgbti-inclusion-index-report-pilot-implementation.

21. Mobilizing for a Research Revolution to Ensure LGBTIQ Inclusion in Asia: A High-impact, Transformative International Partnership (MFARR-Asia) - Partnership Grants. https://cognit.ca/en/project/187472.

এলজিবিটি ইতিহাস: বার্লিন থেকে ব্ল্যাক

সমকামিতা নিয়ে মানব ইতিহাসে প্রথম আলোচনা হয় ৪০০০ বছর আগে, যা প্রফেট আব্রাহামের (ইসলামে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম নামে পরিচিত) সময়ে ঘটেছিল। এই ঘটনা কওমে লুত-এর ঘটনাবলী হিসেবে পরিচিত। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের (যিনি ইসলাম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের নবি) আপন ভাতিজা ছিলেন লুত ইবনে হারান। তিনি ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের সাথে কেনান অঞ্চলে হিজরত করেন। বাইবেল এবং কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, লুত আলাইহিসসালামকে সদোম ও গোমোরাহ শহরের অধিবাসীদের জন্য নবি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তিনি কুরআনে উল্লিখিত ২৫ জন নবির অন্যতম, যাকে আল্লাহ তাআলা সমকামিতায় লিপ্ত লোকদের সতর্ক করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। যখন তারা এই অনৈতিক আচরণ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে সুরা ১৫, ২৬, ২৯, এবং ৬৬ এর বিভিন্ন আয়াতে লুত আলাইহিসসালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

> 'আর লুতকে আমি নবি বানিয়ে প্রেরণ করেছি। তারপর স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, "তোমরা কি এতই লজ্জাহীন হয়ে গেলে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা কি নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে যৌনাচার করছো? তোমরা তো একেবারেই সীমালঙ্ঘনকারী গোষ্ঠী।" কিন্তু তার সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল, "এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও; এরা পবিত্রতার ধ্বজাধারী হওয়ার ভান করে।" শেষ পর্যন্ত আমি লুত আলাইহিসসালাম এবং তাঁর অনুসারী পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি, শুধুমাত্র তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে, কারণ সে পেছনে থাকা অন্যদের সঙ্গেই ছিল। পরে আমি তাদের ওপর ধ্বংসের বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণতি হয়েছিল দেখো।' (সুরা আরাফ, ৮০-৮৪)।

> 'স্মরণ করো লুতের কথা, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "তোমরা কেন এমন অশ্লীল কাজ করছো, যার পরিণতির কথা তোমরা জানো না? তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের সাথে যৌনাচার করবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়।" উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় বললো, "লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, কারণ তারা নিজেদের পবিত্রতার ভান করে।" এরপর আমি লুত আলাইহিসসালাম ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে, কারণ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকার জন্য নির্ধারিত ছিল।' (সুরা নামল, ৫৪-৫৭)

> রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি আমার কওমের জন্য সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ের আশঙ্কা করি, তা হলো, লুতের কওম যা করত, সেটা যদি কেউ করে...' (তিরমিজি, ১৪৫৭)

ইসলাম ধর্মে সমকামী আচরণকে সর্বদা চরম গর্হিত কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, এবং গত ১৪০০ বছরে এই অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে খ্রিষ্টান ধর্মসহ অন্যান্য বেশিরভাগ ধর্মে একসময় সমকামী আচরণকে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। সম্প্রতি, খ্রিষ্টান ধর্মগুরু পোপ সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্কের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন যে, রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতরা সমলিঙ্গ দম্পতিদের আশীর্বাদ করতে পারেন। ("Pope says Roman Catholic priests can bless same-sex couples")[১]। এটি নিয়ে ইউরোপিয়ান এবং আফ্রিকান চার্চ লিডারদের মধ্যে বিভেদ তৈরী হয়েছে ("Same-sex blessings open rift between Vatican and African churches")[২]।

ঐতিহাসিকভাবে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান সমকামী কার্যকলাপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কঠোর শাস্তি আরোপের আইন করেন। ৫৩৮ সালে নোভেল ৭৭-এ তিনি সমকামী আচরণকে ব্লাসফেমাস তথা ধর্মবিরোধী বলে চিহ্নিত করেন[৩]। তিনি দাবি করেন, এই কার্যকলাপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। ৫৪৪ সালে জাস্টিনিয়ান নোভেল ১৪১-এ পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন যে সমকামী আচরণ একটি অপছন্দনীয় বিষয় এবং তা বন্ধ করা যেতে পারে। তিনি নিউ টেস্টামেন্ট থেকে 'কন্ট্রা ন্যাচুরাম' ('প্রকৃতির বিপরীতে') শব্দটি

প্রবর্তন করেন। ১৫৩৩ সালে যুক্তরাজ্য বাগারি অ্যাক্ট (Buggery Act) প্রণয়ন করে সমকামিতাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে। তিন শতাব্দী পর, ১৮৬১ সালে, যুক্তরাজ্যের অফেন্সেস এগেইনস্ট দ্য পার্সন অ্যাক্ট সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নির্ধারণ করে।

কার্ল হাইনরিখ উলরিখস: সমকামী পরিচয়ের অগ্রদূত

কওমে লুতের ঘটনার চার হাজার বছর পর ২৯ আগস্ট, ১৮৬৭-এ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। মিউনিখে জার্মান আইনজ্ঞদের একটি সম্মেলনে অংশ নিয়ে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস পায়ুসঙ্গম বিরোধী আইন (প্যারাগ্রাফ ১৭৫) বাতিলের দাবি জানান [৪]। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই আইন প্রাকৃতিক 'যৌন তাড়না' চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে কিছু মানুষকে বৈষম্যের শিকার করছে। যদিও সম্মেলনে উপস্থিত ৫০০ আইনজ্ঞ, সরকারি কর্মকর্তা এবং একাডেমিশিয়ানরা দুয়ো দিয়ে উলরিখসকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন, তবুও তিনি তার বক্তব্যকে একটি সফল প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেন।

কার্ল হাইনরিখ উলরিখস ১৮২৫ সালের ২৮ আগস্ট হ্যানোভার রাজ্যে (বর্তমান জার্মানি) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন স্থপতি, এবং তার দুই বোন ছিল। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি তার বাবাকে হারান। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন লাজুক এবং কিছুটা অন্তর্মুখী। চৌদ্দ বছর বয়সে উলরিখস তার স্কুলের এক পুরুষ প্রশিক্ষকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন, যা তাকে সারাজীবন তাড়িত করেছে।

স্কুল শেষ করে উলরিখস গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও ধর্মতত্ত্বে পড়াশোনা করেন। পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ল'তে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি সরকার পক্ষের উকিল হিসেবে যোগ দেন এবং ১৮৫৩ সালে জেলা সহকারী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান। ছোট একটি শহরের বিচারক হিসেবে তাকে প্রায়ই সরাইখানা এবং অন্ধকার গলির সন্দেহজনক লোকদের সান্নিধ্যে দেখা যেত। শেষ পর্যন্ত উলরিখসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সরকারি তদন্তে তা প্রমাণিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ১৮৫৪ সালে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এরপর থেকে তিনি তার যৌন প্রবৃত্তিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। (... a new career began as he justified his erotic

interests to himself and came out to his family.) [৫]।

১৮৬৪ সালে উলরিখস 'আরনিং প্রেম' (Urning love) এর সমর্থনে একটি ছদ্মনামে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে আরও ১২টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এসব প্রকাশনায় উলরিখস যৌন-প্রেম (sex-love) সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তার মতে, 'আরনিং' (সমকামী) পুরুষদের "সত্যিকারের পুরুষদের" প্রতি আকর্ষণের কারণ হলো পুরুষের দেহে আটকে থাকা নারীসুলভ আত্মা। উলরিখস জোর দিয়ে বলেন, 'আরনিং প্রেম' সহজাত এবং পুরোপুরি স্বাভাবিক, যদিও বিরল। পরবর্তীতে তার তত্ত্বটি এমন পুরুষদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে বিস্তৃত হয়, যারা পুরুষালি এবং পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট, এবং এমন নারীদেরকেও যারা নারীদের ভালোবাসে[৫]। এই ধারণাগুলো পরে ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়।

১৮৬৫ সালে মিলে জার্মানির শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, বিচারক এবং আইনপ্রণেতাদের একটি গ্রুপকে সমকামিতা অপরাধমুক্ত করার বিষয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। এই প্রস্তাবনাটি এতটাই বিতর্কিত ছিল যে, তারা আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়, আইনগত সুপারিশ তো দূরের কথা। দুই বছর পর, ১৮৬৭ সালে, তিনি জনপরিসরে সমকামিতা অপরাধমুক্ত করার দাবী জানান[৫]।

উলরিখসের কিছু তাত্ত্বিক ধারণা আধুনিক সমকামী অধিকার আন্দোলনে ভিত্তি তৈরী করেছে[৬]।

সমকামিতা জন্মগত: তিনি ঘোষণা করেন যে, সমকামী যৌনতা জন্মগত এবং প্রাকৃতিক তথা সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর মানে হলো, যেহেতু এটি প্রাকৃতিক, তাই এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়; কারও জন্মের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

তৃতীয় লিঙ্গের ধারণা: তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমকামীরা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ (অর্থাৎ, একটি আলাদা পরিচয়ের মানুষ), যারা জন্মগতভাবেই বিষমকামী বা অসমকামী (পুরুষ ও নারী) থেকে আলাদা। সেই সময়ে, এই শ্রেণীর মানুষদের বর্ণনা করার জন্য ইতিবাচক কোনো শব্দ ছিল না, শুধুমাত্র নেতিবাচক এবং আচরণ-ভিত্তিক 'সডোমাইট' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। উলরিখস তাই 'আরনিং' শব্দটি তৈরি করেন। পরে, হাঙ্গেরিয়ান কার্ল মারিয়া কের্টবেনি 'সমকামী' শব্দটি প্রবর্তন করেন। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, ফলে তারা হয় পুরুষ বা নারী। কিন্তু যেসব ভ্রূণ 'আরনিং' হিসেবে বেড়ে ওঠে, তাদের

শারীরিক বিকাশ পুরুষের মতো হলেও মানসিক বিকাশ নারীর মতো হয়। এই ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ পুরুষ বা নারী না হওয়ায় তারা একটি 'তৃতীয় লিঙ্গ' গঠন করে।

যৌন অভিমুখিতা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন) তত্ত্ব: তিনি মানুষের যৌন অভিমুখিতা বা যৌন রুচি সম্পর্কে ধারণা দেন। এর আগে, যৌন আকর্ষণের ভিত্তিতে 'সমকামী' (পুরুষ-পুরুষ বা নারী-নারী) এবং 'বিষমকামী' (পুরুষ-নারী) হিসেবে কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না। পরবর্তীতে 'বাইসেক্সুয়াল' বা 'উভকামী' ধারণাটি যুক্ত হয়, যার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে কিছু মানুষের নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ থাকতে পারে।

সেই সময় যৌনতার ভিত্তিতে আলাদা কোনো পরিচয় ছিল না। পুরুষ পতিতা এবং তাদের খদ্দের, নিজেদেরকে আরনিং বা সমকামী বলে আলাদা শ্রেণী মনে করত না। এদের অনেকের স্ত্রী, সন্তান, পরিবার ছিল। উলরিখস নিজের এক চিঠির মাধ্যমে স্বীকার করেছে যে, *'বার্লিনের পুরুষ পতিতারা আরনিং না'* [৭]। সম-লিংগের যৌনতাকে উলরিখস একটি স্বতন্ত্র পরিচয় হিসেবে গণ্য করে নিজের প্রকাশিত প্যামফ্লেটে লেখেন[৮]-

> 'একজন আরনিং-ও মানুষ। তারও জন্মগত অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। তার যৌনতা প্রকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার। আইনপ্রণেতাদের কোনো অধিকার নেই প্রকৃতিকে ভেটো দেয়ার। তাদের কোনো অধিকার নেই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেয়ার, তাদের অধিকার নেই প্রকৃতি যাদের মধ্যে এই তাড়না তৈরী করেছে, সেসব জীবন্ত প্রাণীদের নির্যাতন করার।'

১৮৯৬ সালে হার্শফিল্ড যখন বার্লিনে থাকা শুরু করেন, তখন শহরটি ইতিমধ্যেই সমকামী পুরুষ (গে) এবং নারী সমকামী (লেসবিয়ান) সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। উলরিখসের বপন করা সমকামী অধিকার আন্দোলনের বীজ, হার্শফিল্ডের নেতৃত্বে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ একটি বৃহৎ আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৮৭০ সালে বিসমার্কের অধীনে জার্মানির একীভূতকরণের ফলে সমকামিতার বিরুদ্ধে আইন আরও বিস্তৃত হয়। এমন সব রাজ্যেও পায়ুসংগমকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যেখানে আগে এ ধরনের আইন ছিল না। অবশেষে, উলরিখস হতাশ হয়ে ১৮৮০ সালে ইতালিতে চলে যান এবং সেখানেই ৭০ বছর বয়সে মারা যান। তিনি জানতেও পারেননি যে, তার শুরু করা আন্দোলন সারা

বিশ্বে, এমনকি বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে 'ব্র্যাক'-এর মতো প্রতিষ্ঠান সমকামী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে।

ম্যাগনাস হার্শফিল্ড: সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ

ম্যাগনাস হার্শফিল্ড, যিনি উলরিখসের চেয়ে চল্লিশ বছরের ছোট এবং পোল্যান্ডে জন্ম নেওয়া একজন ইহুদি পরিবারের সদস্য, ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠেছিলেন। এই জার্মান সমকামী অধিকারকর্মী তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আইনি অধিকার সুরক্ষার জন্য। 'আইনস্টাইন অব সেক্স' নামে খ্যাত হার্শফিল্ড ১৯১৯ সালে বিশ্বের প্রথম যৌনতা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র (Institute for Sexual Research) প্রতিষ্ঠা করেন[৯]। তিনি প্রথম গবেষক হিসেবে দেখিয়েছিলেন যে, সমকামীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তিনি এলজিবিটি সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম কমিউনিটি হেলথ সেন্টারও প্রতিষ্ঠা করেন। হার্শফিল্ড নিজেও সমকামী সঙ্গী নিয়ে তার প্রতিষ্ঠানের ওপরের তলার একটি রুমে থাকতেন।

একাডেমিক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বার্লিনে 'আন্টি ম্যাগনেসিয়া' Aunt Magnesia' নামে পরিচিত একজন ক্রসড্রেসার হিসেবে ড্র্যাগ পারফরম্যান্সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। আজও, ড্র্যাগ শো এলজিবিটি আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে।

১৮৯৭ সালে, হার্শফিল্ড প্রথম এলজিবিটি অধিকার সংগঠন (Scientific-Humanitarian Committee) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জার্মানিতে সমকামিতা অপরাধমুক্তকরণ (ডি-ক্রিমিনালাইজেশন) এবং Paragraph 175 বাতিলের জন্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়, যেখানে ৬,০০০ জন স্বাক্ষরকারীর সমর্থন ছিল[১০]। এই উদ্যোগে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যেমন ইহুদি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, দার্শনিক, একাডেমিক, শিল্পী, এবং রাজনীতিবিদরা প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরের বছর, এই বিষয়টি নিয়ে জার্মান সংসদে বিতর্ক হয়, কিন্তু সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর ফলে, হার্শফিল্ডের কাজকে 'ইহুদি কামনার আগ্রাসী কর্মকাণ্ড' ('an aggressive act of Jewish horniness') বলে আক্রমণ করা হয়।

১৯০৭ সালে এক আর্মি অফিসারের সমকামিতায় জড়িত হওয়ার অপরাধে

বিচার হয়। হার্শফিল্ড সেই অফিসারের পক্ষে বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবী করেন[৯] -

> "Homosexuality was part of the plan of nature and creation just like normal love."

অর্থাৎ, হোমোসেক্সুয়ালিটি প্রকৃতির পরিকল্পনা এবং স্বাভাবিক ভালোবাসার মতো একটি সৃষ্টি।

এতে সাধারণ জনগণ ক্ষেপে যায়। এমনকি তার ছবি ইহুদি-বিরোধী জনপ্রিয় স্লোগানের—"The Jews are our undoing."—পাশে প্রদর্শিত হয়।

২০১৭ সালে, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ইতিহাসের অধ্যাপক হেইকে বাউয়ার হার্শফিল্ডের জীবনী নিয়ে *The Hirschfeld Archives: Violence, Death, and Modern Queer Culture* শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইসরায়েলের *Times of Israel* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর বাউয়ার বলেন, হার্শফিল্ড বুঝতেন যে, 'বিজ্ঞান আসলে রাজনৈতিক' ("Hirschfeld understood that science is political")[৯]। হার্শফিল্ডের মৃত্যুর ৬০ বছর পর ১৯৯৪ সালে, জার্মানিতে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা আইন (Paragraph 175) অবশেষে বাতিল করা হয়।

এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে ট্রান্সজেন্ডারিজমের ইতিহাস। মেডিসিনে পড়াশোনা শেষ করার পর, হার্শফিল্ড আমেরিকার শিকাগো শহরে প্রায় ৮ মাসব্যাপী সফর করেন এবং সমকামীদের উপসংস্কৃতি (homosexual subculture) পর্যবেক্ষণ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করেন।

হার্শফিল্ড সমকামিতা ছাড়াও বিভিন্ন যৌনবিকৃতি নিয়ে কাজ করেছেন, যার মধ্যে ফেটিজমও ছিল। এটিকে এক ধরণের মানসিক রোগ হিসেবে গণ্য করা হতো। কারুর মাঝে কোনো বস্তু বা আচরণকে কেন্দ্র করে যৌন উত্তেজনা তৈরী হতে পারে; যেমন- কেউ কেউ নির্জীব বস্তু, পোশাক, চুল, পা, টেবিলের পা, এমনকি শারীরিক আঘাতেও এক ধরনের যৌন তৃপ্তি লাভ করতে পারে।



ছবি: বার্লিনের ইনস্টিটিউট ফর সেক্সুয়াল রিসার্চে অনুষ্ঠিত কস্টিউম পার্টি, তারিখ এবং ফটোগ্রাফারের নাম অজানা। ম্যাগনাস হার্শফিল্ড (ডানদিকে চশমা পরিহিত) তার সঙ্গী কার্ল গিসের (মাঝখানে) হাত ধরে আছেন। তিনি নিজেও একজন সমকামী ব্যক্তি ছিলেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন 'ট্রান্সভেস্টাইট'। তিনি বার্লিনের ড্র্যাগ সিনে প্রায়শই 'আন্টি ম্যাগনেসিয়া' নামে উপস্থিত হতেন।

ঐতিহাসিকভাবে কিছু মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে, এমন একটি প্রবণতা দেখা যেত (ক্রসড্রেসিং) যেখানে তারা নারীর পোশাক পরিধান করে মানসিক তৃপ্তি পেত। উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ক্রসড্রেসিংয়ের বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ক্রসড্রেসারদের একটি ক্ষুদ্র অংশ নারীর পোশাক পরিধান করে যৌন তৃপ্তি লাভ করে এবং তারা নিজেদেরকে শারীরিকভাবে 'নারী' হিসেবে মনে করে। এদের মধ্যে অনেকেই সাধারণত সমকামী বা উভকামী হন। হার্শফিল্ড এই ক্রসড্রেসারদের জন্য 'ট্রান্সভেস্টাইটিস' (transvestites) নামক নতুন পরিভাষা প্রবর্তন করেন। তিনি রুডলফ রিচটার (Rudolph Richter) নামে একজন ক্রসড্রেসারের ওপর গবেষণা করেন, যিনি দরিদ্র পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন এবং কথিত আছে যে, ছয় বছর বয়সে নিজের পুরুষাঙ্গ (পেনিস এবং শুক্রাশয়) কেটে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। হার্শফিল্ড প্রথমে তাকে নারীতে রূপান্তর করার জন্য লিঙ্গচ্ছেদন (খোজাকরণ) করেন এবং প্রায় ১০ বছর পর কৃত্রিম যোনী প্রতিস্থাপন করেন[১১]।

হার্শফিল্ড বিশ্বাস করতেন যে, প্রজনন অঙ্গের কাঠামোগত পার্থক্য ছাড়া পুরুষ এবং নারী মূলত একই রকম। অর্থাৎ, তিনি প্রাচীনকালের 'একলিঙ্গ মডেল' (One Sex Model)-এ বিশ্বাস করতেন, যেখানে নারীদের প্রজনন অঙ্গগুলো পুরুষদের

তুলনায় উল্টো এবং অপরিপূর্ণ বলে ধরা হয়। এই তত্ত্বের প্রবক্তা গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেন মনে করতেন, 'নারীদের অঙ্গগুলো পুরুষদের মতোই, কিন্তু সেগুলো ভুল জায়গায় আছে।' ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবদেহের গঠন নিয়ে গবেষণার অগ্রগতির ফলে 'দ্বিলিঙ্গ মডেল' (Two Sex Model) প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে নারী এবং পুরুষকে আলাদা শ্রেণীতে ফেলা হয়[১১] কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হার্শফিল্ড এবং তার সমসাময়িক কিছু ইউরোপীয় যৌন বিশেষজ্ঞ এই দ্বিলিঙ্গ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি নতুন মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেন।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক মহলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব, যা প্রজাতির বিবর্তন এবং যৌন প্রজননের ধারণা (নারী ও পুরুষের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি) প্রচার করে, তা হার্শফিল্ড এবং তার সমসাময়িকদের কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়নি। বর্তমান সময়ের অনেক ট্রান্সজেন্ডার কর্মীও একইভাবে বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেন। বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে বিজ্ঞান থেকে বেশি বস্তুবাদী দর্শনের প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়, যার ফলে এটি সর্বদা বিতর্কিত ছিল।

হার্শফিল্ড নারী এবং পুরুষের ধারণাকে একটি বিমূর্ত ধারণা হিসেবে দেখতেন। তিনি মনে করতেন, সমকামী এবং ট্রান্সভেস্টাইটিসরা প্রচলিত দ্বিলিঙ্গ মডেল থেকে বিচ্যুত, এবং তাই তাদেরকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৯৩০ সালে, হার্শফিল্ড ডেনমার্কের একজন পুরুষ, আইনার ওয়েগনারের (পরবর্তীতে লিলি এলবে) লিঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি এই কাজে অনুপ্রাণিত হন অস্ট্রিয়ান এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ইউজেন স্টেইনাচের থেকে, যিনি পুরুষ গিনিপিগ থেকে টেস্টিস এবং নারী গিনিপিগ থেকে ওভারিজ প্রতিস্থাপন করেছিলেন। হার্শফিল্ড ওয়েগনারের খোজাকরণ করে কৃত্রিম যোনী স্থাপন করেন এবং সম্ভবত জরায়ুও প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে, লিলি রূপান্তরের দেড় বছর পর মারা যান। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর হার্শফিল্ডের লাইব্রেরি এবং গবেষণা কেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যার ফলে লিঙ্গ পরিবর্তন ইস্যুটি প্রায় ২০ বছরের জন্য চাপা পড়ে।

ক্রিস্টিন জর্গেনসেন—প্রথম আমেরিকান ট্রান্সজেন্ডার

১৯৫২ সালে প্রথম আমেরিকান পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া ক্রিস্টিন জর্গেনসেন (Christine Jorgensen) এর ঘটনা ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে বিশ্বজুড়ে

আলোড়ন সৃষ্টি করে[১২]। আমেরিকার আর্মিতে কর্মরত ২৬ বছর বয়সী জর্জ জর্গেনসেন ছিলেন সমকামী, নিজেকে নারী হিসেবে কল্পনা করতেন। হরমোন সম্পর্কিত বই পড়ার পর তিনি সম্ভাব্য লিঙ্গ রূপান্তরের কথা জানতে পারেন এবং ডেনমার্কে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ক্রিশ্চিয়ান হ্যামবার্গারের সাথে পরামর্শ করতে যান। এই চিকিৎসক হার্শফিল্ডের কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং ট্রান্সভেস্টাইটিস নির্ণয়ের জন্য হরমোন থেরাপি দিতেন। আমেরিকায় ফিরে জর্গেনসেন এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হ্যারি বেনজামিনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, যিনি হার্শফিল্ডের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকবার সাক্ষাৎও হয়েছিল।

রানী এলিজাবেথ যখন ১৯৫৩ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সেই খবর ছাপিয়ে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি লাইমলাইটে আসে। এই খবরটি ৭০টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং জর্গেনসেন সারা বিশ্ব থেকে ৬০-৭০ হাজারের মতো চিঠি পান। মিডিয়া তাকে নিয়ে এক প্রকারের ক্রেজ তৈরি করে। জাপানের হিরোশিমায় এটম বোমা নিক্ষেপের পর যখন বিজ্ঞানের অপার ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের মাঝে এক ধরনের আস্থা তৈরি হয়, তখন সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, নারী বা পুরুষ বিপরীত লিঙ্গে পরিণত হতে পারে।

১৯৫০-এর দশক থেকে হার্শফিল্ডের এলজিবিটি আন্দোলনের মশাল বহন করেন দুইজন সমকামী (বা বাইসেক্সুয়াল) একাডেমিক—প্রফেসর আলফ্রেড কিনসি এবং প্রফেসর জন মানি। কিনসি তার গবেষণার মাধ্যমে সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন আচরণকে স্বাভাবিক যৌনবৈচিত্র্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৬০-১৯৭০ দশকের যৌন বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে, প্রফেসর মানি জেন্ডারতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে অমানবিক পরীক্ষাগুলোর একটি



George Jorgensen photo before the surgery (left), Christine Jorgensen after (right) (image: National WWII Museum)

ছবি: ক্রিস্টিন জর্গেনসেনের পুরুষ থেকে 'নারী'-তে রূপান্তর

চালান, যার মধ্যে একজন জমজ শিশুর ওপর ভয়াবহ এবং অমানবিক পরীক্ষা ছিল। হ্যারি বেনজামিনের সাথে কিনসির রিসার্চ সহযোগিতা ছিল এবং ম্যাগনাস হার্শফিল্ডের সাথেও যোগাযোগ ছিল। জন মানির সাথেও কিনসির যোগাযোগ ছিল। এলজিবিটি মতবাদ প্রতিষ্ঠায় কিনসি এবং জন মানিসহ অন্যান্য কয়েকজন একাডেমিকের অবদান নিয়ে এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এলজিবিটি বয়ান তৈরীর নেপথ্যে অ্যাক্টিভিস্ট প্রফেসর

দার্শনিক মতবাদকে সামাজিক নীতি নির্ধারণের (যেমন- আইন) পর্যায়ে নিয়ে আসতে বায়োলজিক্যাল প্রমাণ বা ডেটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রফেসর আলফ্রেড কিনসি বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক ছাড়াও সমকামিতা ও উভকামিতার মতো নিষিদ্ধ যৌন আচরণকে স্বাভাবিকীকরণ করতে গবেষণা চালান। কিনসির গবেষণার ডেটা ১৯৭০-এর দশকের নারীবাদী আন্দোলনের অধীনে যৌন বিপ্লবের (Sexual Revolution) বয়ান তৈরীরে একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানের নামে প্রকাশিত কিনসি রিপোর্ট এবং প্রফেসর জন মানির জেন্ডার নিরপেক্ষ তত্ত্ব (Gender Fluid Theory) এলজিবিটি আইডেন্টিটি মুভমেন্টের ভিত্তি স্থাপন করে। গত ৭৫ বছরের সমকামী অধিকারের লম্বা তাত্ত্বিক আলাপ তৈরী করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় স্কলাররা। যারা তাদের মেধা, গবেষণা, থিংকট্যাংক, শিক্ষকতার প্লাটফর্ম এবং মাঠপর্যায়ের সক্রিয় কর্মকাণ্ড দিয়ে এই মতবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাও এই বিকৃত আচরণে অভ্যস্ত ছিলো। নিচের উল্লিখিত লিস্ট ছাড়াও অনেক প্রফেসর এলজিবিটি ন্যারেটিভ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন। ইংরেজিতে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাতে আগ্রহী পাঠকরা গুগল সার্চ বা চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে আরো বিস্তারিত জানতে পারেন।

একাডেমিক নাম	সংক্ষিপ্ত পরিচয়
Judith Butler	একজন লেসবিয়ান। পারফর্ম্যাটিভিটি ও জেন্ডার আইডেন্টিটির ওপর কাজ করেছেন, যা এলজিবিটি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

একাডেমিক নাম	সংক্ষিপ্ত পরিচয়
Eve Kosofsky Sedgwick	কুইয়ার তত্ত্বের ওপর কাজ করা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সমালোচক, যৌন ও লিঙ্গ পরিচয়ের তারল্য নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি একজন লেসবিয়ান।
David F. Greenberg	মহামারী এইডস নিয়ে কাজ করা ইতিহাসবিদ, যার গবেষণা LGBTQ+ আন্দোলনকে নতুন রূপ দিয়েছে।
Cheryl I. Harris	আইনজ্ঞ, যিনি LGBTQ সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আইনগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।
Sylvia Rivera & Marsha P. Johnson	ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট এবং স্টোনওয়াল রায়টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। দুজনই নিজেদেরকে নারী হিসেবে পরিচয় দেন।
José Esteban Muñoz	কুইয়ার তাত্ত্বিক, যিনি কুইয়ার ব্যর্থতা এবং ইউটোপিয়ান ধারণাগুলো নিয়ে কাজ করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি একজন গে ছিলেন।
Judith Halberstam	লিঙ্গ তাত্ত্বিক, যিনি ম্যাসকুলিনিটি বা পুরুষত্ব ও ফেমিনিনিটি বা নারীত্বের প্রচলিত ধারণাগুলো চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি একজন প্রকাশ্য গে।
Dean Spade	আইনজ্ঞ, যিনি ট্রান্সফোবিয়া ও পুলিশের সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তিনি একজন ট্রান্স পুরুষ।
Janet Mock	লেখক ও রূপান্তরকামী অধিকার কর্মী, যিনি ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছেন।
Michel Foucault	সমকামী এবং শিশুকামী ফুকো যৌনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণাগুলো নিয়ে কাজ করেছেন, যা LGBTQ+ আন্দোলনে প্রভাব ফেলেছে।
Jacques Derrida	দার্শনিক, যিনি লিঙ্গ ও যৌনতার প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে deconstruction তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন।
Anne Fausto-Sterling	লেসবিয়ান জীববিজ্ঞানী, যার কাজ লিঙ্গের বাইনারী ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough বইয়ের লেখিকা।

আলফ্রেড কিনসি: যৌন বিপ্লবের জনক

মানব ইতিহাসে যৌনতার বিষয়ে জনমত এবং ধারণা গঠনে প্রফেসর আলফ্রেড কিনসি'র চেয়ে বড় প্রভাব আর কেউ ফেলেনি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যেসব যৌন আচরণকে বিকৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেগুলো স্বাভাবিক এবং উল্টো দাবি করেন যে, একচেটিয়া বিষমকামিতা অস্বাভাবিক এবং এটি সাংস্কৃতিক বাধা ও সামাজিক শর্তাবলীর ফল। প্রায় ৭৫ বছর আগে, কিনসি এবং তার গবেষণা দলের সদস্যরা আমেরিকান জনগণকে 'পরিসংখ্যানগত তথ্য' উপস্থাপন করেন। সহজ করে বলতে গেলে, কিনসি সংখ্যার মাধ্যমে 'প্রমাণ' (পড়তে হবে তথ্য বিকৃতি) করেছিলেন। তখন খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছিল যে, তার উপস্থাপিত ডেটা, যাকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে দাবি করা হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক ছিল না এবং সমাজের প্রচলিত মানদণ্ডেরও প্রতিনিধিত্ব করত না। পরবর্তীতে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, কিনসির ফলাফলগুলো শুধু পক্ষপাতদুষ্টই নয়; বরং প্রতারণামূলক প্রমাণিত হয়েছে।

আমেরিকান জার্নাল অব পাবলিক হেলথ (American Journal of Public Health) ২০০৩ সালে আলফ্রেড কিনসি'র জীবনী আলোকপাত করে, Alfred C. Kinsey: A Pioneer Of Sex Research প্রতিবেদনে[১৩]। এটার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি।

কিনসি ১৮৯৪ সালের ২৩ জুন নিউ জার্সির হোবোকেনে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা, আলফ্রেড সেগুইন কিনসি, একজন ধর্মপ্রাণ এবং কঠোর ব্যক্তি ছিলেন এবং স্টিভেন্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, তার ছেলে জীববিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করে প্রকৌশল অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। দু'বছর পর, আলফ্রেড বিরক্ত হয়ে মেইনের বোডইন কলেজে চলে যান এবং জীববিজ্ঞানে ভর্তি হন। এরপর বাবা-ছেলের সম্পর্ক আর কখনোই স্বাভাবিক হয়নি; ১৯১৬ সালে আলফ্রেড কিনসি স্নাতক হন, কিন্তু তার বাবা সমাবর্তনে যোগ দেননি।

কিনসি হার্ভার্ডে ফলিত জীববিজ্ঞানের ছাত্র হন, যেখানে তিনি বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম মর্টন হুইলারের অধীনে গবেষণা করেন, যিনি শক্তিশালী ডারউইনবাদী এবং বিশিষ্ট সমালোচক এইচ. এল. মেনকেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হুইলারের তত্ত্বাবধানে, কিনসি তার ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে ত্যাগ করেন এবং গল

ওয়াসপের বিবর্তনমূলক শ্রেণিবিন্যাসের ওপর একটি বিশাল গবেষণা শুরু করেন। তিনি কয়েকটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৯ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এর পরের বছর তিনি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

কিনসি একাডেমিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করেন এবং ১৯২৯ সালে পূর্ণ অধ্যাপক হন। ১৯৩৬ সালে তিনি "The Gall Wasp Genus Cynips: A Study of the Origin of Species" এবং "The Origin of Higher Categories in Cynips" প্রকাশ করেন, যা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। তবে, তাকে অন্য কোনো বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপনার প্রস্তাব না পাওয়ায় তিনি হতাশ হন।

এই হতাশার ফলে ১৯৩৮ সালে কিনসি তার জীবনে একটি নতুন ধাপে পা রাখেন। তিনি একটি দলগত কোর্স পরিচালনা শুরু করেন, যেখানে *'বিয়ে ও পরিবার'* বিষয়ে পড়ানো হতো। কিনসির যৌন উদ্দীপনার জীববিজ্ঞান, যৌন সম্পর্কের কৌশল, এবং গর্ভনিরোধের পদ্ধতির ওপর চিত্রিত লেকচারগুলো এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠোর সমালোচনা ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। তিনি প্রথাগত যৌন আচরণের ধারণার পরিবর্তে একটি নতুন জৈবিক সংজ্ঞা (যৌন বিচিত্র) প্রস্তাব করেন, যার মাধ্যমে অনেক যৌন কার্যক্রমকে স্বাভাবিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

তার বিয়ে-সংক্রান্ত কোর্সের জনপ্রিয়তার পরে, কিনসি মানব যৌন অভিজ্ঞতার (Sexual experience) বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত যৌন ইতিহাস সংগ্রহ করা শুরু করেন এবং ছুটির সময় গারী, শিকাগো, সেন্ট লুইস এবং ফিলাডেলফিয়ার মতো শহরগুলোতে একই ধরনের সাক্ষাৎকার নেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্সটিটিউট অব সেক্স রিসার্চ' (Institute of Sex Research) প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৮ সালে কিনসি এবং তার সহযোগীরা *Sexual Behavior in the Human Male* বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটি প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে বেস্টসেলার হয়ে ওঠে, যদিও এতে ৮০৪ পৃষ্ঠার বৈজ্ঞানিক তথ্য, টেবিল এবং গ্রাফ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বইটি ৫,০০০ জনেরও বেশি মানুষের যৌন ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং এতে হস্তমৈথুন, পরকীয় যৌন কার্যকলাপ এবং সমকামিতার ব্যাপকতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ পায়। ধর্মীয় নেতা এবং স্কলাররা

এই সমাজবিরোধী বই প্রকাশ করার জন্য তীব্র নিন্দা জানান, তবে লিবারেলিস্টরা তাকে গ্যালিলিও বা ডারউইনের সাথে তুলনা করে প্রশংসা করেন।

১৯৫৩ সালে কিনসির পরবর্তী বড় প্রজেক্ট ছিল *Sexual Behavior in the Human Female* বইটি, যা প্রায় ৬,০০০ মহিলার যৌন ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এতে মহিলাদের হস্তমৈথুনের অভ্যাস, বিবাহ-পূর্ব যৌনতা এবং অর্গাজম নিয়ে বিস্ময়কর তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। আগের মতোই এই বইটি ব্যাপক সাড়া ফেলে, কিন্তু এবার সমালোচনা আরও তীব্র হয় এবং তার গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই বই দুটির মাধ্যমে কিনসি কয়েক হাজার সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত ডেটা বিশ্লেষণ করে নারী-পুরুষের যৌনতার ব্যাপারে প্রচলিত সামাজিক ধারণাগুলোকে ভাঙতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যকার স্বাভাবিক যৌনতার বাইরেও আরো বিভিন্ন যৌন প্রবণতা কাজ করে। কিন্তু সামাজিকতার কারণে সেগুলো তারা প্রকাশ করে না। তিনি এগুলোকে বলেছেন ট্যাবু বা সমাজে নিষিদ্ধ বিষয়। কিন্তু এগুলো সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও স্বাভাবিক।

কিনসি মানুষের যৌন আচরণকে পরিমাপ করার জন্য একটি স্কেল ব্যবহার করেন। যেটা একাডেমিয়াতে কিনসি স্কেল নামে পরিচিত। এই স্কেলে ০ থেকে ৬ পর্যন্ত মাত্রা আছে। এখানে ০ মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ হেটেরোসেক্সুয়াল বা বিষমকামী। আর ৬ মানে হচ্ছে হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামী। যে যেদিকে বেশি ঝুঁকবে, তার যৌন আচরণ সেটাই। এই দুই সংখ্যার মাঝখানে হলে সে উভকামী। এই কিনসি স্কেল মানদণ্ড হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট, যা সামনের পরিচ্ছদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলফ্রেড কিনসি সম্পর্কে মূল্যায়ন: জীবনীকার জেমস এইচ. জোন্স

জেমস এইচ. জোন্স *Alfred C. Kinsey: A Public/Private Life* আলফ্রেড কিনসির জীবন, কাজ এবং তার প্রভাবের একটি বিস্তৃত ও গভীর চিত্র তুলে ধরে[১৪]। বইটি কিনসির গবেষণার বৈপ্লবিক অবদান এবং তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের বিতর্কিত দিকগুলো বিশ্লেষণ করে, যা তাকে একজন জটিল ও মেধাবী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে।

কিনসি ২০ শতকের একজন প্রভাবশালী বৈজ্ঞানিক, যার গবেষণা মানব

যৌনতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করে। জোন্স কিনসির কাজের প্রশংসা করেন, বিশেষ করে তার দুই গুরুত্বপূর্ণ বই *Sexual Behavior in the Human Male* (১৯৪৮) এবং *Sexual Behavior in the Human Female* (১৯৫৩)। এ দুটি বই যৌনতা নিয়ে প্রথাগত নৈতিকতার বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী ঘোষণা ছিল, যা আমেরিকার সমাজে এক নতুন যুগের সূচনা করে। কিনসির উদ্দেশ্য ছিল যৌন আচরণের বৈচিত্র্যকে বৈজ্ঞানিক ডেটার আলোকে একটি স্বাভাবিক, স্বীকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

জোন্স তার লেখায় কিনসির গবেষণার পদ্ধতি ও তার ফলাফল বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক কি-না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কিনসি গবেষণার জন্য একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তিনি অপরাধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতেন। তিনি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক জনগণের ওপর গবেষণা না করে, মুষ্টিমেয় অস্বাভাবিক জনগণের যৌন আচরণের ওপর ভিত্তি করে ফলাফল তৈরি করেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি বৈজ্ঞানিক নৈতিকতার (Scientific ethics) তোয়াক্কা করেননি। তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিগত ও গভীর, যা অনেক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদেরকে চাপের মুখে তাদের যৌন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে বাধ্য করত। এই ধরনের ইস্যু তার গবেষণার সব ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

> *জোন্সের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, কিনসি ছিলেন একটি দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং যৌনতা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি নিজেও* **সমকামিতা ও স্ত্রী বিনিময়সহ (Wife swap)** *বিভিন্ন যৌন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতেন। এসব কার্যকলাপ তার গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রভাবকে আরও জটিল করে তোলে।*

শিশুদের ওপর গবেষণার বিষয়ে জোন্স সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কিনসির *Sexual Behavior in the Human Male* বইয়ে শিশুর যৌন প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা অনেক সমালোচক মনে করেন নিপীড়নের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। জোন্স এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রশ্ন করেন, কিনসির কাজ কি সত্যিই বৈজ্ঞানিক ছিল, না-কি এটি শিশুদের প্রতি অমানবিক আচরণের একটি প্রতিফলন?

জোন্স মনে করেন, কিনসির উদ্দেশ্য ছিল যৌনতা নিয়ে প্রচলিত দমনমূলক (আইনকানুন) ধারণা পরিবর্তন করা এবং যৌন বৈচিত্র্য মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কিনসির গবেষণার মাধ্যমে মানুষ যৌন আচরণের প্রতি আরও উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং যৌন স্বাধীনতার দাবি আরও শক্তিশালী হয়।

তবে, জোন্স কিনসির কাজের সঙ্গে যে নৈতিক ও পদ্ধতিগত বিতর্ক রয়েছে, সেটিকে অস্বীকার করেননি। তিনি স্বীকার করেন যে, কিনসির গবেষণা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং তার ব্যক্তিগত জীবন এবং পেশাগত নৈতিকতা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা কিনসির উত্তরাধিকারকে জটিল করে তুলেছে।

সমালোচক ররার্ট নাইটের মূল্যায়ন

আলফ্রেড সি. কিনসির গবেষণা নারী এবং শিশুদেরকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেটা জানা যায় আমেরিকান লেখক এবং অ্যাক্টিভিস্ট Robert H. Knight এর কাছ থেকে[১৫]। নাইট লেখেন, হাজার হাজার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে আলফ্রেড কিনসি সিদ্ধান্তে আসেন যে, আমেরিকান নারীরা হয় যৌন নিপীড়নের শিকার, আর না হয় তারা যৌনতার দিক থেকে উচ্ছৃঙ্খল।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং পশ্চিমের যৌন বিপ্লব এবং পশ্চিমা সমাজে এর পরিণতি নিয়ে কাজ করেছেন, এমন লেখকদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত দুজন হচ্ছেন—Edward W. Eichel আর Judith Reisman। মানুষের যৌনতা সম্পর্কে কিনসি এবং তার গবেষক দলের পক্ষপাতিত্ব এবং পদ্ধতিগত ভুল নিয়ে এই দুজন ১৯৯০ সালে একটা বিখ্যাত বই লেখেন—*Kinsey, Sex and Fraud: The Indoctrination of a People*। এই বইতে তারা কিনসির গবেষণার অনৈতিকতাগুলো তুলে ধরেন।

Eichel আর Reisman-এর কাজ পর্যালোচনা করে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী একাডেমিক জার্নাল এবং মেডিকাল জার্নালগুলোর মধ্যেও সবচেয়ে পুরাতন জার্নালগুলোর অন্যতম The Lancet। তাদের ফাইন্ডিংস পর্যালোচনা করে ল্যান্সেট মন্তব্য করে[১৬]—

> '[T]he important allegations from the scientific viewpoint are imperfections in the (Kinsey) sample and unethical,

possibly criminal, observations on children. ... Dr. Judith A. Reisman and her colleagues demolish the foundations of the two (Kinsey) reports.'

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো হলো কিনসির নমুনার অসম্পূর্ণতা। এবং শিশুদের ওপর অনৈতিক এবং অপরাধমূলক পর্যবেক্ষণ। (যে অভিযোগগুলো প্রমাণের মাধ্যমে) জুডিথ রেইসম্যান এবং তার সহকর্মী কিনসির রিপোর্টের ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে।

Robert H. Knight-এর সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরছি [১৭]।

কিনসির গবেষণা নিয়ে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যা নারীত্ব, মাতৃত্ব এবং শিশুদের প্রতি অত্যন্ত অবমাননাকর। প্রথমত, অভিযোগ রয়েছে যে, কিনসি ৭,৭৮৯ জন মহিলার যৌন কার্যকলাপের তথ্য সংগ্রহ করলেও বাচ্চাদের জন্মদানের তথ্য সংগ্রহ করেছেন শুধুমাত্র অবিবাহিত মহিলাদের কাছ থেকে। প্রশ্ন হলো, এই অবিবাহিত মহিলাদের বাচ্চা কোথা থেকে এলো? এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা অবৈধ যৌনসম্পর্কে জড়িয়ে ছিল। কিনসির গবেষণায় স্বাভাবিক বিবাহিত মহিলাদের মাতৃত্বের কোনো ডেটা নেই এবং তিনি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার বা তারা যৌনতার ব্যাপারে বেপরোয়া।

এছাড়া, কিনসির গবেষণায় বিবাহিত মহিলাদের নমুনা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিনসির দল বিবাহিত নারীদের থেকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, তারা অবিবাহিত মহিলাদেরকেও 'বিবাহিত' হিসেবে চালিয়ে দেয়। তিনি 'বিবাহিত' বলতে দুই ধরনের নারীকে বুঝিয়েছেন— এক. যারা সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিয়ে করেছেন, দুই. যারা কাগজপত্র ছাড়াই কমন ল' সম্পর্কের আওতায় নিজেদেরকে বিবাহিত বলে পরিচয় দেন। কিনসি এমনকি কিছু নারীদের রক্ষিতা বা একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে 'বিবাহিত' হিসেবে ধরেছেন।

কিনসির গবেষণা আমেরিকান পুরুষদের যৌন নির্যাতনকারী হিসেবে চিত্রিত করেছে। তিনি দাবি করেছেন, ৯৫ শতাংশ পুরুষ ধর্ষণ, পায়ুকাম, ব্যভিচার, অজাচার ইত্যাদি যৌন অপরাধে লিপ্ত থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে কিনসি প্রস্তাব করেছেন যে, যৌন অপরাধের শাস্তি কমানো উচিত এবং সমাজকে স্বাভাবিক যৌনতার সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

শিশুদের যৌন নির্যাতনকেও কিনসি স্বাভাবিক হিসেবে দেখিয়েছেন। তার বই *Sexual Behavior in the Human Male*-এর গ্রাফে দুই মাস থেকে ১৫ বছরের ছেলেদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি তিনি দাবি করেন, শিশুদের যৌন নিপীড়ন হলেও তারা এটাকে উপভোগ করে। কিনসি শিশুদের অর্গাজমের কথাও উল্লেখ করেন, যা শিশুদের প্রতি অবমাননাকর এবং গুরুতর ভুল ধারণা।

শিশুদের যৌন নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ করতে বলা হলে, কিনসি ইন্সটিটিউট তা দেখাতে অস্বীকৃতি জানায়। কিনসির প্রতারণামূলক এই গবেষণা যৌন নির্যাতনকেই বৈধতা দেয়। ৪,৪৪১ জন মহিলার সাক্ষাৎকারে ১,০৭৫ জন জানিয়েছেন যে, তারা তাদের কৈশোরে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু কিনসি নারীদের মানসিক বা শারীরিক ক্ষতির বিষয়গুলো উপেক্ষা করেছেন এবং শিশু নির্যাতনকারীদের শাস্তি কমানোরও প্রস্তাব দিয়েছেন।

কিনসির গবেষণা ধর্ষকদের জন্যও সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে। তার গবেষণা আমেরিকার আইন ও আদালতকে প্রভাবিত করে, যা শিশু ও নারী নির্যাতনকারীদের পক্ষে একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করেছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ধর্ষণের হার ৩৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কিনসির প্রভাবের ফলাফল। কিনসির মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং যৌন স্বাধীনতার নামে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

প্রফেসর জন মানি: জেন্ডার তত্ত্বের জনক

আমেরিকান শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ Dr. Miriam Grossman যৌনতা, লিঙ্গ পরিচয় এবং যুবক-যুবতীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রের একজন সুপরিচিত গবেষক এবং লেখক। তিনি ২০২১ সালে *Lost in Trans Nation: A Child Psychiatrist's Guide Out of the Madness* বই লিখেছেন, যেখানে জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের জনক প্রফেসর জন মানি'র শৈশব, গবেষণা এবং বিতর্ক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন[১৮]। এই বইয়ের আলোকে জন মানি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি।

প্রফেসর মিরিয়াম গ্রসম্যানের মতে, মেডিকেল ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোর পেছনে একজন ক্লিনিক্যাল মনোরোগ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, একসময় Gender Identity Disorder ছিল বিরল এবং অজানা, যা আজ শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলন আমাদের ভাষা, শিক্ষা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও প্রভাবিত করেছে; এমনকি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নাম বা সর্বনামের ব্যবহারও বাধ্যতামূলক করেছে।

সেই ব্যক্তিটা হচ্ছেন জন মানি

জন মানি নিউজিল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং হার্ভার্ড থেকে ১৯৫২ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার থিসিসের বিষয় ছিল হেরমাফ্রোডিটিজম, একটি বিরল মেডিকেল কন্ডিশন যেখানে নবজাতকের লিঙ্গ স্পষ্ট নয়। এই সমস্যা নিয়ে কাজ করার প্রবল আগ্রহ থেকেই মানি প্রথমবারের মতো 'সেক্স অ্যাসাইনমেন্ট' নিয়ে গবেষণা শুরু করেন—যাতে হেরমাফ্রোডাইট শিশুরা ছেলে বা মেয়ে হিসেবে বড় হতে পারে।

তৎকালীন সময়ে লিঙ্গ-অস্পষ্ট শিশুর বাবা-মা কঠিন উভয়সঙ্কটে থাকতেন। তাদের সন্তানকে কীভাবে পরিচয় দেওয়া হবে, কীভাবে বড় করা হবে—এসব প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা ছিল না। মানি জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে হেরমাফ্রোডাইটদের জন্য প্রথম ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তাদের অপারেশনের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হতো। এই ক্লিনিক পরবর্তীতে আমেরিকার প্রথম ক্লিনিক হয়, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদেরও লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন করা যেত।

মানির তত্ত্ব কেবল হেরমাফ্রোডাইটদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি আরও দাবি করেন, নারী-পুরুষের পরিচয়, আচার-আচরণ এবং আগ্রহগুলো মূলত সামাজিকভাবে গঠিত; এখানে ক্রোমোজোম বা শারীরিক গঠনের ভূমিকা নেই। ১৯৫৭ সালে তিনি "Gender Identity" শব্দটি প্রবর্তন করেন, যা এই মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়কে বোঝায়।

মানির আগে পরিচয়কে শরীর থেকে আলাদা করার ধারণাটি ছিল অকল্পনীয়। তখনকার স্বাভাবিক ধারণা ছিল যে, যার XX ক্রোমোজোম, সে নারী; যার XY, সে পুরুষ। তবে মানি এই ধারণাটি বদলে দেন। তিনি একটি মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গের অস্তিত্বের কথা বলেন, যা শারীরিক লিঙ্গ থেকে পৃথক এবং যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

মানির তত্ত্ব একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুরা জন্মের সময় লিঙ্গ-নিরপেক্ষ থাকে এবং তাদের লিঙ্গ পরিচয় সামাজিক প্রভাব দ্বারা তৈরি হয়। তিনি দাবি করেন, লিঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব, এবং একটি শিশুকে বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে বড় করাও সম্ভব।

মানি ১৯৫৫ সালে তার বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীতে লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। তার জীবনের মিশন ছিল এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা তিনি কল্পনার চেয়েও সফলভাবে করেছিলেন।

মানি ছিলেন যৌন গবেষকদের একটি দলের সদস্য, যাদের অনেকেই আলফ্রেড কিনসির শিষ্য ছিলেন। কিনসি ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত যৌন গবেষক, যিনি প্রথাগত যৌন আচরণের বিরোধী ছিলেন। মানির মতো যারা কিনসির আদর্শ অনুসরণ করতেন, তারা বিশ্বাস করতেন যে, সম্মতির ভিত্তিতে যৌনকর্ম সঠিক, এবং সমস্যার মূল যৌনতা নয়, বরং ভয় এবং নির্যাতন।

মানি মনে করতেন, অস্বাভাবিক যৌন আচরণ বলতে কিছু নেই; কোনো আচরণকে বিচার করা উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে SIECUS (Sexual Information and Education Council of the United States) এর উদ্যোগে, যারা চিকিৎসার জন্য যৌন শিক্ষায় "Sexual Attitude Reassessment" (SAR) প্রবর্তন করেছে। তাদের মতে, চিকিৎসকদের মানুষের যৌন আচরণের ব্যাপকতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা জরুরি। SAR ধারণাটি ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্বাসে:

'মানুষের যৌন আচরণের ব্যাপকতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জনের

অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে আমাদের। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার নিজের বিশ্বাস ও দৃঢ়বোধের অধিকার রয়েছে।'

১৯৭০ সালে, মানি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য অস্বাভাবিক যৌন আচরণের স্লাইড ব্যবহার করে লেকচার তৈরি করেন। ১৯৭১ সালে জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের পাঠ্যক্রমে এমন চলচ্চিত্র দেখানোর প্রচলন করেন, যেখানে স্পষ্ট পশুবৃত্তিক আচরণ, প্রস্রাব পান, মল খাওয়া এবং অঙ্গচ্ছেদের মতো ফেটিশ দেখানো হতো। মানি এমনকি পাঁচজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষের গ্রুপ সেক্স করার একটি চলচ্চিত্রও রেকর্ড করেছিলেন।

মানি তার জেন্ডার থিওরি প্রসারের ক্ষেত্রে খুবই আগ্রাসী ছিলেন। তবে তার অফিসে একটি নির্দিষ্ট পরিবার আসার আগ পর্যন্ত তার তত্ত্ব কেবল অনুমানেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই গল্পটি খুবই করুণ। প্রথমে এটি *Rolling Stone* ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়, পরে জন কলাপিন্টো এই ঘটনা নিয়ে *As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl* নামে একটি বই লেখেন। এখানে আমি সংক্ষেপে বলতে পারি, কিন্তু এই ঘটনা বিস্তারিত পড়ার দাবি রাখে।

১৯৬৫ সালে, কানাডার উইনিপেগের জ্যানেট এবং রন রেইমার নামের এক দম্পতি জমজ সন্তান ব্রুস এবং ব্রায়ান-এর জন্ম দেন। কয়েক মাস পর তাদের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে সমস্যা দেখা দেয়, এবং একজন ডাক্তার খৎনা করার পরামর্শ দেন। আট মাস বয়সে খৎনার সময় ব্রুসের জন্য স্ক্যাল্পেলের পরিবর্তে ইলেক্ট্রোকাউটারি সুঁই ব্যবহার করা হয়, যার ফলে তার পুরো লিঙ্গ পুড়ে যায়।

জন মানির গবেষণার অন্তরালে: রেইমার পরিবারের করুণ পরিণতি

ব্রুস রেইমার জন্মেছিলেন এক সুস্থ ছেলের মতো, কিন্তু শৈশবেই একটি দুর্ঘটনায় তার পুরুষাঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার পিতা রন রেইমার তখন হতাশায় ডুবে গেলেও টেলিভিশনে জন মানির আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য তাকে আশার আলো দেখায়। মানি বলেছিলেন, 'জেন্ডার তৈরি হয়, জন্মায় না' এবং একটি ছেলে মেয়ে হিসেবে বড় হতে পারে। এই ধারণা বিশ্বাস করে রেইমার দম্পতি তাদের সন্তানকে মানির তত্ত্বে সঁপে দেন।

ব্রুস তখন মাত্র দুই বছর দুই মাস বয়সী। তাকে মেয়ে হিসেবে বড় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ব্রেন্ডা, এবং তার পোশাকসহ সবকিছু মেয়েদের মতো সাজানো হয়। মানি তাদেরকে বলেন, ব্রেন্ডার মেয়ে পরিচয় টিকিয়ে রাখতে তাকে হরমোন নিতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে আরও সার্জারির মাধ্যমে যোনি তৈরি করতে হবে। পিতামাতাকে সতর্ক করা হয় যে, তারা যেন কখনো ব্রেন্ডার কাছে তার জন্মগত পরিচয় প্রকাশ না করেন।

একটি শিশুকে তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার

মানি ব্রেন্ডাকে তার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, এই কেস তার তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, লিঙ্গ পরিচয় পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবে ব্রেন্ডা কখনোই মেয়ে হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। তিনি মেয়েদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলতেন, পুতুল নিয়ে খেলায় আগ্রহ দেখাতেন না, বরং ছেলেদের মতো আচরণ করতেন।

মানির প্রতারণা এবং তার প্রভাব

১৯৭২ সালে জন মানি ওয়াশিংটনে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর এক সম্মেলনে ব্রেন্ডার কেসকে সফল ঘোষণা করেন। তার বই *Man and Woman, Boy and Girl*-এ এই কেসকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। মানি তার তত্ত্বের প্রচারে খ্যাতি অর্জন করেন এবং এটি বিভিন্ন পেশাদার জার্নালে বাইবেলের মতো স্থান পায়।

তবে এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে তখন থেকেই কিছু বিরোধিতা ছিল। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিল্টন ডায়মন্ড বলেন, গর্ভাবস্থার সময় থেকেই লিঙ্গ পরিচয় মস্তিষ্কে গড়ে ওঠে এবং মানির কাজ অসম্পূর্ণ। কিন্তু মানি সমালোচনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং তার তত্ত্ব নিয়ে বিরোধিতাকে দমন করার চেষ্টা করেন।

ব্রেন্ডারের প্রকৃত পরিচয়ে ফিরে আসা

১৪ বছর বয়সে ব্রেন্ডা জানতে পারেন তার প্রকৃত পরিচয়। এটি তার জন্য ধাক্কা হলেও তার সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করে ডেভিড

রাখেন এবং ছেলে হিসেবে জীবনযাপন শুরু করেন। ডেভিডের মায়ের মতে, প্রকৃত পরিচয়ে ফিরে আসার পরই তিনি শান্তি পেয়েছিলেন।

ডেভিড জানতে পারেন, মানি তার ক্ষেত্রে গবেষণাকে সফল বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিস্মিত হন যে, তার এই করুণ অভিজ্ঞতাকে মানি অন্যদের ওপর প্রয়োগ করতে চান। ডেভিড এবং তার পরিবার পরে জনসমক্ষে এসে জানান যে, মানির গবেষণা ব্যর্থ হয়েছিল।

এক গবেষণার ভয়াবহ পরিণতি

ডেভিড এবং তার যমজ ভাই ব্রায়ান দুজনই মানির গবেষণার কারণে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছিলেন। ব্রায়ান অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে মারা যান, এবং ডেভিড ৩৮ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। তাদের বাবা-মা মানিকে এই ঘটনার জন্য দায়ী মনে করেন।

ডেভিডের অভিজ্ঞতা তার সময়ের চিকিৎসা ও গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, মানির তত্ত্ব তখনো কিছু চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল।

মানি তার গবেষণার মিথ্যা সাফল্যের দাবির মাধ্যমে যা অর্জন করেছিলেন, তা ছিল শুধুই ব্যক্তিগত খ্যাতি। কিন্তু রেইমার পরিবারের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল হতে পারে মর্মান্তিক।

রেইমার পরিবারের করুণ পরিণতি থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। প্রথমত, একজন প্রভাবশালী বিজ্ঞানীর অহঙ্কার এবং একটি মতবাদ প্রমাণের তাগিদ কীভাবে একটি পরিবারকে ধ্বংস করতে পারে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, পেশাদার চিকিৎসকদের নির্দ্বিধায় ভুল তত্ত্ব গ্রহণের বিপজ্জনক প্রবণতাও এখানে দেখা যায়।

সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, জন মানির তত্ত্ব বায়োফোবিক এবং ভুল ছিল। ডেভিড কখনোই 'লিঙ্গ নিরপেক্ষ' ছিলেন না। মানির দাবি—'ডেভিড নারী অথবা পুরুষ হওয়ার সমান সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছেন' একেবারেই অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। পরিবারের চেষ্টাতেও ডেভিডের স্বভাব ও পছন্দ সবসময় ছেলেদের মতোই ছিল।

এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের শরীর ও ক্রোমোজোম তার

প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে। পরিবেশ বা সামাজিক চাপ দিয়ে এটি পরিবর্তন করা যায় না। ডেভিডের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা হলো, জোরপূর্বক লিঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টার চেয়ে মানুষের স্বাভাবিক পরিচয়কে সম্মান জানানোই সঠিক পথ।

প্রফেসর ইভলিন হুকারের ত্রুটিপূর্ণ গবেষণা: সমকামিতা কোনো অসুস্থতা নয়

১৯৫০-এর দশকে, যখন প্রফেসর জন মানি লিঙ্গ পরিচয় এবং তার সামাজিক নির্মাণ নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর ইভলিন হুকার (Evelyn Hooker) সমকামিতাকে মানসিক ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করার বিরুদ্ধে কাজ করছিলেন। সেই সময়ে, আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) তাদের 'ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স' (DSM)-এ সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডারিজমকে মানসিক রোগ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিল। এমন একটি সময় ছিল, যখন সমকামিতা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল, এবং সমকামী সম্প্রদায়ের সদস্যরা গোপনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য ছিল।

১৯৫৬ সালে প্রফেসর ইভলিন হুকার একটি আলোচিত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, সমকামী ব্যক্তিদের মানসিক অবস্থা এবং আচরণ বিষমকামীদের মতোই সাধারণ। তার এই গবেষণায়, তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সমকামিতা কোনো মানসিক সমস্যা নয়; বরং এটি একটি স্বাভাবিক যৌন প্রবণতা। হুকারের গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর, এটি সমকামী অধিকারের আন্দোলনে একটি বড় প্রভাব ফেলে এবং APA শেষ পর্যন্ত DSM থেকে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলে।

তবে, হুকারের গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। তার গবেষণা শুধুমাত্র ৩০ জন সমকামী এবং ৩০ জন বিষমকামী পুরুষের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল, যা পরিসংখ্যানগতভাবে সাধারণীকরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ২০১২ সালে প্রকাশিত একটি জার্নাল আর্টিকেলে (*Re-Examining Evelyn Hooker: Setting the Record Straight with Comments on Schumm's (Citation2012) Reanalysis*) উল্লেখ করা হয়েছিল যে, হুকারের গবেষণা পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল[১৯]। বিশেষত, হুকার স্বীকার করেছিলেন যে, তার সমকামী নমুনাগুলো নৈর্ব্যক্তিকভাবে সংগ্রহ করা হয়নি; বরং এগুলো তার নিজস্ব

পরিচিতির মধ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা গবেষণার নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল।

গবেষকরা আরও মন্তব্য করেছেন যে, হুকার তার গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বয়স, আইকিউ এবং শিক্ষাগত সামঞ্জস্য দাবী করলেও, বাস্তবে এমন নিখুঁত মিল পাওয়া সম্ভব ছিল না। তার ওপর, বিষমকামী নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়ায়ও অসঙ্গতি ছিল, যা ফলাফলের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। হুকারের পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং পক্ষপাতদুষ্টতা থাকা সত্ত্বেও, তার গবেষণা সামাজিক বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং নীতি-নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

'গে জিন' অস্তিত্বের ভিত্তিহীন দাবী: সাইমন লেভ

সাইমন লেভের (Simon LeVay) তথাকথিত 'গে জিন'-এর অস্তিত্ব আছে বলে বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন, কিন্তু শক্তিশালী দাবী করে সমকামীতা এবং যৌন পরিচয় নিয়ে বিজ্ঞান, সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে এক দীর্ঘ বিতর্কের তৈরী করেন। ১৯৯১ সালে লেভ লস অ্যাঞ্জেলেসের স্যান্টা বারবারার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় *A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men* শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ করেন, যা এলজিবিটি (LGBT) সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত করে মিডিয়ায় ঝড় তোলা হয়। এই ধরনের ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরী করা, বড় বড় দাবী করা এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশলের অংশ। যৌন রুচি বা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন মানুষের জন্মগত বিষয়— এই দাবী করে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস সমকামী অধিকার আন্দোলন শুরু করেন।

সাইমন লেভ জন্মগ্রহণ করেন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে, ১৯৪৩ সালের ২৮ আগস্ট। তিনি ক্যামব্রিজ এবং গটিংগেনে পড়াশোনা করেন, যেখানে তার গবেষণার মূল ফোকাস ছিল মানুষের মস্তিষ্কের কাঠামো। পরে তার আগ্রহ সরে যায় যৌন অভিযোজনতার দিকে। এই পরিবর্তন তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনে। গটিংগেনে পিএইচডি করার সময় সাইমন প্রেমে পড়েন রিচার্ড হার্সে নামের এক আমেরিকান এক্সচেঞ্জ ছাত্রের, যিনি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ছাত্র। রিচার্ডের জার্মানিতে অধ্যয়ন শেষ হলে, সাইমনও তার প্রেমের টানে আমেরিকায় চলে যান। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে একটি চাকরি পেয়ে তিনি সেখানে স্থায়ী হন,

এবং রিচার্ডের সাথে প্রায় এক বছর লিভ-টুগেদার করেন।

রিচার্ড হার্সে জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার পর, সাইমন বোস্টনে থেকে যান এবং হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের নিউরোবায়োলজি বিভাগে পোস্টডক্টরাল কাজ করেন। এরই মধ্যে রিচার্ড এইডসে আক্রান্ত হন এবং সাইমন ছুটি নিয়ে জার্মানিতে তার প্রেমিকের কাছে যান। রিচার্ডের মৃত্যু সাইমনের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তাকে এক নতুন দিকনির্দেশনার পথে চালিত করে[২০]।

এই সময়ে, ১৯৮০-এর দশকে UCLA-তে গবেষকরা পুরুষ এবং নারীদের মস্তিষ্কের পার্থক্য বোঝার জন্য একটি গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন। এই গবেষণা 'ইন্টারস্টিটিয়াল নিউক্লিয়াস অব দ্য অ্যান্টিরিয়র হাইপোথ্যালামাস' (INAH3) নামে একটি অঞ্চলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, যা যৌন আচরণের নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত ছিল। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষদের মস্তিষ্কে INAH3 নারীদের চেয়ে গড়ে দ্বিগুণ বড়, যা নারী-পুরুষের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নির্দেশ করে[২১]।

লেভ তার ১৯৯১ সালের তথাকথিত যুগান্তকারী গবেষণায় মানব মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ, হাইপোথ্যালামাসের (hypothalamus) INAH-3 অঞ্চলের ভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ৪৩ জন পুরুষের মস্তিষ্কের টিস্যু বিশ্লেষণ করেন, যার মধ্যে ১৯ জন সমকামী এবং ২৪ জন হেটেরোসেক্সুয়াল[২২]। গবেষণায় তিনি দেখতে পান যে, সমকামী পুরুষদের INAH-3 অঞ্চলটি হেটেরোসেক্সুয়াল পুরুষদের তুলনায় ছোট। এই পর্যবেক্ষণটি যৌন পরিচয়ের সাথে মস্তিষ্কের কিছু অঙ্গের আকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা ছিল এবং এটি সমকামিতার জন্য একটি প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পেতে সহায়ক হতে পারে।

যদিও লেভের গবেষণাকে সমকামী গবেষক এবং অ্যাক্টিভিস্টরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে দেখাতে শুরু করে, তবে এটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্কও শুরু হয়। গবেষণা নিয়ে প্রথম দিকে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল এবং সমালোচকরা দাবি করেন যে, গবেষণার নমুনা আকারে ছোট ছিল এবং এতে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এছাড়া, কিছু সমালোচক বলেন যে, গবেষণায় ব্যবহৃত ডেটার মান অগ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেহেতু লেভের নমুনাগুলো মূলত মৃত্যুর পরের মস্তিষ্কের টিস্যু ছিল। এ কারণে গবেষণার ফলাফল দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে গে জিনের অস্তিত্ব আছে বলে দাবী করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যে লেভের গবেষণা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিছু বিজ্ঞানী এই গবেষণার ফলাফলকে সমর্থন করেন, তবে একাধিক গবেষণার মাধ্যমে তাদের দাবির জন্য আরও সমর্থন প্রয়োজন। লেভের কাজ পরবর্তীকালে অন্যান্য গবেষণার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা যৌনতা ও লিঙ্গের জটিলতা নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ তৈরি করেছে। অবশেষে এই গে জিন দাবী করা ছিল একটি বৈজ্ঞানিক প্রতারণা (Scientific Hoax), যা প্রমাণিত হয় ২০১৯ সালে। প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের জেনেটিক স্টাডি করে গে জিনের সন্ধান পাওয়া যায়নি *(There is no gay gene, major study concludes)*। কিন্তু ততদিনে এলজিবিটি আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে এতই শক্তিশালী হয়েছে যে, এখন এটাকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে।

কুইয়ার থিউরি: মিশেল ফুকো এবং জুডিথ বাটলার

কুইয়ার তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, যা যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের প্রচলিত ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই তত্ত্ব মানব সমাজে ব্যবহৃত ভাষা, ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সামাজিক আচরণ কীভাবে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করে, সেই বিষয়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। এলজিবিটি আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে, কুইয়ার তত্ত্ব লিঙ্গের অপরিবর্তনীয়তার ধারণাকে অস্বীকার করে এবং বহুবিধ লিঙ্গ পরিচয় ও তাদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতার জন্য এক নতুন দিশা প্রদর্শন করে। কুইয়ার তত্ত্ব অনুযায়ী, লিঙ্গ ও যৌনতা কেবল শারীরিক বা প্রাকৃতিক বিষয় নয়; বরং এগুলো সামাজিক প্রথা দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়। এই তত্ত্বের বিকাশ একাধিক তাত্ত্বিকের অবদানের ফল; যাদের মধ্যে মিশেল ফুকো, জ্যাক দেরিদা, অ্যান ফাউস্টো-স্টার্লিং এবং জুডিথ বাটলার উল্লেখযোগ্য।

মিশেল ফুকো যৌনতার ইতিহাস এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করে কুইয়ার তত্ত্বের বীজ বপন করেন। তিনি দেখান যে, যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা শারীরিক নয়, বরং সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া একটি নির্মাণ, যা সামাজিক নিয়ম, প্রথা এবং ক্ষমতার কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জ্যাক দেরিদা তার ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্বের মাধ্যমে লিঙ্গের বাইনারি ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি বলেন, মানুষের পরিচয় নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি তরল এবং পরিবর্তনশীল। এইভাবে, লিঙ্গের ধারণা শুধুমাত্র নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এবং এটি বহুমাত্রিক হতে পারে।

অ্যান ফাউস্টো-স্টার্লিং দেরিদার ধারণাকে আরও প্রসারিত করেন, যেখানে তিনি লিঙ্গের তরলতা এবং পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তার কাজ দেখায় যে, লিঙ্গ কেবল একটি জৈবিক (biological) বা সামাজিক গঠন নয়, বরং এটি একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া।

জুডিথ বাটলার তার Gender Performativity তত্ত্বের মাধ্যমে কুইয়ার তত্ত্বের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেন। তিনি বলেন, লিঙ্গ একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক অবস্থা নয়, বরং এটি সমাজে নির্দিষ্ট কাজ ও আচরণের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এর মানে হলো, যদি কেউ শারীরিকভাবে পুরুষ হন, কিন্তু নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দিতে চান, সেটাই তার প্রকৃত পরিচয়। একইভাবে, শারীরিকভাবে

নারী হলেও, যদি কেউ নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দেন, সেটাও তার পরিচয়।

কুইয়ার তত্ত্বের এই বিকাশ আমাদেরকে শেখায় যে, লিঙ্গ ও যৌনতার ধারণা সনাতন বা স্থির নয়; বরং এটি একটি সামাজিক নির্মাণ, যা পরিবর্তনযোগ্য এবং বহুমাত্রিক। এটি মানুষের পরিচয় সম্পর্কে একটি নতুন এবং মুক্ত ধারণার প্রসার ঘটিয়েছে, যা সমাজে লিঙ্গ এবং যৌনতার বিদ্যমান প্রথাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।

লিঙ্গ পরিচয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। জুডিথ বাটলার, যিনি নিজেও একজন লেসবিয়ান, ১৯৯০ সালে তার প্রকাশিত বই *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*-এ একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, লিঙ্গ কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নয়; বরং এটি সমাজের প্রথা এবং মানুষের আচরণ দ্বারা গঠিত। তার মতে, লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তনযোগ্য, এবং এই ধারণা বর্তমানে লিঙ্গ ও যৌনতার চলমান আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

যদিও বাটলারের তত্ত্বটি মৌলিক, তাতে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটকে পরিচয় তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, কিন্তু তার রাজনৈতিক প্রভাবের আলোচনা করতে গিয়ে সামাজিক প্রেক্ষাপটকে অপ্রাসঙ্গিক বলে অভিহিত করেছেন, যা তার তত্ত্বের মধ্যে একটি সাংঘর্ষিক দিক তৈরি করেছে। ওপরন্তু, তার তত্ত্বটি খুব বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। এভাবে, কুইয়ার তত্ত্ব লিঙ্গ ও যৌনতার ধারণার পুনর্নির্মাণে এবং সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত সমাজ গঠনের দাবিকে জোরালো করে।

মিশেল ফুকোর (Michel Foucault) বিতর্কিত জীবন

ফুকোর নিজের ব্যক্তিগত জীবন এবং কিছু আচরণ তার তত্ত্বের নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ফুকোকে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের সাথে তার আচরণ নিয়ে। তিউনিসিয়ান একাডেমিক ও লেখক হায়থেম গেসমি আল-জাযিরাতে লেখেন যে, ফুকো তিউনিসিয়ায় তার একাডেমিক ক্যারিয়ার শুরু করার সময় শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন করতেন[২৩]। এটি তিউনিসিয়ায় একটি ওপেন সিক্রেট ছিল বলে গেসমি উল্লেখ করেন। এই অভিযোগকে আরও

গুরুতর করে তোলেন ফ্রান্সের সুপরিচিত প্রাবন্ধিক গাই সোরমান, যিনি ২০২১ সালের ৫ই মার্চ ফরাসি টিভি চ্যানেল France 5-এ একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি তিউনিসিয়ায় ফুকোর সাথে দেখা করতে গেলে দেখি সে এক শিশুর সাথে যৌনকর্মে ব্যস্ত।'

সেই বছর ২৮শে মার্চ, ব্রিটিশ পত্রিকা Sunday Times-এ দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে সোরমান আরও বলেন, 'বাচ্চাগুলো ছিল ৮, ৯, ১০ বছরের, এবং ফুকো তাদের দিকে টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলত, রাত দশটায় প্রতিদিনের জায়গায় দেখা করো।' সেই জায়গা ছিল সিদি বু সাইদের একটি স্থানীয় কবরস্থান, যেখানে ফুকো কবর ফলকের ওপর শিশুদের সাথে যৌনকর্ম করতেন।

ফুকোর নিজের যৌনাচার এবং তার দ্বারা সংঘটিত নির্যাতনের অভিযোগ তার একাডেমিক কাজের নৈতিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। যৌনতার ইতিহাস এবং ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে ফুকোর তত্ত্বগুলো চার্চ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমালোচনায় ব্যবহার করা হলেও, তার নিজের আচরণ তার লেখা ও মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। ফুকোর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগগুলো এবং সেগুলোর পক্ষে থাকা প্রমাণগুলো তার জীবনের এবং তত্ত্বের একটি অন্ধকার দিক উন্মোচিত করেছে।

১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে নারীবাদ এবং যৌন বিপ্লব ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে একটি নতুন সামাজিক ধারণার সূচনা করে। নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই বিপ্লব প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, বিশেষ করে যৌন নৈতিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যৌন বিপ্লবের প্রভাবে সমাজে বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক, পর্নোগ্রাফি, ওরাল সেক্স, পায়ুকাম এবং সমকামিতার মতো নিন্দিত এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ক্রমশ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করে।

এই পরিবর্তনের পেছনে ছিল পশ্চিমা সংস্কৃতিতে কিছু নতুন জীবনদর্শন, যা নাস্তিক্য দর্শন এবং বিশেষ করে উদারনীতিবাদ (লিবারেলিজম), উপযোগিতাবাদ (ইউটিলিটারিয়ানিজম), এবং 'আমাদের শরীরের মালিক আমরা নিজেই' (We own our own bodies) মতবাদ থেকে উদ্ভূত। উদারনীতিবাদে ব্যক্তির ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং বাসনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এ মতাদর্শের নীতি-নৈতিকতা (মোরাল কোড) ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এ দর্শনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে বাধা দূর করা; এবং সেখানে সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধের কোনো ভূমিকা থাকে না।

অন্যদিকে, উপযোগিতাবাদ (ইউটিলিটারিয়ানিজম)—এই মতবাদের ভিত্তি ছিল 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ' (Maximum happiness for the maximum number of people) অর্জনের লক্ষ্যে। এর ফলে ব্যক্তিগত সুখ এবং আনন্দ অন্বেষণই প্রধান নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে, আমেরিকা একটি রক্ষণশীল দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল, যেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা—যারা আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন—খ্রিষ্টান ধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এ কারণে আমেরিকার সংস্কৃতি এবং আইনি কাঠামোতে ধর্মীয় মূল্যবোধ গভীরভাবে প্রোথিত হয়। এরই প্রতিফলন হলো আমেরিকার রাষ্ট্রীয় নীতিবাক্য "In God We Trust"। ১৯৫৬ সালে কংগ্রেসে পাস হওয়া একটি বিলের মাধ্যমে এই নীতিবাক্যটি গৃহীত হয়, যেটিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার স্বাক্ষর করেন। এই বিলের মাধ্যমে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবদানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

যৌন বিপ্লব এবং নারীবাদের উত্থান পশ্চিমা সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে, যা ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীলতার বিপরীতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সুখকে প্রাধান্য দেয়।

১৯৬০-এর দশকের যৌন বিপ্লবের সময় পাল্টা-সংস্কৃতি (Counterculture) সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬০-এর দশকের আগে, বিবাহপূর্ব যৌনতা এবং সমকামী কার্যকলাপ সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ (taboo) ছিল, এবং অবিবাহিত দম্পতিদের একসাথে বসবাস করা ছিল অত্যন্ত বিরল ও অস্বাভাবিক[১৪]। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ধারা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০ সালে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অবিবাহিত নারী-পুরুষ একসঙ্গে বসবাস করত, যা ২০১৬ সালে বেড়ে প্রায় ১৮ মিলিয়নে (১ কোটি ৮০ লক্ষ জুটি) পৌঁছায়[১৫]। এটি দেখায় যে বিয়ে—যা আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতি ছিল—এখন অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ হয়ে পড়েছে।

১৯৬০-এর দশকের আগে যৌনতা নিয়ে আলোচনা, বিশেষ করে পাবলিক বা প্রাইভেট গণ্ডিতে, লজ্জাবোধ এবং অস্বস্তির কারণ ছিল। পর্নোগ্রাফি এবং যৌন উত্তেজনাপূর্ণ গল্পগুলো পশ্চিমা বিশ্বে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে, হাজার হাজার বছর ধরে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী, বিয়ের মাধ্যমে যৌন সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য ছিল বংশবৃদ্ধি এবং পরিবার গঠন, যা সমাজের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। নারীরা সন্তান ধারণের ফলে শারীরিকভাবে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকত, যা তাদের সামাজিক অবস্থানকেও প্রভাবিত করত।

এই প্রেক্ষাপটে, জন্মনিরোধক বড়ি (contraceptive pill) আবিষ্কার যৌন বিপ্লবে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। জন্মনিরোধক পিলের ফলে নারীরা আরও স্বাধীনভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে, যা বাছ-বিচারহীন মেলামেশাকে সহজ করে তোলে। ১৯৩০-এর দশক থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও সেগুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত ছিলো না এবং গর্ভধারণের ঝুঁকি অনেক বেশি ছিল। তবে, জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের উদ্ভাবনের ফলে এই সমস্যাগুলোর অনেকটাই সমাধান হয় এবং যৌন স্বাধীনতা আরও প্রসারিত হয়।

যদিও সময়ের সাথে সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে, তবে হোমোসেক্সুয়ালিটি বা এলজিবিটি প্রশ্নে আমেরিকায় রাষ্ট্রীয়ভাবে রক্ষণশীল অবস্থান

২০০০ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৯৮৬ সালে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের একটি আইনি লড়াইয়ে, সুপ্রিম কোর্ট 'সোডোমি আইন' (sodomy law) সমর্থন করে, যা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন কার্যকলাপকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। এমনকি লিবারেল আদর্শের ধারক ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও ১৯৯৩ সালে 'ডোন্ট আস্ক, ডোন্ট টেল' (Don't Ask, Don't Tell) নীতি প্রণয়ন করেন, যা সামরিক বাহিনীতে সমকামিতা নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৯৬ সালে 'ডিফেন্স অব ম্যারেজ অ্যাক্ট' (Defense of Marriage Act) পাস হয়, যা বিবাহকে কেবল একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে।

এইসব পরিবর্তন এবং আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াগুলো দেখায় যে, যৌন বিপ্লব এবং পাল্টা-সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও, সমাজের এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো এবং রক্ষণশীল মূল্যবোধ বজায় ছিল। তবে, সময়ের সাথে সাথে এসব ধারণা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং পরিবর্তিত হয়, যা আজকের সমাজে যৌনতা এবং সম্পর্কের বিষয়ে আরও উদার ধারণার প্রবর্তন করেছে।

আমেরিকায় সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিল এবং অতপর...

২০০৩ সালে টেক্সাসের একটি আইনি লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে (Lawrence v. Texas), আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সমকামিতা-বিরোধী আইন বাতিল করে দেয়, যা সমলিঙ্গের যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করত। এই রায়ের ফলে সমকামিতা ডি-ক্রিমিনালাইজড হয় এবং বিশ্বব্যাপী এলজিবিটি আন্দোলনের জন্য একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। আমেরিকায় এলজিবিটি ও ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি আন্দোলন বিশেষভাবে বেগবান হয় প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমর্থনের মাধ্যমে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৪ সালের সিনেট নির্বাচনের সময়, ওবামা সমলিঙ্গের বিয়ের (same-sex marriage) বিরোধিতায় কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে, দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন আসে। ডিনার টেবিলে তার মেয়ের সাথে একটি আলাপচারিতায়, যেখানে তার মেয়ের কিছু বন্ধু সমলিঙ্গের পরিবারের সন্তান ছিল, ওবামা অনুতাপ অনুভব করেন এবং বুঝতে পারেন যে, সমলিঙ্গের বিয়ে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এই উপলব্ধির পর, তিনি সমকামী বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন।

সমকামিতা ডি-ক্রিমিনালাইজেশন এলজিবিটি সামাজিকীকরণের নিয়ামক

দেশ	সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিল (Decrimi-naization)	সমকামিতা (same-sex partnership or union) সম্পর্ক আইনগতভাবে সিদ্ধ	সমকামী বিয়ে আইন (same-sex marriage law)	সমকামিতাকে নৈতিকভাবে সঠিক মনে করা (২০২০)[২৬], [২৭]
আমেরিকা	২০০৩	২০০৩	২০১৫	৭২%
কানাডা	১৯৬৯	২০০১	২০০৫	৮৫%
অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৫	২০০৯	২০১৭	৮১%
ইংল্যান্ড	১৯৬৭	২০০৫	২০১৪	৮৬%
নেদারল্যান্ডস	১৮১১	১৯৯৮	২০০১	৯২%
জার্মানী	১৯৭৬	২০০১	২০১৭	৮৬%
স্পেন	১৯৭৯	২০০৫	২০০৫	৮৯%
সুইডেন	১৯৪৪	১৯৯৫	২০০৯	৯৪%
ফ্রান্স	১৭৯১	১৯৯৯	২০১৩	৮৬%
ইতালি	১৮৯০	২০১৬	-	৭৫%
ব্রাজিল	১৮৩১	২০০৪	২০১৩	৬৭%
আর্জেন্টিনা	১৮৮৭	২০১০	২০১০	৭৬%
নেপাল	২০০৭	২০০৭	-	৬৪%
ইন্ডিয়া	২০১৮	-	-	৩৭%

২০১৩ সালে, "ডিফেন্স অব ম্যারেজ অ্যাক্ট" (Defense of Marriage Act) বাতিল করার মাধ্যমে সমলিঙ্গের বিয়ের আইনগত স্বীকৃতির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। এটি এমন একটি আইন ছিল, যা বিবাহকে কেবলমাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট এই আইনটি বাতিল করে, যা সমলিঙ্গের বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসে। একই সময়ে, ২০১০ সালে, 'ডোন্ট আস্ক, ডোন্ট টেল' (Don't Ask, Don't Tell) আইনটিও ওবামার বিশেষ নির্দেশে বাতিল করা হয়, যা সামরিক বাহিনীতে

সমকামীদের প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার দেয়।

২০১৫ সালে "Obergefell v. Hodges" মামলার রায়ে, আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সমলিঙ্গের বিয়েকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই রায়টি সমকামী বিয়েকে বৈধতা দেয় এবং সমকামী অধিকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে ওঠে।

ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সমকামিতা অনেক আগেই ডি-ক্রিমিনালাইজড হয়েছিল, তবে সমলিঙ্গের বিয়ে আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। তবে, আমেরিকায় ২০০৩ সালে সমকামিতা ডি-ক্রিমিনালাইজড হওয়ার পর পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে এলজিবিটি আন্দোলন আরও দ্রুতগতিতে এগোতে শুরু করে।

ব্র্যাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের সূচনা

দেড়শ বছর আগে বার্লিনের উলরিখস হাইনরিখস-এর প্রজ্বলিত সমকামী অধিকার আন্দোলনের মশাল বাংলাদেশে পৌঁছে ২০০৫ সালে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমা সমাজে যখন সমকামিতা সামাজিকভাবে দৃশ্যমান হওয়া শুরু হয়, সেই সময়ে বাংলাদেশের মত রক্ষণশীল সমাজে ব্র্যাক এনজিও এই পায়ুসংগম অধিকার নিয়ে একাডেমিক গবেষণার আড়ালে কাজ শুরু করে; আরও স্পষ্টভাবে বললে ২০০৫ সালে। ব্রিটেনের অর্থায়নে রিয়েলাইজিং রাইটস প্রজেক্ট শুরু হয় এলজিবিটি সামাজিকীকরণে। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার ডেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ স্কুল জনপরিসরে সমকামী অধিকার দাবী করে। এরপর উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাকের নেতৃত্বে শুরু হয় বাংলাদেশে সমকামী আন্দোলনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর কাজ। সামনের পরিচ্ছেদগুলোতে দেখতে পাব ব্র্যাক কিভাবে দেশি-বিদেশি শক্তিশালী এলজিবিটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন পাশ করানোর পর্যায়ে উপনীত হয়।

Reference

1. Pope says Roman Catholic priests can bless same-sex couples. (2023).
2. Same-sex blessings open rift between Vatican and African churches. Le Monde.fr (2023).

3. Haskins, S. The influence of Roman laws regarding same-sex acts on homophobia in Africa. African Human Rights Law Journal 14, 393–411 (2014).

4. Meet Karl Heinrich Ulrichs, 'the first gay person to publicly out himself'. https://www.thepinknews.com/2021/10/11/karl-heinrich-ulrichs-gay-coming-out/.

5. Ulrichs and America Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) and the United States, by Jonathan Ned Katz OutHistory. https://outhistory.org/exhibits/show/katz-ulrichs/katz-ulrichs.

6. WashingtonPost.com: Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality. https://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/queerscience.htm.

7. Hirshfield. Vier Briefe. 1899, P.46.

8. "Karl Heinrich Ulrichs" in Gay and Lesbian Biography (London: St. James Press), Pages 436-439.

9. 100 years ago, Germany's 'Einstein of Sex' began the gay rights movement. https://www.timesofisrael.com/100-years-ago-germanys-einstein-of-sex-began-the-gay-rights-movement/.

10. Bauer, H. The Hirschfeld Archives: Violence, Death, and Modern Queer Culture. (2017).

11. Joyce, H. Trans: When Ideology Meets Reality. (Oneworld Publications, London, 2021).

12. (Trans)Formation: The Story of Christine Jorgensen | AMERICAN EXPERIENCE | PBS. (2023).

13. Brown, T. M. & Fee, E. Alfred C. Kinsey: A Pioneer Of Sex Research. Am J Public Health 93, 896–897 (2003).

14. Jones, J. H. (James H. Alfred C. Kinsey : A Public/Private Life. (New York : W.W. Norton, 1997).

15. Fraud and pervert Alfred C. Kinsey returns - Washington Times. https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/24/fraud-and-pervert-alfred-c-kinsey-returns/.

16. Really, Dr Kinsey? - The Lancet. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PII0140-6736(91)91322-L/fulltext?code=lancet-site.

17. How Alfred C. Kinsey's Sex Studies Have Harmed Women and Children.

18. Grossman, M. Lost in Trans Nation: A Child Psychiatrist's Guide Out of the Madness. (Skyhorse Publishing, 2023).

19. 19. Cameron, P. & Cameron, K. Re-Examining Evelyn Hooker: Setting the Record Straight with Comments on Schumm's () Reanalysis. Marriage & Family Review 48, 491–523 (2012).

20. COVER STORY ; Social Studies ; Scientist Simon LeVay Heads New College That Explores Contributions of Gay Community--Now All He Needs Is a Building - Los Angeles Times. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-05-05-we-53866-story.html.

21. Two sexually dimorphic cell groups in the human brain - PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2918374/.

22. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men - PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18872190/.

23. Reckoning with Foucault's alleged sexual abuse of boys in Tunisia | Racism | Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2021/4/16/reckoning-with-foucaults-sexual-abuse-of-boys-in-tunisia.

24. Opinion | The Downside of Cohabiting Before Marriage - The New York Times. https://www.nytimes.com/2012/04/15/opinion/sunday/the-downside-of-cohabiting-before-marriage.html.

25. Number of cohabiting Americans rises, especially among those 50+ | Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2017/04/06/number-of-u-s-adults-cohabiting-with-a-partner-continues-to-rise-especially-among-those-50-and-older/.

26. Same-Sex Marriage Around the World. Pew Research Center https://www.pewresearch.org/religion/fact-sheet/gay-marriage-around-the-world/ (2024).

27. Kent, J. P. and N. The Global Divide on Homosexuality Persists. Pew Research Center https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/ (2020).

সমকামী আচরণ কি অধিকারের বিষয়?

এলজিবিটি আলোচনাকে নৈতিকতার ডিসকোর্স হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের অসচেতনতা এবং সমাজের প্রচলিত প্রথার নৈতিক ভিত্তি নিয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে সমকামিতাকে এমনভাবে শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় যাতে বেশিরভাগ মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। মনে হতে পারে, তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দিলে কোনো সমস্যাই নেই; তারা তো মানুষ, তাদেরও অধিকার আছে। যৌন আকর্ষণ, যৌন আচরণ এবং পরিবার গঠনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সমতা, মর্যাদা এবং মানবাধিকারের প্রশ্ন। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোর আলোকে সমকামী গোষ্ঠী তাদের মূল লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারণ করেছে যে, এলজিবিটি মতবাদের বিরোধিতা করা মানে সমতা, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং সহমর্মিতার বিরোধিতা করা। তারা হাজার হাজার বছরের প্রচলিত নৈতিকতাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে যে, সেই পরিভাষাগুলোর অর্থ রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

সমকামী আচরণকে অধিকার বলার যৌক্তিক ভিত্তি কী

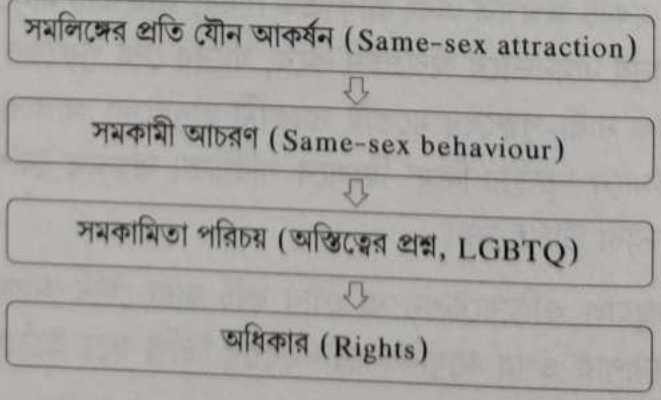
আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম প্রকাশ্য সমকামী আন্দোলনের পুরোধা কার্ল হাইনরিখ উলরিখস ১৮৬৯ সালে সমলিঙ্গের যৌনতাকে পরিচয় (আইডেন্টিটি) হিসেবে উপস্থাপন করে তৎকালীন জার্মানির সমকামিতা-অপরাধ আইন (প্যারাগ্রাফ ১৭৫) বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হন। তিনি মূলত পায়ুসংগমের অধিকার দাবি করেন। তার যুক্তি ছিল, যেহেতু সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন) একটি জন্মগত এবং প্রাকৃতিক বিষয়, তাই এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিছু মানুষ এমনভাবে জন্মগ্রহণ করে, যাদের দেহ পুরুষের হলেও আত্মা নারীর। স্বাভাবিক নারী-পুরুষের মতোই সমকামী মানুষদের আলাদা একটি শ্রেণী রয়েছে, যা বর্তমানে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে পরিচিত। জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কাউকে দোষী ভাবা উচিত নয়।

উল্লেখ্য, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা যৌন রুচি দ্বারা যৌন আকর্ষণ বোঝানো হয় এবং এই ধারণার ওপর আধুনিক যৌনতত্ত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এই ধারণা

অনুযায়ী, মানুষের দেহ এবং যৌন রুচি আলাদা হতে পারে, যা নারীত্ব বা পুরুষত্বের সাথে সামঞ্জস্য না-ও রাখতে পারে। যারা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে সমকামী; যারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তারা অসমকামী; এবং যারা উভয় লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তারা উভয়কামী। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের ধারণার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন উলরিখস, যার সময়কালে এটি 'আরনিং' নামে পরিচিত ছিল।

উলরিখস এনলাইটেনমেন্ট যুগের বস্তুবাদী চিন্তক ও তাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় লিঙ্গের এই বিতর্কিত তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে, কিছু সমকামী বিজ্ঞানী (যেমন- হার্শফিল্ড, আলফ্রেড কিনসি, জন মানি) এবং সমাজ ও নৃতত্ত্ববিদ (যেমন- জুডিথ বাটলার) ভুলভাল বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে সমকামী আচরণকে পরিচয় (আইডেন্টিটি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর মানুষের পরিচয় তার অস্তিত্বের মূলে নিহিত।

এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টদের দাবি হলো, সমাজের প্রচলিত প্রথায় (ধর্মীয় বিধি-নিষেধ) সমলিঙ্গের মানুষের জন্মগত যৌন আকাঙ্ক্ষা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন) অবদমিত থাকে, অর্থাৎ তারা তা প্রকাশ করতে পারে না। *সমাজ তাদের বিকৃত যৌন আচরণকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলে তারা বৈষম্যের শিকার হয়।* তাদের সংখ্যা যেহেতু কম, তাই তারা সমাজের 'অবহেলিত গোষ্ঠী' বা 'সংখ্যালঘু' এবং 'সুবিধাবঞ্চিত' সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে, 'আচরণ' থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সমকামিতার বৈধতাকে 'অধিকার' ডিসকোর্সে পরিণত করা হয়। বর্তমানে বিকৃত যৌনতা তথা সমকামিতার যেকোনো আলোচনা অধিকারের আলোচনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।



নৈতিকতা নির্ধারণের মাপকাঠি কী

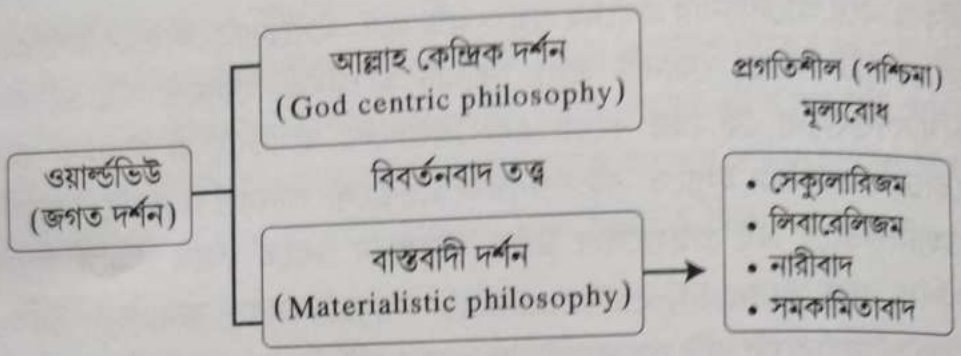
অধিকার নিয়ে আলোচনার প্রথমেই প্রশ্ন করতে হবে—নৈতিকতা কীভাবে নির্ধারিত হয়? কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল? কোনটি স্বাভাবিক, কোনটি অস্বাভাবিক? এই মানদণ্ডগুলো কে স্থির করে? এবং নির্ধারণের মাপকাঠি বা নিয়ামক কী? যেকোনো সামাজিক ইস্যুতে এই দর্শনগত প্রশ্নগুলো অনিবার্যভাবে উঠে আসে। ঐতিহাসিকভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে সামনে আসে আদর্শিক দ্বন্দ্ব (Ideological conflict)। সাধারণভাবে, সামাজিক নীতি-নৈতিকতা নির্ধারণের দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি বা ওয়ার্ল্ডভিউ রয়েছে: একদিকে রয়েছে সৃষ্টিকেন্দ্রিক ধর্মীয় দর্শন, আর অন্যদিকে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক (বস্তুবাদী) দর্শন।

ধর্মীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক-ভুল বা ভাল-মন্দ নির্ধারণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ) নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে, বস্তুবাদী বা জড়বাদী দর্শনে সৃষ্টিকর্তার কোনো স্থান নেই; সেখানে নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে মানুষের মন, যাকে 'মাইন্ড গড' বলা যেতে পারে।

বস্তুবাদী দর্শনে, জাগতিক যাবতীয় অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হলো বস্তু (ম্যাটার)। বস্তুময় মহাবিশ্ব চিরন্তন এবং স্থান ও কালের নিরিখে অসীম। মানুষের ভাবনা ও চেতনা বিবর্তনের ধারায় উদ্ভূত হয়ে বস্তুভিত্তিক এবং বস্তুর প্রতিফলন হিসেবেই বিবেচিত। যেহেতু বস্তুকে পরিমাপ করা সম্ভব, তাই নৈতিকতা নির্ধারণে বিজ্ঞান এবং এম্পিরিক্যাল ডেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহজভাবে বলা যায়, অনেক মৌলিক বিষয়ে (যেমন- বিয়ে, যৌন সম্পর্ক) আস্তিক্য নৈতিকতা অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ এগুলো হলো ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, যা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। অপরদিকে, কালের বিবর্তনে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতি-নৈতিকতারও পরিবর্তন হতে পারে (যেমন সমকামিতার ক্ষেত্রে), যা প্রগ্রেসিভ দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যে পশ্চিমা সমাজ আজ সমকামিতার মতো অযৌক্তিক এবং বিকৃত বিষয়কে মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই সমাজ মাত্র ২০০ বছর আগেও সৃষ্টিকর্তা-কেন্দ্রিক ধর্মীয় দর্শনের অধীনে পরিচালিত হতো। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পশ্চিমা সমাজ ক্রমশ সৃষ্টিকর্তা-কেন্দ্রিক (Theocentric) জীবনদর্শন থেকে বিচ্যুত হয়ে বস্তুবাদিতার (Materialism) দিকে ঝুঁকে পড়ে। আঠারো শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডের চিন্তাবিদরা এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেন, যেখানে

জ্ঞানার্জন এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রেও মানুষের যুক্তি প্রাধান্য পেতে শুরু করে।



উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাইবেলের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের আলোকে বাইবেলের দাবিকৃত পৃথিবীর ৬,০০০ বছরের বয়স খণ্ডিত হয়, এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে বলা হয় যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রজাতির উদ্ভব কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে ধাপে ধাপে ঘটেছে। এর ফলে খ্রিষ্টান ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে, নিটশে তার বিখ্যাত উক্তি 'ঈশ্বর মৃত' (God is dead) ঘোষণা করেন, যার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সমাজের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে[১]।

আঠারো ও উনিশ শতাব্দীতে লিবারেলিজম বা উদারনীতিবাদের উত্থান ঘটে, যেখানে সৃষ্টিকর্তা নির্দেশিত সমাজ ও পারিবারিক নীতি এবং মূল্যবোধের বিপরীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualism) তথা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মালিকানার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। *The Rise and Triumph of the Modern Self* বইয়ে লেখক কার্ল ট্রুম্যান দেখান যে, ফরাসি দার্শনিক রুশোর মতে, মানুষের মূল পরিচয় (Core Identity) হলো তার অন্তর্নিহিত মানসিক অনুভূতি এবং অকৃত্রিমতা[২]। নিজের প্রতি অকৃত্রিম থাকা (Authenticity) মানে হলো নিজের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা, যা রুশো 'Self-actualization' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ট্রুম্যান এটিকে 'মনস্তাত্ত্বিকীকরণ' (Psychologization) বলে অভিহিত করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের এলজিবিটি আইডেন্টিটির আলোচনায়ও প্রতিফলিত হয়, যেখানে একজন ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলো প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

যখন মানুষের জীবনে ধর্মের গুরুত্ব কমে যায়, তখন যৌন নৈতিকতার মানদণ্ড

নিজেদের ইচ্ছামতো নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ প্রদত্ত যৌন বিধি-নিষেধের গাইডলাইন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যেসব দার্শনিকের প্রভাব রয়েছে, তাদের মধ্যে কার্ল মার্ক্স (Karl Marx: ১৮১৮–১৮৮৩), ফ্রিডরিখ নিটশে (Friedrich Nietzsche: ১৮৪৪–১৯০০) এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud: ১৮৫৬–১৯৩৯) অন্যতম।

কার্ল মার্ক্স বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন, যা আস্তিক্য নীতির পরিবর্তে একটি বিপ্লবী ধারণা। নিটশে ধর্মীয় নৈতিকতাকে তীব্রভাবে চ্যালেঞ্জ করেন এবং যুক্তির চেয়ে ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব দেন। ফ্রয়েড ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে যৌনতাড়না (Sex Drive) পূরণে জোর দেন এবং সুখের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা চেয়েছেন, যদিও তিনি সভ্যতার স্বার্থে এটিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। ফ্রয়েডের ধারণাগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও, তারা সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ায় গভীর প্রভাব ফেলেছে।[১]

ফ্রয়েডের অনুসারীরা, যেমন উইলহেল্ম রাইখ (Wilhelm Reich: ১৮৯৭–১৯৫৭) এবং হার্বার্ট মার্কুজ (Herbert Marcuse: ১৮৯৮–১৯৭৯) যৌন স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো ওকালতি করেছেন। এরা সবাই নাস্তিক্য মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাদের চিন্তাধারা সমাজের প্রচলিত যৌন নৈতিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, যদি যৌন আচরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক তথা ধর্মীয় মূল্যবোধকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে যৌন নৈতিকতার কম্পাস শুধুমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এর ফলে, বিকৃত যৌন আচরণকে পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে তা অধিকারের দাবিতে পরিণত করা সহজ হয়ে যাবে। মোটাদাগে, আধুনিক নৈতিকতা (লিবারেল) নির্ধারণে যে মাপকাঠিগুলো বিবেচনা করা হয়—

* ব্যক্তি স্বাধীনতা (Individual freedom)
* ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন (Self-autonomy)
* অকৃত্রিমতা (Authenticity)
* পারস্পরিক সম্মতি (Consent)

সমকামীরা কি বৈষম্যের শিকার বা অধিকার বঞ্চিত?

সমকামীদের নিয়ে কিছু পরিচিত শব্দ আছে, যেমন- সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া জনগণ, মার্জিনালাইজড সম্প্রদায় এবং সুবিধাবঞ্চিত। সুশীল সমাজ, লিবারেল গ্রুপ, এনজিও এবং সমকামী এক্টিভিস্টরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, সেকেলে ধ্যান-ধারণার কারণে সমাজ সমকামীদের অধিকার স্বীকৃতি দেয় না। তারা বলেন, তারাও অন্য দশজনের মতো মানুষ, তাদেরও ভালোবাসার অধিকার আছে। তবে ব্যাপারটি কি আসলেই এমন? যদি শুধুমাত্র সমলিঙ্গের যৌনাচার বাদ দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে তাদের অন্যান্য সব অধিকার, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, নাগরিকত্ব, এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। বৈষম্যের আলোচনার সূচনা ঘটে তখনই যখন সমকামী পরিচয়কে আলাদা করে দেখা হয়। মূলত, সমাজের অঙ্গ হিসেবে তারা অন্যান্য মানুষের মতো সব মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকেন, এবং বৈষম্য বা পছন্দের অভাব তখনই উঠে আসে যখন এই আলাদা পরিচয়টি অধিকারের দাবিতে পরিণত হয়।

সমকামীরা 'সমতা বা সমান অধিকার' বলে আসলে কী বোঝায়

সহজভাবে বলতে গেলে, সমকামী ব্যক্তিরা তাদের যৌনকর্মের বৈধতা, পায়ুসংগমের অধিকার এবং সামাজিকীকরণের দাবি করেন। তাদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সমলিঙ্গের মধ্যে বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনত বৈধতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই আচরণকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা। কিছু প্রধান দাবী হলো:

* শিক্ষা ও সচেতনতা: পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিশুদের জানানো হবে যে, সমকামিতা মানসিক বিকৃতি নয়, এটি অসমকামিতার মতো একটি স্বাভাবিক জন্মগত বিষয় এবং পাপ-পুণ্যের বিষয় নয়।
* ট্রান্সজেন্ডার অধিকার: ট্রান্সজেন্ডাররা তাদের ইচ্ছানুসারে নিজেদের নারী বা পুরুষ হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে, এবং রাষ্ট্র তাদের নতুন পরিচয়কে আইনত স্বীকৃতি দেবে। নারীর ক্ষেত্রে যেমন- চাকরি, হোস্টেল, টয়লেট, নারীকেন্দ্রিক বিশেষ সুবিধা, খেলাধূলা ইত্যাদিতে পুরুষেরা নারী (ট্রান্সজেন্ডার) হিসেবে ভোগ করার অধিকার দাবি করছে।
* স্বাস্থ্যসেবা: বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরের জন্য সার্জারি, হরমোন ট্রিটমেন্ট, কাউন্সিলিং ইত্যাদির খরচ জনগণের আয়করের টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করার

দাবী রয়েছে।

* রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি: সমকামীদের দীর্ঘকাল ধরে বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে তাদের কাফফারা বা স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রশংসা এবং উদ্‌যাপন (যেমন- প্রাইড মান্থ বা সমকামিতার গর্বের মাস পালন) দাবি করা হচ্ছে।

এই দাবীগুলো সমাজে সমকামীদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেওয়া উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত।

লিবারেল নৈতিকতায় যেকোনো বিকৃত আচরণকে অধিকার বানানো যাবে

এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝতে সহজ হতে পারে।

জেনোমেলিয়া বা ট্রান্সঅ্যাবল্ড

কিছু মানুষ নিজেকে বিকলাংগ বা পঙ্গুত্ববরণ করার তীব্র আকর্ষণ বোধ করে এবং নিজের পা কেটে ফেলার মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি অনুভবও করে। এই প্রকারের বিকৃতি জেনোমেলিয়া বা বডি ইন্ট্রিগ্রেটি ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের শরীরের অংশ কেটে ফেলে বা অঙ্গহানির মাধ্যমে এক ধরনের যৌন তৃপ্তি লাভ করে। সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্তিশালী মানুষের জন্য নিজস্ব অঙ্গহানি বা পা কেটে ফেলার মতো কার্যকলাপ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, তবে যারা এই বিকৃতির শিকার, তাদের কাছে এটি এক ধরনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে গণ্য হয় [৩] also referred to as body integrity identity disorder (BIID)।

অবশ্য, এ ধরনের আচরণের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন, সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ যেমন অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়, তেমনি এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাও তাদের কাছে জন্মগত ও প্রাকৃতিক মনে হতে পারে। এতে অন্যের সম্মতির প্রয়োজন হয় না, যা কিছুটা যৌক্তিক মনে হতে পারে। নব্বইয়ের দশকে স্কটিশ সার্জন রবার্ট স্মিথ দুজন সুস্থ মানুষের পা কেটে দিয়ে এই বিষয়টির বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করেছিলেন। ২০০৫ সালে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২ জনের মধ্যে ২৫ শতাংশ নিজেরাই পা কেটে ফেলেছে। এমনও ঘটেছে যে, চিকিৎসক পা কেটে দেয়ার জন্য রাজি হননি, ফলে রোগীরা ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পা আহত করে তাতে সার্জারী করিয়েছেন।[৪]

কোনো সুস্থ মানুষকে অক্ষমে রূপান্তরিত করা কি নৈতিকভাবে ঠিক? এটা নিয়েও গবেষণা প্রবন্ধ বের হয়েছে। লিবারেল নৈতিকতা অনুযায়ী এটা তাদের অধিকার। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ট্রান্সজেন্ডাররা নিজেদের বাসনা পূরণ করতে যদি সার্জারি করে বিভিন্ন অংগ ফেলে দিতে পারে, তবে তারাও একই যুক্তিতে পা কেটে ফেলতে পারে। এই ধরনের মানুষকে ট্রান্সঅ্যাবল্ড (Transabled) অর্থাৎ রূপান্তরিত অক্ষম মানুষও বলা হয়।[৫] ট্রান্সজেন্ডারদের মতো এরা নিজেদের এই আচরণকে পরিচয় মনে করে। এখন তারাও নিজেদের সংখ্যালঘু, সুবিধাবঞ্চিত মনে করে তাদের অধিকার দাবী করতে পারে। তাদের চলাফেরার জন্য বিশেষ রাস্তাসহ, বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট সিস্টেম তৈরী করা সরকারে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাদেরকে সমাজে স্বীকৃতি না দিলে মানসিক যাতনায় তারা আত্মহত্যাও করতে পারে। এই মানসিক অবস্থায় যেন তারা পতিত না হয়, সেজন্য এটাকে সমাজিকভাবে উতযাপনের ব্যবস্থা করাও উচিত।

অজাচার

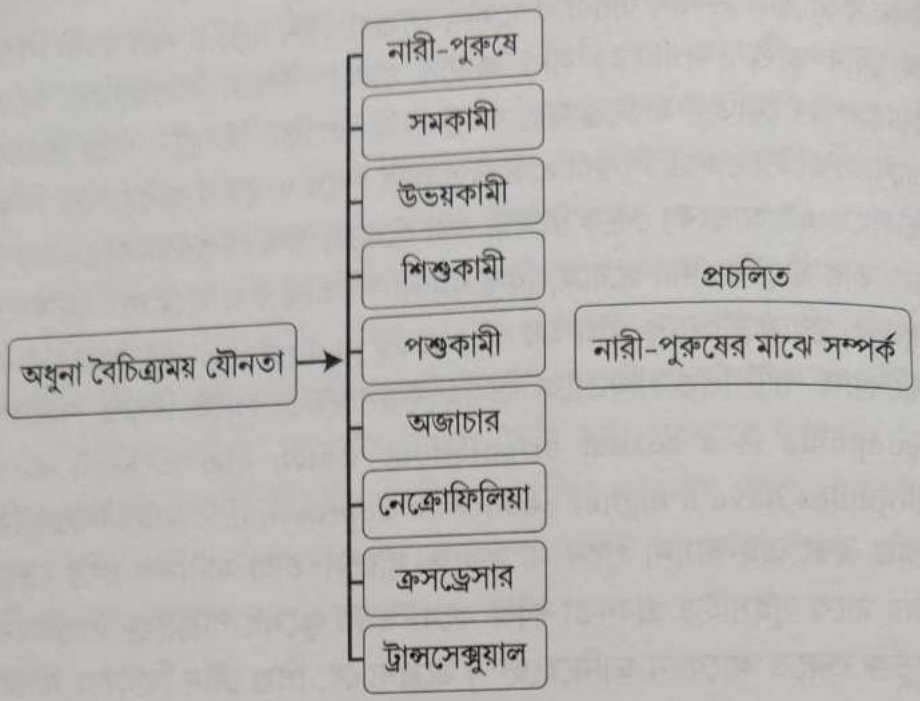
অজাচার (ভাই-বোন, পিতা-মাতার সাথে সন্তানের যৌন সম্পর্ক), শিশুকাম, পশুকামসহ সব বিকৃত আচরণকে পরিচয় বানিয়ে স্বাভাবিকীকরণে দাবী করা হচ্ছে। যে অজাচার সব সমাজ এবং কালচারে নিষিদ্ধ ছিল এখন তা আইনত গ্রহণযোগ্য করা হচ্ছে লিবারেল নৈতিকতা গ্রাউন্ডে[৬]। প্রসংগত, অজাচার নিয়ে জার্মানী মাল্টিডিসিপ্লিনারি এথিক্স কাউন্সিল রায় দিয়েছে, এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয় (Incest 'a fundamental right', says German Ethics Council)[৭]। পশ্চিমা দেশে অজাচার নিষিদ্ধ করার মূল কারণ ধর্মীয় নৈতিকতা ছিল না; এই অজাচার যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু নিলে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পড়তে পারে। শিশুর জন্ম না হলে এই নিষেধাজ্ঞা ভিত্তিহীন। পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ অজাচারে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিগত অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। বিশ্বের ২০টির মতো দেশে ইনসেস্ট বা অজাচার নিরপরাধীকরণ বা ডি-ক্রিমিনালাইজেশন করা হয়েছে[৮]।

শিশুকামিতা

সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা মহারথীদের (যেমন আলফ্রেড কিনসি) বেশিরভাগ নিজেরা সমকামী ছিলেন এবং তারা শিশুকামিতাকে (পেডোফিলিয়া)

সমর্থন করেছেন। কিনসি ধারণা করতেন, শিশুরা যৌন বস্তু; ৪ মাস বয়সী শিশুও চরম যৌন তৃপ্তি (অর্গাজম) লাভ করতে পারে। পশ্চিমে শিশুকামিতা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নৈতিক গ্রাউন্ডে নয়; কনসেন্ট বা সম্মতির বিষয়টির নিয়ে বিতর্কের কারণে। সম্মতির ক্ষেত্রে শিশুরা প্রভাবিত হতে পারে বা জোর-জবরদস্তির শিকার হতে পারে এই আশংকা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু শিশুকামিতা যে জন্মগত বিষয়, তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু বাসনা চরিতার্থ করা যাবে না। এই ধরণের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনকে বলা হয় Virtuous pedophilia নেদারল্যান্ডের এক পলিটিক্যাল পার্টি শিশুকামিতাকে ডি-ক্রিমিনালাইজড করতে বিবৃতি দিয়েছে— "Pedophilia is a sexual orientation, which one is born with... Pedophiles have a higher chance of depression." অর্থাৎ শিশুকামিতা জন্মগত এবং এই বাসনা পূরণ না করতে পারলে তারা মানসিক কষ্টে ভোগে, তাদের মাঝে সুইসাইড প্রবণতা কাজ করে। তারা স্কুলের পাঠ্যক্রমে শিশুকামিতা অন্তর্ভুক্ত করতে আবেদন জানিয়েছে[৯]। উল্লেখ্য যে, শিশু যৌন নির্যাতন অপরাধে অভিযুক্তদের বড় একটি অংশ হচ্ছে সমকামী (এলজিবিটি) সম্প্রদায়ের। ৪০০০ পেডোফাইলের (শিশুকামী) ওপর এক বৃহৎ গবেষণা করে দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৩% পেডোফাইল সমকামী এবং আরো অনেকে উভকামী[১০]। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় সমকামীদের সংখ্যা খুবই নগন্য (১%)। তার মানে অভিযুক্ত পেডোফাইলদের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ অনেক বড় সংখ্যা। এই গবেষণায় এটাও দেখে গেছে যে, সমকামী পেডোফাইলদের এই ধরনের অপরাধ পুনরায় করার সম্ভাবনাও বেশি এবং তাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলাও কঠিন।

পরস্পর সম্মতির বিষয়টিও আপেক্ষিক। কিছু সংস্কৃতিতে শিশুদের সাথে যৌনতাকে স্বাভাবিক মনে করা হয় এবং তাদের মাইন্ডসেট সেভাবেই তৈরী করা হয়। অন্যদিকে পূর্ণবয়স্ক মানুষরা বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্কে লিপ্ত আপাতত সম্মতির ভিত্তিতে হলেও শতকরা ৫০ ভাগের বেশী নিজেদের দোষী (গিল্টি) মনে করে[১১]। অন্যদিকে জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ায় আক্রান্ত শিশুরা পিতামাতার সম্মতি ছাড়াই নিজেদের বন্ধ্যাত্ববরণের মতো সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার পশ্চিমা দেশে রয়েছে। এটা ডাবল স্টান্ডার্ড হয়ে গেল না?



ন্যুডিজম বা ন্যাচারিজম

সমকামিতার মতো বিকৃত যৌনাচার স্বাভাবিক ধরা হলে ন্যুডিজম লাইফস্টাইলও (নগ্ন থাকা) স্বাভাবিকীকরন হয়ে যাবে। পশ্চিমে অনেক মানুষ নগ্ন থাকতে আনন্দ অনুভব করে। এক হিসেবে দেখা গেছে, শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ জনসমক্ষে নগ্ন চলাফেরায় সুখ অনুভব করে (the life-affirming joys of going publicly unclothed)[১২]। এ কারণে ন্যুড বিচ, ন্যুড হোটেল, ন্যুড পার্ক ইত্যাদির বড় বিজনেস দাঁড়িয়ে গেছে। কোভিডের পর নগ্ন হওয়ার প্রবণতা আরো অনেক বেড়ে গেছে। ইংল্যান্ডে কোভিডের পর গত ১০০ বছরের মধ্যে এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

জনসমক্ষে নগ্নতা কি যৌন সুড়সুড়ির সাথে সম্পর্কিত? এটা নিয়েও বিতর্ক করা যায়। নগ্নতার সাথে নাকি যৌনতার সম্পর্ক নেই, এটা নাকি একটা শিল্প। কেউ যৌন উত্তেজিত হলে এটা ব্যক্তির দোষ। পাবলিক প্লেসে নগ্নতায় সমকামিতার মতো সম্মতির বিষয়ও নেই। শালীনতা এখানে আপেক্ষিক। শালীনতার সংজ্ঞাই পালটে গেছে আধুনিককালে। পশ্চিমা দেশে নগ্নতাও ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনের অন্তর্ভুক্ত যা লিবারেল মূল্যবোধের অন্যতম মৌলিক বিষয়।

এখন একই যুক্তিতে বাংলাদেশের মতো দেশে নগ্নতার সংস্কৃতি যদি অধিকারের

মোড়কে স্বাভাবিকীকরণ করা হয় তবে কি তা মেনে নিবেন? সমকামিতা/ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ যদি নৈতিক অধিকার মনে করা হয়, তাহলে নগ্ন সাইক্লিস্টদেরও মেনে নিতে হবে।

References

1. Islam and the LGBT Question: Reframing the Narrative. Yaqeen Institute for Islamic Research. https://yaqeeninstitute.org/read/paper/islam-and-the-lgbt-question-reframing-the-narrative. Accessed 7 Jul 2024.
2. Trueman CR, Dreher R. The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution. Wheaton: Crossway; 2020.
3. Body integrity dysphoria. Wikipedia. 2024.
4. First MB. Desire for amputation of a limb: paraphilia, psychosis, or a new type of identity disorder. Psychol Med. 2005;35:919–28.
5. Taylor A. The Complicated Issue of Transableism. JSTOR Daily. 2019. https://daily.jstor.org/the-complicated-issue-of-transableism/. Accessed 13 Nov 2024.
6. Andrade GE. A libertanian critique of incest laws: Philosophical and anthropological perspectives. Human Affairs. 2021;31:139–48.
7. Incest "a fundamental right", says German Ethics Council| News | | The Week. https://theweek.com/law/60587/incest-a-fundamental-right-says-german-ethics-council. Accessed 13 Nov 2024.
8. Countries Where Incest Is Legal 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-incest-is-legal. Accessed 13 Nov 2024.
9. sharon. Dutch Governing Party Advocates Accepting Pedophilia and Teaching It in Schools. 2023. https://europeanconservative.com/articles/news/dutch-governing-party-advocates-accepting-pedophilia-and-teaching-it-in-schools/. Accessed 13 Nov 2024.
10. Maletzky BM. Factors associated with success and failure in the behavioral and cognitive treatment of sexual offenders. Annals of Sex Research. 1993;6:241–58.
11. Up to half of young women feel guilty, embarrassed or stressed over their sex life. 2020. https://uk.style.yahoo.com/sex-guilty-embarrassed-stressed-women-094824554.html. Accessed 13 Nov 2024.
12. Bare with us: why naturism in Britain is booming. The Guardian. 2022

অপরাধ থেকে অধিকার: সমকামিতার আইনি রূপান্তর

বর্তমান বিশ্বকে বলা যায় অধিকারের বিশ্ব। সর্বত্র এখন অধিকার প্রতিষ্ঠার জয়জয়কার, যা আজ থেকে পাঁচ দশক আগেও কল্পনা করা যেত না। এমনকি সত্তরের দশকেও বিশ্বে সার্বজনীন মানবাধিকার নামে কোনো প্রতিষ্ঠিত ধারণা ছিল না। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণাটি ছিল মূলত এক প্রতীকী ঘোষণা, যার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত কনভেনশন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই কনভেনশন ১৯৭৭ সালে কার্যকর হওয়ার পর থেকে মানবাধিকার বলতে এমন এক ধরনের অধিকার বোঝানো শুরু হয়, যা শুধুমাত্র আইনি অধিকার নয়; বরং এগুলো মানুষ হিসেবে সবার অধিকার।

এ সময় থেকে রাষ্ট্রগুলোর প্রতি মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার দাবি করার একটি বৈশ্বিক পরিবেশ তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে মানবাধিকার বলতে কয়েকটি নির্দিষ্ট অধিকারকে বোঝানো হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দশক থেকে আরেক দশকে, বিভিন্ন নতুন ধরনের অধিকার এই তালিকায় যুক্ত হতে থাকে। এর মধ্যে সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

এই অধিকারগুলো একেবারে সাম্প্রতিককালের অর্জন। অথচ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও সমকামিতা ঘৃণিত, শাস্তিযোগ্য এবং নিষিদ্ধ অপরাধ ছিল। এ অংশে আমরা কিভাবে সমকামিতা একটি অপরাধ থেকে মানবাধিকারের অংশে পরিণত হলো, সেই উত্তরণমুখী গল্পটি তুলে ধরবো।

সমকামিতার নিরপরাধিকরণ: যেভাবে শুরু হলো

১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ সরকার সমকামিতা ও পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত ফৌজদারি আইন সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৫ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে, যা

'ওলফেনডেন কমিটি' নামে পরিচিত। জন ওলফেনডেনের নেতৃত্বে এ কমিটি ১৯৫৭ সালে তাদের প্রতিবেদনে সমকামিতাকে অপরাধের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার এবং পতিতাবৃত্তিকে সামাজিক জীবিকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করে। তাদের মতে, এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ফৌজদারি আইনের মাধ্যমে এগুলোকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য ফৌজদারি আইন ব্যবহার করা ঠিক হবে না বলে কমিটি মত দেয়।

ওলফেনডেন কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দশ বছর পর, ১৯৬৭ সালে 'সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট' পাস করে ইংল্যান্ডে সমকামিতাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। তবে তার আগেই এ প্রতিবেদন আইন অঙ্গনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইংলিশ কমন ল'র দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়, আর বিংশ শতাব্দীর দুই বিখ্যাত আইনবিদ অক্সফোর্ডের প্রফেসর হারবার্ট হার্ট এবং বিচারপতি লর্ড প্যাট্রিক ডেবলিন-এর মধ্যে 'ওলফেনডেন প্রতিবেদন' নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। এ বিতর্ক ইতিহাসে 'হার্ট-ডেবলিন বিতর্ক' নামে পরিচিত এবং আজও আইন শিক্ষার্থীদের জন্য আইন ও নৈতিকতার অধ্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন। প্রফেসর হার্টের যুক্তি বিজয়ী হয়, যার ফলে সিদ্ধান্ত আসে যে, ফৌজদারি আইন সমাজে নৈতিকতা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে না। এই সিদ্ধান্ত ফৌজদারি আইনের ভিত্তিকে পরিবর্তন করে দেয় এবং আইন থেকে নৈতিকতাকে পৃথক করে ফেলা হয়।

এরপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও যৌন আচরণ, যা আগে বিকৃত বা অনৈতিক বলে বিবেচিত হতো, ধীরে ধীরে আইনগত স্বীকৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমকামী পরিচয় মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সমকামী বিবাহের বৈধতা দেওয়া হয়, যা মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বিবাহ এবং পরিবার নিয়ে মশকরা করার মতো বলে সমালোচিত হয় (আমেরিকার প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস এর মন্তব্য অনুযায়ী)। ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত সমকামিতা আন্দোলনের একটি বর্ধিত রূপ হিসেবে দেখা দেয়।

একই সময়ে ষাটের দশকে মনোবিজ্ঞান (অধ্যাপক কিনসি) এবং পরবর্তীতে সমাজতত্ত্ব (জুডিথ বাটলার) প্রভৃতি শাস্ত্রে সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়কে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রমাণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা গে জিন আবিষ্কারের দাবি পর্যন্ত করেন। তবে সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়বাদকে বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন। এই আইনের হাত ধরেই সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের নতুন নতুন মতবাদগুলো দ্রুত বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হয়।

সমকামিতা ও জেন্ডার পরিচয়বাদের অধিকার হয়ে উঠা

১৯৭৭ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কনভেনশন কার্যকর হওয়ার পর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলন এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে। এ সময়ই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এনজিওগুলো গড়ে উঠতে থাকে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (১৯৬১) এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (১৯৭৭)। এসব এনজিও বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল সমতা ও বৈষম্যবিলোপ। এই ধারণার অধীনে দ্রুতই তাদের এজেন্ডায় সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক আইন ও সাংবিধানিক আইন মানবাধিকারের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আশির দশক থেকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানবাধিকার আইন নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে ওঠে, যা অভাবনীয় গতিতে বিস্তৃত হতে থাকে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রগুলো পরবর্তীতে সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার বিষয়ক প্রচারণায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্তি একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও সংবিধানের মাধ্যমে মানবাধিকার ধারণার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এ প্রসারে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ ধাত্রীর ভূমিকা পালন করে।

২০১১ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ধারীদের সুরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা আন্তর্জাতিকভাবে এই নীতি গ্রহণের পথ সুগম করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘ 'জন্ম থেকেই মুক্ত ও স্বাধীন' (Free and Equal) নামে একটি ক্যাম্পেইন চালু করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বজুড়ে সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাকে প্রমোট করা। পরবর্তীতে, ২০১৬ সালে জাতিসংঘ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে শুরু করে, যা এ ধরনের মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও প্রচারের প্রক্রিয়াকে আরও সুদৃঢ় করে।

References

1. Report of the Committee on Homosexuality Offences and Prostitution submitted to Home Office, popularly known as *Wolfenden* Committee

Report, 1957

2. Hart-Devlin Debate,

3. Universal Declaration of Human Rights, 1948

4. Makau Mutua, The Ideology of Human Rights,

5. Samuel Moyn, *The Last Utopia: Human Rights in History*, Harvard University Press, 2010

6. UN Human Rights Council Resolution 2011

7. UN free and equal campaign, www.unfe.

এলজিবিটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন

ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি : প্রাকৃতিক হওয়া মানেই কি স্বাভাবিক?

যেকোনো বস্তুবাদী দর্শনকে (Materialistic ideology) সামাজিকভাবে বাস্তবায়ন করতে জীববিজ্ঞান খুব কার্যকরি একটি টুল। কোনো দর্শনকে জীব ও জীবনের সাথে কোনোভাবে যোগসূত্র দেখাতে পারলে সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এখানে ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি (ভ্রান্তি) নামক কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। কোনো কিছু প্রকৃতিতে ঘটে বা বিদ্যমান আছে বলে তাকে স্বাভাবিক বা নৈতিক হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা এই ফ্যালাসির প্রতিপাদ্য বিষয়। সমকামিতা মতবাদকে সমাজে চাপিয়ে দিতে LGBTQ+ অ্যাক্টিভিস্ট ও গবেষকরা ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসির আশ্রয় নিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছে যে, সমকামিতা (হোমোসেক্সুয়ালিটি) জীবজগতে বিদ্যমান, তাই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অর্থাৎ অনৈতিক নয়। এ কারণেই মানসিক বিকৃতিকে তারা লিঙ্গ-বৈচিত্র্য (Gender diversity) হিসেবে স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা করে।

প্রসঙ্গত, কট্টর বিবর্তনবাদী এবং যৌন বিপ্লবের জনক (Father of sexual revolution) অধ্যাপক আলফ্রেড কিনসি কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে এক ধরনের পোকা Gall Wasp (বোলতা)-এর শ্রেণি বিন্যাস ও জীবনচক্র নিয়ে পিএইচডি করেছেন। এই পিএইচডি গবেষণার আলোকে তিনি সমকামী আচরণকে সমাজে স্বাভাবিকীকরণে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসির আলোকে মনে করতেন—যা কিছু জীবজগতে আছে, তা মানুষের মাঝেও থাকা স্বাভাবিক; ঐতিহ্যগত সামাজিক মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। তিনি বিবর্তনবাদের আলোকে সমাজের প্রচলিত যৌন আচরণ (অসমকামী বা হেটেরোসেক্সুয়াল) ছাড়াও সব ধরনের যৌনতাকে (সমকামিতা, বাইসেক্সুয়ালিটি, শিশুকামিতা, পশুকামিতা ইত্যাদি) প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক মনে করতেন। অধ্যাপক কিনসির মতে, 'Nearly all the so-called sexual perversions fall within the range of biological normality.' অর্থাৎ প্রায় সব যৌনবিকৃতি প্রকৃতিগতভাবে

স্বাভাবিক ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে।[১]

৩৭ বছরব্যাপী ক্রাইম রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে এক গবেষণায় ('Sexual offending runs in families: A 37 year nationwide study') দেখা গেছে, যৌন অপরাধের (ধর্ষণ) সাথে জিনগত যোগসূত্র (Genetic link) রয়েছে।[২] অর্থাৎ, যৌন অপরাধের সাথে বংশগত লিংক রয়েছে। এই গবেষণায় মোট ২১,৫৬৬ জন যৌন অপরাধী পুরুষ—যেখানে ৬,১৩১ জন ধর্ষক এবং ৪৪৬৫ শিশু যৌন নির্যাতনকারীদের ডেটা বিশ্লেষণ করে এই জেনেটিক যোগসূত্র পাওয়া গেছে। গবেষণায় জিনগত কোনো যোগসূত্র থাকলেই কি আমাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য (Justified) হবে? জীবজগতে অজাচার (incest, যেমন বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোনের যৌন সম্পর্ক), ক্যানিবালিজম (একই প্রজাতির সদস্যদের মাংস খাওয়া) কি স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সব বিকৃত যৌনাচার বৈধ, তবে কি এমন সমাজ কি বাসযোগ্য থাকবে?

সমকামিতা সামাজিকভাবে চাপিয়ে দিতে বড় রকমের ত্রুটিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে কয়েকটি মৌলিক দাবি করা হয়েছিল। এলজিবিটি গোষ্ঠীর একেকটি দাবি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমাণিত হতে ২০-৩০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের সেই দাবিগুলোকে ভিত্তি করে নীতিনির্ধারণ ও আইনগত ভিত্তি দাঁড় করানো হয়েছে, যা সহজে আর পরিবর্তনযোগ্য নয়। রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু আইনি ভিত্তি পেয়ে গেলে অনৈতিক দাবিও সাধারণ মানুষের কাছে স্বাভাবিক হয়ে নৈতিক সমর্থন পেয়ে থাকে। বর্তমানে সমকামিতাবাদের বিরুদ্ধে গবেষণার ফলাফল প্রকাশের জন্য গবেষকদের বিভিন্ন রকমের হয়রানির শিকার হতে হয়। তাদেরকে চাকুরি থেকে অপসারণ করতে লবিং করে প্রতাপশালী এলজিবিটি গোষ্ঠী।

সমকামিতা নিয়ে গবেষণার পদ্ধতিগত ভিন্নতা

যুগ যুগ ধরে সামাজিক ইস্যু নিয়ে গবেষণার সীমাবদ্ধতার কারণে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার এক ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক অনেক বিষয়ে (নীতি-নৈতিকতাও এর অন্তর্ভুক্ত) গবেষণার ডেটা বা তথ্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়, কেননা, এ বিষয়টি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অনুষদের মতো নয় (যেমন- মেডিক্যাল, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র)। এই অনুষদের গবেষণায় সামাজিক

এবং পরিবেশগত অনেক ফ্যাক্টর বা কারণ জড়িত থাকার কারণে প্রাপ্ত ডেটা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এজন্যই এই বিতর্কিত সামাজিক ইস্যুতে গবেষণার ফলাফল পলিসি লেভেলে বাস্তবায়ন করতে গেলে রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠতে পারে (যেমন- সমকামিতা তথা LGBTQ+ ইস্যু)।

যেমন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, আপনার প্রায়শই পানির পিপাসা হচ্ছে, শরীর ঘেমে যাচ্ছে এবং ঘন ঘন টয়লেটে যেতে হচ্ছে। চিকিৎসক এই লক্ষণগুলোর কারণ অনুসন্ধানে রক্ত পরীক্ষা করতে বলবেন। রক্তের ইনসুলিনের মাত্রা পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক জানাতে পারবেন আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা। তেমনিভাবে কোনো শিশু খুব দুর্বল, ফ্যাকাশে টাইপের হয়ে গেছে, অসুখ লেগেই থাকছে। এই লক্ষণগুলো দেখে শিশু বিশেষজ্ঞ হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস নামক রক্ত পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং এই টেস্টের পর জানা যাবে শিশুটি থ্যালাসেমিয়া রোগে (বংগশত) আক্রান্ত কিনা। প্রসঙ্গত, এই রোগটি ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই রোগটি নিশ্চিতভাবে (১০০%) প্রতিরোধযোগ্য, যদি থ্যালাসেমিয়ার রোগের দুই বাহক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হন।

ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা, তা রক্তের নমুনা থেকে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করা যায়। তেমনিভাবে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস টেস্ট করে জানা যায় থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত, না-কি এই রোগের বাহক। এই ল্যাব টেস্টগুলোর ক্ষেত্রে আপনি কোন সমাজে বাস করছেন, কোন ধর্ম বা মূল্যবোধ লালন করছেন, তা মুখ্য বিষয় নয়; রক্তে সেই বিশেষ জৈব উপাদান আছে কিনা, তা-ই বিবেচ্য।

অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান এবং সাইকোলজি (দুটি ফিল্ডের মধ্যে অনেক যোগসূত্র রয়েছে) অনুষদের গবেষণাগুলো সচরাচর চিকিৎসাশাস্ত্র বা জীববিজ্ঞান অনুষদের মতো নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনি শিশুদের স্থূলতাকে একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে মনে করেন কিনা? আপনি সুখী কিনা, হতাশায় ভুগছেন কিনা? সমাজবিজ্ঞান এবং সাইকোলজি ফিল্ডের এসব প্রশ্নের জবাব বের করতে ল্যাব টেস্টের পদ্ধতি নেই। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা বা Screening instrument-এর মাধ্যমে বের করার কারণে এসব প্রশ্নের জবাব সমাজ এবং মানুষ ভেদে ভিন্ন হয়। তাই আমেরিকার কোনো গবেষণায় ব্যবহৃত কোনো কোশ্চ্যানিয়ার বাংলাদেশে ব্যবহার করে করা হলে সেটা ডেটা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। কেননা দুই দেশের প্রেক্ষাপট বা সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি ভিন্ন।

এ কারণে দেখা যায়, পাশ্চাত্যের ক্ষমতাধর দেশ বা প্রতিষ্ঠানগুলো এক হয়ে তাদের সামাজের মূল্যবোধসংক্রান্ত ইস্যুগুলো ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে বাইরের দেশ ও সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরোপ করতে প্রচেষ্টা চালায়, যার মূলে কাজ করে তাদের অর্থনৈতিক প্রাপ্তি এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের মানসিকতা। যেমন বর্তমানে LGBTQ+ ইস্যু মুসলিম দেশগুলোতে চাপিয়ে দিতে পশ্চিমা বিশ্ব মরিয়া হয়ে উঠেছে। মুসলিম দেশগুলোর ওপর তাদের পলিটিক্যাল প্রভাব থাকার কারণে তারা সেসব দেশে এ সংক্রান্ত রিসার্চে অর্থায়ন করছে। আর টাকার জন্য তাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে স্থানীয় গবেষক ও সুশীল সমাজ। শুধু তা-ই নয়, কৌশলে প্রভাব খাটিয়ে ভিন্নমত পোষণকারী রিসার্চারদের আদর্শিক কারণে কোণঠাসা করে রাখা হয়। এতকিছুর পরও যা কিছু প্রকাশিত হয়, সেগুলোর খুঁত বা সীমাবদ্ধতা বের করে বিতর্কিত করা হয়। তাই সামাজিক সংবেদশনশীল বিষয়গুলোতে শব্দের মারপ্যাঁচ অনেক বেশি, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মূলত এই সামাজিক ইস্যুগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা থাকে। অন্যান্য বেসিক বা প্রায়োগিক ফিল্ডের গবেষণা নিয়ে এমন বিতর্ক সচরাচর দেখা যায় না।

সমকামিতা গবেষণার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা

সমকামিতা সংক্রান্ত গবেষণা শুরু থেকেই ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। আমেরিকার কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটি (Kansas State University)-এর অধ্যাপক Walter Schumm এই ফিল্ডের রিসার্চের সীমাবদ্ধতা এবং পক্ষপাতিত্ব নিয়ে ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা সুপরিচিত SAGE প্রকাশনার *Comprehensive Psychology* নামক জার্নালে প্রকাশ করেছেন। আর্টিকেলটির শিরোনাম *Navigating Treacherous Waters—One Researcher's 40 Years of Experience with Controversial Scientific Research*, গুগল সার্চ করে এটা পড়ে নিতে পারেন।[৩] LGBTQ+ গবেষণার ডেটা নিয়ে যেসব কারণে সংশয় তৈরি হতে পারে, তার কয়েকটি আলোকপাত করছি—

১. যৌনতা নিরূপণ স্কেল (নিক্তি) নিয়ে সংশয়

সমকামিতা, অসমকামিতা এবং উভকামিতার মতো যৌন আকর্ষণ পরিমাপ করা এই অনুষদের গবেষণার একটি মৌলিক বিষয়। যৌন অভিমুখিতা (Sexual

orientation) নির্ধারণের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি মাধ্যম হলো কিনসি স্কেল (Kinsey Scale)। অধ্যাপক আলফ্রেড কিনসি এই স্কেলটি ব্যবহার করে যৌন অভিমুখিতা নিরূপণ করেন। এটি কোনো মেডিক্যাল টেস্টের মতো নয়, বরং কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যক্তির যৌন আকর্ষণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। একসময় দাবি করা হতো যে, যৌন অভিমুখিতা একটি স্থায়ী মানসিক অবস্থা যা জন্মগতভাবে নির্ধারিত; তবে এই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যদি যৌনতা পরিমাপের এই স্কেলটি বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এই স্কেল থেকে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল নিয়ে সংশয় দেখা দেয়া স্বাভাবিক। যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্নবিদ্ধ ডেটা দিয়ে বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিনসি স্কেলে ০ থেকে ৬ পর্যন্ত মাত্রা আছে; যেখানে ০ হলো বিশুদ্ধ হেটেরোসেক্সুয়াল বা বিষমকামী, এবং ৬ হলো হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামী। কোনো ব্যক্তি টেস্টে যেদিকে বেশি ঝুঁকবে, তার যৌন আচরণ সেটাই বলে বিবেচিত হবে, এবং যদি তিনি এই দুই মাত্রার মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকেন, তাহলে তাকে উভকামী হিসেবে গণ্য করা হয়।

কিনসি'র যৌন রুচি পরিমাপক স্কেল	
রেটিং	বর্ণনা
০	সম্পূর্ণরূপে বিষমকামী (Exclusively heterosexual)
১	প্রধানত বিষমকামী, শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে সমকামী
২	প্রধানত বিষমকামী, তবে আংশিকভাবে সমকামী
৩	সমানভাবে বিষমকামী এবং সমকামী
৪	প্রধানত সমকামী, কিন্তু অংশিকভাবে বিষমকামী
৫	প্রধানত সমকামী, শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে বিষমকামী
৬	সম্পূর্ণরূপে সমকামী (Exclusively homosexual)

আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, একটি স্কেলে ০ থেকে ৬ পর্যন্ত মোট ৭টি মাত্রা রয়েছে। এখন, আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো— এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে আপনি কোনটাতে অবস্থান করছেন? যদি আপনি ০ নির্দেশ করেন, তাহলে আপনাকে একজন বিষমকামী হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যিনি

শুধুমাত্র বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন। আর যদি আপনি ৬ নির্দেশ করেন, তাহলে আপনাকে সমকামী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, যিনি শুধুমাত্র সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কিন্তু যদি আপনি ১, ২, ৩, ৪, বা ৫-এ অবস্থান করেন, তাহলে আপনার মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতিই যৌন আকর্ষণ রয়েছে বলে ধরা হবে। এখানে, আপনি কোন সংখ্যায় অবস্থান করছেন তার ওপর নির্ভর করবে এই আকর্ষণের মাত্রা। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ১-এ অবস্থান করেন, তাহলে আপনার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রধান, তবে সমলিঙ্গের প্রতি সামান্য আকর্ষণও রয়েছে। ২-এ অবস্থান করলে, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ কিছুটা বাড়বে, কিন্তু এখনও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকবে। কিনসির মতে, ৩-এ অবস্থান করা মানে, আপনার মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি সমানভাবে আকর্ষণ রয়েছে, অর্থাৎ আপনি উভকামী। ৪ থেকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ কমতে শুরু করে এবং সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। ৫-এ অবস্থান করলে এই আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়, এবং ৬-এ পৌঁছালে পুরোপুরি সমকামী হিসেবে চিহ্নিত হওয়া যায়।

এই স্কেলের একটি মৌলিক সমস্যা হলো, এটি সহজেই মানুষকে সমকামী বা সমকামীতাপ্রবণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। যেমন, কেউ যদি ০ থেকে ১-এ ওঠে, তাহলে তাকে বিষমকামী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কেউ যদি ৬ থেকে ৫-এ নামে, তাকে সমকামী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। অর্থাৎ, *এই স্কেলটি প্রাকৃতিকভাবে সমকামী প্রবণতার প্রতি পক্ষপাতমূলক।* এটি আসলে মানুষের যৌন আচরণের প্রকৃত প্রভাব নির্ধারণ করতে সক্ষম নয়। এই স্কেলে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি আচরণকে একসাথে রেখে প্রকৃত যৌন আচরণ বের করা দুঃসাধ্য। এটি একটি জোরপূর্বক শ্রেণিবিন্যাসের প্রক্রিয়া। যদি দুই ধরনের আচরণ আলাদাভাবে জানার চেষ্টা করা হতো, তবে প্রকৃত আচরণটি বেরিয়ে আসত।[৪] এই পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেই অধ্যাপক কিনসির সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজ দুটোই অ্যাকাডেমিক পরিসরে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে।

২. ক্ষুদ্র স্যাম্পল সাইজ বা পরীক্ষণের নমুনার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় স্যাম্পল সাইজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে যদি জনসংখ্যা বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য জেনারালাইজ করা হয়, তাহলে প্রাপ্ত ডেটার

মান যথেষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা জানতে চাই যে, ট্রান্সজেন্ডার নারীদের মস্তিষ্কের গঠন জন্মগত নারীদের মস্তিষ্কের গঠনের সাথে মিল আছে কিনা, তবে গবেষণার স্যাম্পল সাইজ বড় হওয়া প্রয়োজন। ট্রান্সজেন্ডার নারীরা, যাদের জন্মগতভাবে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, নিজেদের প্রকৃত নারী হিসেবে বিবেচনা করেন এবং এই দাবির ভিত্তিতে সমাজে নারী হিসেবে অধিকারের জন্য ট্রান্সজেন্ডার আইন প্রণয়নের চেষ্টা চালান।

ট্রান্সজেন্ডার নারীদের সত্যিকারের নারী হিসেবে প্রমাণ করতে নিউরোসায়েন্স গবেষণার মাধ্যমে ব্রেইন ইমেজিং স্টাডির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের গবেষণায় স্যাম্পল সাইজ কতটা বড় হচ্ছে, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ স্যাম্পল সাইজ ছোট হলে সেই ডেটা পুরো দেশের বা বিশ্বের মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বিশ্বব্যাপী সমকামীদের সংখ্যা মাত্র ১%। তাই এত বড় স্যাম্পল পাওয়া কঠিন। এখন পর্যন্ত নিউরোসায়েন্সে যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলোর স্যাম্পল সাইজ সাধারণত ১০-২৫ জন ট্রান্সজেন্ডারের বেশি নয়। এ ধরনের ছোট স্যাম্পল সাইজ দিয়ে যদি ট্রান্সজেন্ডারদের প্রকৃত নারী হিসেবে দাবি করা হয়, তাহলে আইনি ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। যদি আইন করা হয়, তবে অনেকেই বিশেষ সুবিধা পেতে এই পরিচয়কে ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কারাগারে ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগতভাবে পুরুষ) প্রকৃত নারীদের সাথে সহাবস্থান করে তাদের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এমনকি প্রেগন্যান্সির ঘটনাও ঘটেছে।

এসব উদাহরণ দেখায় যে, ক্ষুদ্র স্যাম্পল সাইজ নিয়ে করা গবেষণা পুরো জনগোষ্ঠীর জন্য জেনারালাইজ করা উচিত নয়। এতে তথ্যের অপব্যবহার এবং আইনি এবং সামাজিক অনিয়মের ঝুঁকি থেকে যায়।

৩. ত্রুটিপূর্ণ স্টাডি ডিজাইন

গবেষণায় শুধু স্যাম্পল সাইজ বড় হলেই হবে না; স্যাম্পল কীভাবে সংগৃহীত হচ্ছে, সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রশ্ন করা হয়, 'বাংলাদেশে সমকামীর সংখ্যা কত?' এবং এই গবেষণা যদি অনলাইন গ্রুপে পরিচালিত হয়, তবে ফলাফল দেখে মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশে সমকামীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট স্যাম্পলিং পদ্ধতি গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।

সমকামিতাকে স্বাভাবিকীকরণের অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক আলফ্রেড কিনসিও

তার ১৯৪৮ সালের স্টাডিতে সুবিধামতো স্যাম্পলিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তার গবেষণার জন্য ডেটা সংগ্রহ করেছিলেন জেলখানা এবং পতিতালয় থেকে, যেখানে বিকৃত যৌন আচরণের হার সাধারণত বেশি থাকে। এমনভাবে স্যাম্পল নির্বাচন করার কারণে তার গবেষণার ফলাফলগুলো পক্ষপাতমূলক হয়েছে।

আজকের দিনে, যদি কিনসির এই স্টাডি পুনরায় করা হতো, তাহলে এটি সঠিক গবেষণা নীতিমালা মেনে পরিচালিত না হওয়ার কারণে কোনো মানসম্পন্ন জার্নালে গ্রহণযোগ্য হতো না। সঠিক স্টাডি ডিজাইন না থাকায় এটি সরাসরি বাতিল বা রিজেক্ট করা হতো।

৪. গবেষণায় উপযুক্ত কন্ট্রোলের সীমাবদ্ধতা

ট্রান্সজেন্ডার হওয়া কোনো স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়; এটি মূলত ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছা ও নিজস্ব পরিচয়ের ওপর নির্ভরশীল। সবাই ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় গ্রহণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সার্জারি (শুধুমাত্র ২-৩%) বা হরমোন চিকিৎসা (প্রায় ২০%) গ্রহণ করে না। কেউ কেউ শুধু বাহ্যিক পোশাক, চুলের স্টাইল বা সম্বোধনের সর্বনাম (যেমন: He, She, They) পরিবর্তন করে নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দেন। ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় বর্তমানে 'জেন্ডার ফ্লুইড' বা 'জেন্ডার তারল্য' হিসেবে এক ধরনের গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে সম্প্রতি একটি আইন পাস হয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি প্রতিবছর তার জেন্ডার আইডেন্টিটি পরিবর্তন করতে পারে।[৫] এমন অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা যদি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের (যেমন- জন্মগতভাবে পুরুষ বা নারী) সাথে করা হয়, তাহলে তা মৌলিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হবে। গবেষণায় উপযুক্ত কন্ট্রোল না থাকলে, এমন ফলাফল আসতে পারে যা প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং ব্যক্তিগত পছন্দের পরিবর্তনকে তুলে ধরে।

এলজিবিটি গবেষকরা (যারা আবার অ্যাক্টিভিস্টও হয়ে থাকেন) সচরাচর বৈজ্ঞানিকভাবে ৩টি দাবি করে থাকেন—

* নারী-পুরুষের বাইনারি সেক্স সিস্টেমকে অস্বীকার করে নন-বাইনারি (লিঙ্গ বৈচিত্র্য) দাবি
* সমকামী আচরণ জন্মগত বিষয় (Born this way hypothesis)
* সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা যৌন অভিমুখিতা/রুচি অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য (Immutablity of sexual orientation)।

সেক্স: বাইনারি নাকি লিঙ্গ-বৈচিত্র্য

২০১৮-এর শেষের দিকে আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন সরকারি সংস্থাগুলোর মাঝে একটি মেমো প্রচার করে, যেখানে জেন্ডারের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়[৬]—'জন্মগত জননাঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হবে একজন ব্যাক্তির জেন্ডার (...determined by the genitals that a person is born with)'। এই মেমো নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, এমনকি বিখ্যাত মেডিক্যাল স্কুলগুলোতে প্রতিবাদ মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়। ২,৬০০ জনেরও বেশি বিজ্ঞানী একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এই মর্মে[৭]—'কোনো জেনেটিক পরীক্ষা নেই, যার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে জেন্ডার, এমনকি সেক্স নির্ধারণ করা যায় (There are no genetic tests that can unambiguously determine gender, or even sex)।' বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক জার্নাল Nature এই বিষয়ে প্রতিবাদ হিসেবে সম্পাদকীয় আর্টিকেল প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়[৮]—'গবেষণা এবং মেডিক্যাল সম্প্রদায় এখন সেক্সকে পুরুষ ও মহিলা থেকে আরও জটিল হিসেবে দেখে (the research and medical community now sees sex as more complex than male and female),' এবং 'এটা ভ্রান্ত ধারণা যে, বিজ্ঞান মানুষের সেক্স এবং জেন্ডারের সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে (the idea that science can make definitive conclusions about a person's sex or gender is fundamentally flawed)।'

এগুলো ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি। এর মাধ্যমে মানুষের বায়োলজিক্যাল ন্যাচার বা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সায়েন্টিক জার্নাল এই ধরনের অবস্থানকে সমর্থন করে। Nature-এ পূর্বে প্রকাশিত 'Sex Redefined' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে অভিমত দেওয়া হয়[৯]—'The idea of two sexes is simplistic. Biologists now think there is a wider spectrum than that'। অন্যদিকে Scientific American এবং National Geographic-এর মতো জনপ্রিয় বিজ্ঞান ম্যাগাজিনগুলো পাঠকদের জানায়—'The science is clear and conclusive: sex is not binary)'। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের বড় বড় মিডিয়াতে আরও আক্রমণাত্মকভাবে প্রকাশ করা হয় [১০]—'Biologists now think the idea of two sexes is inaccurate।'

জেন্ডারকে সেক্স থেকে পৃথক করে এমন ধারণা নিয়ে নারীবাদী লেখকরা অনেক লিখেছেন। জুডিথ বাটলার এবং অ্যান ফাউস্টো স্টার্লিংয়ের মতো নারীবাদী

দার্শনিকরা প্রস্তাব করেছেন—জেন্ডার এবং সেক্স উভয়ই সামাজিকভাবে নির্মিত হয় (Social construct)। অর্থাৎ, তারা সেক্সের বাইনারি (ছেলে ও মেয়ে) সিস্টেমের বাস্তবতাকে বস্তুত অস্বীকার করে।[১১]

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে একটি শিশুর লিঙ্গ পরিচয় (Sexual identity) হয় যেকোনো দুটির একটি—ছেলে অথবা মেয়ে। এজন্য সেক্সকে বলা হয় বাইনারি (Sex is binary)। লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণে সুস্পষ্ট জেনেটিক ভিত্তি রয়েছে। ছেলেদের থাকে XY ক্রোমোজোম, আর মেয়েদের থাকে XX ক্রোমোজোম। এখানে মূল পার্থক্য হচ্ছে Y ক্রোমোজম, আরও নির্দিষ্ট করে বললে—একটিমাত্র জিন (যা SRY নামে পরিচিত), যার উপস্থিতি বা অনুস্থিতি নির্দিষ্ট করে দেয়—সে ছেলে নাকি মেয়ে হবে। এ কারণে SRY জিনকে 'মাস্টার সেক্স রেগুলেটর' তথা 'ছেলে-মেয়ে হওয়ার মলিকিউলার সুইচ' বলা হয়। সুইচটি যদি সক্রিয় থাকে, তবে ভ্রূণটি হবে ছেলে। আর যদি SRY জিন কোনো কারণে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে ভ্রূণটি হবে মেয়ে। মাতৃগর্ভে শিশু বিকাশের ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে ভ্রূণের জননাঙ্গ পার্থক্য করা যায় না। এরপর XX ভ্রূণটিতে প্রাথমিক জননাঙ্গ ওভারি বা ডিম্বাশয়, ফ্যালোপিয়ান টিউব, জরায়ু, যোনি তৈরি হতে থাকে। আর XY ভ্রূণে শুক্রাশয়, ভাস ডিফারেন্স, প্রোস্টেট গ্রন্থি, পেনিস তৈরি হওয়া শুরু হয়। জন্মের সময় ছেলে বা মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯.৯৮%।[১২] খুবই বিরল ঘটনা হিসেবে জেনেটিক ত্রুটি নিয়ে এমন কিছু শিশু (০.০১৮%) জন্ম নেয়, যাদেরকে আমরা ইন্টারসেক্স বা বাংলাদেশে হিজড়া বলে থাকি। বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে অত্যন্ত মৌলিক বিষয় হলো, নারী-পুরুষ যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা। কিন্তু ইন্টারসেক্স শিশুরা সচরাচর প্রজননে অক্ষম হয়।

ইন্টারসেক্স কেসের প্রকৃত সংখ্যা কম হলেও বেশি দেখানোর প্রচেষ্টা

ট্রান্স অ্যাক্টিভিস্টরা দিবালোকের মতো স্পষ্ট বাইনারি সিস্টেমকে চরমভাবে অস্বীকার করে। কারণ, তারা মনে করে, বাইনারি সিস্টেম তাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। লিঙ্গ-বৈচিত্র্য (Gender diversity), সমতা (Equality) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) সমাজ তৈরির ব্যানারে বাইনারি সিস্টেমকে প্রশ্ন করে এবং তাদের নন-বাইনারি দাবির প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয় ইন্টারসেক্সকে। লিঙ্গ-বৈচিত্র্য জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে ২০০০ সালে ব্রাউন

ইউনিভার্সিটির লেসবিয়ান অধ্যাপক অ্যান ফস্টো-স্টার্লিং (Anne Fausto-Sterling) তার প্রকাশিত বইয়ে (Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality)[১৩] দাবি করেন—সেক্স কোনো ফিক্সড বিষয় নয়, এটা 'Continuum' অর্থাৎ স্পেকট্রাম বা বর্ণালি, যেটা লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময়। তার এই চরম বিশ্বাসের ভিত্তি বিরল কিছু ইন্টারসেক্স কেইস (লিঙ্গ প্রতিবন্ধী)। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণকারী লেভি সুইদাম (Levi Suydam)-এর অস্বাভাবিক কেইসকে সামনে আনেন, যার নিয়মিত মাসিক (Menstruation) হতো, আবার পুরুষাঙ্গও (পেনিস ও অণ্ডকোষ) ছিল।

তিনি ইন্টারসেক্সের এক বিস্তৃত ডেফিনেশনের (..'any individual who deviates from the Platonic ideal of physical dimorphism at the chromosomal, genital, gonadal and hormonal levels') আলোকে দাবি করেন—ইন্টারসেক্স বিরল কোনো ঘটনা নয়, প্রতি ১০০০ জন শিশুর ১৭ জন হয় ইন্টারসেক্স (অর্থাৎ ১.৭%)। অধ্যাপক ফস্টো-স্টারলিং এবং তার কলিগ এটাও স্বীকার করেন—অনেক ইন্টারসেক্স কেইসকে ডায়াগনোসিস করা যায় না, কেননা এদের কোনো ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাই এই সংজ্ঞানুসারে স্বাভাবিকের তুলনায় ক্লিনিক্যালি কোনো পার্থক্য না করা চিকিৎসক এবং রোগীদের জন্য কনফিউশন তথা সংশয় তৈরি করে।

অন্যদিকে বিখ্যাত ইউরোলজিস্ট জন উইনার (John Wiener)-এর মতে, ইন্টারসেক্স হলো তারা, যাদের জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে অমিল থাকে ('a discordance between phenotypic sex and chromosomal sex')।[১২] এই সংজ্ঞানুসারে সব ক্লিনিক্যাল কেইস (True intersex) অন্তর্ভুক্ত করা গেলেও কিছু বিরল কেইস বাদ পড়তে পারে।

আমেরিকার Montgomery Centre for Research in Child and Adolescent Development-এর রিসার্চার লিওনার্ড সাক্স (Leonard Sax) ক্যালকুলেশন করে দেখান, ইন্টারসেক্স হওয়ার সম্ভাবনা ০.০১৮%, যা অধ্যাপক ফস্টো-স্টারলিংয়ের হিসাবের (১.৭%) তুলনায় ১০০ গুণেরও কম। ফস্টো-স্টারলিংয়ের বিশ্লেষণে আওতাভুক্ত একটি 'ইন্টারসেক্স' অবস্থা, Late-Onset Congential Adrenal Hyperplasia (LOCAH) ড. লিওনার্ড সাক্সের ডেফিনেশনে সেটি বাদ পড়ে যায়। LOCAH হচ্ছে মোট ইন্টারসেক্সের ৮৮%।[১২] এই কেইসের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশু স্বাভাবিক লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছু ক্লিনিক্যাল লক্ষণ ২৫ বছর বয়সে ধরা পড়ে; ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি বয়সে, এমনকি সারাজীবন অজানাই থেকে যায়। ছেলেদের প্রায় ৫০%-এর ক্ষেত্রে মাথার চুল পড়ে যায় (টাক)। মেয়েদের অনেকের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। কারও মুখে লোম গজায়, কারও কারও গর্ভধারণে সমস্যা হতে পারে (Infertility)। তা ছাড়া বিরল কিছু কেইস থাকে, যাদের ক্লাইটোরিস স্বাভাবিকের তুলনায় বড় হতে পারে।

ইন্টারসেক্স : স্বাভাবিকতা বনাম অস্বাভাবিকতা বিতর্ক

ইন্টারসেক্স কি স্বাভাবিক লিঙ্গ-বৈচিত্র্য নাকি অসুস্থ অবস্থা (Pathological condition)? অধ্যাপক ফস্টো-স্টারলিং ইন্টারসেক্সকে প্যাথলোজিক্যাল বা রোগ হিসেবে দেখাতে নারাজ, যা তার বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি খুব জোর দিয়ে দাবি করেন, ইন্টারসেক্স অবস্থা প্রাকৃতিক এবং নরমাল।[১৩]

> 'Complete maleness and complete femaleness represent the extreme ends of a spectrum of possible body types. That these extreme ends are the most frequent has lent credence to the idea that they are only natural (i.e produced by nature) but normal (i.e they represent both a statistical and social idea). Knowledge of biological variation, however allows us to conceptualize the less frequent middle spaces as natural, although statistically unusual' (p. 76).

তিনি ন্যাচারাল শব্দের সমার্থক হিসেবে নরমাল শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদিও দুটো সমার্থক নয়। উদাহরণস্বরূপ, দুই মাথাবিশিষ্ট একটি বাছুর জন্ম নেওয়া একটি প্রাকৃতিক (Natural) ঘটনা, কিন্তু এটা তো আর স্বাভাবিক (Normal) নয়; এটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। অন্যভাবে উদাহরণ দিলে হয়তো পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সহজ হবে। ধরুন, বলা হলো 'মানুষ চোখ দিয়ে দেখে'। এটি তো খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। কিন্তু এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা এটিকে প্যাঁচিয়ে বলতে পারে—এটি ঠিক নয়, কেননা 'অন্ধ মানুষেরা চোখে দেখে না'। এটি একটি জৈবিক বৈচিত্র্য, চোখে না দেখাও স্বাভাবিক।

বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে নন-সায়েন্স একাডেমিশিয়ানদের প্রভাব বিস্তার

৯০-এর দশক থেকে আর্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ডিসিপ্লিনের অনেক অ্যাকাডেমিশিয়ান (ফিলোসফার, এনথ্রোপোলজিস্ট, ভাষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী) জেন্ডার ইকুয়ালিটির মূলনীতির আলোকে বায়োলজিক্যাল সেক্সের বাইনারি সিস্টেমকে অস্বীকার করতে যুক্তি দেখান—সেক্সও হচ্ছে একটি সোশ্যাল কনট্রাক্ট (Sex is a social contruct)। এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা সেক্সকে গুরুত্বহীন করে জেন্ডার (নন-বাইনারি সিস্টেম) নামক কনসেপ্টকে বিস্ময়করভাবে মূল ধারায় অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বাইনারি সিস্টেমকে আখ্যায়িত করা হচ্ছে বৈষম্যের হাতিয়ার। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, বিখ্যাত জার্নালগুলোও এই নন-সায়েন্টিক মতবাদকে প্রমোট করছে। কিছু নমুনা তুলে ধরছি[১৪]—

* প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিষয়ক অধ্যাপক আগুস্টিন ফুয়েন্টেস বলেন,[১৫] 'প্রজননকোষের ওপর ভিত্তি করে বাইনারি সিস্টেমকে বিশ্বাস করা মানে 'বৈষম্য'-কে প্রচার করা।'
* অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক অমিয়া শ্রীনিবাসন জৈবিক লিঙ্গ 'প্রাকৃতিক', 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে' বা 'নিরপেক্ষ' ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'এটি একটি সাংস্কৃতিক (Social construct) বিষয়, যা প্রাকৃতিক (Naural) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।'
* ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের Gender and Sexualities-এর চেয়ারম্যান ব্র্যান্ডন অ্যান্ড্রু রবিনসন দাবি করেন, 'সেক্সকে বায়োলজিক্যাল হিসেবে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা উচিত।'

এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও বিজ্ঞানীরা প্রায়ই বাইনারি সিস্টেমের ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়ার জন্য কাল্পনিক প্রতিপক্ষ তৈরি করেন। এ ক্ষেত্রে, তারা জৈবিক লিঙ্গের মূল ধারণা—যা শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সাথে সম্পর্কিত—পুরুষ ও নারীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (যেমন উচ্চতা বা ওজন)-এর সাথে তুলনা করেন। তাদের যুক্তি হলো, যেহেতু পুরুষ ও নারীর সব বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য (যেমন উচ্চতা) বাইনারি নয়, তাই জৈবিক লিঙ্গও বাইনারি হতে পারে না। কিন্তু এটি একটি কুযুক্তি, কারণ জীববিজ্ঞানীরা কখনোই দাবি করেন না যে, পুরুষ এবং নারীরা সব উপায়ে আলাদা।

এমন দাবি করা হলে, তা স্পষ্টতই মিথ্যা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাস্তবতা হলো, যদি বায়োলজিক্যাল সেক্সকে গুরুত্বহীন বা অস্বীকার করা হয়, তবে সমকামী পরিচিতিকেও বাতিল করতে হবে। কারণ, যদি সেক্স বা লিঙ্গ (মেয়ে ও ছেলে) সংক্রান্ত কোনো পার্থক্য না থাকে, তবে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণও অর্থহীন হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন অনেক অ্যাক্টিভিস্ট সমকামিতাকে একই লিঙ্গের (same-sex) পরিবর্তে একই জেন্ডার পরিচয়ের (same gender identity) প্রতি আকর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই, যখন লেসবিয়ানরা ট্রান্সজেন্ডার নারী (জৈবিক পুরুষ) এর সাথে ডেটিং করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদেরকে 'চরমপন্থী' বা 'বর্ণবাদী' হিসেবে নিন্দা করা হয়, যা বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ার সাথে মেলে না।[১৬]

সেক্স-বাইনারি ইস্যুতে অক্সফোর্ড প্রফেসরের পরিণতি

সেক্স শুধু বাইনারি হতে পারে[১৭]—এই মন্তব্যের কারণে বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী এবং প্রকাশ্যে নাস্তিক্যবাদ প্রচারকারী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজির অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সকে 'ট্রান্সফোবিক' তকমা দেওয়া হয়। এর ফলশ্রুতিতে আমেরিকার হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ২৫ বছর আগে তাকে দেওয়া পদক ফিরিয়ে নিয়েছে।[১৮] অধ্যাপক ডকিন্স বলেন,[১৭]

> 'Sex really is binary. You're either male or female, and it's absolutely clear you can do it on gamete size. You can do it on chromosomes. To me, as a biologist, it's distinctly weird people can simply declare "I am a woman though I have a penis,"' Dawkins insisted.

ইন্টারসেক্স এবং ট্রান্সজেন্ডার চিকিৎসা নিয়ে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

অস্পষ্ট লিঙ্গ নিয়ে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে সেক্স রি-এসাইনমেন্ট সার্জারি করা দীর্ঘদিনের মেডিক্যাল প্র্যাকটিস। সন্তানের পিতামাতার সম্মতিতে এই সংশোধনমূলক সার্জারি করা হয়। কিন্তু এলজিবিটি গ্রুপ এই সার্জারির বিপক্ষে। তারা একে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করে।[১৯] তারা সেক্সকে বাইনারি

মনে করে না এবং ইন্টারসেক্স অবস্থাকে স্বাভাবিক লিঙ্গ-বৈচিত্র্য হিসেবে গণ্য করে। LGBTQ+ গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সার্জারি করা মানে এটাকে ত্রুটি বা অসুস্থতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। অন্যদিকে তারাই আবার জেন্ডার ডিসফোরিয়ার শিশুদের পিউবার্টি ব্লকার এবং সার্জারির মাধ্যমে জেন্ডার আইডেন্টিটি গ্রহণ করাকে অধিকার মনে করে। এরকম অসংখ্য দ্বিমুখিতার নজির ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।

সমকামী হওয়া কি জন্মগত বিষয়?

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ যখন বেগবান হতে শুরু করে, তখন এলজিবিটি গবেষকরা দাবি করে—সেক্সের মতো তাদের জেন্ডার পরিচয়ও জন্মগতভাবে গর্ভাবস্থায় নির্দিষ্ট হয় ('Born this way' hypothesis)। এই দাবির সপক্ষে তারা জেনেটিক্স এবং নিউরোসায়েন্স ফিল্ডে ত্রুটিযুক্ত কিছু ছোট স্টাডির (যেখানে স্যাম্পল সাইজ খুবই কম) ফলাফল উপস্থাপন করত। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই দাবি প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

নিউরোসায়েন্স

নিউরোবায়োলজিক্যাল গবেষণা (যেমন- ইমেজিং টেকনোলজি) থেকে জানা যায় যে, ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিষ্কের গঠনে (brain structure) উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু ট্রান্সজেন্ডাররা তাদের জৈবিক লিঙ্গ নিয়ে অসন্তোষে ভোগেন, ধারণা করা হয় যে, তাদের মস্তিষ্কের গঠনও তাদের জেন্ডার আইডেন্টিটি অনুযায়ী হওয়া উচিত। এই হাইপোথেসিস পরীক্ষা করার জন্য, ২০২২ সালে একটি পেপার প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল *Brain Sex in Transgender Women Is Shifted towards Gender Identity*[২০]। এই গবেষণায় মাত্র ২৪ জন ট্রান্সজেন্ডার নারীর মস্তিষ্কের গঠনকে ২৪ জন জন্মগত পুরুষ এবং ২৪ জন নারীর মস্তিষ্কের গঠনের সাথে তুলনা করা হয়। এত ক্ষুদ্র স্যাম্পল সাইজের (২৪ জন) ওপর ভিত্তি করে গবেষকরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (যারা জন্মগতভাবে পুরুষ) মস্তিষ্কের গঠন পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্কের গঠনের মাঝামাঝি ধরনের, যা তাদের শারীরিক লিঙ্গের চেয়ে তাদের জেন্ডার আইডেন্টিটির দিকে পরিবর্তিত হয়েছে ('the underlying brain anatomy in transgender

people is shifted away from their biological sex towards their gender identity')।

২০২১ সালে প্রকাশিত একটি রিভিউ পেপারেও একই ধরনের দাবি করা হয় যে, ট্রান্সজেন্ডারদের মস্তিষ্কের গঠন সম্ভবত আলাদা; যদিও এই পেপারগুলোতে ব্যবহৃত গবেষণাসমূহ ত্রুটিপূর্ণ ছিল[২১]।

২০২৩ সালে একটি বড় আকারের গবেষণায় প্রশ্ন তোলা হয়, মস্তিষ্কের গঠনের সাথে সেক্স এবং জেন্ডার বৈচিত্র্যের (diversity) কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য, বিশেষ স্ক্যানিং মেশিন ব্যবহার করে ৯-১১ বছর বয়সী ৭,৬৯৩ জন শিশুর মস্তিষ্কের গঠন পরিমাপ করা হয়[২২]। এই গবেষণায় ছেলে শিশুদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা কি নিজেদের মেয়ে মনে করে (feels like a girl) এবং মেয়ে শিশুদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা কি নিজেদের মনে ছেলে মনে করে (feels like a boy)। একটি ৫ পয়েন্টের লিকার্ট স্কেল —"Not at all", "A little", "Somewhat", "Mostly", "Totally" ব্যবহার করে তাদের সম্ভাব্য যৌন অভিমুখিতা পরিমাপ করা হয়। (যদিও যৌন আকর্ষণ সাধারণত বয়ঃসন্ধির সময় থেকে শুরু হয়, এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা দাবি করেন যে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার প্রবণতা তিন বছর বয়স থেকেই শুরু হতে পারে, যেমন- পুরুষালি বা মেয়েলি খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ)।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, জন্মগত ছেলে ও মেয়ে শিশুদের মস্তিষ্কের গঠনে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, তবে জেন্ডার বৈচিত্র্যের (অর্থাৎ মানসিক লিঙ্গ) ভিত্তিতে মস্তিষ্কের গঠনের কোনো সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া যায়নি।

ট্রান্সজেন্ডারদের 'Born this way' (এভাবেই তারা জন্মগ্রহণ করে) হাইপোথেসিস প্রমাণ করার জন্য ভ্রূণ অবস্থায় কোনো হরমোনগত পার্থক্য বা ভিন্নতা আছে কিনা তা নিয়ে ইন্টারসেক্স (হিজড়া) শিশুদের ওপর পর্যাপ্ত গবেষণা করেও কোনো শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয়নি[২৩]।

জেনেটিক স্টাডি : 'গে জিন'-এর কি আসলেই অস্তিত্ব রয়েছে?

১৯৯৩ সালে বিশ্বমিডিয়ায় 'গে জিন' (Gay Gene) আবিষ্কারের কাহিনি তোলপাড় সৃষ্টি করে। সমকামী হওয়ার জেনেটিক ভিত্তি পাওয়ার উন্মাদনায়

NATIONAL GAY & LESBIAN TASK FORCE বিবৃতি দেয়—The NIH study... shows that homosexuality is a naturally occurring and common variation among humans..."।[২৪] ২০১৯ সালে MIT ও হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা সমকামী মানুষদের সম্পর্কে একটি বড় গবেষণা করেন, যা বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণায় প্রায় ৬ লাখ মানুষের জিন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[২৫] গবেষণায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রথমত, সমকামী হওয়ার ক্ষেত্রে জিন খুবই কম ভূমিকা রাখে—প্রায় ১-এর মধ্যে ০.৩২ ভাগ। এর মানে হলো, আপনার জীবনে যা ঘটেছে, যেমন- আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আপনি কোথায় বেড়ে ওঠেন, সমকামী হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো জেনেটিক কারণের চেয়ে দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—এমন কোনো একক (No single genetic determinant) 'সমকামী জিন' নেই, যা মানুষকে সমকামী করে তোলে।

গবেষণার নেতৃত্বদানকারী লিড অথার বলেন, কেবল জিনের ওপর ভিত্তি করে কেউ সমকামী হবে কিনা তা অনুমান করা অসম্ভব ('It will be basically impossible to predict one's sexual activity or orientation just from genetics.')।[২৬]

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, সমকামী হওয়া কেবল জিনগত বিষয় নয়, এর সাথে পরিবেশ তথা সংস্কৃতি, আইন এবং ধর্মের মতো বিষয়ও নির্ভর করে। টিমের কয়েকজন সমকামী বিজ্ঞানী এই গবেষণার ফলাফল জার্নালে পাবলিশ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, কেননা তারা চিন্তিত ছিলেন এই ভেবে যে, তাদের ফাইন্ডিংস LGBTQ+গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে ব্যবহার করতে পারে।[২৬] অবশেষে টিমের সিনিয়র বিজ্ঞানীরা (যারা নিজেরাও সমকামী) ডেটা প্রকাশে সিদ্ধান্ত নেন।

উল্লিখিত গবেষণার ফলাফল চার বছর আগের আরেকটি বড় গবেষণার (টুইন স্টাডি) সাথে মিলে যায়, সেখানে জিনগতভাবে সমকামী হওয়ার অত্যন্ত দুর্বল যোগসূত্র পাওয়া যায়। উভয় গবেষণা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়—সমকামিতা বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে জিনগত ভূমিকার প্রয়োজন হয় না।[২৭]

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কি অপরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য?

২০১৫ সালে আমেরিকায় সমলিঙ্গের বিয়ে বৈধের মামলায় (Obergefell v. Hodges) সুপ্রিম কোর্টকে একটি মূল পয়েন্টে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা যৌনমুখিতা কি অপরিবর্তনযোগ্য, নাকি এটি বেছে নেওয়ার বিষয়?[২৮] গবেষণার আলোকে যুক্তি দেওয়া হয়—সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন অপরিবর্তনযোগ্য (Immutable), অর্থাৎ এটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। গবেষণার ডেটা ব্যবহার করে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা বলেন, যেহেতু যৌনমুখিতা পরিবর্তন করা যায় না, তাই এলজিবিটি মানুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন রাখা ন্যায্য নয়। এরপর থেকে আমেরিকায় সমলিঙ্গের বিয়ে বৈধ হয়ে যায়। বিজ্ঞানের ফাইন্ডিংস অনেক বিষয়ে পরিবর্তনশীল হতে পারে, কিন্তু আইনি সিস্টেম দ্রুত পরিবর্তন করা যায় না। বিতর্কিত সামাজিক এবং সাইকোলজিক্যাল ইস্যুর সুরাহা সায়েন্টিফিক ডেটার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে বিজ্ঞানের প্রতিই মানুষের এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে, আর সমাজে তৈরি হচ্ছে অস্থিরতা।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন যে স্থায়ী কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, তা অনেক গবেষণায় প্রমাণিত। বর্তমানে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা তাদের দাবি আদায়ে এই ইস্যু সচরাচর ব্যবহার করে না। যৌনমুখিতা যে পরিবর্তনশীল, তা নিয়ে কয়েকটি স্টাডির সারাংশ তুলে ধরা হলো—

* ২০১৯ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার আলোকে এক স্টাডিতে দেখা যায়, ১৩% থেকে ৫৩% সমকামী জীবনযাত্রার মানুষ বিষমকামীতে পরিবর্তিত হতে পারে। অন্যদিকে মাত্র ১% থেকে ১২% বিষমকামী (অসমকামী) মানুষ সমকামীতে পরিবর্তিত হতে পারে।[২৯] এখান থেকে স্পষ্ট—সমকামিতার তুলনায় বিষমকামিতা (হেটেরোসেক্সুয়াল) যৌন বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীল (Stable)।

* ২০২৩ সালে ১০৭৭ জন সমকামী কিশোর-কিশোরীদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ১৮ মাসের মধ্যে ৪০% উত্তরদাতা কমপক্ষে একবার যৌন আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে বিষমকামী হতে পারে। এই প্রবণতা জন্মগত মেয়েদের (~৪৭%) মাঝে ছেলেদের তুলনায় বেশি (~২৬.৬%)।[৩০]

* আরেকটি স্টাডি অনুযায়ী ৭৫% এলজিবিটি পরিচয় গ্রহণকারী তরুণ-তরুণী

(Young adult) ৫ বছরের মধ্যে যৌনমুখিতা পরিবর্তন করে থাকে। অর্থাৎ, তারা সমকামী থেকে বিষমকামী যৌন প্র্যাকটিস করে থাকে।[৩১]

অবৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ

সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ১৯৭৩ সালে মানসিক রোগের লিস্ট বাদ দেওয়া ছিল মানব সভ্যতার অন্যতম এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের মোড়কে সমকামিতা বিষয়ে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাবই মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন তাদের ম্যানুয়াল (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) থেকে সমকামিতাকে বাদ দেওয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করে একটি জার্নাল পেপার আকারে প্রকাশিত হয়েছে (‘*Homosexuality and scientific evidence: On suspect anecdotes, antiquated data, and broad generalizations*’)।[৩২] নিচে এই পেপারের বিশ্লেষণকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করা হলো।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন ড. রবার্ট এল. কিনি। তিনি আমেরিকার বিখ্যাত Purdue University থেকে ফার্মেসিতে পিএইচডি করেন। Franciscan University of Steubenville থেকে দর্শনে (বায়োএথিক্স) এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার ‘Homosexuality and Scientific Evidence’ শীর্ষক নিবন্ধে উপযুক্ত বিশ্লেষণ এবং যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তুলে ধরেন যে, সমকামিতা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি এবং কোনোভাবেই তা স্বাভাবিক যৌন আচরণের ভেতরে পড়ে না। সমকামিতা সমর্থনকারী এবং প্রচারকারী সংস্থা[১] আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ) এবং[২] আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক

---

[১] American Psychological Association (APA): আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন (এপিএ) হলো, সাইকোলজি ফিল্ডে আমেরিকার এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ও পেশাদার সংস্থা, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার। এদের মধ্যে গবেষক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, কন্সাল্ট্যান্ট এবং ছাত্র রয়েছে।

[২] American Psychiatric Association: আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন হলো, প্রায় ৩৫ হাজার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সদস্যসংবলিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাইকিয়াট্রিক সংস্থা। তাদের মূল লক্ষ্য হলো, মানসিকভাবে ভারসাম্যহীনদের জন্য মানবিক ও কার্যকর চিকিৎসা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই সংস্থাটিই মূলত ‘দ্য ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিজঅর্ডার (ডিএসএম)’ নামক হ্যান্ডবুকের প্রকাশক—যা আমেরিকার এমনকি বিশ্বের অধিকাংশ

অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ) কর্তৃক প্রকাশিত দুটো ডকুমেন্টে তিনি তার যুক্তিগুলো ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) এবং আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (APA) এর দুটি মূল ডকুমেন্টের বিস্তারিত পর্যালোচনার মাধ্যমে। এই সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে যে, সমকামিতা কোনো মানসিক ব্যাধি নয় বরং মানুষের যৌনতার একটি স্বাভাবিক বৈচিত্র্য। তবে রবার্ট এল. কিনি তার নিবন্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সমকামিতা সম্পর্কে এই দুই সংস্থা যে তথ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তা বেশিরভাগই দুর্বল, অপ্রাসঙ্গিক এবং সমকামিতাকে মানসিক ব্যাধি হিসেবে দেখতে বাধা দিতে অক্ষম। তাদের রেফারেন্সগুলো এতটাই দুর্বল যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো সংস্থার পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি উল্লেখ করা উচিত যে, APA কর্তৃক প্রকাশিত ডকুমেন্টগুলোর একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন জুডিথ এম. গ্লাসগোল্ড, একজন লেসবিয়ান মনোবিজ্ঞানী এবং APA এর গে এবং লেসবিয়ান ডিভিশন ৪৪-এর সাবেক সভাপতি। টাস্ক ফোর্সের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে লি বেকস্টেড, জ্যাক ড্রেশার, বেভারলি গ্রিনে, রবিন লিন মিলার, রজার এল. ওয়ার্থিংটন এবং ক্লিনটন ডব্লিউ. অ্যান্ডারসন ছিলেন, যাদের অনেকেই নিজেরাও এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্য। ফলে, তাদের গবেষণার 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

একসময় সমকামিতাকে মস্তিষ্কের বিকৃতি বা মানসিক ব্যাধি হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু ১৯৭০-এর দশক থেকে, আমেরিকার প্রধান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনগুলো সমকামিতাকে স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে, তারা প্রায় জোরপূর্বক এই পরিবর্তন এনেছে।

এই সংস্থাগুলোর মতে, সমকামিতা কোনো মানসিক বা বিকাশজনিত ত্রুটি নয় বরং স্বাভাবিক যৌনতার একটি অভিযোজন। তারা 'স্বাভাবিক' বলতে বোঝায় 'মানসিক ব্যাধির অনুপস্থিতি' এবং 'ইতিবাচক ও স্বাস্থ্যকর মানব বিকাশ'। এদের মতে, কয়েক দশকের গবেষণা ও ক্লিনিকাল অভিজ্ঞতার আলোকে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, সমকামিতা মানসিক ব্যাধি নয়। তারা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের

দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রামাণিক নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের যে সমস্ত সাইকিয়াট্রিস্ট এই ডিএসএম-এর বিষয়বস্তু নির্ধারণের সাথে জড়িত থাকেন, তাদেরকে সাইকিয়াট্রি ফিল্ডের বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

একটি বক্তব্যের রেফারেন্স দেয়, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, সমকামীদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন পরিবর্তন করার চেষ্টা প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

রবার্ট কিনির মতে, ফ্রয়েডের একক প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে অযৌক্তিক। ফ্রয়েড নিজেও একসময় বলেছিলেন যে, সমকামিতা যৌন বিকাশের একটি ব্যাঘাতের ফল হতে পারে, যা পুরো বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তিকর করে তোলে।

APA টাস্ক ফোর্স দ্বিতীয় রেফারেন্স হিসেবে আলফ্রেড কিন্সির দুটি বই থেকে উদ্ধৃতি দেয়—*সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন হিউম্যান মেইল* এবং *সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন হিউম্যান ফিমেইল*। তারা যুক্তি দেয়, যেহেতু সমকামিতা সমাজে পূর্বের অনুমানের চেয়ে বেশি বিস্তৃত, তাই এটি একটি স্বাভাবিক যৌন আচরণ। কিনসির এই মতবাদ ফ্রয়েডের মতবাদের মতোই অপরিপক্ক। কিনসির মতে, 'কিছু মানুষ' যদি সমকামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে এটি যৌন চাহিদার একটি স্বাভাবিক রূপ। রবার্ট কিনি উল্লেখ করেন, এই ধরনের যুক্তির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পিএইচডি ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। 'কিছু মানুষের' ইচ্ছার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হতে পারে, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিকভাবে যৌক্তিক নয়। উদাহরণ হিসেবে, তিনি 'বডি ইন্টেগ্রিটি আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার' (জেনোমেলিয়া বা অ্যাপোটেমনোফিলিয়া) এবং 'নন-সুইসাইডাল সেলফ ইনজুরি' (স্ব-আঘাত বা সেলফ হার্ম)-এর মতো মানসিক অস্বাভাবিকতাগুলোর কথা উল্লেখ করেন।

জেনোমেলিয়া এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে সুস্থ মানুষ তার স্বাভাবিক ও কার্যকরী অঙ্গ কেটে ফেলার ইচ্ছা পোষণ করে এবং এটি বাস্তবায়ন করে মানসিক তৃপ্তি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শৈশব থেকেই এই মানসিক বিকৃতির সূচনা হতে পারে এবং কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটি জন্মগতও হতে পারে। অন্যদিকে, নন-সুইসাইডাল সেলফ হার্ম হলো মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছাড়াই নিজেকে আঘাত করা, যা করে রোগী এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে। এই প্রবণতা কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং সময়ের সাথে তা বাড়ছে।

রবার্ট কিনি উল্লেখ করেন যে, কিনসির যুক্তি অনুযায়ী, যদি 'কিছু মানুষ' নিজেদের অঙ্গ কেটে ফেলার বা নিজেকে আঘাত করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে এটিও মানব আচরণের একটি স্বাভাবিক অভিযোজন হতে পারে। কিন্সির মতো যুক্তির মাধ্যমে আমরা যদি মানুষের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বাভাবিকীকরণ

করি, তাহলে তো মনোবিজ্ঞান বা মনোরোগবিদ্যার প্রয়োজনই থাকে না। এমনকি সিরিয়াল কিলার হওয়ার ইচ্ছাকেও এমন যুক্তি দিয়ে জাস্টিফাই করা যেতে পারে। তাই, যদি সিরিয়াল কিলার হওয়ার ইচ্ছা বা জেনোমেলিয়া, সেলফ-হার্ম ইত্যাদি স্বাভাবিক না হয়ে মানসিক বিকৃতি হয়, তবে সমকামিতাও মানসিক বিকৃতির বাইরে কিছু নয়।

তৃতীয় রেফারেন্স হিসেবে APA সি.এস. ফোর্ড (C.S. Ford) এবং ফ্রাঙ্ক এ. বিচ (Frank A. Beach)-এর একটি গবেষণা উল্লেখ করে। গবেষণায় বলা হয়েছে, যেহেতু সমকামী যৌন আচরণ বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যায়, সেহেতু এটি অস্বাভাবিক নয়। ফোর্ড এবং বিচের মতে, যদি কোনো আচরণ প্রাণী এবং মানব প্রজাতির মধ্যে বিস্তৃতভাবে দেখা যায়; তবে সেটি স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ, ক্যানিবালিজম (নরমাংস ভক্ষণ) কিছু প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি আচরণ, কিন্তু এটি কি মানব সমাজে স্বাভাবিক বলে ধরা যাবে? ক্যানিবালিজম প্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক হতে পারে, তবে মানুষের মধ্যে তা নিশ্চিতভাবেই অস্বাভাবিক এবং অপ্রাকৃতিক। APA-র এই রেফারেন্স কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যথার্থ।

চতুর্থত, সাইকোলজিস্ট এভলিন হুকার (Evelyn Hooker)-এর গবেষণার ভিত্তিতে APA দাবি করে যে, সমকামিতা সহজাতভাবে সাইকোপ্যাথোলজির সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এটি কোনো ক্লিনিক্যাল সত্তা নয়। হুকার সমকামী ও বিষমকামী পুরুষদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের পার্থক্য নির্ধারণের জন্য একটি নন-ক্লিনিকাল স্টাডি করেন। গবেষণায় দেখা যায়, অভিযোজন, মানসিক ভারসাম্য, এবং সামাজিক এডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে সমকামী এবং বিষমকামীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। তাই APA-র মতে, সমকামিতা মানসিক অসুস্থতা নয় বরং একটি স্বাভাবিক যৌন অভিমুখিতা।

APA-র এই সিদ্ধান্তগুলো এবং তাদের রেফারেন্সের ভিত্তি কতটা বৈজ্ঞানিক তা নিয়ে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে।

APA এবং জন সি. গনসিওরেকের (John C. Gonsiorek) একটি পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, যদি মানুষের যৌন আচরণ তার মানসিক ও সামাজিক ভারসাম্যে কোনোভাবে প্রভাব ফেলত, তাহলে সমকামী এবং বিষমকামীদের মানসিক তুলনামূলক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যেত।

অর্থাৎ, সমকামীদের মানসিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিকভাবে মানিয়ে চলার ক্ষমতা বিষমকামীদের তুলনায় কম হতো। তবে গবেষণায় এমন কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি। গনসিওরেকের মতে, যদিও আত্মবিশ্বাস, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, সম্পর্কের জটিলতা এবং যৌন সমস্যার মতো বিষয়ে সমকামী, বিষমকামী এবং উভকামীদের মধ্যে কিছু পার্থক্য পাওয়া গেছে, তবে তা এমন কোনো মাত্রায় নয় যে, সেটিকে 'সাইকোপ্যাথোলজিকাল কন্ডিশন' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। যদি সমকামিতা একটি মানসিক ব্যাধি হতো, তাহলে সমকামীদের মধ্যে বিষণ্ণতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সম্পর্কের সমস্যা ইত্যাদি বিষমকামীদের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় দেখা যেত। তাই, তাদের যুক্তিতে দাবি করা হয়েছে যে, সমকামিতা কোনো মানসিক ব্যাধি বা সামাজিক অস্থিতিশীলতার কারণ নয়।

তবে, হুকার এবং গনসিওরেক কেউই তাদের যুক্তিগুলোকে সঠিকভাবে সমর্থন করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ দিতে পারেননি। অনেক মানসিক ব্যাধি আছে যা কোনো ব্যক্তির বিষণ্ণতা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করে না, এবং এসব অবস্থার মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বা সামাজিক কার্যক্ষমতা সীমিত হয় না। *দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব পজিটিভ সাইকোলজি*-তে এই ধারণাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সচেতন এবং সক্ষম ব্যক্তি তার মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সুখী জীবনযাপন করতে পারেন। একজন পিডোফাইল (শিশুকামী ব্যক্তি) হয়তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একজন মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারেন এবং তার প্রবণতা তার কাছে কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে নাও হতে পারে। একইভাবে, জেনোমেলিয়া (একটি মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি নিজেই তার অঙ্গ অপসারণ করতে চায়) আক্রান্ত ব্যক্তিরাও তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে পারেন এবং তাদের ক্ষেত্রে মানসিক রোগের কোনো উপসর্গ বা চিকিৎসার প্রয়োজন না-ও পড়তে পারে।

এমনকি APA-এর নিজস্ব গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, টরেট'স ডিজঅর্ডার (Tourette's Disorder) আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ধরনের অসুবিধা ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের টরেট'স রোগীরা নিজেরাও বুঝতে পারেন না যে তারা এই রোগে আক্রান্ত। তবে, টরেট'স ডিজঅর্ডারকে মানসিক অবস্থার তালিকা থেকে

বাদ দেওয়া হয়নি। তাই, সমকামিতার ক্ষেত্রে, মানসিক স্থিতিশীলতা বা সামাজিক এডজাস্টমেন্টের ওপর ভিত্তি করে এটি একটি মানসিক ব্যাধি নয় বলে সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিযুক্ত নয়।

References

1. Brown, T. M. & Fee, E. Alfred C. Kinsey: A Pioneer Of Sex Research. *Am J Public Health* 93, 896–897 (2003).
2. Långström, N., Babchishin, K. M., Fazel, S., Lichtenstein, P. & Frisell, T. Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study. *Int J Epidemiol* 44, 713–720 (2015).
3. Navigating Treacherous Waters—One Researcher's 40 Years of Experience with Controversial Scientific Research, - Walter R. Schumm, 2015.https://journals.sagepub.com/doi/10.2466/17.CP.4.24.
4. The Kinsey scale is ill-suited to most sexuality research because it does not measure a single construct | PNAS. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2015820117.
5. German government approves law to make legal gender change easier for trans, intersex, non-binary | Euronews. https://www.euronews.com/2023/08/23/german-government-approves-law-to-make-legal-gender-change-easier-for-trans-intersex-non-b.
6. 'Transgender' Could Be Defined Out of Existence Under Trump Administration - The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/transgender-trump-administration-sex-definition.html.
7. Transgender, intersex, and gender non-conforming people #WontBeErased bypseudoscience. *Not-Binary.org*https://not-binary.org/statement/.
8. US proposal for defining gender has no basis in science. https://www.nature.com/articles/d41586-018-07238-8.
9. Sex redefined | Nature. https://www.nature.com/articles/518288a.
10. Heggie, V. Nature and sex redefined – we have never been binary. *The Guardian* (2015).
11. Fausto-Sterling, A. Opinion | Why Sex Is Not Binary. *The New York Times* (2018).
12. How common is Intersex? A response to Anne Fausto-Sterling: The Journal of Sex Research: Vol 39, No 3. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224490209552139.

27. Polderman, T. J. C. *et al.* Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. *Nat Genet* 47, 702–709 (2015).

28. Diamond, L. M. & Rosky, C. J. Scrutinizing Immutability: Research on Sexual Orientation and U.S. Legal Advocacy for Sexual Minorities. *J Sex Res* 53, 363–391 (2016).

29. Sprigg, P. Evidence Shows Sexual Orientation Can Change. *FRC* http://www.frc.org/sexualorientation.

30. Srivastava, A., Hall, W. J., Krueger, E. A. & Goldbach, J. T. Sexual Identity Fluidity and Depressive Symptoms: Findings From a National Longitudinal Study of Sexual Minority Adolescents. *J Adolesc Health* 73, 873–879 (2023).

31. Diamond, L. M., Dickenson, J. A. & Blair, K. L. Stability of Sexual Attractions Across Different Timescales: The Roles of Bisexuality and Gender. *Arch Sex Behav* 46, 193–204 (2017).

32. Kinney, R. L. Homosexuality and scientific evidence: On suspect anecdotes, antiquated data, and broad generalizations. *Linacre Q* 82, 364–390 (2015).

শব্দের মারপ্যাঁচ: সেক্স, জেন্ডার, ট্রান্সজেন্ডার

শব্দের ধূম্রজাল একটি সুচতুর ফাঁদ

সমকামিতা/এলজিবিটি আলোচনায় একাডেমিশিয়ান, নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেক্স এবং জেন্ডার শব্দের মর্মার্থ নিয়ে একধরণের দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা তৈরী হয়েছে। সমকামী আচরণকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক নারী-পুরুষের পরিচয় অর্থাৎ শারীরিক লিঙ্গ পরিচয়কে (sexual identity) প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে অস্বাভাবিক মানসিক লিঙ্গ পরিচয়ের (gender identity) মাধ্যমে। স্বাভাবিক সামাজিকভাবে রীতিনীতিতে যৌনতা এবং লজ্জাশীলতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার ফলে যৌনতা একান্ত ব্যক্তিগত সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে গণ্য করা হয়। পারিবারিকভাবে হাজার হাজার বছর ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন নারী-পুরুষ এ ব্যাপারে দীক্ষিত হয়ে আসছে, এই বিষয় নিয়ে তেমন বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন পড়েনি। নারী-পুরুষের পরিচয় এবং সমাজে তাদের ভূমিকা (জেন্ডার রোল) নিয়ে যদি বড় ধরণের কোনো সমস্যা বা অসংলগ্নতা তৈরী হতো, তাহলে সেটি আলোচনার বিষয় হতে পারতো। সেরকম কোন আলোচনা বা ডিসকোর্স মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়নি।

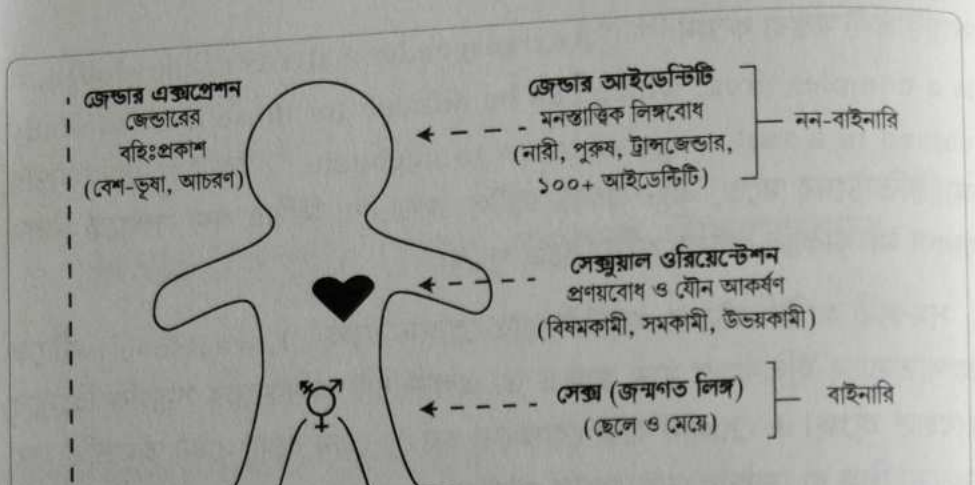
আশির দশকে এইচআইভি/এইডস মহামারির ফলে একাডেমিক ক্ষেত্রে যৌনবৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা বাড়তে থাকে, যার লক্ষ্য ছিল অস্বাভাবিক যৌনাচারকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজে সমকামিতা সংক্রান্ত শব্দগুলোতে নেতিবাচক ধারণা থাকায়, এগুলো নতুন করে উপস্থাপিত করা হয় বা এক্রোনিম (সংক্ষিপ্ত রূপ) দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়। এলজিবিটি (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার) এই ধরনের একটি এক্রোনিম, যা অস্বাভাবিক যৌন আচরণের নানা দিককে তুলে ধরে। বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের জটিলতা সম্পর্কে বিবিসি'র প্রতিবেদনে এক

অ্যাক্টিভিস্ট মন্তব্য করেন [১]- "As transgender activists acknowledge, it is a complex area, which can be difficult for those less than fully versed in a vast range of terms to negotiate." অর্থাৎ " ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টদের মতে, এটি একটি জটিল ক্ষেত্র, যা বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কে বিশদ ধারণা না থাকলে বোঝা কঠিন হতে পারে।

সমকামী আক্টিভিস্টদের একটি বিখ্যাত স্লোগান হচ্ছে- 'Love is love'। এটিকে আপাতভাবে ইতিবাচক মনে হলেও তা এলজিবিটি অধিকারের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ স্লোগান দ্বারা বোঝানো হয় যে প্রেম হলো এমন অনুভূতি যার কোনো লিঙ্গ বা জেন্ডার নেই। অর্থাৎ সমলিঙ্গের প্রেমও হতে পারে। শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তিত সংজ্ঞা নেতিবাচক কোনো বিষয়কে ক্রমশ স্বাভাবিকীকরণে যে ভূমিকা রাখতে পারে তার একটি উদাহরণ আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে দেয়া যাক। ভালবাসা শব্দের অর্থ ইতিবাচক হতে পারে। যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ইত্যাদি। আবার এই শব্দটিকে ব্যবহার করেই ভালবাসা দিবসের (ভ্যালেন্টাইন্স ডে) নামে ব্যভিচার বা জিনাকে প্রকারান্তরে স্বাভাবিকীকরণ করা হচ্ছে। একসময় আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব অবাধ মেলামেশাকে গর্হিত কাজ মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সেই ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রায় স্বাভাবিকীকরণ হয়ে গেছে! ইদানিং অভিভাবকরাও মনে করছেন, উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা একটু-আধটু ভালবাসায় জড়িত হওয়া, প্রেম করা, নিজের পছন্দের পার্টনারকে একটু "পরখ" করে নেয়া তেমন দোষের কিছু নয়। তেমনিভাবে দেশের একজন সঙ্গীতশিল্পী আত্মহত্যা করার পরে সেটিকে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' হিসেবে প্রচার করেছে দেশের লিবারেল গোষ্ঠী। কেননা আত্মহত্যা আমাদের সমাজে অত্যন্ত নেতিবাচক শব্দ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে 'স্বেচ্ছামৃত্যু শব্দের সাথে জড়িয়ে আছে মৃত্যুর অধিকারের ইস্যু (Right to die)[২]।

জেন্ডার আইডেন্টিটির মত দূর্বোধ্য বিষয়টি ছবির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছি। এখানে নারী বা পুরুষের আইডেন্টিটি নির্ধারণ করতে চারটি পৃথক পৃথক বিষয় রয়েছে- সেক্স, জেন্ডার আইডেন্টিটি, জেন্ডার এক্সপ্রেশন এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন।

এই চারটি বিষয়ের মধ্যে সেক্স (প্রজনন অঙ্গ) হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক (জড়বাদি) বিষয় যা চোখে দেখা যায়, স্পর্শ করা, বোঝা যায়। অন্যদিকে জেন্ডার আইডেন্টিটি এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে নন-ম্যাটেরিয়ালিস্টিক বিষয় যা মনের ব্যাপার;



যাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শও করা যায় না। জেন্ডার এক্সপ্রেশন হচ্ছে বাহ্যিক অভিব্যক্তি যার উৎপত্তি হচ্ছে মানুষের মনে (অর্থাৎ নন-ম্যাটেরিয়ালিস্টিক) এবং বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশিত হয় বেশভূষা, আচরণ ইত্যাদি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিসের মাধ্যমে।

সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির সনাতন ধারণা	সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির বর্তমান ধারণা
শারীরিক লিঙ্গ (সেক্স) + মানসিক লিঙ্গ (জেন্ডার)	শুধু মানসিক লিঙ্গ (জেন্ডার)
মূল ভিত্তি- যৌনাঙ্গ (পুং বা স্ত্রী জননাঙ্গ)	মূল ভিত্তি- মন যেটা অনুভব করে
অভিব্যক্তি- শারীরিক লিঙ্গভিত্তিক বেশ-ভূষা, চাল-চলন ইত্যাদি	অভিব্যক্তি- বেশ-ভূষা, চাল-চলন ইত্যাদি আইডেন্টিটি সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে।
সেক্স, জেন্ডার আইডেন্টিটি, জেন্ডার এক্সপ্রেশন এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন- এই ৪টি বিষয় নন-কম্পার্টমেন্টালাইজড। অর্থাৎ আইডেন্টিটি প্রকাশে একসাথে গণ্য করা হয়।	সেক্স, জেন্ডার আইডেন্টিটি, জেন্ডার এক্সপ্রেশন এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন- এই ৪টি বিষয় কম্পার্টমেন্টালাইজড, অর্থাৎ আলাদা আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাভাবিকভাবে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলে বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গের ভিত্তিতে (পুরুষাঙ্গ বা স্ত্রীঅঙ্গ) আমরা শিশুটিকে ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে শনাক্ত করি এবং সেই অনুসারে লালন-পালন করি। শিশুটি নিজেও তার যৌনাঙ্গের ভিত্তিতে (পুরুষাঙ্গ বা যোনী) নিজেকে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে মনে করে বড় হতে থাকে। সেক্সুয়াল এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রেও শিশুটি তার যৌনাঙ্গের ভিত্তিতেই ছেলেদের অথবা মেয়েদের পোষাক, সাজগোজ, খেলাধুলা, আচরণ এবং আবেগের প্রকাশ করে থাকে। বয়ঃসন্ধির সময় যৌনাঙ্গের ভিত্তিতেই তার বিভিন্ন জৈবিক পরিবর্তন হয় এবং ফলশ্রুতিতে সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন)[১]। এই সবকিছু মিলেই একটি মানুষের সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি তৈরি হয় যার মূল ভিত্তি হলো যৌনাঙ্গ। স্বাভাবিকভাবে এই চারটি বিষয় একসাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে। অর্থাৎ এগুলো আলাদা আলাদা বিষয় (compartmentalized) নয়। বোঝার সুবিধার্থে বলা যায়, একটা ছেলে যার পুরুষাঙ্গ আছে, কিন্তু সে মানসিকভাবে নিজেকে মেয়ে মনে করে এবং অভিব্যক্তিতে সে মেয়েলী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে- ব্যাপারটা মোটেই এমন হবে না। বরং এসবগুলো একইসাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই কাজ করে।

বর্তমান সময়ে জেন্ডার আইডেন্টিটির ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচনার বিষয় হচ্ছে ব্যক্তির মন। যৌনাঙ্গকে (পুরুষাঙ্গ বা যোনী) আইডেন্টিটি নির্ধারণে বিবেচনায় রাখা হয় না। অন্য দুটি বিষয়ও (জেন্ডার এক্সপ্রেশন এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন) আইডেন্টিটির নির্ধারণে যুক্ত নয়। অর্থাৎ এগুলো পৃথক পৃথক বিষয় (compartmentalized) হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

নতুন জেন্ডার আইডেন্টিটি ধারণা: বিমূর্ততার প্রতিচ্ছবি

এবস্ট্রাক্টকে অনুধাবন করতে গেলে উচ্চমার্গীয় বুদ্ধিভিত্তিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা প্রয়োজন। বিভিন্ন কিছুর সৌন্দর্য উপলব্ধিতে এবস্ট্রাক্ট সাহায্য করতে পারে। তবে এবস্ট্রাক্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করার ঝুঁকি রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে এটা খুব

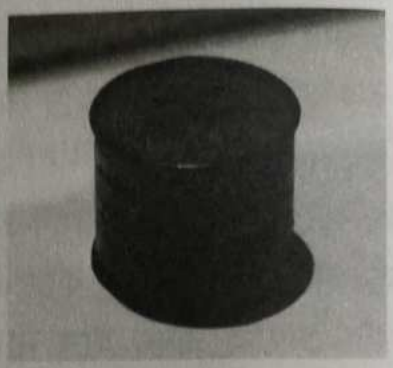
[১] সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন যৌন অভিমুখিতা/রুচি পরিভাষাকে অনেকেই জেন্ডার আইডেন্টিটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন। এটি হচ্ছে একজন মানুষ আরেকজনের প্রতি শারীরিক, মানসিক এবং আবেগীয় যৌনানুভূতির (sexual attraction) প্রকাশ যার মধ্যে রয়েছে- সমকামিতা (Homosexuality), বিষমকামিতা (Heteorsexuality) এবং উভয়কামিতা (Bisexuality)

সাবজেক্টিক ব্যাপার। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি এটাকে বিভিন্নভাবে অনুধাবন করতে পারেন। এই এবস্ট্রাক্ট সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি কতদূর যেতে পারে তার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

কয়েক বছর আগে (২০১৯) এক শিল্প প্রদর্শনীতে ইতালিয়ান শিল্পী মরিজিও ক্যাটালান (Maurizio Cattelan) একটি পাকা কলা টেপ দিয়ে দেয়ালে আটকিয়ে রাখে। এই ধারণা বা এবস্ট্রাক্টটির নাম দেয়া হয় 'কমেডিয়ান'[৩]। দক্ষিণ কোরিয়ার মানবিক বিভাগের এক ছাত্র সেই কলাটি খেয়ে ফেলে। দেয়ালে টেপ দিয়ে লাগানো কলা নামক কনসেপ্টটি নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়। পরবর্তীতে সেই এবস্ট্রাক্টটি ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলারে (প্রায় ১২ কোটি টাকা) বিক্রি হয়!



কমেডিয়ান (আর্ট)



মানুষের পায়খানার কৌটা

আরেকজন ইতালিয়ান শিল্পী পিয়েরো মানজোনির (Piero Manzoni) আরেকটি উদ্ভট এবস্ট্রাক্ট শিল্পকর্ম বিশ্বে আলোচিত হয়। এই শিল্পকর্মে শিল্পী তার নিজের পায়খানা (৩০ গ্রাম) টিনের কৌটায় ভরে সেটা উপস্থাপন করেন। কৌটায় রাখা পায়খানা সমওজনের সোনার দামে বিক্রি হয়। সেই কৌটার একটি বিক্রি হয় ১ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ডে, অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকারও বেশি (২০০৭)। আরেকটি বিক্রি হয় ২ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ডে, অর্থাৎ ৩১ কোটি টাকা (২০১৬)[৪]। এই পায়খানা শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত নির্যাস বিভিন্ন জন বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখে। এর মধ্যে ছিল পুঁজিবাদকে তাচ্ছিল্য করা, বাক-স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, নারীবাদ, বাকস্বাধীনতা, এবং শিল্পে নিজেদের কথা বলার স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়, এই শিল্পকর্মের যথাযথ সংরক্ষণ না করার কারণে একটি পায়খানার কৌটা ফুটো হয়ে মল বের হয়ে আসে। এই ইস্যুতে ক্রেতা মামলা করেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে ডেনমার্ক ডলারে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার (২৩ কোটি টাকাও বেশি) দেওয়া হয়।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এবস্ট্রাক্টের নামে কোনো জিনিসকে অস্বাভাবিক

এবং বিকৃতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এই ধরণের বিকৃতি কিছু ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সচরাচর সীমাবদ্ধ থাকে। এগুলো নিয়ে আমরা তেমন ভাবিত হই না। খুব বেশী হলে এগুলোকে পাগলের কান্ডকারখানা বলে চালিয়ে দিই।

কিন্তু ভয়ঙ্কর সমস্যা তখনই হয় যখন কোনো মানসিক বিকৃতিকে মানবাধিকার, লিঙ্গ-বৈচিত্র্য, সমতা, অন্তর্ভুক্তির (Inclusiveness) ব্যানারে দেশে নতুন আইন তৈরীর মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। নব্য জেন্ডার আইডেন্টিটি তেমনি একটি এবস্ট্রাক্ট আইডিয়া যার ভিত্তি হচ্ছে- মন যা চায় তা নিজের পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করার অধিকার। এই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ আমেরিকায় আইনিভাবে বৈধ হওয়ার এক যুগের মধ্যেই নারী, পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় ছাড়াও কুকুর, বিড়াল, জড়বস্তু, বয়স্ক মানুষ নিজেকে শিশু মনে করা (Transage), নিজের পা কেটে ফেলার বাতিক (Transabled) ইত্যাদি নিজের জেন্ডার আইডেন্টিটি হিসেবে গ্রহণ করার নজির তৈরী হয়েছে।







সমকামিতার সাথে জড়িত শব্দগুলোর ১৫০ বছরের বিবর্তনের ইতিহাস[৫]

৪,০০০ বছর আগে সমকামিতার অপরাধের জন্য সোডোম ও গোমরাহ নগরী ধ্বংস হয়েছিল বলে জানা যায়। কওমে লুতের এই ঘটনার পর থেকে আব্রাহামিক ধর্মের অনুসারীরা (মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি) সমকামিতাকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নেতিবাচক হিসেবে গণ্য করে আসছে। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে অল্প কিছু নৃতত্ত্ববিদ (Anthropologist) সমকামিতা নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩০-এর পর থেকে বিষয়টি দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল৫। তাদের প্রচেষ্টার ফলে নৃতত্ত্বে সমকামিতাকে কেন্দ্র করে একটি শাখা গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে লেসবিয়ান (নারী সমকামী) ও গে (পুরুষ সমকামী) নৃতত্ত্বে রূপ নেয়। পরে এই ইস্যু আরও বিস্তৃত হয়ে কুইয়ার (Queer) এবং ট্রান্সজেন্ডার নৃতত্ত্বে পরিণত হয়।

১৯৮০-এর দশকে অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদ সমকামী মানুষদের বর্ণনা করতে 'হোমোসেক্সুয়াল' (Homosexual) শব্দটি এড়িয়ে চলতেন৬। কারণ, সমাজে সমকামিতাকে মানসিক বিকৃতি বা ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করা হতো, ফলে সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি প্রত্যাখ্যান করেন। সেই সময়ে 'গে' এবং 'লেসবিয়ান' শব্দগুলো বেশি প্রচলিত হয়। ১৯৯০-এর দশকে আমেরিকায় 'ট্রান্সসেক্সুয়াল' (লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য সার্জারি) এবং 'ট্রান্সভেস্টাইট' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। সুশীল সমাজ, এনজিও, একাডেমিয়া, এবং রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিজমের কারণে 'ট্রান্সজেন্ডার', 'কুইয়ার', 'গে', 'লেসবিয়ান'—এই শব্দগুলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

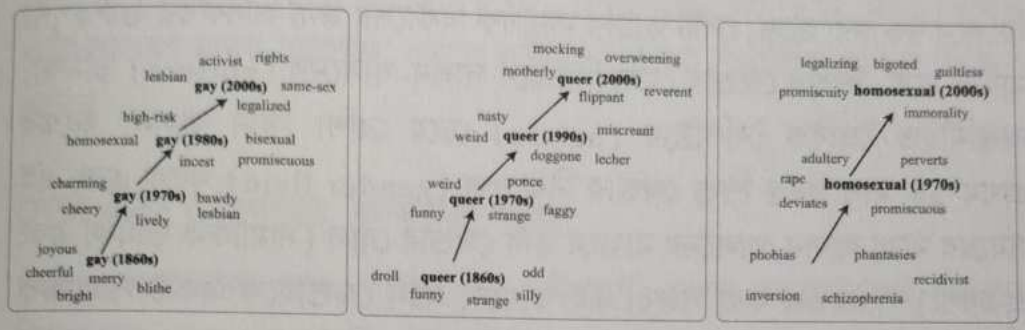
'Corpus of Historical American English' (COHA) ডেটাবেইজের ৪০ কোটি শব্দ এবং বিভিন্ন রচনাশৈলীর ওপর ভিত্তি করে একটি গবেষণায় গবেষকরা 'ওয়ার্ড এমবেডিং' (word embedding) কৌশল ব্যবহার করে ১৮৬০ থেকে ২০০০-এর দশক পর্যন্ত যৌনতা-ভিত্তিক শব্দগুলোর (যেমন, সমকামী, লেসবিয়ান, গে, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার) অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন। প্রতিটি দশকে প্রতিটি শব্দের সাথে সবচেয়ে সম্পর্কিত ৫০টি শব্দের পর্যালোচনা করা হয়[৫]।

'গে' (gay) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৮৬০-এর দশকে। কিন্তু সময়ের সাথে এর অর্থ পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৬০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত 'গে' বলতে বোঝাতো খুশি, আনন্দিত, হাসিখুশি এবং উচ্ছ্বাসিত। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে এর অর্থ পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯৮০-এর দশক থেকে 'গে' শব্দটি সমকামিতার অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সময়ে 'গে' শব্দটির সঙ্গে 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে 'গে' শব্দটির সঙ্গে 'অবাধ', 'ব্যভিচার', 'অদ্ভুত', 'সাইকোপ্যাথ' ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দ যুক্ত ছিল। এটি থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজে 'গে' শব্দটির সমকামী অর্থ গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে ২০০০-এর দশকে নেতিবাচক শব্দগুলো কমে যায় এবং এর সঙ্গে 'অধিকার' এবং 'বৈধ' এর মতো ইতিবাচক শব্দ যুক্ত হতে থাকে।

'কুইয়ার' (queer) শব্দটি ১৮৬০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত মূলত অদ্ভুত বা বিশেষ কিছু বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে এটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় এবং নতুন সংজ্ঞা পায়, যেখানে এটি 'ফ্যাগি' (faggy,

অর্থাৎ সমকামী) এবং 'লেচার' (lecher) এর মতো শব্দগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে। ২০০০-এর দশকে এটি ইতিবাচক হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯৩০ থেকে ২০০০-এর দশক পর্যন্ত, 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি সাধারণত নেতিবাচক শব্দের সাথে যুক্ত ছিল যা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তবে ২০০০ সালের পর থেকে এই নেতিবাচক সংযুক্তি কমে যায় এবং শব্দটির সঙ্গে আরও নিরপেক্ষ এবং ইতিবাচক শব্দ যুক্ত হতে থাকে।



'জেন্ডার' শব্দের উত্থান: কীভাবে এটি 'সেক্স' থেকে আলাদা হলো

'জেন্ডার' এমন একটি ম্যাজিক শব্দ যা মানব সভ্যতার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে বদলে নতুন এক সভ্যতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫৫ সালে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মানি (যাকে জেন্ডার আইডেন্টিটির জনক বলা হয়) ইন্টারসেক্স মানুষদের নিয়ে গবেষণা করার সময় 'জেন্ডার' শব্দটি প্রথমবারের মতো নন-গ্রামাটিক্যাল অর্থে ব্যবহার করেন। তার গবেষণায় (Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: Psychological findings) তিনি 'জেন্ডার রোল' সম্পর্কে ধারণা দেন[৭]:

> "Gender role is used to signify all those things that a person says and does to disclose himself or herself as having the status boy or man, girl or woman, respectively. It includes, but is not restricted to, sexuality in the sense of eroticism."

অর্থাৎ, (সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে) একজন মানুষ নিজেকে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে প্রকাশ করতে যা কিছু করে তা জেন্ডার

রোল বা ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি শুধুমাত্র যৌন অনুভূতির ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অধ্যাপক মানি মনে করেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, নারী-পুরুষের জেন্ডার রোল সাধারণত তাদের জন্মগত লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটি শুধুমাত্র ক্রোমোজোম, যৌনাঙ্গ বা হরমোনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না, বরং অন্যান্য ফ্যাক্টরও গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে, লিঙ্গ সংশোধনের ক্ষেত্রে শিশুটিকে কোন লিঙ্গের (ছেলে বা মেয়ে) হিসেবে বড় করা হচ্ছে, সেটি তাদের মানসিক বিকাশের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মানির মতে, শিশুর জেন্ডার রোল নির্ধারণে লালন-পালনের (nurture) ভূমিকা, অন্তর্নিহিত জৈবিক বৈশিষ্ট্যের (nature) চেয়ে বেশি। তিনি বলেন, জন্মের প্রথম ১৮ মাস পর্যন্ত শিশু জেন্ডার নিরপেক্ষ (gender fluid) থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে লালন-পালনের মাধ্যমে তার জেন্ডার রোল (সামাজিক ভূমিকা এবং প্রত্যাশা) পরিবর্তন করা সম্ভব। এই কারণে, মানি জেন্ডারকে একটি সামাজিক নির্মাণ (social construct) হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য তিনি একজোড়া জমজ ভাইয়ের ওপর একটি বিতর্কিত ও অমানবিক গবেষণা পরিচালনা করেন। ২০০০ সালের পর তার এই গবেষণার বিকৃতির প্রমাণ ফাঁস হয়। পূর্ব পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭০-এর দশক থেকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদে নারীবাদী একাডেমিশিয়ানরা সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য চিত্রায়নে জেন্ডার শব্দ ব্যবহার শুরু করেন। আশি ও নব্বইয়েরর দশকে, একাডেমিয়াতে 'জেন্ডার' শব্দ ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানে এর প্রয়োগ 'সেক্স' শব্দের চেয়ে বেশী ছিল। সায়েন্টিফিক জার্নালে জেন্ডার ও সেক্স শব্দ দুটোকে সমার্থক হিসেবে (অর্থাৎ দুটো একই অর্থ প্রকাশ করে) ব্যবহার শুরু হয়। নারীবাদের প্রতি সহানুভূতির কারণে জীববিজ্ঞানে জেন্ডার শব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে[৭]। ১৯৯৩ সালে যৌনমিলনের সাথে বিভ্রান্তি এড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন (এফডিএ) 'সেক্স' এর পরিবর্তে 'জেন্ডার' শব্দ ব্যবহার শুরু করে। ২০১১ সালে, এফডিএ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে- 'সেক্স'কে জৈবিক শ্রেণীবিভাগ হিসেবে এবং 'জেন্ডার'কে নারী বা পুরুষ হিসেবে নিজের বহিঃপ্রকাশ (self-representation) এবং সামাজিক ভূমিকা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে[৮]।

১৯৯০ সাল থেকে সমকামী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জেন্ডার স্টাডিজ,

কালচারাল স্টাডিজ এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদে কুইয়ার তত্ত্বের (Queer theory) আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেখানে প্রচলিত জেন্ডার রোল, যৌনতা এবং পরিচয়কে প্রশ্ন করে সমাজের ক্ষমতার গঠনকে (Power structure) নতুন করে ঢেলে সাজাতে ব্যাপক কাজ শুরু হয়। অর্থাৎ কুইয়ার তত্ত্বের মাধ্যমে এলজিবিটি/সমকামিতাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেক্সুয়াল আইডেন্টিটিকে ('শারীরিক লিঙ্গ' ভিত্তিক নারী-পুরুষ পরিচয়) গুরুত্বহীন করে জেন্ডার আইডেন্টিটিকে ('মানসিক লিঙ্গ' ভিত্তিক পরিচয়) উপজীব্য করা হয়। ২০০৯ পর্যন্ত একাডেমিশিয়ান, নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ মানুষ 'জেন্ডার' বলতে নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকা হিসেবে জানত।

সেক্স এবং জেন্ডারের কার্যকরী সংজ্ঞা

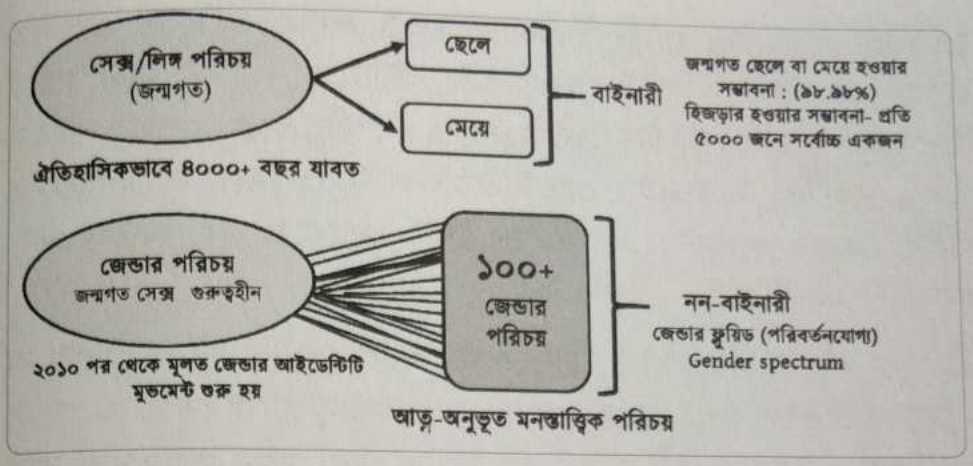
সেক্স এবং জেন্ডার শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অর্থ প্রকাশ করলেও এই ফিল্ডের বিশেষজ্ঞরা ছাড়া প্রায় সবাই এটা গুলিয়ে ফেলেন। সমাজবিজ্ঞানে জেন্ডার শব্দটি অত্যন্ত সুপরিচিত হলেও এটি বর্তমান সময়ের ট্রান্সজেন্ডারবাদে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণায় এই শব্দ দুটোর পরিপূর্ণ অর্থ অস্পষ্ট থাকলে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধা তৈরী করতে পারে। এজন্য আমেরিকার National Institute of Health শব্দ দুটির পার্থক্য স্পষ্ট বোঝাতে ছবি সংযোজন করেছে[১]। সহজভাবে বলতে গেলে সেক্স হচ্ছে জন্মগত বা জৈবিক (Biological) বিষয় যেখানে ছেলে এবং মেয়ের দৈহিক গঠন, শারীরবৃত্তীয়, জেনেটিক এবং হরমোনগত পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে জেন্ডার হচ্ছে সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক বিষয়ের সাথে জড়িত যার সাথে জৈবিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নেই। সেক্স এবং জেন্ডারের মধ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে পার্থক্য টেবিল আকারে নিচে দেওয়া হলো:

আঙ্গিক	সেক্স (Sex)	জেন্ডার (Gender)
সংজ্ঞা	বায়োলজিক্যাল বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন ক্রোমোসোম, হরমোন এবং জননাঙ্গের ভিত্তিতে মানুষকে পুরুষ বা মহিলা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকায় মানুষকে পুরুষ, মহিলা, বা অন্যান্য লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি মানুষ কীভাবে নিজেকে অনুভব করে এবং সমাজ কীভাবে তাদের দেখতে চায়।

আঙ্গিক	সেক্স (Sex)	জেন্ডার (Gender)
জন্মগত বা অর্জিত	জন্মগত, মানুষ জন্মগতভাবে সেক্স বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।	অর্জিত, এটি ব্যক্তির জীবনকাল জুড়ে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব দ্বারা গঠিত হয়।
ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য	জননাঙ্গ, ক্রোমোসোম (XX বা XY), হরমোন (এস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন) ইত্যাদি।	পোশাক, আচরণ, সামাজিক ভূমিকা এবং পরিচয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।
ধারাবাহিকতা	সাধারণত স্থির বা অপরিবর্তনীয় (যেমন: পুরুষ বা মহিলা)।	পরিবর্তনশীল এবং সমাজ বা ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জেন্ডার ভিন্নভাবে চিহ্নিত হতে পারে।
পরিচয়	শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে পুরুষ বা মহিলা হিসেবে পরিচিতি।	একজন ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ, মহিলা, উভয়, বা অন্য কোনো জেন্ডার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।
পরিবর্তনযোগ্যতা	সাধারণত পরিবর্তন করা যায় না।	ব্যক্তির অনুভূতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল হতে পারে।
উদাহরণ	পুরুষ (Male), মহিলা (Female)	নারী (Woman), পুরুষ (Man), অ-বাইনারি (Non-binary) ইত্যাদি

ট্রান্সজেন্ডার

GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) হল একটি এলজিবিটি প্ল্যাটফর্ম যা তাদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। GLAAD-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, জেন্ডার আইডেন্টিটি হলো একটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিশ্বাস বা অনুভূতি, যা তার নিজস্ব লিঙ্গ পরিচয় বা অস্তিত্বকে



প্রতিফলিত করে ('deeply internal sense of gender or a person's innate understanding of their own gender')। যদি কারো এই পরিচয় তার জন্মগত লৈঙ্গিক (সেক্স) পরিচয়ের সাথে মিলে যায়, তবে তাকে সিসজেন্ডার (Cisgender, সংক্ষেপে cis) বলা হয়। অন্যদিকে, যদি জেন্ডার আইডেন্টিটি তার জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মেলে না (not aligned between sex and gender), তবে তাকে ট্রান্সজেন্ডার (Transgender, সংক্ষেপে Trans) বলা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, শারীরিক লিঙ্গ পরিচয়ের মতো জেন্ডার আইডেন্টিটি চোখে দেখে বোঝা যায় না ("gender identity is not visible to others. You cannot look at someone and 'see' their gender identity")। নন-বাইনারি পরিচয়ও (যারা জন্মগত ছেলে বা মেয়ে পরিচয়ে বিশ্বাসী নয়) ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটির মতোই একটি জেন্ডার আইডেন্টিটি।

১৯৯০ সালের পর থেকে ট্রান্সজেন্ডার তথা জেন্ডার আইডেন্টিটি আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা। এটা ক্ষেত্রে বিশেষে নন-বাইনারী এবং এলজিবিটির সমার্থকও হতে পারে। ১৯৬৫ সালে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার অধ্যাপক জন এফ অলিভ্যান (John F. Oliven) ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটা (*Transsexualismus*) জার্মান শব্দ হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রবর্তন হয়। এরপর এ শব্দ *Transexual* হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ছিল। শুরুর দিকে ট্রান্সজেন্ডার বলতে শুধুমাত্র তাদেরকেই বোঝানো হতো যারা হরমোন এবং লিঙ্গ সার্জারির মাধ্যমে নিজেদের বাহ্যিক অবয়ব পরিবর্তন করতো।

বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। এই বিষয়ে আলোকপাত করতে *Understanding the Link: "Homosexuality," Gender*

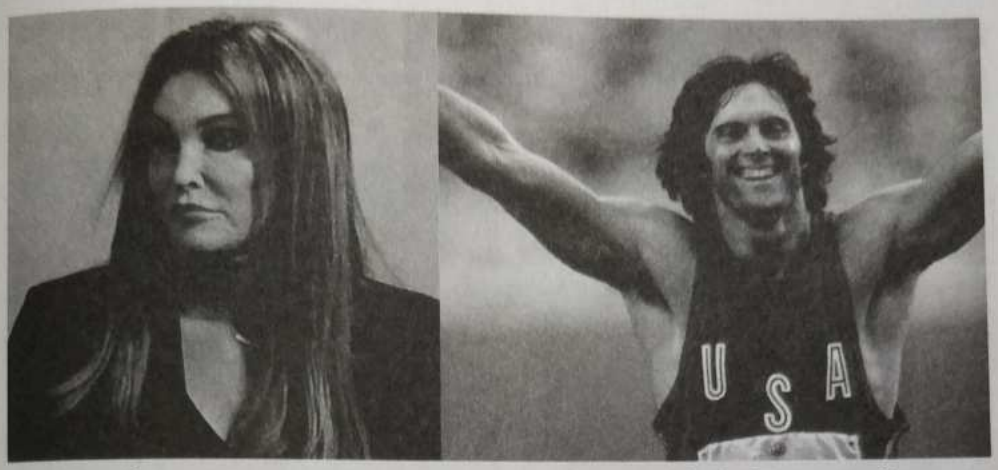
Identity, and the DSM শিরোনামে একটি জার্নাল আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। এটার মাধ্যমে বিভিন্ন জেন্ডার আইডেন্টিটি বোঝায় যার মধ্যে রয়েছে ট্রান্সসেক্সুয়াল, ট্রান্সভেস্টাইটিস, ক্রস-ড্রেসারার (বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরিধান করে), ড্র্যাগ কিং, ড্র্যাগ কুইন, মেল টু ফিমেল পার্সন (FTM), ফিমেল টু মেল পার্সন, জেন্ডার বেন্ডারস, জেন্ডার ভ্যারিয়েন্ট (লিংগবৈচিত্র্য), জেন্ডার নন-কনফর্মিং, নন-বাইনারি, জেন্ডার কুইয়ার ইত্যাদি[১০]।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ট্রান্সজেন্ডার হওয়া কোনো বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিকেল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না। মনের ইচ্ছানুযায়ী যে কেউ, যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। যেদিন কেউ অনুভব করে যে সে তার জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না বা সেই পরিচয়ে বিশ্বাস করে না, সেদিন থেকেই সে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। রূপান্তরিত ব্যক্তিদের লিঙ্গ পরিচয় (পুরুষাঙ্গ বা Penis এবং স্ত্রীঅঙ্গ বা Vagina) তিনটি উপায়ে জেন্ডার ট্রাঞ্জিশন বা রূপান্তরিত হতে পারে-

* সামাজিক রূপান্তর (social transition): নামের পরিবর্তন, নতুন সর্বনামে সম্বোধন (pronouns, e.g they, hir), বেশভূষা পরিবর্তন, মেকাপ শুরু করা বা বাদ দেয়া (যেমন নেইল পলিশ), মেয়েদের অলংকার পরিধান শুরু করা বা বাদ দেয়া- ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীদের সামনে শুধু ঘোষণা দিয়েই ট্রান্সজেন্ডার হওয়া যায়।
* আইনগত রূপান্তর (Legal Transition): জন্মসনদে সেক্স আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে জেন্ডার আইডেন্টিটি গ্রহণ, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি রেকর্ড, ব্যাংক একাউন্টে নাম পরিবর্তন করা
* মেডিকেল রূপান্তর (Medical Transition): অত্যন্ত ব্যয়বহুল হরমোন চিকিৎসা এবং বিভিন্ন ধরণের সার্জারী করে শারিরীক অবয়ব পরিবর্তন করা।

ট্রান্সজেন্ডারের বাস্তব কিছু দৃষ্টান্ত

ব্রুস জেনার: আমেরিকান ক্রীড়াবিদ। তিনি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল জিতে নেন। খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ব্যবসা এবং বিনোদনের ক্যারিয়ারেও সফলতা লাভ করেন। তিনি তিনবার বিয়ে করেন



এবং তার ছিলো ছয় সন্তান। ৬৬ বছর বয়সে ২০১৫ সালে তিনি নিজেকে নারী ঘোষণা দেন। ব্রুস জেনার থেকে নাম পরিবর্তন করেন হয়ে যান ক্যাটেলিন জেনার।

ওয়াচস্কি ব্রাদারস (Wachowski brothers) থেকে সিস্টার: ১৯৯৯ সালে সাড়া জাগানোসিনেমা, ম্যাট্রিক্স (Matrix) এর পরিচালক ছিলেন দুই ভাই, ল্যারি এবং অ্যান্ডি ওয়াচস্কি (Larry and Andy Wachowski)। তারা নিজেদের নারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ওয়াচস্কি বোন হয়ে গেছেন!

নির্বাচনে দাঁড়াতে নিজেকে 'নারী' ঘোষণা



মেলিসা পল্টন (Melissa Poulton) পুরুষ হিসেবে ২০১৯ সালের ইংল্যান্ডের স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি দিব্যি পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ২০২৩ সালে হঠাৎ 'নারী' হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন! শুধু পোষাক পরিবর্তন এবং পরচুলা লাগিয়ে তিনি নারী হয়ে গেলেন। এই দৃষ্টিকটু বিষয় নিয়ে বিরোধী দলীয় নারী এমপি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

মন্তব্য করায় তাকে ট্রান্সফোবিক আখ্যা দেয়া হয়। অবশেষে তিনি সেই পোষ্ট মুছে দিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হোন[১১]।



পুরুষ (২০২২)



'নারী' (পরচুলা ও পোষাক)

ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন দরকার নেই

অনেকের ধারণা ট্রান্সজেন্ডার হতে বাহ্যিক (পোষাক) বা শারীরিক পরিবর্তন করতে হয়। বাস্তবতা হলো এসব পরিবর্তন ছাড়াও যে কেউ মনের ইচ্ছা অনুযায়ী শুধু সর্বনাম পরিবর্তন করেই ট্রান্সজেন্ডার বনে যেতে পারে। বিখ্যাত নারীবাদী অধ্যাপক জুডিথ বাটলার বর্তমান ট্রান্সজেন্ডারবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক। তিনি একজন মহিলা এবং সমকামী (লেসবিয়ান)। তিনি শুধুমাত্র সর্বনাম (She/Her) পরিবর্তন করে



প্রফেসর জুডিথ বাটলার
(লেসবিয়ান, নন-বাইনারী)



মিলি সাইরাস (প্যানসেক্সুয়াল)

নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার (নন-বাইনারী, they/them) হিসেবে পরিচয় দেন। ডিজনি চ্যানেলের টিনেজারদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানের (Hannah Montana) বিশ্ববিখ্যাত কিশোরী অভিনেত্রী মিলি সাইরাস (Miley Cyrus) প্যানসেক্সুয়াল ও জেন্ডার ফ্লুইড আইডেন্টিটি গ্রহণ করেছেন কোন পরিবর্তন ছাড়াই।

সমকামিতা এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যের ভাষার পরিসীমা কতদূর বিস্তৃত

সমকামিতা ক্রমাগত পরিভাষাগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শুরুতে এটা পরিচিত ছিল গে এবং লেসবিয়ান ইস্যু। এ প্রসঙ্গে *Annual Review on Law and Social Science* নামক জার্নালে ডেভিড ফ্র্যাঙ্ক (David Frank) এবং নোলান ফিলিপস (Nolan Phillips) উল্লেখ করেন[১২]-

> "The expansion of sexuality in society is self-reinforcing. The legitimation of each new identity endangers others. Thus, the old gay center on campus morphs into the lesbian and gay center, and then the LGB center, then the LGBT center and then the LGBTQ center, and at some point the LGBTQI center, and now even the LGBTQQIAAP center (lesbian, gay, bisexual, transgendered, queer, questioning, intersex, asexual, allies and pansexual)"

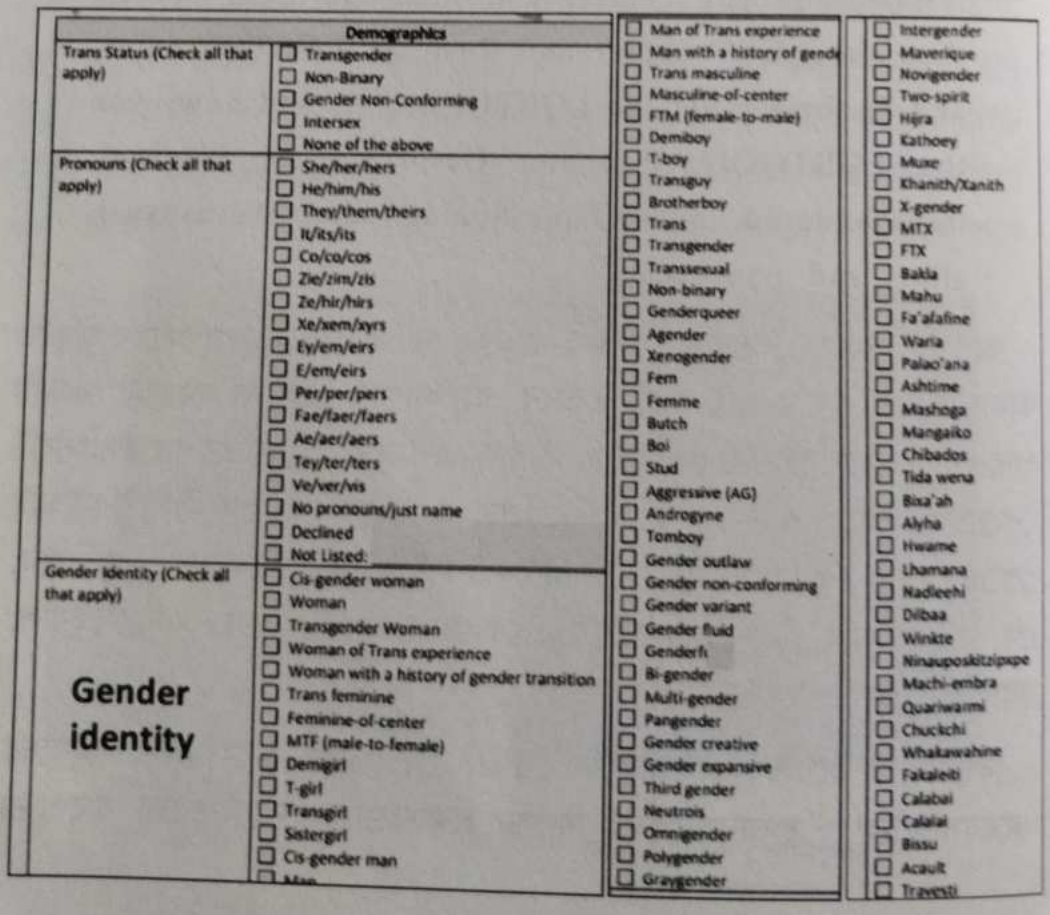
অর্থাৎ- "সমাজে যৌনতার বিস্তার স্ব-প্রবর্ধিত হয়। প্রতিটি নতুন পরিচয়ের স্বীকৃতি অন্যদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। এভাবে, ক্যাম্পাসের পুরোনো সমকামী কেন্দ্রটি পরিণত হয় লেসবিয়ান ও গে কেন্দ্রে, তারপর এলজিবি কেন্দ্রে, এরপর এলজিবিটি কেন্দ্রে এবং তারপর এলজিবিটিকিউ কেন্দ্রে, এবং এক সময় এলজিবিটিকিউআই কেন্দ্রে, এবং এখন এমনকি এলজিবিটিকিউকিউআইএএপি কেন্দ্রে (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইর, কোয়েশ্চেনিং, ইন্টারসেক্স, অ্যাসেক্সুয়াল, অ্যালাইস এবং প্যানসেক্সুয়াল)।"

বিশ্ববিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Yale University) মেডিসিন অনুষদের ওয়েবসাইটের[১৩] তথ্যানুসারে এই ফিল্ডের শব্দভান্ডার সম্পর্কে ভালো ধারণা না

থাকলে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি মানসিক কষ্ট পেতে পারেন। কেননা এটি তার পরিচয়ের প্রশ্ন-

> "ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের ঘিরে একটি সম্পূর্ণ শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, এবং যদি আপনি সর্বশেষ শব্দগুলোর সাথে পরিচিত না হন, তাহলে সহজেই আপনার কথা কারো অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, যদিও সেটি আপনার উদ্দেশ্য না। কারো ব্যবহৃত শব্দগুলো বুঝে ওঠা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে—এই শব্দভাণ্ডারে এমন শব্দও রয়েছে যেগুলোর অর্থ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এবং আবারও পরিবর্তিত হতে পারে।"

আমরা সাধারণত জেন্ডারকে দুটি ভাগে বিভক্ত করি—মেয়ে এবং ছেলে। অন্যদিকে, যৌন আকর্ষণ (sexual orientation) বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন: সমকামিতা (homosexuality), উভকামিতা (bisexuality), এবং অসমকামিতা (heterosexuality), যা আমরা বিকৃত বলে মনে করি। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে, জেন্ডার আইডেন্টিটির সংখ্যা ১০০টিরও বেশি হতে পারে! বিবিসি

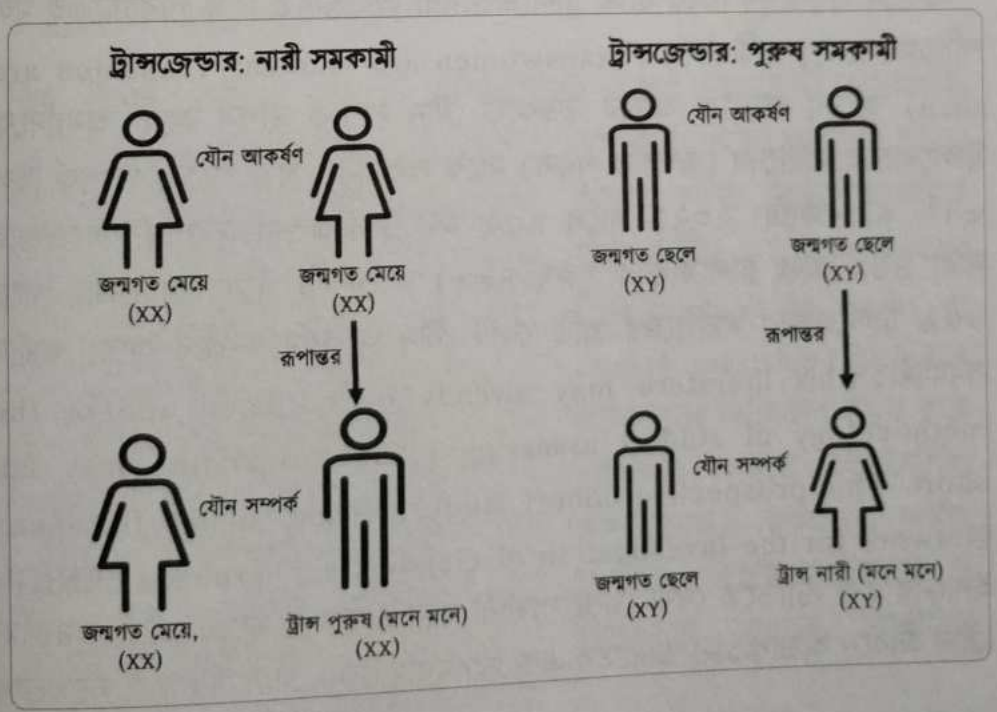


শিশুদের যৌনশিক্ষা দেওয়ার জন্য ১০০টিরও বেশি জেন্ডার আইডেন্টিটির একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল[১৪]। শুধু জেন্ডার আইডেন্টিটির বিভিন্নতার সংরক্ষণের জন্যও একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট রয়েছে (https://www.sexualdiversity.org/)। এই ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১০৭টি জেন্ডার আইডেন্টিটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২০২২ সালে, আমেরিকার ডেমোক্র্যাট শাসিত সানফ্রান্সিসকোর এক এলাকায় ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য বিশেষ ভাতা দেওয়ার আবেদন ফর্মে ৯৭টি জেন্ডার আইডেন্টিটি, ১৮টি সর্বনাম (আমরা সাধারণত He, She, They—এই তিনটি সর্বনাম ব্যবহার করি) এবং ১৯টি সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন যুক্ত করা হয় (নিচের ছবিতে)[১৫]। এটি মানুষের নামকরণের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এখন জেন্ডার আইডেন্টিটিকে আর শারীরিক লিঙ্গের (anatomy) সাথে সরাসরি যুক্ত করা হয় না, তবুও এগুলোর উদ্ভব যৌন বিকৃতির প্রতিফলন হিসেবেই ঘটেছে।

ট্রান্সজেন্ডাররা সচরাচর সমকামী বা উভকামী

সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণের কারণে ট্রান্সজেন্ডাররা সচরাচর রূপান্তর প্রক্রিয়ার (যেমন সামাজিক, মেডিকেল ও আইনি রূপান্তর বা ট্রাঞ্জিশন) মধ্য দিয়ে যান। অন্যদিকে গে, লেসবিয়ান এবং উভকামীরা নিজেদের যথাক্রমে জন্মগত ছেলে



(XY) বা মেয়ে (XX) হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। ট্রান্সজেন্ডারবাদে কারো সম্পূর্ণ সক্ষম পুরুষাঙ্গ থাকার পরেও যদি নিজেকে নারী দাবি করে, তবে তাকে আইনত এবং সামাজিকভাবে নারী হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার নারীরা (XY) অন্য জন্মগত ও জৈবিকভাবে পুরুষকে (XY) পছন্দ করে। তাই, এখানে যৌন সম্পর্কের দিক থেকে সমকামিতা (XY, XY) হবে। সেই ট্রান্সজেন্ডার নারী (সার্জারী করে অবিকল নারীর মত দেখায়) যদি অন্য নারীকে বিয়ে করতে চায় তবে তারা এটাকে সমাজের চোখে সমকামিতা (লেসবিয়ান) হিসেবে দেখাতে চায়। সাম্প্রতিকালে Transwoman-কে মিডিয়াতে শুধু Woman হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

২০২৩ সালে BMC Public Health জার্নালে ট্রান্সজেন্ডারদের যৌনসঙ্গী (Sexual partner) নিয়ে ১৪৩৬ জন আমেরিকান (ট্রান্সজেন্ডার ২৭৮ জন, এবং সিসজেন্ডার অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় দানকারী ১১৬২ জন) একটা গবেষণায় অংশগ্রহণ করে[১৬]। ৫ বছরব্যাপী তাদের যৌনসঙ্গী কোন লিঙ্গের ছিলো তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ডেটা অনুযায়ী- ট্রান্সজেন্ডার পুরুষরা (জন্মগত নারী) বায়োলিজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে ৭৬% সমকামী যৌন (XX, XX) সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদিও তারা ট্রান্সজেন্ডারবাদ অনুযায়ী নিজেদের হেটেরোসেক্সুয়াল বা অসমকামী দাবী করে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডাররা রূপান্তরিত লিঙ্গ পরিচয়কেই মূল পরিচয় হিসেবে দাবী করে (Transwomen are women; Transmen are men) তাদের অনেকে আবার উভকামী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (জন্মগত পুরুষ) মাঝে সমকামী (XY, XY) সম্পর্ক ছিল ৬৭% এর ক্ষেত্রে। ২০২১ সালে ৯০২ জন ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে (ট্রান্সজেন্ডার নারী ৪৬৯ এবং ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ ৪৩৩) আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে ৮০% ট্রান্সজেন্ডার সমলিঙ্গের প্রতি বেশী যৌন আকর্ষণ অনুভব করে, অর্থাৎ সমকামী১৭this literature may already be outdated and/or the methodology of studies assessing sexual orientation may fall short. This prospective cohort study was part of the European Network for the Investigation of Gender Incongruence (ENIGI। ইরানের এক স্টাডিতে দেখা গেছে সার্জারী করা ট্রান্সজেন্ডারদের ৯৭% সমকামী যৌন জীবনে অভ্যস্ত১৮। ভারতের এক গবেষণায় দেখা গেছে ৭৩% ট্রান্সজেন্ডার

পায়ুকামী[১৯]। ২০১৩-২০১৪ সালের ইউরোপের গবেষণা অনুযায়ী ৪৬ থেকে ৮০% ট্রান্সজেন্ডার নিয়মিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত এবং এদের বেশীর ভাগ সমকামী যারা পায়ুকাম করে[২০] respectively (late onset।

বিসিসি'র এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন (*The lesbians who feel pressured to have sex and relationships with trans women*) নিয়ে ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে তোলপাড় হয়। ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ) কেউ কেউ প্রকৃত নারীদের (যারা লেসবিয়ান) সাথে লেসবিয়ান (নারী সমকামী) হিসেবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত লেসবিয়ান নারীরা তাদের সাথে মিলিত হতে চান না, চাপ অনুভব করেন কেননা সেসব ট্রান্সজেন্ডার নারীদের পুরুষাঙ্গ (পেনিস) রয়েছে। একজন মন্তব্য করেন-

> 'What if you met a woman in a bar and she's really beautiful and you got on really well and you went home and you discovered that she has a penis? Would you just not be interested?'
>
> *অর্থাৎ মদখানায় কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করার জন্য এক লেসবিয়ান তাকে বাসায় আনার পর যদি আবিষ্কার করে যে ঐ সুন্দরী মেয়ে আসলে পুরুষ অর্থাৎ তার পুরুষাঙ্গ রয়েছে! তার প্রতি কি আগ্রহ তৈরী হবে?"*

কিছু বিরল কেইসও রয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারা প্রকৃত বিষমকামী/অসমকামী



সম্পর্কও গড়ে তুলতে পারে। কল্পনা করুন- দুজন স্বাভাবিক পুরুষ-নারীর (Inservative and receiver in terms of sexual courtship) হঠাৎ মনে হলো তারা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে লিঙ্গবৈশিষ্ট্য অদল-বদল করবে। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের সাজগোজ ও চিকিৎসার মাধ্যমে নিজেদের

রূপান্তরিত করে ফেলল এবং তারা আবার বিয়েও করল। অর্থাৎ একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী (যার পুরুষাঙ্গ আছে অর্থাৎ Insertive) এবং আরেকজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ (যার যোনী রয়েছে, অর্থাৎ Receiver) হিসেবে যৌন সম্পর্ক করে তবে তারা বিষমকামী (Heterosexual) সম্পর্ক স্থাপন করল। এমন দৃষ্টান্তও তৈরী হয়েছে। ইকুয়েডরে নারী-পুরুষ পার্টনার নিজেদের অদল-বদল করে ফেলে (Diane and Fernando)। ২০১৬ সালে 'বাবা' সন্তান জন্ম দিয়েছে বলে লিবারেল মিডিয়া (বিবিসি, গার্ডিয়ান) ইতিবাচক প্রতিবেদন করে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশটিতে এলজিবিটি অধিকার যে বাস্তবায়ন হয়েছে এই ঘটনাটি হলো তার একটি দৃষ্টান্ত[২১]। অন্যদিকে রক্ষণশীল মিডিয়া এটি নিয়ে প্রশ্ন তোলে পুরুষ কিভাবে সন্তান জন্ম দিতে পারে[২২]।

> দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম ট্রান্সজেন্ডার বাবা-মা! Father' is pregnant by the 'mother' 'বাবা' গর্ভবতী এবং 'মা' সন্তান ধারণে সহায়তাকারী। যিনি নিজেকে পুরুষ দাবী করছেন তিনি জন্মগত মেয়ে (সন্তান ধারণে জরায়ু আছে), আর যিনি নিজেকে মেয়ে বলছেন তিনি জন্মগৎ পুরুষ (সন্তান ধারনে শুক্রানু দিতে পারেন)। মোদ্দা কথা- ফ্যান্টাসিতে আক্রান্ত হয়ে নিজেদের বাহ্যিক চেহারা আদল-বদল করেছেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে- আমেরিকায় সমলিঙ্গের বিয়ের বৈধ হওয়ার আগে (২০১৪) ট্রান্সজেন্ডার নারী টেকনিক্যালি জৈবিক ও জন্মগত পুরুষকে আইনত বিয়ে করতে পারেনি। কারণ ট্রান্সজেন্ডার নারীকে পুরুষ হিসেবেই ধরা হতো। ১৯৯৬ সালে Littleton v. Prange কেইসের ক্ষেত্রে সমলিঙ্গের বিয়ে হিসেবে পরিগণিত হবে বিধায় আদালত তা অবৈধ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডেও এমন উদাহরণ রয়েছে[২৩]।

References

1. A guide to transgender terms - BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine-32979297.
2. Annadurai, K., Danasekaran, R. & Mani, G. 'Euthanasia: Right to Die with Dignity'. J Family Med Prim Care 3, 477–478 (2014).
3. Maurizio Cattelan: Banana artwork eaten by Seoul museum visitor. (2023).
4. Artist's Shit. Wikipedia (2024).

5. Shi, Y. & Lei, L. The evolution of LGBT labelling words: Tracking 150 years of the interaction of semantics with social and cultural changes. English Today 36, 33–39 (2020).

6. Wilson, A. Queer anthropology. Cambridge Encyclopedia of Anthropology (2019).

7. Haig, D. The Inexorable Rise of Gender and the Decline of Sex: Social Change in Academic Titles, 1945–2001. Arch Sex Behav 33, 87–96 (2004).

8. Health, C. for D. and R. Evaluation of Sex-Specific Data in Medical Device Clinical Studies - Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff (PDF Only). FDA (2019).

9. Sex & Gender | Office of Research on Women's Health. https://orwh.od.nih.gov/sex-gender.

10. Toscano, M. E. & Maynard, E. Understanding the Link: "Homosexuality," Gender Identity, and the DSM. Journal of LGBT Issues in Counseling 8, 248–263 (2014).

11. Smith, B. Trans row as Tory deputy chair calls Green candidate 'man in a wig'. The Telegraph (2023).

12. Sex Laws and Sexuality Rights in Comparative and Global Perspectives | Annual Review of Law and Social Science. https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134007#_i2.

13. Transgender Glossary: Terms You Can Learn > News > Yale Medicine. https://www.yalemedicine.org/news/transgender-guide-terms-you-can-learn.

14. BBC programme tells 9-year-olds there are 'over 100 genders' | Daily Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9179703/BBC-programme-tells-9-year-olds-100-genders.html.

15. San Francisco's trans benefits application has over a HUNDRED gender and pronoun options | Daily Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/health/article-11439455/San-Franciscos-trans-benefits-application-gender-pronoun-options.html.

16. Reisner, S. L. et al. Sexual orientation in transgender adults in the United States. BMC Public Health 23, 1799 (2023).

17. Defreyne, J. et al. Sexual orientation in transgender individuals: results from the longitudinal ENIGI study. Int J Impot Res 33, 694–702 (2021).

18. Nematollahi, A., Gharibzadeh, S., Damghanian, M., Gholamzadeh, S. & Farnam, F. Sexual behaviors and vulnerability to sexually transmitted

infections among transgender women in Iran. BMC Women's Health 22, 170 (2022).

19. Sinha, A. et al. Sexual Behavior of Transgenders and their Vulnerability to HIV/AIDS in an Urban Area of Eastern India. Indian Journal of Public Health 61, 141 (2017).

20. Cerwenka, S. et al. Sexual behavior of gender-dysphoric individuals before gender-confirming interventions: a European multicenter study. J Sex Marital Ther 40, 457–471 (2014).

21. The transgender family where the father gave birth. BBC News (2016).

22. Ecuadorian transgender man Fernando Machado gives birth to baby | Daily Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/news/article-3804052/Transgender-man-gives-birth-baby-falling-pregnant-transgender-woman.html.

23. Opinion | What Marriage Equality Means for Transgender Rights - The New York Times. https://www.nytimes.com/2015/07/16/opinion/what-marriage-equality-means-for-transgender-rights.html.

শব্দ বিভ্রাট—হিজড়া, লিঙ্গ প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ

হিজড়া 'সংস্কৃতি' নাকি লিঙ্গ প্রতিবন্ধিত্ব

এলজিবিটি সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় হিজড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে আনা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে গবেষকরা হিজড়াদের যৌনতা নিয়ে গবেষণা করে তাদের পায়ুকামী হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার ভিত্তিতে ১৮৯৭ সালে সমকামিতা-অপরাধ-আইন (পেনাল কোড ৩৭৭) সংশোধন করা হয়। ১৯৯০-এর দশক থেকে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের ছত্রছায়ায় এলজিবিটি আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ায় বেগবান হয় এবং পশ্চিমা একাডেমিশিয়ানরা হিজড়া সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণায় জোর দেন।

> *উল্লেখ্য, হিজড়া সম্প্রদায় শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যমান এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও তাদের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। দক্ষিন এশিয়ায় বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ বাস করে। এদের মাঝে যদিও অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের হিজড়াদের মতো গুরুত্ব বা ফান্ডিং দেওয়া হয় না, যা প্রমাণ করে যে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিকীকরণের চেয়ে সমকামিতা মতবাদকে প্রচারের চেষ্টা বেশি হচ্ছে।*

হিজড়ার সংজ্ঞা স্পষ্ট না থাকায় নীতি নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। হিজড়া কি কেবল একটি সাংস্কৃতিক পরিচয়, নাকি এটি একটি লিঙ্গ-পরিচয়ের অংশ? এই বিতর্কে প্রবেশের আগে হিজড়াদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়া-সংক্রান্ত আলোচনায় ড. আদনান হোসেনের গবেষণা, জাতিসংঘের UNDP ও হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতা ও অর্থায়নে সেলিনা হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিজড়া শব্দকোষ' বই এবং মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে হিজড়া সম্প্রদায়

ভারতীয় উপমহাদেশে হিজড়া সম্প্রদায়ের ২০০০ বছরের পুরোনো ইতিহাস রয়েছে [১]। হিজড়ারা নিজেদের প্রচলিত অর্থে নারী বা পুরুষ হিসেবে পরিচয় না দিয়ে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে, যেখানে 'বহুচরা মাতা' নামে এক দেবীর প্রতি তাদের গভীর আনুগত্য কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এই দেবীর পূজায় প্রায়শই লিঙ্গচ্ছেদ (নির্বাণ) করা হয়, যা হিজড়াদের ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ[২]। হিজড়ারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের মা দেবীদের সাথে একটি বিশেষ আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, যা ভারতীয় সমাজে তাদের জন্য একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে, হিজড়াদের ছেলে শিশুদের ওপর আশীর্বাদ বা অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হতো। 'সত্যিকারের' হিজড়া হওয়ার জন্য 'নির্বাণ' (খোজাকরণ বা Emasculation) আচার পালন করা হতো, যেখানে পুরুষাঙ্গ (পেনিস বা শিশ্ন, অণ্ডকোষ, অণ্ডথলি) সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা হয়। তবে, বর্তমানে এই লিঙ্গচ্ছেদ আচার বাধ্যতামূলক বা সর্বজনীনভাবে পালিত হয় না; কিছু হিজড়া ধর্মীয় (বিশেষ করে মুসলিম) বা ব্যক্তিগত কারণে এর বিরোধিতা করেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, হিজড়াদের প্রায়ই দেবতাদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হতো, এবং তাদের আশীর্বাদ লাভের জন্য মানুষ তাদের কাছে প্রার্থনা করত। বিবাহ, জন্ম এবং মৃত্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি ছিল প্রাচীন হিন্দু সমাজের সামাজিক রীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া, হিজড়া সংস্কৃতির আরেকটি ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সাধারণত দলবদ্ধভাবে একজন গুরুর অধীনে বসবাস করেন, যা তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম দিক।

এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টদের মতে, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলিতে তৃতীয় লিঙ্গের উল্লেখ থাকলেও, এটি বর্তমানের সমকামিতা বা এলজিবিটি আন্দোলনকে সরাসরি সমর্থন করে না। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌন অভ্যাস সব সমাজেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আইনগত বা সামাজিকভাবে এটিকে কখনোই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যদি সমকামিতা প্রাচীন হিন্দু সমাজে মূলধারার অংশ হতো, তাহলে আজকের দিনে এটির পক্ষে আন্দোলন করতে হতো না।

মুসলিম শাসনামলে হিজড়াদের সামাজিক অবস্থান

রাজতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতার পালা বদল ঘটে উত্তরাধিকার সূত্রে। তাই বংশানুক্রমিক এই ধারা নিশ্চিত করতে রাজদরবারে পুরুষাঙ্গবিহীন বা যৌন অক্ষম (যারা খোজা বা ইউনাক নামে পরিচিত) কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হতো। পুরুষ শিশুদের যৌনাঙ্গ অপসারণ করে ইউনাক বা খোজা বানানো হতো। যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করেও খোজা বানানোর রীতি ছিল। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, চীন, ভারত, পারস্য, গ্রিস, রোম ইত্যাদি সভ্যতায় রাজদরবার-ব্যবস্থাপনায় খোজাদের মাধ্যমে সেবা গ্রহণের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাজকীয় পরিবারের রক্ষক, রাজ্যের প্রশাসক, সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তাদের নিযুক্ত করা হতো। মধ্যযুগেও ইউরোপে ইউনাকদের মাধ্যমে নানা সেবাগ্রহণ অব্যাহত ছিল[৩]। মুসলিম শাসকরাও খোজাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও মোগল আমলে হিজড়াদেরকে (যাদের মধ্যে ইউনাক বা খোজা ও ইন্টারসেক্স অন্তর্ভুক্ত) রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে (সেনাপতি, মন্ত্রী, পরামর্শক) আসীন হতে দেখা যায়।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের পর্দার ব্যাপারে খোজা (Lacking sexual desire) বা যৌন প্রতিবন্ধীদের (ইন্টারসেক্স) ক্ষেত্রে শিথিল করার ব্যাখ্যা রয়েছে[৪]। এই কারণে খোজারা মুসলিম শাসনামলে এমন পদে আসীন হওয়ার সুযোগ পেত, যা অনেক পরিপূর্ণ পুরুষের ক্ষেত্রে সম্ভব হতো না। তারা রাজতন্ত্রের আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত ছিল। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'গায়রে মাহরাম' মহিলাদের সামনে তারা দাস হওয়ার কারণে আসা-যাওয়ার সুযোগ পেত[৫]। এ কারণেই ইসলামি সাম্রাজ্যে রাজসভায় বা অন্দরমহলে খোজাদের নজির পাওয়া যায়। সাধারণত তাদেরকে মুসলিম হওয়ার আগেই খোজা বানানো হতো। তাদের কেউ কেউ পূর্বে দাস হিসেবে ছিল, যাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা হতো (যেমন- পশ্চিম আফ্রিকা) এবং পরবর্তী সময়ে তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছিল এবং কোনো-না-কোনোভাবে মুসলিম ভূমিতে এসেছিল[৫]।

তাদের খোজাকরণ কোন পর্যায়ের (অণ্ডকোষ বা শিশ্ন বা উভয়ই), তার ওপর ভিত্তি করে তাদের সামাজিক অবস্থান কী হবে এবং তারা গায়রে মাহরামদের দেখতে পারবে কি না—এই বিষয়গুলো নিয়ে তৎকালীন মুসলিম স্কলাররা আলোচনা করেছেন, যেমন অষ্টম শতাব্দীর শাফিয়ি মাজহাবের একজন আলিম তাজ উদ্দিন সুবকি রাহিমাহুল্লাহ এর অন্যতম একজন। তাদের ব্যাখ্যায় তারা কোনোভাবেই খোজাকরণের বৈধতা প্রদান করেননি। যেমনটি নিচের উদ্ধৃতাংশে পাওয়া যায়[৬]—

> 'হিজড়ারা জন্মগতভাবে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী, কিন্তু খোজারা জন্মগতভাবে খোজা নয়। ইসলামি আইনে কাউকে খোজাকরণ নিষিদ্ধ ছিল এবং এখনো বলবৎ আছে। দাস ব্যবসায়ীরা দাস বালকদের ইসলামি সাম্রাজ্যে আমদানির আগেই রাজ্যের সীমানায় তাদের খোজা করত। কিন্তু এই বিষয়ের শরিয়াগত দিক অনেক ধার্মিক আলেমদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। ইমাম সুবকি তার অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেন, খোজাদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা নিন্দনীয় (মাকরুহ), কিন্তু নিষিদ্ধ (হারাম) নয়, কারণ খোজাদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা পরোক্ষভাবে তাদের খোজাকরণের প্রতি বৈধতা প্রদান করে, যা একটি নিষিদ্ধ কাজ। অধ্যায়টি আবু হানিফার প্রতিষ্ঠিত হানাফি ফিকহের বইসমূহেও পাওয়া যাবে।'

বিষয়টি পঞ্চাদশ শতাব্দীতে কায়রোর মামলুক শাসনামলের প্রেক্ষাপটে বলা যায়[৬]—সুলতান বা অন্যান্য বিত্তবানদের গৃহে খোজারা রাজকীয় হারেমের তত্ত্বাবধান করত এবং অন্দরমহলের সীমানা পাহারা দিত। তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, যদিও খোজারা মুসলিম হওয়ার পরে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তবুও ইসলামে খোজাকরণের কোনো বৈধতা পাওয়া যাবে না।

ব্রিটিশ শাসনামল

১৮৫২ সালের ১৭ আগস্ট। উত্তর ভারতের ময়নপুরি জেলায় ভুরাহ (Bhoorah) নামে একজন হিজড়াকে 'মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন' অবস্থায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভুরাহর দুই শিষ্য এবং অন্য এক পুরুষের সাথে প্রেমের সম্পর্কে ছিল। সে খুন হওয়ার আগে তার প্রেমিকাকে অন্য এক পুরুষের জন্য ছেড়ে দেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ বিচারকরা এই ঘটনার তদন্তে নিশ্চিত হন—ভুরাহকে তার প্রাক্তন প্রেমিক রাগের মাথায় হত্যা করেছে। বিচারের সময় তারা হিজড়াদের (নপুংসক) ক্রস-ড্রেসার, ভিক্ষুক এবং অপ্রাকৃত পতিতা হিসেবে বর্ণনা করেন[৭]।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর উত্তর ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা হিজড়া সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে 'বিলুপ্তি' করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে একজন বিচারক মন্তব্য করেছিলেন, হিজড়া গোষ্ঠী 'ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য অপমান'; অন্য আরেকজন মনে করেন, তাদের অস্তিত্ব ব্রিটিশ সরকারের জন্য 'ধিক্কার'। ঐতিহাসিক জেসিকা হিনচির মতে, এই হত্যাকাণ্ডটি আশ্চর্যজনকভাবে ব্রিটিশদের মধ্যে হিজড়াদের প্রতি 'নৈতিক আতঙ্ক' (Moral panic) সৃষ্টি করে। ভুরাহ ছিল

সেই সময় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং এর প্রতিবেশী উত্তরাখণ্ড) বসবাসকারী ২,৫০০ জন রেকর্ডকৃত হিজড়াদের একজন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভুরাহ অপরাধের শিকার হয় কিন্তু তার মৃত্যুকে হিজড়া সম্প্রদায়ের অপরাধী (criminal) এবং অনৈতিকতার (immorality) প্রমাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়[৭]।

১৮৫০-এর দশক থেকে, ব্রিটিশ প্রশাসক এবং অভিজাত শ্রেণির ভারতীয়রা হিজড়াদের নারীসুলভ আচরণ এবং জনসমক্ষে প্রদর্শিত তাদের সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের ব্যাপারে ক্রমশ ক্ষোভ প্রকাশ করা শুরু করে। ব্রিটিশদের কাছে হিজড়ারা ছিল 'অশাসনযোগ্য' জনগোষ্ঠী এবং তাদের শাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ। ১৮৭১ সালে আইনের মাধ্যমে হিজড়াদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করে তাদের 'বিলুপ্তি' ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতিহাসবিদ জেসিকা হিনচি হিজড়াদের অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করার নেপথ্যে আমদানি করা ব্রিটিশ রীতির পাশাপাশি উচ্চবর্গীয় ভারতীয়দের নেতিবাচক মনোভাবকেও দায়ী করেন[৮]।

সিস্টেম্যাটিক ডকুমেন্টেশন তথা গবেষণা-দক্ষতার কারণে মাত্র কয়েক হাজার ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা ভারতীয় উপমহাদেশকে প্রায় দুইশত বছর শাসন করেছিল। এই অঞ্চলে আর্থসামাজিক ফ্যাক্টর, মানুষের চিন্তাচেতনা, আবেগের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার কাজে ব্রিটিশ চিকিৎসকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অসুস্থতার সময় চিকিৎসকদের কাছে মানুষ খোলাখুলি কথা বলেছেন। হিজড়া সম্প্রদায় নিয়েও তারা বিস্তর গবেষণা করেছেন। ১৮৪৩ সালে জনস্বাস্থ্য রিসার্চ ফিল্ডের বিখ্যাত *দ্য ল্যানসেট* জার্নালে দুইজন চিকিৎসক হিজড়াদের যৌন শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে অ্যাকাডেমিক বিতর্কে জড়ান—তারা কি হার্মাফ্রোডাইট, খোজা পুরুষ, নাকি 'স্ত্রী খোজা'? (Female Eunuchs in India, Lancet 40, no. 1029 (1843): 262; A Bengal Surgeon, 'Supposed Female Eunuchs', Lancet 40, no. 1031 (1843): 343)। এর এক যুগ পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে, হিজড়াদের মধ্যে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী ইন্টারসেক্সসহ 'খোজা' (Emasculated/Castrated) পুরুষ রয়েছে (Hijras were generally male-born castrates or 'eunuchs')।

বিংশ শতাব্দী (১৯০০)-এর আগ পর্যন্ত হিজড়াদের যৌন কার্যকলাপ বর্ণনা করতে ব্রিটিশ গবেষকরা 'সমকামী' (Homosexual) শব্দ ব্যবহার করেননি। হিজড়া সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ ছিল খোজা, যারা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায় না,

কিন্তু ধর্মীয় আচার অনুযায়ী পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলার রীতি ছিল। খোজা-হিজড়াদের যৌন সম্পর্ক বর্ণনা করতে গবেষকরা 'অপ্রাকৃতিক অপরাধ' (Unnatural crime) এবং 'মলদ্বারকাম' বা 'পায়ুকাম' (Sodomy) শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'অস্বাভাবিক পতিতাবৃত্তি' (Unnatural prostitution) এবং 'পেশাদার পায়ুকামী' (Professional sodomy)-এর মতো পতিতাবৃত্তিজাত শব্দও ব্যবহার করা হতো। যদিও এই শব্দগুলোতে অসমকামী কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে সেগুলো মূলত পুরুষ-পুরুষ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। ঔপনিবেশিক গবেষকরা হিজড়াদের পরোক্ষভাবে 'পুরুষ' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেন, যদিও তারা নিজেদেরকে নারী হিসেবে পরিচয় দেয়—যা তাদের সেক্সুয়াল পার্টনারদের থেকে ভিন্ন লিঙ্গ-পরিচয় বহন করে[৮]।

ব্রিটিশ চিকিৎসকরা গবেষণায় দেখতে পান, ইন্টারসেক্সদের (Natural-born eunuch) দেখতে এবং তাদের চলন-বলনে মেয়েদের সাথে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ ছেদনকারী (নকল হিজড়া—উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের সংজ্ঞানুযায়ী) হিজড়াদের শারীরিকভাবে ইন্টারসেক্সদের তুলনায় অনেক বেশি পুরুষালি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

Criminal Tribe Act 1871 আইনটি পুলিশকে হিজড়াদের ওপর আরও বেশি নজরদারি বাড়ানোর ক্ষমতা দিয়েছিল। পুলিশ হিজড়াদের ব্যক্তিগত তথ্যসহ তাদের জন্য স্পেশাল রেজিস্টার (Surveillance system) তৈরি করে। কেননা তারা হিজড়াকে অপরাধী এবং যৌনগতভাবে বিচ্যুত ব্যক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করত। এই নজরদারির উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন সংখ্যায় না বাড়তে পারে এবং ক্রমশ তাদের বিলুপ্তি ঘটে। পুলিশ হিজড়াদেরকে মহিলাদের পোশাক পরা, গয়না ব্যবহার করা বা জনসমক্ষে পারফর্ম করতে বাধা দিত। যদি তারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করত, তবে তাদের জরিমানা বা কারাগারে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো। এমনকি তাদের লম্বা চুল কেটে দেওয়া হতো। হিজড়াদের সাথে বসবাসকারী শিশুদের 'অপমানজনক জীবন থেকে উদ্ধার' করার নামে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতো। যদি কোনো হিজড়া ছেলে শিশুদের সাথে বসবাস করত, তবে তাদের জরিমানাসহ কারাগারে নেওয়া হতো[৮]।

১৮৮৪ সালে সমকামিতা অপরাধ আইনের (৩৭৭) অধীনে একজন বেনামি হিজড়াকে অভিযুক্ত করা হয়। এটি Queen-Express v. Khairati কেইস নামে পরিচিত। সেখানে চার মাস আগে সমকামিতায় জড়িত হওয়ার পাশাপাশি

সন্দেহজনক সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করা হয়। ট্রায়াল কোর্টে সমকামিতায় অভ্যস্ত হওয়ার তৎকালীন ক্যাটামাইট টেস্ট (*...the distortion of the orifice of the anus into the shape of a trumpet...*) প্রমাণ হিসেবে উপস্থান করা হয়। পরবর্তী সময়ে উচ্চ আদালত সময়, অপরাধ করার স্থান এবং সুনির্দিষ্ট পরিচয়ের অভাবে মামলাটিকে খারিজ করে দেন[৯]।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে পায়ুকামকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৮৯৭ সালে ৩৭৭ ধারার আইনটি সংশোধন করে একটি ধারা যুক্ত করা হয়; যেখানে হিজড়াদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা, ব্রিটিশরা হিজড়াদের যৌন-আচরণকে সমকামী আচরণ হিসেবে দেখত[৯]।

> *"The 1897 amendment-subtit'led "An Act for the Registration of Criminal Tribes and Eunuchs"-linked "eunuch" identity to Section 377.*

ব্রিটিশরা হিজড়াদের আচরণকে অসহনীয় মনে করত, একইভাবে ব্রিটেনেও এই ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য ছিল। পায়ুকামের বিরুদ্ধে আইনটি ঔপনিবেশিক যুগের আইন। তাই সংজ্ঞা অনুসারে এ আইন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রোডাক্ট। কিন্তু এই যুক্তি কি ঔপনিবেশিক যুগের আইনকে ভুল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়া

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক ধারণার প্রতিচ্ছবি হিসেবে, ২০১৩ সালে গৃহীত সরকারি নীতিতে হিজড়াদের লিঙ্গ প্রতিবন্ধী (যা জেনেটিক বা হরমোনাল ত্রুটিজনিত হতে পারে) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এবং ভারতের সাধারণ জনগণও এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করে[৮], [১০]। তবে, পশ্চিমা একাডেমিশিয়ান এবং দেশীয় এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা হিজড়াদের সংজ্ঞা পাল্টে তাদেরকে 'সংস্কৃতি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যেখানে জন্মগত লিঙ্গত্রুটির বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। এই আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী, যে-কেউ হিজড়া হতে পারে যদি তারা হিজড়া সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ:

* দলবদ্ধ জীবনযাপন: হিজড়া সম্প্রদায়ের গুরু মায়ের অধীনে চ্যালা হিসেবে দলবদ্ধভাবে বসবাস করা।

* হিজড়াগিরি: মেয়েদের পোশাক পরে নাচ-গান করা (বাদাই), এবং ট্রেন, বাস, বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বখশিস হিসেবে অর্থ উপার্জন করা।
* বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ: গ্রাম বা শহরের বিয়েতে গিয়ে উপস্থিত লোকদের বিনোদন দেওয়া, বর-কনেকে আশীর্বাদ (বিয়ে তোলা) করে সম্মানি বখশিস নেওয়া।
* শিশুর জন্মের সময় আশীর্বাদ: নবজাতকের খবর পেলে সেখানে গিয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ করা (যা 'সাকরাও' নামে পরিচিত)।
* যৌনকর্ম: যৌনকর্মের মাধ্যমে উপার্জন করা, এবং এই ক্ষেত্রে ঢেরায় না থেকেও হিজড়া-গুরুকে এলাকাভিত্তিক চাঁদা প্রদান করা।
* হাততালি দেওয়ার বিশেষ প্রথা: বিভিন্ন অনুভূতি (যেমন- রাগ, ক্ষোভ, বা অস্তিত্ব প্রকাশ) জানাতে বিশেষ ধরনের 'হাততালি' দেওয়া, যা প্রায় ২০০০ বছর ধরে প্রচলিত।

এই সংস্কৃতি ও জীবনের ধারা হিজড়া সম্প্রদায়কে ঐতিহ্যগত ও সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে আসছে।

দেশের হিজড়া-দলে কারা বাস করে?

দেশে পশ্চিমা আর্থিক সহায়তায় হিজড়াদের কেন্দ্র করে এইচআইভি প্রতিরোধ, গবেষণা এবং এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে সম্মিলিতভাবে *হিজড়া শব্দকোষ* নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইয়ের তথ্য অনুসারে, হিজড়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণির বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

আকুয়া (ট্রান্সজেন্ডার): এই দলে এমন পুরুষরা অন্তর্ভুক্ত যারা নারী সাজতে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে নারী হিসেবে কল্পনা করে মানসিক তৃপ্তি পায়। আকুয়াদের 'হিজড়া' বলা হয়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, অনেক আকুয়া হিজড়াকে লিঙ্গ রূপান্তরকামী (ট্রান্সউইম্যান) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা শুধু বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরার মাধ্যমে আনন্দ পায় না, বরং নিজেদের লিঙ্গও পরিবর্তন করে পরিপূর্ণ নারীত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়।

জেনানা (ট্রান্সজেন্ডার): জেনানারা মেয়েদের সাজে সজ্জিত পুরুষ, তবে এদের আকুয়া বলা যায় না, কারণ তারা নারী বেশে মানসিক সুখ লাভ করে না; বরং কিছু

সুবিধা ভোগের জন্য হিজড়া সম্প্রদায়ে যোগ দেয়। জেনানা হিজড়ারা দুই ধরনের হতে পারে: (ক) পৌরুষহীন জেনানা এবং (খ) যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন জেনানা। এরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ পুরুষ এবং অনেকের স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। কিছু জেনানা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিজড়া সম্প্রদায়ে পেশা বা আয়ের জন্য যোগ দেয়। এছাড়া অনেক অনাথ ছেলে-শিশু—যারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বা ইন্টারসেক্স নয়—হিজড়া পাড়ায় বেড়ে উঠলে স্থায়ীভাবে 'ভেজাল' বা 'ফেইক' হিজড়া তথা জেনানা হিজড়া হিসেবে পরিচিতি পায়।

নারী সদস্য (ছিবড়ি): পুরুষকেন্দ্রিক হিজড়া সম্প্রদায়ে কিছু নারী সদস্যও থাকে, যাদের শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি নেই। এদেরকে ছিবড়ি বলা হয় এবং তারা সাধারণত অর্থনৈতিক কারণে হিজড়া দলে যোগ দেয়। অধিকাংশ ছিবড়ি বিবাহিত হলেও স্বামী পরিত্যক্তা এবং তারা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে হিজড়া ঢেরায় বসবাস করে, এমনকি কেউ কেউ সন্তানসহ বসবাস করে।

ছিন্নি (ট্রান্সজেন্ডার নারী): ছিন্নিরা পুরুষাঙ্গ কর্তন করা খোজা-হিজড়া। এরা রূপান্তরকামী (ট্রান্সউইমেন) হিজড়া যারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণ নারী হিসেবে কল্পনা করে এবং কেউ কেউ হরমোন থেরাপি বা সার্জারির মাধ্যমে শারীরিক রূপান্তর ঘটায়। তাদের মধ্যে এমন মানসিকতা থাকতে পারে, যা পুরুষাঙ্গের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করার বিকৃত চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে। ছিন্নিরা হিজড়া মহল্লায় বসবাস না করলে হিজড়া পরিচয় নিতে পারে না। অনেক সময় জোরপূর্বক লিঙ্গচ্ছেদের ঘটনাও ঘটে, যেখানে ছেলে-শিশু, কিশোর এবং যুবকদের অপহরণ করে তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে স্থায়ীভাবে হিজড়াতে পরিণত করে এবং তাদের দিয়ে ব্যবসা করানো হয়।

ইন্টারসেক্স : হিজড়া পল্লিতে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বা আন্তঃলিঙ্গের মানুষের সংখ্যা খুবই বিরল[১১]।

হিজড়া স্বীকৃতির সরকারী প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক এই বিষয়টি সরাসরি 'হিজড়া শব্দকোষ' নামক বই (পৃষ্ঠা ১৬০-১৬৪) থেকে উপস্থাপন করছি। এখানে তারা সরকারী রেফারেন্সের ওপর ভিত্তি করে ডকুমেন্টেশন করেছে।

"২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে হিজড়াদের বিষয়ে কিছু কাজ শুরু হয়। তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব এনামুল হক মোস্তফা শহীদ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য একটি নতুন ভাবনা উন্নয়নের জন্য একটি ব্যতিক্রমী প্রকল্প গ্রহণ করেন। এরপর হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি জরিপ কাজ শুরু হয় । সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এই জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা প্রায় ৯২৮৫ জন। ওই সময়ে যেসকল এনজিও হিজড়াদের নিয়ে কাজ করছিল তাদের কাছ থেকেও হিজড়াদের জীবনধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। তাদেরকে কীভাবে মূল ধারায় আনা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা এবং হিজড়াদের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে কয়েকটি স্টেকহোল্ডার মিটিং করা হয়। সেসময় হিজড়া প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায়, তারা হিজড়া নামে কোথাও কোনো কিছু করতে পারে না। হিজড়া হিসেবে তাদের কোন স্বীকৃতি নেই । তাদের পাসপোর্ট বা ভোটার আইডি কার্ড করার ক্ষেত্রে তাদেরকে নারী বা পুরুষ লিখতে হয়। যেহেতু হিজড়াদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো স্বীকৃতি ছিল না, সেহেতু হিজড়া হিসেবে তাদের পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে এই সংকট ছিল ।

তখন এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে মন্ত্রণালয়ে একটি সারসংক্ষেপের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ তাদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী-এর কোনোটিতেই নিজেদের লিঙ্গ স্বীকৃতি চাচ্ছিল না। তারা নিজেদেরকে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেছে এবং সেভাবেই তাদের দাবি উত্থাপন করে। হিজড়াদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় থেকে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করে স্বীকৃতি প্রদান-

সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি ২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি, রবিবার বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।' *তথ্যসূত্র : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*

হিজড়া চিহ্নিতকরণের সরকারী নীতি

'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকৃত হিজড়া চিহ্নিতকরণের বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে উঠে। অনেকেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদেরকে হিজড়া বলে পরিচয় দেয়। অনেকের স্ত্রী সন্তান থাকা সত্ত্বেও নিজেদের পরিচয় গোপন করে হিজড়া বেশ ধারণ করে, নেতা সেজে অন্যান্য হিজড়াদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বা অনৈতিক কাজ করিয়ে তাদেরকে শোষণ করে। তাদের কাছ থেকে নিয়মিত বখরা আদায় করে নিজেরা লাভবান হয়। এ অবস্থার নিরসনের লক্ষ্যে প্রকৃত হিজড়াদের সনাক্তকরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট মাঠ পর্যায়ে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী হিজড়াদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপযুক্ত হিজড়াদের সনাক্তকরণ, ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব হিজড়াদের বিশেষ ভাতা প্রদান কার্যক্রম এবং বিভিন্ন স্তরের হিজড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বিতরণের নিমিত্তে উপজেলায়, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের মাধ্যমে ডাক্তারি পরীক্ষা করে প্রকৃত হিজড়াদের সনাক্তকরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশাসন-কর্তৃক মাঠপর্যায়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাসহ পত্র প্রেরণ করা হয়। যদিও অনেক হিজড়াদের এই ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

হিজড়াদের অনেকেই অভিযোগ করেন ডাক্তারি পরীক্ষাকালে অনেক সময় তাদেরকে অশালীন আচরণ ও মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। তারা এর সম্মানজনক সুরাহা চান। কিন্তু হিজড়া নিবন্ধন ছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

থেকে প্রকৃত হিজড়াদের তালিকা প্রণয়ন করা কার্যত সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ডাক্তারি পরীক্ষার পর সনাক্তকৃত হিজড়াদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনসহ প্রত্যেককে একটি পরিচয়পত্র দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃত হিজড়াগণ তাদের জন্য সরকার প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এই পরিচয়পত্র তাদের পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। *তথ্যসূত্র : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*"

মিডিয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী হিজড়াদের তথ্য-উপাত্ত

ঢাকায় ৯০ ভাগই নকল হিজড়া

পুলিশ জানিয়েছে, সজনি হিজড়া তার মতো আরও ৭ থেকে ৮ জনকে নিয়ে তৈরি করেন নকল হিজড়া গ্রুপ। রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তাঘাট, বাসাবাড়ি, দোকানপাট থেকে শুরু করে যেখানে-সেখানে টাকার জন্য মানুষকে নাজেহাল করছিলেন তারা। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, "রাজধানীতে নব্বই ভাগই নকল হিজড়া। শুধু রাস্তায় বা বাসায় চাঁদাবাজি নয়, অপহরণের মাধ্যমেও সোহাগের চক্রটি হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা। এমনকি চাঁদাবাজির টাকা চড়া সুদে খাটানোরও প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা"[১২]।'

১৫ বছর ধরে পুরুষদের হিজড়া বানাতেন ভুয়া ডাক্তার হাদিউজ্জামান[১৩]

'পিবিআই ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার কুদরত-ই-খুদা বলেন, ঘটনার অনুসন্ধানে নেমে দেখা যায়, সমাজে হিজড়া হিসেবে পরিচিতদের ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশই ভুয়া। এদের মধ্যে তিনটি ধরন রয়েছে। একটি হলো হরমোন ইনজেকশন ও অন্যান্য ওষুধ দিয়ে পুরুষ থেকে নারীস্বভাবে রূপান্তর করা। আরেকটি ধরনের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষের গোপনাঙ্গ বাদ দেয়া এবং নারীসুলভ শারীরিক গড়ন তৈরি করা হয়। আর কিছু ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ও ওষুধ-ইনজেকশন দুই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। এর বাইরে থাকা ৫ থেকে ১০ শতাংশ হয়তো জন্মগতভাবেই হিজড়া। পিবিআই এর অনুসন্ধান বলছে, গ্রেপ্তারের পর চম্পা ওরফে স্বপ্না জানিয়েছেন, তিনি একজন স্বাভাবিক পুরুষ ছিলেন। তার নাম ছিল নওশাদ মিয়া।

তার ১২ বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিষণ্ণতায় ভুগতে থাকেন আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এবং কর্মবিমুখ হয়ে বেকার জীবনযাপন করেন। ওই সময় দেলু হিজড়ার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দেলু প্রকৃতপক্ষে হিজড়া নন, তিনি স্বাভাবিক পুরুষ। হিজড়া সেজে নানা অপকর্ম করেন। তিনি নওশাদকে হিজড়া হওয়ার প্রস্তাব দেন। দেলু জানান, হিজড়া হলে তিনি সহজে অনেক টাকা আয় করতে পারবেন। সেই সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তিতে দিনযাপন করতে পারবেন। তার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নওশাদ হিজড়াদের দলে যোগ দেন।'

হিজড়া শনাক্তকরণে মেডিক্যাল টেস্ট

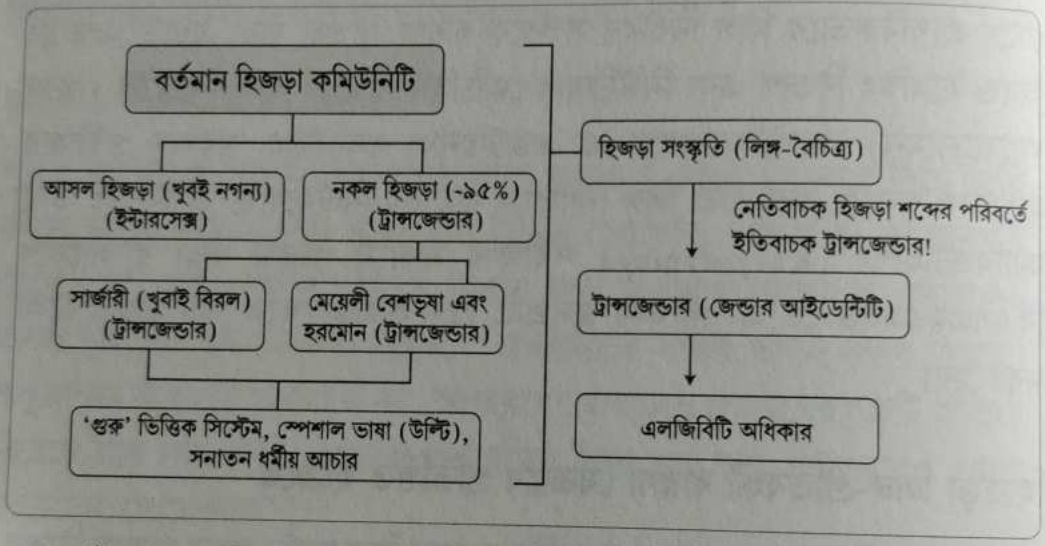
ডাক্তারি পরীক্ষায় বাহ্যিকভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও গড়ন দেখে প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া এক্স-রে অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগ এবং নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগে সম্পূর্ণ পেটের (হোল অ্যাবডোমেন) আলট্রাসনোগ্রাম ও এক্সটারনাল জেনিটাল অরগান পরীক্ষার মাধ্যমেও শনাক্ত করা যায়। লিঙ্গ নির্ধারণে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত তথ্য ক্যারিওটাইপিং (Karyotyping) পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিএসএমএমইউ-তে এ পরীক্ষায় জনপ্রতি তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়।

হিজড়া লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী ধারণা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

ধর্মীয় আচার হিসেবে বাহুচুরা মাতা দেবীর সম্মানে লিঙ্গ কর্তন করার মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন (আশীর্বাদ ও অভিশাপ) করার প্রেক্ষাপট থেকে হিজড়া কালচারের উৎপত্তি। কিন্তু কালের বিবর্তনে এই সংস্কৃতিতে অন্যান্য সামাজিক অনুষঙ্গ (ভেজাল) মিশ্রিত হতে থাকে। কোনো পরিবারে লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী (ইন্টারসেক্স) পুত্রসন্তান জন্ম নিলে সামাজিকভাবে অবজ্ঞার শিকার হওয়ার ভয়ে পিতামাতারা সচরাচর গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। হিজড়ারা এই শিশুসন্তানের খবর পেলে সেখানে সদলবলে ছুটে যায় এবং সন্তানটিকে জোর করে বা বুঝিয়ে নিজেদের আয়ত্তে নিতে চেষ্টা করে। এমনও ঘটনা ঘটেছে, ইন্টারসেক্স শিশু জন্ম নিলে দারিদ্রতা ও সামাজিক লোকলজ্জার কারণে পিতামাতা নিজ থেকেই সেই সন্তানকে হিজড়া-ঢেরায় রেখে আসতেন। এখন এটি নেই বললেই চলে।

বায়োলজিক্যাল ত্রুটি নিয়ে জন্মানো শিশুদের যেখানে আরও বেশি যত্ন ও

ভালোবাসা দেওয়া দরকার, সেখানে সেই সমস্ত শিশুদের এমন অমানবিক অবস্থা সমাজের মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানসিক ক্ষত সৃষ্টি করে। বয়ঃসন্ধির সময় বায়োলজিক্যাল ত্রুটির কারণে ছেলে হিসেবে বেড়ে ওঠা কিশোর মেয়েলি আচরণ প্রকাশ করতে পারে। অসচেতনতা এবং দরিদ্রতার কারণে অনেকের চিকিৎসার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করার সুযোগ থাকে না। যার ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অবহেলা এবং অবজ্ঞা করার কারণে এই কিশোররা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে; অবশেষে হিজড়া-দলে আশ্রয় খুঁজে নেয়। এসব কারণে এই উপমহাদেশে হিজড়া বিষয়টা লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী ধারণা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তা যুক্তিযুক্তও বটে। পশ্চিমা সমকামিতা মুভমেন্ট একটি পলিটিক্যাল কনসেপ্ট, যা নিয়ে এই অঞ্চলের সাধারণ জনগণ অবগত নয়।



হিজড়া সংস্কৃতির ব্যানারে বাংলাদেশে সমকামিতা/ট্রান্সজেন্ডার স্বীকৃতির দাবী

হিজড়া সংস্কৃতির অবসান কি মানবাধিকার কর্মীরা চায়?

অনেক মানবাধিকারকর্মী সমকামিতা-অপরাধ-আইনকে ঔপনিবেশিক আইন বলে চালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এমন যুক্তি দাঁড় করায় যে, নপুংসকরা (হিজড়া) কার্যত পুরো ইতিহাসজুড়েই ছিল এবং দক্ষিণ এশিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং, হিজড়াদের (যদিও সকল হিজড়াই নপুংসক নয়) ব্যানারে ট্রান্সজেন্ডারদের অবশ্যই সমাজে গ্রহণ করতে হবে। এই যুক্তিকে খণ্ডন করা খুবই সহজ। মানব ইতিহাসে অনেক কিছুই বিদ্যমান ছিল, যেমন- মাদকদ্রব্য, ব্যভিচার, সমকামী আচরণ; কিন্তু কোনো কিছুর ইতিহাসে অস্তিত্ব থাকা মানে সেই কাজকে বৈধতা প্রদান করে না।

এই ধরনের যুক্তি দিয়েই আজ 'Woke culture' তথা এলজিবিটি কালচারের বাস্তবতা আমাদের ওপর জেঁকে বসেছে।

যেসকল 'মানবতাবাদী' অ্যাক্টিভিস্টরা মানুষের অধিকার নিয়ে সোচ্চার, তারাই আবার হিজড়া এবং তাদের জীবনপদ্ধতির সমর্থন যোগায়, যেখানে তাদেরকে বাধ্য হয়ে গুরুর দাসত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে—সমাজ যদি হিজড়াদের গ্রহণ করে, তবে তাদের চাকুরি পাওয়া সহজ হবে। ফলে নাচানাচি, পতিতাবৃত্তির দিকে ধাবিত হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে কি তারা তাদের গুরুর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে? যেখানে হিজড়া-দলে যোগ দেওয়ার পূর্বশর্তই হলো গুরুর আনুগত্য মেনে নেওয়া।

ইন্টারসেক্স (জন্মগত হিজড়া)

কোনো শিশু জন্মগ্রহণের সুসংসবাদ শোনার পর আমরা সচরাচর জানতে চাই—সে 'ছেলে না মেয়ে?' (Is it a boy or girl?)। একটি শিশুর ছেলে বা মেয়ে হওয়া তার পিতামাতার মিলনের সময়েই নির্ধারিত (Sex determined) হয়ে যায়। বাবা থেকে আসে শুক্রাণু (Sperm) আর মা থেকে আসে ডিম্বাণু (Oocyte)। ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু মিলিত হয়ে (Fertilization) জাইগোট তৈরি হয় এবং এই একটিমাত্র কোষ থেকে মাতৃগর্ভে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হয়ে পূর্ণাঙ্গ ছেলে বা মেয়ে হিসেবে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে।

জেনেটিক পর্যায়ে শুক্রাণু বহন করে X অথবা Y ক্রোমোজোম। অন্যদিকে ডিম্বাণু শুধু X ক্রোমোজোম বহন করে। ক্রোমোজমের বিন্যাস XY হলে শিশুটি হবে ছেলে এবং XX হলে শিশুটি হবে মেয়ে। ছেলেমেয়ের এই লিঙ্গ নির্ধারণ সিস্টেমকে বাইনারি বলা হয়। কেননা এতে শুধু দুটি অপশন রয়েছে। এটি বায়োলজিক্যালি বা প্রকৃতিগতভাবে খুবই সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত সিস্টেম। জন্মের সময় ৯৯.৯৮% ক্ষেত্রে হয় ছেলে, নয়তো মেয়ে। ব্যতিক্রম হিসেবে XY বা XX ক্রোমোজোমের বিন্যাস ঠিক থাকার পরও জিনগত ত্রুটির (মিউটেশন) কারণে ছেলে এবং মেয়েদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যে হেরফের হতে পারে[১৪]।

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক গঠন এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে দুটো হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলোকে সেক্স হরমোন বলা হয়। ছেলেদের শারীরিক গঠন ও যৌনতা বিকাশে অ্যান্ড্রোজেন এবং নারীদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন হরমোন দায়ী। এই দুটো হরমোনের পরিমাণগত পার্থক্য হলে ছেলে এবং মেয়েদের বৈশিষ্ট্যগত আংশিক বা পুরোপুরি উলটপালট (ছেলেকে দেখতে মেয়ের মতো, আবার মেয়েকে দেখতে ছেলের মতো) হয়ে যেতে পারে। যেসমস্ত শিশুদের জেনোটাইপের (XY ও XX chromosome) সাথে সাথে ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য (বাহ্যিকভাবে ছেলেমেয়েদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো খালি চোখে বোঝা যায়) তথা বহিঃযৌনাঙ্গের (External genitalia) অসামঞ্জস্য (অমিল) থাকে, তাদেরকে প্রকৃত ইন্টারসেক্স বা 'উভয় লিঙ্গ মানব' বলা হয়। এগুলো খুবই বিরল ঘটনা। জিন বা হরমোনগত ত্রুটির কারণে আরও বিভিন্ন ধরনের যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ইন্টারসেক্স অবস্থা কখন শনাক্ত করা যায়?

যেসব শিশুর অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তাদের ক্ষেত্রে 'ইন্টারসেক্স অবস্থা' জন্মের পরপরই শনাক্ত করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো বয়ঃসন্ধি তথা পিউবার্টির সময় প্রকাশ পেয়ে থাকে। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে ২০-২৫ বছর পরেও দেখা দিতে পারে[১৪]। সমস্যা হলো, ছোটবেলা থেকে কোনো শিশু ছেলে বা মেয়ে হিসেবে বড় হতে হতে বয়ঃসন্ধিকালের সময় হরমোনগত পরিবর্তনের কারণে কখনো বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য তার মাঝে চলে আসতে পারে। এক্ষেত্রে 'ইন্টারসেক্স মানুষ' বাহ্যিকভাবে দেখতে পুরোপুরি নারী বা পুরুষের মতো হলেও সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা তার থাকে না। এমনকি এই সময়ে তাকে সামাজিক অসচেতনতার কারণে 'লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হওয়ার ধাক্কা মেনে নিতে অনেক বেগ পেতে হয়; অনেকে সামাজিকভাবে অবজ্ঞার শিকারও হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রায়ই মূলধারার মিডিয়াতে এই ধরনের ঘটনাগুলো নিয়ে শিরোনাম হতে দেখা যায়। তবে ইদানীংকালে এই বিষয়ে এমনভাবে প্রতিবেদন ছাপানো হতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলো পাঠ করে একজন সাধারণ মানুষ 'ইন্টারসেক্স' ও 'ট্রান্সজেন্ডার' বিষয় দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যেকোনো শারীরিক বা মেডিক্যাল সমস্যার (যেমন- হরমোনের কমবেশি হওয়া) কারণে কেউ কখনো ট্রান্সজেন্ডার হয় না; এই ব্যাপার পুরোটাই মানসিক ইস্যু। খেয়াল করলে দেখবেন, এই ইন্টারসেক্স হওয়ার ঘটনাগুলো বয়ঃসন্ধির সময়কালে ঘটে, যখন একজন মানুষের সেক্স হরমোন তৈরি হওয়া শুরু হয়।

অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম (AIS)

এটি একটি ইন্টারসেক্স অবস্থা। এ ধরনের শিশুরা জিনগতভাবে পুরুষ (XY) হলেও তারা দেখতে অবিকল মেয়েদের (XX) মতো। তাদের বহিঃযৌনাঙ্গ (যোনি ও ক্লাইটোরিস) থাকলেও তাদের জরায়ু (যেখানে গর্ভস্থ শিশু বড় হয়) ও ডিম্বাশয় থাকে না। এ কারণে বয়ঃসন্ধির বয়স পার হয়ে গেলেও তাদের মাসিক (Menstruation) হয় না। এমতাবস্থায় তারা যখন চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন, তখনই এই সমস্যার কথা প্রথম জানতে পারেন। অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর (Androgen receptor) নামক একটি জিনে ত্রুটির কারণে তাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন (ছেলেদের হরমোন) কাজ করতে পারে না। বিষয়টি তালা-চাবির

মতো কল্পনা করলে আমাদের জন্য অনুধাবনে আরও সহজ হতে পারে। যেমন চাবি (হরমোন) থাকলেও তালা (অ্যান্ড্রোজেন রিসিপ্টর) অকেজো থাকে।

অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম (AIS) অপেক্ষাকৃত বিরল একটি রোগ। কমপ্লিট অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম (AIS) রোগটি প্রতি ২০ হাজার থেকে ৬৪ হাজার নবজাতক পুরুষ শিশুর একজন নিয়ে জন্মাতে পারে[১৫]। প্রসঙ্গত আমার পিএইচডি গবেষণার একটি প্রজেক্ট ছিল জেব্রাফিশ (ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল অর্গানিজম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)-এর অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর ক্লোনিং করে জেনেটিক এবং বায়োকেমিকেল এনালাইসিস করা[১৬]।



Photo: @JUNI KRISWANTO @Francois Nel, @rivergallo on Instagram

বাইরে একদম নারীর মত মনে হলেও তারা পুরুষ!
Androgen Insensitive Syndrome (AIS)

কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH)

১৮৬৫ সালে ইতালির অধ্যাপক লুইজি দে ক্রেচিও (Luigi De Crecchio) প্রথম জন্মগত অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া—সংক্ষেপে CAH—রোগীর বর্ণনা করেন[১৭]। জিউসেপ্পে মার্জো নামে এক পুরুষ ৪০ বছর বয়সে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। লাশের ময়নাতদন্ত করার সময় তিনি জরায়ু ও ডিম্বনালি দেখে বিস্মিত হন। লোকটির অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডও বড় ছিল। রোগীর ছয় সেন্টিমিটার লম্বা পেনিস ছিল, কিন্তু অণ্ডথলিতে অণ্ডকোষ ছিল না। জন্মের সময় তাকে মেয়ে হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল, কিন্তু ৪ বছর বয়সে তাকে ছেলে বলে পুনর্বিবেচনা করা হয়। প্রাপ্তবয়সে জিউসেপ্পে এক মেয়ের প্রেমে পড়েন। কিন্তু তিনি যখন তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব

দেন, তখন জন্ম নিবন্ধনের সার্টিফিকেটে তার নাম জিউসেপিনা দেখে মেয়েটি পালিয়ে যায়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, জিউসেপ্পে মনের দুঃখে মারা গিয়েছিলেন।

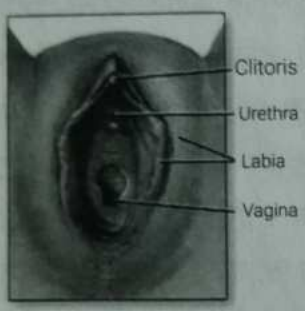
কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া একটি জিনগত রোগ, যা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলো কিডনির ওপরে অবস্থিত। এগুলো এমন কিছু হরমোন উৎপাদন করে, যেগুলো শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রায় ৯৫% CAH কেইসের সাথে ২১-হাইড্রোক্সিলেজ (Enzyme 21-hydroxylase) জিনে মিউটেশন হলে শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পুরুষালি হরমোন (অ্যান্ড্রোজেন) নিঃসরণ হয়।[১৮]

তিন ধরনের CAH অবস্থা তৈরি হতে পারে। এর দুটির একটি হলো 'ক্লাসিক CAH', যা সল্ট-ওয়েস্টিং (salt-wasting) নামে পরিচিত, অন্যটি 'সিম্পল ভিরিলাইজিং CAH'। এর তৃতীয় আরেকটি প্রকারকে 'নন-ক্লাসিক CAH' বলা হয়। ২১-হাইড্রোক্সিলেজ ঘাটতির কারণে যেকোনো ক্লাসিক ফর্মের ছেলেমেয়েদের সাধারণত প্রাথমিক বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় সাধারণত তারা খর্বকায় হতে পারে। তা ছাড়া এ ধরনের সমস্যার কারণে সন্তান-ধারণ-ক্ষমতা কমে (Infertility) যেতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে মুখ, বুক ও পিঠে পুরুষদের মতো চুল বা লোম উঠতে শুরু করে, যা হারসুটিজম (Hirsutism) নামে পরিচিত; আবার টাকও পড়তে পারে। অ্যান্ড্রোজেন নামক পুরুষ হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা দেয়। কারও কারও অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাবও হতে পারে। এই ধরনের লক্ষণের সাথে মেয়েদের পলিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (POCS)-এর সাথে মিল রয়েছে।

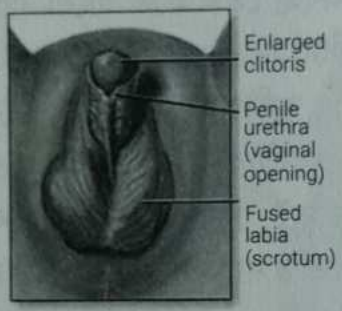
ক্লাসিক ২১-হাইড্রোক্সিলেজ ঘাটতিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রায় ৭৫ শতাংশের ক্ষেত্রে লবণ-ক্ষয়কারী (salt wasting) ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম হারায়, যা শৈশবকালে জীবননাশক হতে পারে। লবণ-ক্ষয়কারী ধরনের শিশুরা সচরাচর দুর্বল হয়, ওজন কমে যায়। তা ছাড়া ডিহাইড্রেশন এবং বমি অনুভব করতে পারে। সিম্পল ভিরিলাইজিং CAH-এর ক্ষেত্রে তেমন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, তারা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করে।

নন-ক্লাসিক CAH-এর ক্ষেত্রে ২১-হাইড্রোক্সিলেজ এনজাইম তৈরি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে মেয়েদের বয়ঃসন্ধির সময় অ্যান্ড্রোজেন (পুরুষ হরমোন)

মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে সেই মেয়েতে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে পারে, যেমন- ছেলেদের মতো শারীরিক গঠন, কণ্ঠস্বর সেই মেয়েতে দেখা দিতে পারে। নন-ক্লাসিক CAH-এর ক্ষেত্রে বিরল কিছু কেইসে মেয়েদের ক্লাইটোরিস অনেক বড় হয়ে যায়। তখন ছেলেদের পেনিসের (Penis) মতো দেখায় এবং লেবিয়া মেজরা (Labia majora) ফিউজড হয়ে শুক্রাশয় তৈরির অবস্থা তৈরি হতে পারে। তবে তাদের ভেতরে জরায়ু ও ডিম্বাশয় থাকে। অস্পষ্ট জেনিটালিয়ার কারণে এই ধরনের মেয়ে-শিশুকে পুরুষ হিসেবে বড় করা হয়। সার্জারি করে এটি কারেকশন করা যায়। অন্যদিকে ছেলেদের ক্ষেত্রে পেনিস স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট (Micro penis) হতে পারে।



স্বাভাবিক নারীর বাহ্যিক জননাঙ্গ





ইন্টারসেক্স (CAH) ভেতরে মেয়ে, বাইরে ছেলেরমত

কেইস স্টাডি : খুলনায় সার্জারির মাধ্যমে ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তর![১৯]

'ডা. নিরুপম মন্ডল শনিবার (১৩ মে) বিকেলে বাংলানিউজকে বলেন, ১৭ বছরের একজন ছেলেকে অপারেশন করে নারীতে রূপান্তর করা হয়েছে। কেননা তিনি ভেতরে জীনগতভাবে পুরুষ; কিন্তু বাইরে নারী। একজন নারীর যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা সবই রয়েছে তার। তার দুটো ব্রেস্ট আছে। সে দেখতে আকর্ষণীয় সুন্দরী। তার বড় বড় চুল আছে। কণ্ঠস্বর নারীর। তার চলন বলন, শরীরের গঠন, অঙ্গভঙ্গি সবই নারী। কিন্তু তার ভেতরটা পুরুষের মতো। পুরুষের অন্ডকোষ দ্বিখণ্ডিত করলে যেমন হয় তেমন রয়েছে। কিন্তু সেটা বাইরে নয় ভেতরে রয়েছে, পুরুষাঙ্গ রয়েছে। তার মাসিকের রাস্তা নেই, শরীরে ডিম্বাশয় থাকার কথা কিন্তু নেই, জরায়ু থাকার কথা ছিল কিন্তু নেই। ভেতরে ভেতরে সে একজন পুরুষ, বাইরে নারী। সামাজিকভাবে নারী হিসেবে বড় হয়েছে। ১৭ বছর বয়স হয়ে গেছে। এখন সে ও তার অভিভাবকরা চায় নারীতে রূপান্তরিত হতে। এটা করতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। ...প্রথমে আমরা তার পেনিস কেটে ফেলেছি। তাকে মাসিকের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছি। পেটের মধ্যে যে দুটি টেস্টিস ছিল তা অপারেশন করে

অপসারণ করেছি। আশা করি, এখন একজন নারীর জীবন যাপন করতে পারবে। কিন্তু একজন পূর্ণাঙ্গ নারীর জীবন পেতে হলে তো মাতৃত্বের স্বাদ পেতে হয়। এটা সে কোনোদিন পাবে না। এরপর তাকে আমরা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট দেব, যাতে সে একজন কোমল নারীতে পরিণত হবে। সে একজন নারীর যৌন জীবন পালন করতে পারবে; কিন্তু তার বাচ্চা হবে না।'

ইন্টারসেক্স বনাম ট্রান্সজেন্ডার: টিএমএসএস এনজিও প্রতিষ্ঠাতার গল্প

অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৩ সালে বগুড়া সদরের ঠেঙ্গামারা গ্রামে। তিনি একজন ছেলে হিসেবে বেড়ে উঠেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় ২৩ বছর বয়সে শারীরিক পরিবর্তন ঘটলে তিনি অপারেশনের মাধ্যমে ছেলে আব্দুস সামাদ থেকে নারী হোসনে-আরা বেগম হয়ে এক নতুন জীবন ধারণ শুরু করেন। তিনি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু আনসার আলী তালুকদারকে বিয়ে করেন। তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রফেসর আলহাজ আনসার আলী তালুকদার ও অধ্যাপিকা ড. হোসনে-আরা বেগমের সংসারে একমাত্র পুত্রসন্তান এম আলী হায়দার রয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দেশের তৃতীয় বৃহৎ এনজিও (TMSS) গড়ে তোলেন[২০]।

দেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ নিয়ে আলোচনায় অনেক ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট 'ছেলে থেকে মেয়েতে রূপান্তরিত হওয়া'-এর এই ঘটনাকে সুচতুরভাবে উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এক ধরনের নৈতিক সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ বাস্তবতা হলো, ১৯৭৫ সালে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বলে কিছুই ছিল না। এ আন্দোলন লাইমলাইটে আসে ৯০-এর দশক থেকে। ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বিশ্বের এলজিবিটি থিংকট্যাংকরা মিলিত হয়ে আন্দোলনের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে, যা 'Yogyarkarta Principles' হিসেবে পরিচিত[২১]। এই আলোচনায় ট্রান্সজেন্ডারের মতো চরমপন্থী ধারণাকে তারা এলজিবিটি আন্দোলনের সম্মুখসারিতে আনার সিদ্ধান্ত হয়। ২০১০ সালের পর থেকে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন মূলত বেগবান হওয়া শুরু হয়। তাই যারা ড. হোসেনে-আরা-বেগমকে ট্রান্সজেন্ডারের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন, তারা এই মতবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ। হতে পারে তারা জেনে-বুঝে প্রতারণার আশ্রয় নেন।

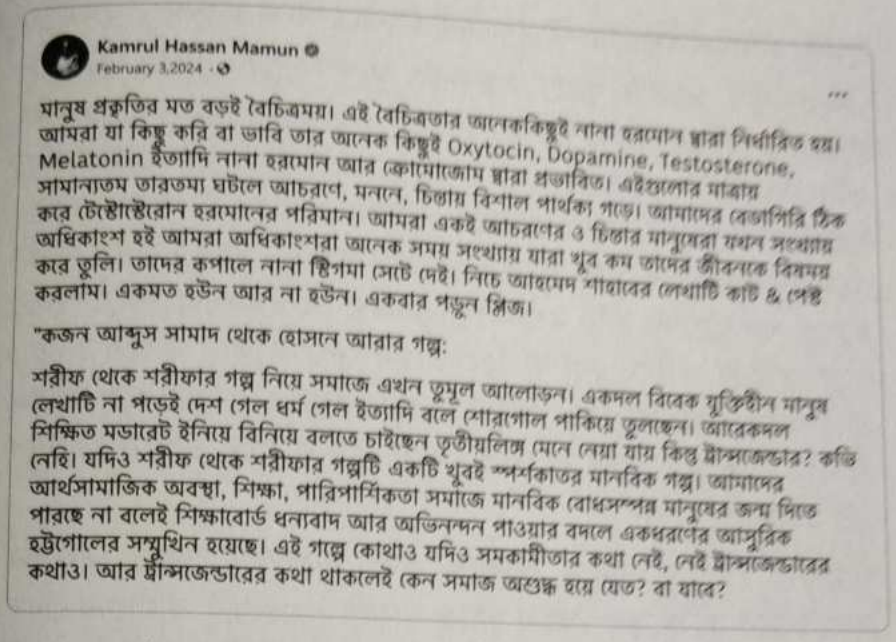
সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের প্রফেসর কামরুল হাসান মামুন

পাঠ্যপুস্তকে শরীফ-শরীফার বিতর্কে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি নৈতিক সমর্থন তৈরি করতে ড. হোসেন আরা-বেগম-এর ঘটনাটি উল্লেখ করে উনার ফ্যান-ফলোয়ারদের কনফিউজড করার চেষ্টা করেন। তিনি দেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মধ্যে সেলিব্রেটি ফেসবুকার। প্রফেসর মামুন সাহেবের ফেসবুক পোস্টটি উল্লেখ করছি, যেন পাঠকরা বুঝতে পারেন—কীভাবে তারা ভুল তথ্য দিয়ে ন্যারেটিভ তৈরি করেন :

'মানুষ প্রকৃতির মত বড়ই বৈচিত্রময়। এই বৈচিত্রতার অনেককিছুই নানা হরমোন দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা যা কিছু করি বা ভাবি, তার অনেককিছুই Oxytocin, Dopamine, Testosterone, Melatonin ইত্যাদি নানা হরমোন আর ক্রোমোজোম দ্বারা প্রভাবিত। এইগুলোর মাত্রায় সামান্যতম তারতম্য ঘটলে আচরণে, মননে, চিন্তায় বিশাল পার্থক্য গড়ে। আমাদের বেডাগিরি ঠিক করে টেস্টোস্টেরোন হরমোনের পরিমাণ। আমরা একই আচরণের ও চিন্তার মানুষেরা যখন সংখ্যায় অধিকাংশ হই, আমরা অধিকাংশরা অনেক সময় সংখ্যায় যারা খুব কম তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলি। তাদের কপালে নানা স্টিগমা সেটে দেই। নিচে আহমেদ শাহাবের লেখাটি কাট & পেস্ট করলাম। একমত হউন আর না হউন। একবার পড়ুন প্লিজ।

"একজন আব্দুস সামাদ থেকে হোসনে আরার গল্প:

শরীফ থেকে শরীফার গল্প নিয়ে সমাজে এখন তুমূল আলোড়ন। একদল বিবেক যুক্তিহীন মানুষ লেখাটি না পড়েই দেশ গেল, ধর্ম গেল ইত্যাদি বলে শোরগোল পাকিয়ে তুলছেন। আরেকদল শিক্ষিত মডারেট ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চাইছেন তৃতীয় লিঙ্গ মেনে নেয়া যায়; কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার? কভি নেহি। যদিও শরীফ থেকে শরীফার গল্পটি একটি খুবই স্পর্শকাতর মানবিক গল্প। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা সমাজে মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষের জন্ম দিতে পারছে না বলেই শিক্ষাবোর্ড ধন্যবাদ আর অভিনন্দন পাওয়ার বদলে এক ধরনের আসুরিক হট্টগোলের সম্মুখীন হয়েছে। এই গল্পে কোথাও যদিও সমকামিতার কথা নেই, নেই ট্রান্সজেন্ডারের কথাও। আর ট্রান্সজেন্ডারের কথা থাকলেই কেন সমাজ অশুদ্ধ হয়ে যেত? বা যাবে?



Kamrul Hassan Mamun
February 3,2024 ·

মানুষ প্রকৃতির মত বড়ই বৈচিত্রময়। এই বৈচিত্রতার অনেককিছুই নানা হরমোন দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা যা কিছু করি বা ভাবি তার অনেক কিছুই Oxytocin, Dopamine, Testosterone, Melatonin ইত্যাদি নানা হরমোন আর ক্রোমোজোম দ্বারা প্রভাবিত। এইগুলোর মাত্রায় সামান্যতম তারতম্য ঘটলে আচরণে, মননে, চিন্তায় বিশাল পার্থক্য গড়ে। আমাদের বেডাগিরি ঠিক করে টেস্টোস্টেরোন হরমোনের পরিমান। আমরা একই আচরণের ও চিন্তার মানুষেরা যখন সংখ্যায় অধিকাংশ হই আমরা অধিকাংশরা অনেক সময় সংখ্যায় যারা খুব কম তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলি। তাদের কপালে নানা ষ্টিগমা সেটে দেই। নিচে আহমেদ শাহাবের লেখাটি কাট & পেষ্ট করলাম। একমত হউন আর না হউন। একবার পড়ুন প্লিজ।

"কজন আব্দুস সামাদ থেকে হোসনে আরার গল্প:

শরীফ থেকে শরীফার গল্প নিয়ে সমাজে এখন তুমুল আলোড়ন। একদল বিবেক যুক্তিহীন মানুষ লেখাটি না পড়েই দেশ গেল ধর্ম গেল ইত্যাদি বলে শোরগোল পাকিয়ে তুলছেন। আরেকদল শিক্ষিত মডারেট ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চাইছেন তৃতীয়লিঙ্গ মেনে নেয়া যায় কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার? কভি নেহি। যদিও শরীফ থেকে শরীফার গল্পটি একটি খুবই স্পর্শকাতর মানবিক গল্প। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিপার্শিকতা সমাজে মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষের জন্ম দিতে পারছে না বলেই শিক্ষাবোর্ড ধন্যবাদ আর অভিনন্দন পাওয়ার বদলে একধরণের আসুরিক হট্টগোলের সম্মুখিন হয়েছে। এই গল্পে কোথাও যদিও সমকামীতার কথা নেই, নেই ট্রান্সজেন্ডারের কথাও। আর ট্রান্সজেন্ডারের কথা থাকলেই কেন সমাজ অশুদ্ধ হয়ে যেত? বা যাবে?

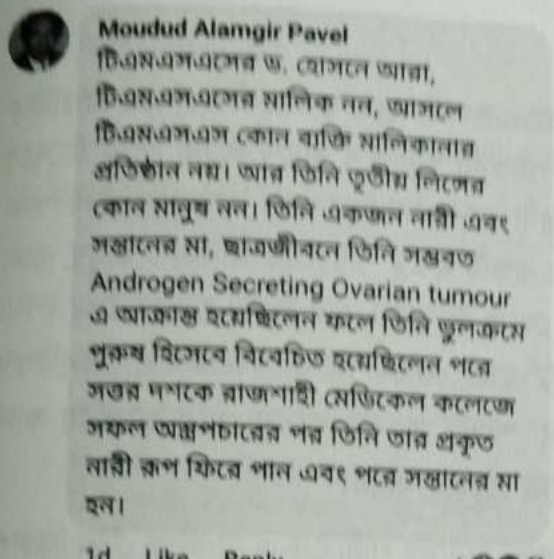
১৯৭৬ বা ৭৭ সাল হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, নাম আব্দুস সামাদ। একদিন নিজের মাঝে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন অনুভব করেন। পরিবর্তনটি শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই। এ পরিবর্তনের কথা লতিফ হলে অবস্থান করা তার সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন; ফলে পরামর্শ নিলেন একজন চিকিৎসকের। প্রাজ্ঞ সেই চিকিৎসক তার শরীরে ছোট্ট একটা সার্জারি করলেন। ব্যাস, আব্দুস সামাদ হয়ে গেলেন হোসনে আরা বেগম। এরপর লতিফ হলের আব্দুস সামাদকে হোসনে আরা হয়ে চলে যেতে হলো মন্নুজান হলে। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, সদ্য রূপান্তরিত হোসনে আরা বেগম একদিন ঘোষণা দিয়েই লাল বেনারসি পরে বিয়ে করে বসলেন সহপাঠী এক বন্ধুকে। উদারমনা বন্ধুটিও তাঁকে স্ত্রী হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীরা সেই অভূতপূর্ব বিয়েকে নেচে-গেয়ে উদযাপন করলেন। সেই রূপান্তর আর বিবাহের গল্প সেসময় পত্র-পত্রিকার খুব মুখরোচক এবং কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ হয়ে উঠেছিল। আমরা তখন প্রবল আগ্রহ নিয়ে সেই সংবাদ পড়েছি। সংবাদের ফলো আপ খোঁজার চেষ্টা করেছি।

না, সেই রূপান্তর বা ট্রেন্সজেন্ডারের ঘটনা নিয়ে তখন কেউ কোথাও কোনো ঘৃণা উগড়ে দিয়েছে বলে শোনা যায়নি। মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো মোল্লা একে ঘৃণ্য কাজ বলে সমালোচনা করেনি। অবশ্য মাদ্রাসায় তখন মোল্লারা থাকলেও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ছিল একেবারেই

দুর্লভ। অর্থাৎ বর্তমানের এই ঘৃণাজীবী জেনারেশনের তখনও জন্ম হয়নি। এবার বলুন, ভার্সিটি-পড়ুয়া সেই যুবক আব্দুস সামাদ সেদিন যদি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিচক্ষণ সিদ্ধান্তটি না নিতেন, যদি সেই নমস্য চিকিৎসক তাঁর সার্জারিটি না করতেন, যদি আব্দুস সামাদ তার পরিবর্তনের কথা সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করতেন (অবশ্য শেয়ার না করলেও চাল-চলন ও কথাবার্তার ধরন থেকেই তা প্রকাশিত হয়ে যেত) ফলাফল কী হতো? সহপাঠীদের ঠাট্টা মশকরা বুলিং-এর শিকার হয়ে ক্ষোভ লজ্জা ঘৃণায় হয়তো তাঁকে একদিন হিজড়াদের ঢেঁড়ায় গিয়ে উঠতে হতো। এবং আজও হয়তো তিনি হিজড়াদের মাসি হয়ে ঢেঁড়ায় বসে জীবন কাটাতেন। তাহলে জাতি কি পেত পঞ্চাশ লাখ মানুষের ভাগ্য বদলানোর এই মহান ব্যক্তিকে?

আমাদের চোখের সামনে আকাশ-ছোঁয়া সফলতায় ভাস্বর একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকার পরও যদি আমাদের চোখ না খুলে, তাহলে বলতে হবে আমরা আসলেই একটি ব্যর্থ জাতি। এই ব্যর্থতার দায় আমাদের সরকারগুলির, কারণ পঞ্চাশ বছরেও তারা বিবেক সহমর্মিতা আর বোধবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মানবিক প্রজন্ম তৈরি করতে পারেনি। মাত্র পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে রূপান্তরকে সমাজ সাদরে গ্রহণ করেছে আজ সেই রূপান্তরকে ভাবা হচ্ছে অপরাধ হিসেবে। কী বিপুল পতন আমাদের! রাস্তাঘাট ব্রীজ কালভার্টের উন্নয়নই আসল উন্নয়ন নয় মানবিক উন্নয়নটিই আসল উন্নয়ন এবং তা তৈরি করতে আমরা একশত ভাগ ব্যর্থ হয়েছি।" - আহমেদ শাহাব, ডেট্রয়েট, মিশিগান।'

আব্দুস সামাদ থেকে হোসনে-আরা এবং এরপর সন্তানের মা হওয়া এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, উনি ভেতরে নারী ছিলেন (জরায়ু না থাকলে সন্তান ধারণ করতে পারতেন না), কিন্তু বাইরে পুরুষের মতো তার জেনিটালিয়া ছিল। এটি নন-ক্লাসিক কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH) অথবা অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেটিং ওভারিয়ান টিউমার ছিল, যার কারণে তখন তার ইন্টারনাল জেনিটালিয়া ফিমেল হলেও এক্সটার্নালি ক্লাইটোরিস বড় হয়ে পেনিসের মতো এবং লেবিয়া মেজরা (Labia majora) ফিউজড হয়ে শুক্রাশয়হীন স্ক্রোটামের মতো ছিল। এক্ষেত্রে টিউমার থাকলে সার্জন তা অপসারণ করে যোনি পুনর্গঠন করে দেন, ক্লাইটোরিস থেকে অতিরিক্ত কোষ অপসারণ করে দেন। পরে তিনি সন্তান ধারণ



করতে সক্ষম হন। কারণ তার জন্মায়ু ও ওভারি কার্যকরী ছিল। বিষয়টির পক্ষে ফেসবুকে ট্রান্সজেন্ডার-বিষয়ক এক বিতর্কে দেশের এক সিনিয়র ইউরোলজিস্ট (Dr. Moudud Alamgir Pavel)-এর একটি বক্তব্য স্ক্রিনশটে যুক্ত করে দিলাম। এই জন্মগত সমস্যাকে (ইন্টারসেক্স বা জন্মগত হিজড়া) ট্রান্সজেন্ডারের (মানসিক রোগ) সাথে মিলিয়ে আবেগ তৈরির প্রচেষ্টা একজন অ্যাকাডেমিশিয়ানের কাছে কখনোই কাম্য নয়।

হরমোনগত পরিবর্তনের সাথে কি ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কোনো সম্পর্ক রয়েছে

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো—'না, নেই'। কয়েক বছর আগেও কেউ কেউ বিশ্বাস করত, ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার পেছনে হরমোনগত সমস্যা দায়ী হতে পারে। তবে এই ধারণা সত্যি কিনা, তা জানার জন্য আমেরিকার একদল গবেষক ১০১ জন ট্রান্সজেন্ডারের ওপর গবেষণা করে তাদের ফলাফল *Journal of Adolescent Health* নামক জার্নালে (২০১৫ সালে) প্রকাশ করে। সেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসে যে, ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার সাথে হরমোনের তারতম্য ঘটে না। গবেষক দলের প্রধান মন্তব্য করেন, 'We've now put to rest the residual belief that transgender experience is a result of a hormone imbalance,' says Olson. 'It's not.' তাই ট্রান্সজেন্ডার হওয়া পুরোপুরি মানসিক বিষয়, যার সাথে শারীরিক কোনো সম্পর্ক নেই[২২]। যদি জন্মগত সমস্যাই হতো, তবে অসুস্থতা মানুষের জেন্ডার আইডেন্টিটি মুভমেন্ট হিসেবে এত দূর আসত না, বিশ্বে এটা ইস্যুই হতো না।

তৃতীয় লিঙ্গ

সমকামিতার ইতিহাস নিয়ে আলোচনার পরিচ্ছদে তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক সমকামী অধিকার আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে প্রথমে তৃতীয় লিঙ্গের তাত্ত্বিক ধারণা দেন জার্মানির কার্ল হাইনরিখ উলরিখস। তিনি মনে করতেন যে, সমকামীরা একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের অধিকারী মানুষ, যারা জন্মগতভাবে সাধারণ নারী-পুরুষ থেকে আলাদা। তার সময়ে সমকামীদের বর্ণনা করতে নেতিবাচক শব্দ 'সডোমাইট' ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট শব্দ ছিল না। উলরিখস এই শূন্যতা পূরণের জন্য 'আরনিং' শব্দটি প্রবর্তন করেন। পরে হাঙ্গেরির কার্ল মারিয়া কের্টবেনি 'সমকামী' শব্দটির প্রচলন ঘটান।

উলরিখসের ধারণা ছিল, বেশিরভাগ মানুষের শারীরিক ও মানসিক যৌন বিকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, ফলে তারা স্পষ্টভাবে পুরুষ বা নারী হিসেবে পরিচিত হন। কিন্তু কিছু ভ্রূণ 'আরনিং' পরিচয়ের অধিকারী হিসেবে বেড়ে ওঠে, যাদের শারীরিক গঠন পুরুষের মতো হলেও মানসিকভাবে নারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এর অর্থ, শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ হলেও তারা মনে নারী হিসেবে নিজেকে অনুভব করেন। এই ধরনের ব্যক্তিদের তিনি 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পরবর্তীকালে ম্যাগনাস হার্শফিল্ড সমকামিতায় আসক্তদের মধ্যে বিশেষ একটি শ্রেণি «ট্রান্সভেস্টাইট' হিসেবে আলাদা করেন, যারা বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরে যৌন তৃপ্তি লাভ করতে পছন্দ করেন। হার্শফিল্ড তাদেরকে 'ট্রান্সভেস্টাইট' (১৯১০) নামে পরিচিত করেন, যাদের অনেকেই উভয়কামী। ট্রান্সভেস্টাইটদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সার্জারি ও হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরকে স্থায়ীভাবে বিপরীত লিঙ্গের মতো করতে চান। হার্শফিল্ড এই গোষ্ঠীর জন্য 'ট্রান্সসেক্সুয়াল' (Transsexual) পরিভাষাটি প্রচলিত করেন, যা পরবর্তীকালে 'ট্রান্সজেন্ডার' মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশে হিজড়াদের স্বীকৃতির সময় তৃতীয় লিঙ্গ বলতে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিজড়াকে বুঝানো হয়েছে। হিজড়া এবং তৃতীয় লিঙ্গের আইনী সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট না করা হলে এলজিবিটি ইস্যুতে সামাজিক অস্থিরতা তৈরী হবে।

References

1. The Third Gender and Hijras. https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/gender/third-gender-and-hijras.
2. NANDA, S. The hijras of India: Cultural and individual dimensions of an institutionalized third gender role. in Culture, Society and Sexuality (Routledge, 2006).
3. Emasculation. Wikipedia (2024).
4. The ruling on castration - Islam Question & Answer. https://islamqa.info/en/answers/126987/the-ruling-on-castration.
5. Marmon, S. Eunuchs and Sacred Boundaries in Islamic Society. (Oxford University Press, New York, 1995).
6. Tumadir, D. Transgender Muslims in the Subcontinent? Making Sense of Hijras. Muslim Skeptic https://muslimskeptic.com/2021/11/25/transgender-muslims-in-the-subcontinent-making-sense-of-hijras/ (2021).
7. How Britain tried to 'erase' India's third gender. (2019) BBC.
8. Hinchy, J. Governing Gender and Sexuality in Colonial India: The <I>Hijra</I>, c.1850–1900. (Cambridge University Press, 2019). doi:10.1017/9781108592208.
9. This Alien Legacy. Human Rights Watch (2008). https://www.hrw.org/report/2008/12/17/alien-legacy/origins-sodomy-laws-british-colonialism
10. Kalra, G. & Shah, N. The Cultural, Psychiatric, and Sexuality Aspects of Hijras in India. International Journal of Transgenderism 14, 171–181 (2013).
11. The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2017.1317831.
12. ঢাকায় ৯০ ভাগই নকল হিজড়া: পুলিশ. https://shorturl.at/cz2E0.
13. ১৫ বছর ধরে পুরুষদের হিজড়া বানাতেন ভুয়া ডাক্তার হাদিউজ্জামান. দৈনিক ইনকিলাব https://dailyinqilab.com/national/news/626374.
14. How common is Intersex? A response to Anne Fausto-Sterling: The Journal of Sex Research: Vol 39, No 3. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224490209552139.
15. How to Cope With Androgen Insensitivity. Verywell Health https://www.verywellhealth.com/androgen-insensitivity-4173975.

16. Hossain, M. S., Larsson, A., Scherbak, N., Olsson, P.-E. & Orban, L. Zebrafish Androgen Receptor: Isolation, Molecular, and Biochemical Characterization1. Biology of Reproduction (2008) doi:10.1095/biolreprod.107.062018.

17. 150 Years of Congenital Adrenal Hyperplasia: Translation and Commentary of De Crecchio's Classic Paper from 1865 | Endocrinology | Oxford Academic. https://academic.oup.com/endo/article/156/4/1210/2803353.

18. 21-hydroxylase deficiency: MedlinePlus Genetics. https://medlineplus.gov/genetics/condition/21-hydroxylase-deficiency/.

19. Banglanews24. খুলনায় সার্জারির মাধ্যমে ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তর! banglanews24.com https://banglanews24.com/health/

20. Pratidin, B. ৪০ বছর ধরে নারীদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ড. হোসনে-আরা. বাংলাদেশ প্রতিদিন http://www.bd-pratidin.com/country/2019/09/11/456138 (2019).

21. Stephen Whittle: "The Yogyakarta Principles provide guidance and are a constant reference point" | Heinrich Böll Stiftung. https://www.boell.de/en/2016/07/20/yogyakarta-principles-provide-guidance-and-are-constant-reference-point.

22. News, N. Sex Hormone Levels Consistent With Birth Gender in Transgender Teens. Neuroscience News https://neurosciencenews.com/transgender-hormone-levels-teens-2396/ (2015).

সমকামী আন্দোলনের বৈপ্লবিক উত্থান: ট্রান্সজেন্ডারবাদ

ট্রান্সজেন্ডার টিপিং পয়েন্ট

১৪ জুন ২০১৪ সাল। টাইম ম্যাগাজিন একজন পুরুষকে নারীর বেশভূষায় দেখাতে অভিনেতা ল্যাভার্ন কক্সের (Laverne Cox) একটি কভার ফটোসহ ফিচার প্রকাশ করে। কক্সকে এর মাধ্যমে 'ট্রান্সজেন্ডার টিপিং পয়েন্ট' (Transgender tipping point) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি কিছু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করেছিলেন এবং নারীর মতো দীর্ঘ চুল, মেকআপ, পোশাক ও হাই হিল পড়েন। যদিও কক্সকে এই 'ট্রান্সজেন্ডার টিপিং পয়েন্ট'-এর মুখচ্ছবি হিসেবে দেখানো হয়েছিল, এর আগে 'ট্রান্সজেন্ডারিজম' বা দ্রুত বিবর্তিত "জেন্ডার আইডেন্টিটি' ধারণা সমাজের মূলধারায় তেমনভাবে স্থান পায়নি। কক্সে মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদ মুভমেন্টের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।

মাত্র ছয় বছরের (২০১৪-২০২০) মধ্যেই দেখা গেল 'ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রিটি', 'ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিট', 'ট্রান্সজেন্ডার সিইও', 'ট্রান্সজেন্ডার হেলথ কভারেজ', এবং 'ট্রান্সজেন্ডার ছাত্র'[১]। এই সম্প্রদায়ের জন্য নতুন ভাষা, আইন এবং নীতিমালা তৈরি করা শুরু হলো, এবং সমাজকে অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য করল।

মনে হতে পারে হঠাৎ করেই যেন 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়, জনসাধারণের অগোচরে অনেক বড় বড় পরিবর্তন ঘটছিল। অবশেষে এমন একটা পর্যায় (Thresold) আসে, যখন তা দৃশ্যমান হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের সমাজের কথা উল্লেখ করা দরকারী মনে হচ্ছে। বর্তমানে LGBTQ+ ইস্যু নিয়ে কথা বললে প্রায় সবাই অবিশ্বাস করেন; মনে করতে থাকেন, এটা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, এটা বাংলাদেশে অসম্ভব—এমন অভিব্যক্তি দেখা যায়। যারা সচেতন করার চেষ্টা করছেন, তাদেরকেই বরং সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে সমকামী অধিকার নিয়ে শব্দের মুখোশে কাজ শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে প্রকাশ্যে LGBTQ+ তথা সমকামী অধিকার দাবী করে[২]। এরপর থেকে দ্রুত গতিতে অনেক পরিবর্তন হতে থাকে। হিজড়ার মুখোশে আসে ট্রান্সজেন্ডার। বাংলাদেশে এই আন্দোলন নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এতই এগিয়ে গিয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ সচেতন হওয়ার আগেই ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। এই বছর (২০২৪) তা সংসদে পাশ করার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা ছিল। ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আসিফ মাহতাব উৎসের(পাঠ্যপুস্তকের শরীফার গল্প) বইয়ের পাতা ছেঁড়ার ঘটনা ছিল টিপিং পয়েন্ট। এরপর থেকে সাধারণ মানুষ সচেতন হওয়া শুরু করেন। সামনে পরিচ্ছেদে এসব নিয়ে দেখতে পাব বিস্তারিত আলোচনা, তারা কোন কৌশলে এগোচ্ছে, তা নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।



ট্রান্সজেন্ডারবাদ এক অবিশ্বাস্য বৈপ্লবিক ধারণা?

সমকামী (গে এবং লেসবিয়ান) এবং উভয়কামীরা (বাইসেক্সুয়াল) বিকৃত যৌনতায় অভ্যস্ত হলেও তারা বাহ্যিকভাবে (বেশভূষা, আচরণ) বিষয়কামীদের (হেটেরোসেক্সুয়াল) মতোই। অন্যভাবে বলা যায়, একজন সমকামী পুরুষ আরেকজন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলেও তারা নিজেদের ছেলে হিসেবে পরিচয় দেয়। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার নারী (যিনি যৌন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সমকামী বা উভয়কামী) জন্মগত পুরুষ হলেও নিজেকে নারী মনে করে, চলনে-বলনে, বেশ-ভূষায় নারীদের নকল করে। এখানে উল্লেখ যে, তারা জন্মগত নারী বা পুরুষের পরিচয়কে অস্বীকার করে নিজেদের কল্পিত পরিচয়কেই আসল মনে করে সমাজে আইনত স্বীকৃতি দাবী করে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের আলোকে হাজার হাজার বছর ধরে সমাজের প্রতিষ্ঠিত জৈব লিঙ্গভিত্তিক নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ শুধুমাত্র যৌনতার বিষয় নয়, এর

সাথে জড়িয়ে গেছে মানব সভ্যতার পুরো সিস্টেম। এটা মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক ধারণা।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের শেকড় সেই জার্মানির বার্লিনে, জন্ম হয়েছিল কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের চিন্তা এবং ম্যাগনাস হার্শফিল্ডের অ্যাক্টিভসমের মাধ্যমে। মেডিকেল তত্ত্ব এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদের শুরু হয়, যা তখন ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ হিসেবে পরিচিত ছিলো। সমকামী আন্দোলনের মতো ট্রান্সজেন্ডারবাদ উত্থানের নিয়মতান্ত্রিক নয়। সমকামী আন্দোলনের সিস্টেম্যাটিক ইতিহাস প্রায় ১৫০ বছরের (১৮৬০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত)। অন্যদিকে ১৯৫০ দশকে হ্যারি বেনজামিনের হাত ধরে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ আমেরিকায় আমদানী হলেও সেটা চিকিৎসার গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল[৩]।

১৯৬৯ সালে নিউ ইয়ার্কের স্টোনওয়ালের তথাকথিত দাঙ্গা শুরু করেছিল 'ড্রাগ কুইন' বা নারী সাজা পুরুষরা। তাদেরকে সমকামী আন্দোলনের অংশ মনে করা হতো। ট্রান্সজেন্ডার পরিচয়ের (জেন্ডার আইডেন্টিটি) ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসেবে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে।

সমকামী (LGB) আন্দোলনের মতো ট্রান্সজেন্ডার (T) আন্দোলন সামাজিকভাবে তেমনটা দৃশ্যমান ছিল না। তারা নীরবে নিভৃতে কাজ করার নীতি গ্রহন করে। ষাটের দশক থেকে লিঙ্গ সার্জারী এবং হরমোন চিকিৎসা বৈধ ছিল। লিঙ্গান্তর করার পর বিভিন্ন আইনত জটিলতা শুরু হয়—নতুন পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার, পাবলিক টয়লেট, নারী হোস্টেল সিট, জেলখানায় কয়েদীর থাকার জায়গা, নারীদের খেলাধুলা ইত্যাদি। তাই সঙ্গত কারণে শুরুতে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টদের মূল ফোকাস ছিল আইন সংস্কার নিয়ে।

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড কারা?

আধুনিক ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ দশকের শুরুতে। এই আন্দোলনের প্রধান স্থপতি হচ্ছেন দুজন আমেরিকান ট্রান্সজেন্ডার ফিলিস ফ্রাই (Philips Frye), মার্টিনি রুথব্লাট (Martine Rothblatt) এবং ব্রিটিশ ট্রান্সজেন্ডার স্টিফেন হুইটল (Stephen Whittle)। তিনজনই আইন বিশেষজ্ঞ। মাত্র দুই দশকের প্রচেষ্টায় পুরো সমকামী অধিকার তথা LGBTQ+ আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন। ট্রান্সজেন্ডারিজম বিশ্বায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রেখেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন। এই আন্দোলনের নেপথ্যের বিষয়গুলো জানা থাকলে তাদের কৌশল সম্পর্কে সচেতন হওয়া যাবে।

ফিলিস ফ্রাই

তিনি একজন অগ্রণী ট্রান্সজেন্ডার অধিকারকর্মী। ১৯৭০-এর দশকে ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন; বিশ্ব তখনো আধুনিক ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিত্ব কেটলিন জেনারের নাম জানেনি। তবে তার ব্যক্তিগত লড়াই—যা তার লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে ছিল—তার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। ১৯৭২ সালে, যখন তিনি একজন নারী হিসেবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, সেনাবাহিনী ফ্রাইকে 'অ্যাভার্সন থেরাপি'-র মাধ্যমে তার জন্মগত লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত, ফ্রাইকে সম্মানের সাথে অব্যাহতি দেওয়া হয় ১৯৭৭ সালে[৪]।

১৯৭৬ সালে, ফ্রাই 'সাহসী' সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রকাশ্যে রূপান্তরিত হয়ে ফিলিস ফ্রাই হন। যদিও এটি তার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য একটি বিশাল স্বস্তির মুহূর্ত ছিল, তবে এটি বৈষম্য এবং কষ্টের একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ফ্রাই তার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার হারান এবং তার সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে চলে যায়। ফ্রাই এবং তার স্ত্রী ট্রিশ, যারা ফ্রাইয়ের রূপান্তরকে মেনে নিয়েছিলেন, গুরুতর আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ। এই প্রতিকূলতার পরও, ফ্রাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি যৌথ এমবিএ এবং আইন ডিগ্রি অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

আইন স্কুলে পড়ার সময় ফ্রাই ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বৈষম্যমূলক আইনগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বাথরুম সম্পর্কিত আইনের বিরোধিতা করেন। ফ্রাই নিজেই হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাথরুম ব্যবহারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সফলভাবে নীতি চ্যালেঞ্জ করে লিঙ্গ-উপযোগী বাথরুম ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

ফ্রাই হিউস্টনের ক্রস-ড্রেসিং অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন সিটি কাউন্সিলে লবিং করার পর এই অধ্যাদেশটি বাতিল করা হয়। ফিলিস ফ্রাই ১৯৯২ সালে ICTLEP (International Conference on Transgender Law and Employment Policy) প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে নীতিমালা (পলিসি) নিয়ে আলোচনা করে। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই ট্রান্সজেন্ডার আইন ও নীতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

আনা হয় এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আইনত স্বীকৃত হয়। ২০১০ সালে তিনি টেক্সাসের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান, যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। এর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং নতুন প্রজন্মের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন।

তিনি এমন বেশ কিছু আইনি লড়াইয়ে অংশ নেন, যা ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের নিজেদের পরিচয় আইনগত পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে। এ ক্ষেত্রে জন্মসনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অন্যান্য আইনি নথিতে লিঙ্গ পরিবর্তনের বৈধতা প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়তা করেন।

মার্টিনি রুথব্লাট

মার্টিন রথব্লাট একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ট্রান্সজেন্ডার পথিকৃৎ, আইনজীবী এবং বায়োটেক উদ্যোক্তা। মেডিকেল এথিক্স-এ পিএইচডি ডিগ্রীধারী। রথব্লাট পুরুষ হিসেবে পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার শুরু করেন আইন এবং টেলিকমিউনিকেশন দিয়ে। তিনি স্যাটেলাইট রেডিও কোম্পানি সিরিয়াসএক্সএম-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তার এই উদ্যোগ বেশ সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালে মার্টিন রুথব্লাট নিজেকে নারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে লিঙ্গ রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেন। মার্টিনি রুথব্লাট (ট্রান্স উইমেন) হিসেবে নতুন নামে পরিচিত হন। এরপর থেকে ট্রান্সজেন্ডারের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও তীব্রভাবে যুক্ত হন[৫]।

মার্টিনি রুথব্লাটের বায়োটেক ফিল্ডে প্রবেশের প্রধান কারণ ছিল তাঁর মেয়ের বিরল ফুসফুসের রোগ। তিনি উপলব্ধি করেন যে, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষত যেসব রোগের নিরাময় এখনও পাওয়া যায়নি। তার মেয়ে জেনিফার ফুসফুসের উচ্চ রক্তচাপ (Pulmonary Hypertension) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার জন্য কোনো কার্যকরী চিকিৎসা তখন ছিল না। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং ১৯৯৬ সালে United Therapeutics নামে একটি বায়োটেক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন[৫]। তিনি এই কোম্পানীর সিইও হিসেবে বছরে ৩৯ মিলিয়ন ডলার সম্মানি পেতেন। জুন ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী ইউনাটেড বায়োটেক কোম্পানী বাজার ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশী।

ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠায় মার্টিনি রুথব্লাটের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে, আইনি ও সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তিনি বিভিন্ন ট্রান্সজেন্ডার সংগঠন এবং প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৯২ সালে ফিলিস ফ্রাইয়ের সাথে ICTLEP (International Conference on Transgender Law and Employment Policy) এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। ICTLEP ট্রান্সজেন্ডার মানুষের অধিকার রক্ষা, আইনগত স্বীকৃতি এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের বিষয়ে কাজ[৬]।

একজন অ্যাটর্নি-উদ্যোক্তা হিসেবে রুথব্লাট স্যাটেলাইট-ভিত্তিক নেভিগেশন সেবার জন্য স্যাটেলাইট অরবিট/স্পেকট্রাম বণ্টন বিষয়ে নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক অনুমোদন প্রাপ্তির প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেন (১৯৮৭) এবং ডাইরেক্ট-টু-পারসন স্যাটেলাইট রেডিও ট্রান্সমিশন (১৯৯২)-এর ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের বায়োপলিটিক্যাল প্রকল্পের নেতৃত্বও দেন, যা জাতিসংঘের জন্য মানব জিনোম ও মানবাধিকার বিষয়ক একটি খসড়া সার্বজনীন ঘোষণা তৈরিতে কাজ করেছিল (যার চূড়ান্ত সংস্করণ ইউনেস্কো দ্বারা ১১ নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে গৃহীত হয় এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দ্বারা ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সালে অনুমোদিত হয়)[৬]। তিনি ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের জন্য তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পরিচিত, যার মধ্যে যুক্তরাজ্যে *জেন্ডার রিকগনিশন অ্যাক্ট ২০০৪* তৈরিতে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

স্টিফেন হুইটল

স্টিফেন হুইটল একজন ব্রিটিশ ট্রান্সজেন্ডার আইনজীবী, একাডেমিক এবং মানবাধিকার কর্মী। ১৯৫৫ সালে ম্যানচেস্টারে নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করা হুইটল ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি নিজেকে একজন ট্রান্স পুরুষ হিসেবে ঘোষণা দেন। পেশাগত জীবনে হুইটল একজন প্রখ্যাত অ্যাকাডেমিক। তিনি ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ট্রান্সজেন্ডার আইন ও নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

১৯৭০ ও ৮০ দশকে ট্রান্স হওয়ার কারণে তিনি চাকরি হারান। ১৯৮৫ সালে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, ট্রান্স মানুষদের আইনজীবী হতে হবে, তবেই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে। ১৯৯০ সালে তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯২ সালে স্টিফেন প্রেস ফর চেঞ্জ (PFC)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হন, যা যুক্তরাজ্যের

ট্রান্সজেন্ডার লবিং গ্রুপ। PFC ইউরোপীয় বিচার আদালত এবং ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতে মামলা করে ট্রান্স মানুষের জন্য লিঙ্গ পরিচিতি আইন ২০০৪-এর অধীনে আইনি স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০১০ সালে PFC যুক্তরাজ্যের ইকুয়ালিটি ল-এর অধীনে ট্রান্স মানুষের জন্য পূর্ণ সুরক্ষা অর্জন করে[৭]।

ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ট্রান্সজেন্ডার ল' অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট পলিসি (ICTLEP)

এই সম্মেলনের উদ্যোগে তৈরী হয় 'ইন্টারন্যাশল বিল অব ট্রান্সজেন্ডার রাইটস' নামে খসড়া আইন[৮]। নামে আন্তর্জাতিক হলেও আসলে এটা ছিল মূলত আমেরিকার হাতেগোনা কিছু নারী সাজা পুরুষ আইনজীবী যার মধ্যে ফিলিস ফ্রাই, স্টিফেন হুইটল, এবং মার্টিন রথব্লাট অন্যতম।

* আইনি পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি বিকাশ: ICTLEP ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের জন্য মডেল আইন প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা বর্তমানের আইনি সুরক্ষার ভিত্তি তৈরি করেছে। কর্মসংস্থানে বৈষম্য দূরীকরণে নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং আইনগত ভিত্তি স্থাপন করেন। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো যুক্তরাজ্যের ২০০৪ সালের জেন্ডার রিকগনিশন অ্যাক্ট, যা আইনি লিঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ দেয়।
* কর্মী ও আইনজীবীদের সহযোগিতা: ICTLEP আন্দোলনকর্মী ও আইনজীবীদের মধ্যে গভীর সহযোগিতার পথ তৈরি করেছিল। মার্টিন রুথব্লাট, ফিলিস ফ্রাই এবং স্টিফেন হুইটল একে অপরের কৌশল শেয়ার করে আইনি ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে কাজ করেছেন। এই সহযোগিতা বিভিন্ন দেশে আইনি সংস্কারে সাহায্য করেছে এবং আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করেছে।
* কর্মসংস্থানে বৈষম্য দূরীকরণ: ICTLEP ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য রোধে কার্যকর নীতিমালা তৈরি করে। এই নীতিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইক্যুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কমিশনের (EEOC) সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছিল, যা লিঙ্গ পরিচয়কে (Gender Identity) যৌন বৈষম্যের (Sexual discrimination) আইনি সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে।
* স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেসের সম্প্রসারণ: মার্টিন রুথব্লাটের নেতৃত্বে ICTLEP

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রসার এবং বীমা কাভারেজ অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দিয়েছিল। এর ফলে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার-অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনার পথ সুগম হয়।

* আন্তর্জাতিক প্রভাব ও বৈশ্বিক নীতি: ICTLEP-এর প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাজ্যে স্টিফেন হুইটলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে যায়, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি মডেল হয়ে ওঠে।

জেন্ডার রেকগনিশন অ্যাক্ট (Gender Recognition Act)

২০০৪ সালে যুক্তরাজ্যে পাস হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের তাদের লিঙ্গ পরিচয়কে আইনি স্বীকৃতি দেয়ার সুযোগ প্রদান করে। এই আইনটি ব্রিটেনে ট্রান্স ব্যক্তিদের জন্য লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত আইনি সুরক্ষার দিক থেকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল[৯]। এই আইনের প্রণয়নে স্টিফেন হুইটল সহ অনেক মানবাধিকার কর্মীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের মূল পয়েন্টগুলো নিম্নরূপ:

* লিঙ্গ স্বীকৃতি সার্টিফিকেট (Gender Recognition Certificate - GRC): GRC প্রাপ্তির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তাদের আইনি লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে, যা তাদের জন্ম নিবন্ধন, বিবাহের নথি, এবং অন্যান্য আইনি ডকুমেন্টে সংশোধন আনার সুযোগ দেয়।

* বৈবাহিক অবস্থা: এই আইনের অধীনে একজন ব্যক্তি তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারেন এবং আইনি লিঙ্গ পরিবর্তনের পরও যদি তারা বিবাহিত থাকেন, তারা সেই বিবাহকে ধরে রাখতে পারেন। তবে আইনটি পাস হওয়ার সময়, বিবাহিত ট্রান্স ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন অনুসারে বিয়ে বিচ্ছেদ বা সিভিল পার্টনারশিপ প্রয়োজন ছিল, যদিও পরবর্তীতে এই বিধান সংশোধিত হয়েছে।

* স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রমাণপত্র: GRC পেতে একজন ট্রান্স ব্যক্তিকে একটি মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে লিঙ্গ ডিসফোরিয়ার (Gender Dysphoria) প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয় এবং চিকিৎসাগত রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য

দিয়ে যাচ্ছেন তা প্রমাণ করতে হয়। এছাড়াও, আবেদনকারীকে কমপক্ষে দুই বছর ধরে তাদের পছন্দের লিঙ্গ অনুযায়ী জীবনযাপন করার প্রমাণ দিতে হয়।

* বয়সের সীমা: আইনটি ১৮ বছরের ওপরে থাকা ট্রান্স ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। এর ফলে, কিশোর-কিশোরীরা এই আইনের অধীনে তাদের লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারে না।

ইয়োগ্যাকার্তা প্রিন্সিপলস

২০০৬ সালের মার্চ মাসে ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগ্যাকার্তায় এই নীতিমালার খসড়া তৈরি করার জন্য একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ২৯ জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ এবং অ্যাক্টিভিস্ট অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে অনেকে LGBTQ+ অধিকার আন্দোলনে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, যৌন দিকনির্দেশনা ও লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত বৈষম্য দূর করতে একটি শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন করা। বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা LGBTQ+ জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের মধ্যে থাকা অংশগ্রহণকারীরা তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে পরামর্শ দিয়ে নীতিগুলো তৈরি করেন[১০]।

সাবেক আইরিশ পুরোহিত মাইকেল ও'ফ্ল্যাহার্টির-এর নেতৃত্বে LGBTQ+ অধিকার কর্মীরা যুক্তি দেখায় যে, যেসমস্ত দেশ জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে, তাদের স্বাভাবিকভাবেই এই LGBTQ+ গোষ্ঠীদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এই দ্বীপে তৈরী করা নীতিগুলো আইনি বাধ্যতামূলক ছিল না, এই নীতিগুলো মূলত ছিল একটি ইচ্ছার তালিকা। তারা ধারণা করেছিলেন যে বিশ্বব্যাপী এনজিও, আইনজীবী এবং রাষ্ট্র এই নীতিগুলোকে গ্রহণ করতে প্ররোচিত হবে। বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল।

> *সোনিয়া ওনুফের কোরেয়া, একজন ব্রাজিলিয়ান কর্মী এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন, স্বীকার করেছিলেন যে, খসড়াকারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্দোনেশিয়া নির্বাচন করেছিলেন। কারণ তারা চেয়েছিলেন একটি মুসলিম দেশ থেকে এই নীতিগুলো প্রণয়ন করা হোক, যাতে এটি পশ্চিমা বিলাসী জীবনধারা থেকে উদ্ভূত বলে মনে না হয়।*[৭]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইয়োগ্যাকার্তার সুলতান নিজেই কখনও তাঁর শহরের জন্য এই নীতিগুলো গ্রহণ করেননি।

ইয়োগ্যাকার্তা নির্যাস—সহজভাবে বলা যায়, এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবাধিকারের আড়ালে বিকৃত যৌনতা ও লিঙ্গ পরিবর্তনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আইন, পাবলিক পলিসি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় LGBTQ+ বা সমকামিতার সামাজিকীকরণ করা। নীতিমালায় SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) নামে একটি নতুন সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। Sexual Orientation দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সমকামিতা (গে, লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল), আর Gender Identity দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ইচ্ছেমতো পরিচয় পরিবর্তন (ট্রান্সজেন্ডার)। ইয়োগ্যাকার্তা নীতিমালার কিছু প্রধান অবস্থান:

* পায়ুসংগম-বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে।
* সমকামী যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না, অর্থাৎ সমকামিতাকে বৈধতা দিতে হবে।
* জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সমকামীদের মেডিকেল চেকআপ ও বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা দিতে হবে।
* সমলিঙ্গের বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে হবে।
* LGBTQ+ মতবাদ প্রচারে মিছিল, মিটিং ও বক্তব্যের মাধ্যমে জনপরিসরে প্রচারণার সুযোগ দিতে হবে।

YP10+ বা যোগকার্তা নীতিমালার (Yogyakarta Principles) দশম বার্ষিকী সংস্করণে (২০১৭ সালে) নতুন কিছু পয়েন্ট যুক্ত করা হয়েছিল। এই আপডেট সংস্করণটি Yogyakarta Principles plus 10 (YP+10) নামে পরিচিত।

ট্রান্সজেন্ডার যেভাবে হঠাৎ লাইমলাইটে এলো

ইন্দোনেশিয়ায় ইয়োগ্যাকার্তা নীতিমালা প্রস্তুতির সম্মেলন মূলত ছিল সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি (গে, লেসবিয়ান এবং বাইসেক্সুয়াল) গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। শেষ মুহূর্তে জেন্ডার আইডেন্টিটি (ট্রান্সজেন্ডার) আইনজীবী এবং অ্যাক্টিভিস্ট স্টিফেন হুইটেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রসঙ্গে হুইটাল এক সাক্ষাৎকারে বলেন[৭]-

'আমন্ত্রণটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না,

কারণ এর আগে কেউ কখনো আমাদের (ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টদের) কোনো বিষয়ে মতামত জানতে চায়নি। যুক্তরাজ্যে আমরা একটি পৃথক ট্রান্স সংস্থা "প্রেস ফর চেঞ্জ" গঠন করেছিলাম, যার আমি একজন সদস্য ছিলাম। এটি গড়ে তোলা হয়েছিল, কারণ তখন ট্রান্স সম্প্রদায়ের কোনো স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ছিল না। আমি ট্রান্সজেন্ডার ইউরোপ (TGEU)-এর গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলাম এবং ২০০৭ সালে WPATH-এর সভাপতি নির্বাচিত হই। এই পদে আসীন হওয়া প্রথম নন-মেডিকেল ট্রান্স ব্যক্তি ছিলাম আমি। আমাকে এই আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে অধ্যাপক রবার্ট উইন্টারমুটের ভূমিকা থাকতে পারে। তিনি আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের (ICJ) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা দীর্ঘদিন ধরে একে অপরকে চিনতাম এবং ILGA-ইউরোপের মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। আমন্ত্রণটি হঠাৎ করেই আসে—মাত্র দুই সপ্তাহ আগে। তখন ভাবলাম, আচ্ছা, আমাকে যোগকার্তা যেতে হবে, এটি কোথায়? আমি খোলা মনে সেখানে গিয়েছিলাম এবং অসাধারণ কিছু মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।'

এই মিটিং-এ আপনার ভূমিকা কী ছিল?

'আমার মূল কাজ ছিল ট্রান্স অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা—কাজের পরিবেশে ট্রান্স ব্যক্তিদের পরিচয় ও তাদের জীবনের জটিলতাগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং আমরা যেন পুরুষ-মহিলা দ্বৈতবাদের সীমাবদ্ধতার বাইরে চিন্তা করতে পারি, সেদিকে আমার জোর ছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আমাদের পরিবারের অভিজ্ঞতা। আমার সঙ্গী অনেক কষ্টের পর ডোনার ইনসেমিনেশনের অধিকার পেয়েছিলেন, কারণ তিনি আমার সাথে থাকতেন (নোট: তিনি জন্মগতভাবে মেয়ে হলেও নিজেকে পুরুষে রূপান্তর করেছিলেন, কিন্তু বীর্য উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন)। আমি মনে করি, LGBT পরিবারগুলোর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি পরিবারের প্রচলিত ধারণাকে আরও বিস্তৃতভাবে স্বীকৃতি দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।'

নীতিমালায় ট্রান্স শব্দ ব্যবহার করা হয়নি কেন? এ প্রশ্নের জবাবে বলেন,

'ভাষার ব্যবহার খুবই ভেবেচিন্তে করা হয়েছে, কারণ এর মূল ভিত্তি হলো সার্বজনীন মূল্যবোধ—যা প্রতিটি মানুষের অধিকার। আমরা যা তৈরি করেছি, তা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে যাদের লিঙ্গ পরিচয় ভিন্ন বা যাদের যৌন প্রবণতা হেটেরোনরমেটিভ পথ অনুসরণ করে না। আমরা চেয়েছিলাম, এই মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হোক। তাই এগুলোকে খোলামেলা রাখা হয়েছে এবং এমন একটি আইনি কাঠামোর কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দমতো জীবনযাপন করতে পারে। তাদের পরিচয়ের ভিন্নতাগুলো বিকাশের সুযোগ পায় এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বাইরেও হতে পারে।'

তাহলে, আপনার দৃষ্টিতে কি বিতর্কের সূচনা করা সম্ভব হয়েছে?

'নিঃসন্দেহে। যদি এই মূলনীতি লিখিত না হত, তাহলে আমরা ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১১ সালে জাতিসংঘে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুই করতে পারতাম না। আমি একেবারে নিশ্চিত যে আমরা জাতিসংঘে বিতর্কের সূচনা করতে পেরেছি এবং এই মূলনীতি যৌন প্রবণতা এবং লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কিত অধিকারকে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

যোগকার্তা নীতিমালা এখনো অত্যন্ত কার্যকর এবং বর্তমান জাতিসংঘ ও ইউরোপের মানবাধিকার মূল্যবোধের সাথে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, যদিও এটি জাতিসংঘের কোনো আনুষ্ঠানিক নথি ছিল না, তবু জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে এটি একটি সুস্পষ্ট ও সঠিক বিবৃতি প্রদান করেছে, যা মানুষের যৌন প্রবণতা, লিঙ্গ পরিচয় বা জন্ম পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করে। নীতিগুলো প্রায় জাতিসংঘের সিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে—অনেকেই ধরে নেন যে YYP জাতিসংঘ থেকেই এসেছে। এটি বিশ্বের আইনজীবী ও নীতি নির্ধারকদের কাছে LGBT ব্যক্তিদের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই নীতিগুলো আইনজীবী ও আইন প্রণেতাদের জন্য একটি স্থায়ী রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে, যা তারা তাদের কাজের সাথে তুলনা করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, যখন ইউরোপ কাউন্সিলের SOGI সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখন নীতিগুলো নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছিল। একইভাবে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস-এর চার্টারও একটি নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নীতিগুলো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে, যা ন্যায়বিচারের পথে অগ্রসর হতে সহায়ক।

ট্রান্সজেন্ডারিজমের নীরব বিপ্লব

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন ট্রান্সজেন্ডার অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রে একটি 'নীরব বিপ্লব' ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় আইনি লড়াই পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে নির্বাহী আদেশ (Executive orders) এবং নীতিগত পরিবর্তনের (Systematic changes of policies) মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অধিকার এবং সুরক্ষা সম্প্রসারিত করা হয়। এভাবে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর আইনি স্বীকৃতির জন্য মজবুত ভিত্তি তৈরি করে।

২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা ফেডারেল কর্মচারীদের সমকামী পার্টনারদের জন্য সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেন, যা বৃহত্তর লিঙ্গ পরিচয় স্বীকৃতির (Gender Identity Recognition) দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এরপরে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের সরকারি নথিপত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। ২০১৩ সালে সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসন লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি সহজ করা হয়। পূর্বের ব্যয়বহুল এবং জটিল লিঙ্গ পুনর্নির্মাণ সার্জারি সিস্টেম পরিবর্তন করে শুধুমাত্র একজন চিকিৎসকের লেটারের মাধ্যমে অফিশিয়ালি লিঙ্গ পরিবর্তন করার সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

২০১৪ সালে ওবামা নির্বাহী আদেশ ১৩৬৭২ স্বাক্ষর করেন, যা ফেডারেল ঠিকাদারদের (কন্ট্রাক্টর) জন্য লিঙ্গ পরিচয়ের (Gender identity) ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে[১১]। এটি প্রথমবারের মতো ফেডারেল কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিচয়কে স্পষ্টভাবে সুরক্ষা দেয়।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে, অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (ACA) লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। এই নীতিটি ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস বাড়ায়, যার মধ্যে হরমোন থেরাপি ও লিঙ্গ-নিশ্চিতকারী (Gender affirmative) চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৬ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে

ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত করতে নির্দেশিকা জারি করা হয়। এর মাধ্যমে স্কুলগুলোতে তাদের পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে একটি নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা হয়।

ওবামার প্রশাসন আরও বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সিভিল রাইটস অ্যাক্টের অধীনে লিঙ্গ পরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী সুরক্ষা প্রসারিত করে। এগুলোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আবাসন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা বৈষম্যের শিকার না হয়ে সমান অধিকার পেতে শুরু করে। ওবামার প্রশাসন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য যে সুরক্ষা এবং অধিকার প্রদান করেছে, তা এখনো মার্কিন নীতিতে বড় প্রভাব ফেলছে।

টাইমলাইন: আমেরিকায় ট্রান্সজেন্ডারের নীরব বিপ্লব

বছর	ঘটনা
২০০৯	প্রেসিডেন্ট ওবামা সমকামী সঙ্গীদের জন্য ফেডারেল কর্মচারীদের সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেন।
২০১০	অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট পাস, যা লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।
২০১৩	সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রশাসন লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ করে, ডাক্তারি চিঠি দ্বারা লিঙ্গ পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়।
২০১৪	নির্বাহী আদেশ ১৩৬৭২, যা ফেডারেল ঠিকাদারদের লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।
২০১৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত করতে নির্দেশিকা জারি করা হয়।

ট্রান্সজেন্ডার স্বীকৃতিতে ব্যাপক পলিসি পরিবর্তন

২০১৫ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা খাতের বিভিন্ন নীতিমালায় লিঙ্গ নিশ্চিতকরণকে সমর্থন করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পলিসি পরিবর্তনগুলো বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছে।

ক্ষেত্র	নীতিমালা পরিবর্তন	বিবরণ
রাষ্ট্র	মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ট্রান্সজেন্ডারদের খোলাখুলি সেবা করার অনুমোদন (২০১৫)	ওবামা প্রশাসন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের খোলাখুলি সামরিক বাহিনীতে সেবা করার অনুমোদন দেয়। এটি ২০১৭ সালে ট্রাম্প বাতিল করেন, কিন্তু ২০২১ সালে বাইডেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
	শিরোনাম IX নির্দেশনা (২০১৬)	ওবামা প্রশাসন ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের তাদের লিঙ্গ পরিচয় অনুযায়ী বাথরুম ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। ২০১৭ সালে ট্রাম্প প্রশাসন এটি বাতিল করে, পরে বাইডেন এটি পুনঃস্থাপন করেন।
	নির্বাহী আদেশ লিঙ্গ পরিচয় সুরক্ষার জন্য (২০২১)	বাইডেন প্রশাসন ফেডারেল সংস্থাগুলোকে লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যা কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন এবং শিক্ষায় ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের বাথরুম ব্যবহার (২০১৫-২০১৬)	বিভিন্ন স্কুল জেলা ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মিল রেখে বাথরুম ব্যবহার করতে দেয়া শুরু করে। কিছু রাজ্যে আইন পাস হয়, যেমন ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ ইয়র্ক।
	লিঙ্গ নিশ্চিতকরণ পাঠ্যক্রম (২০২১)	Fair Education Act অনুসারে ক্যালিফোর্নিয়া LGBTQ+ ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যক্রম চালু করে। এটি ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক ছিল।
	খেলাধুলায় অংশগ্রহণ (২০১৫-২০২১)	ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মিল রেখে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়। বাইডেনের ২০২১ সালের নির্বাহী আদেশ এটিকে আরও শক্তিশালী করে।
কর্পোরেট এবং ব্যবসা	স্বাস্থ্য সেবা প্রসার (২০১৬)	গুগল, অ্যাপল এবং স্টারবাকসের মতো কোম্পানিগুলো ট্রান্সজেন্ডার কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে, যা লিঙ্গ নিশ্চিতকরণ সার্জারি ও হরমোন চিকিৎসার অর্থায়ন করে।
	বৈষম্য প্রতিরোধ নীতিমালা (২০১৯)	Fortune 500 কোম্পানির ৯০% এরও বেশি লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে, যা কর্মক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে।

ক্ষেত্র	নীতিমালা পরিবর্তন	বিবরণ
স্বাস্থ্যসেবা	অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (ACA) সুরক্ষা	ACA এর ১৫৫৭ ধারা লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। এটি ট্রাম্প প্রশাসনে চ্যালেঞ্জ হলেও, বাইডেন এটি পুনরায় কার্যকর করেন।
	লিঙ্গ নিশ্চিতকরণ স্বাস্থ্যসেবার প্রসার	Medicaid এর প্রসার ঘটানো হয় যা লিঙ্গ নিশ্চিতকরণ সার্জারি ও হরমোন চিকিৎসা কভার করে, বিশেষ করে কম আয়ের ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য।
রাজ্য পর্যায়	আইনি লিঙ্গ স্বীকৃতি	ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন এবং ওয়াশিংটনের মতো রাজ্যগুলো তাদের ড্রাইভারের লাইসেন্স এবং অন্যান্য আইডিতে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ করে, এমনকি তৃতীয় লিঙ্গ চিহ্নের অপশনও রাখে।

ট্রান্সজেন্ডার বিস্ফোরণ

LGBTQ+ আন্দোলন বেগবান হওয়ার সাথে সাথে সমাজে নৈতিকতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০১৫ সালে আমেরিকাতে সমকামী বিয়ে বৈধতা পাওয়ার পর এনজিও, অ্যাক্টিভিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মিডিয়া, রাজনীতিবিদ, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যারা এতদিন ধরে গড়ে তোলা যে বিশাল নেটওয়ার্ক সমকামিতা (LGB) স্বাভাবিকীকরণে কাজ করছিল, তারা মনোনিবেশ করে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচার এবং প্রসারে। শিক্ষা, চিকিৎসা, করপোরেট, ব্যবসা, খেলাধূলা মিডিয়া—সব সেক্টরে পলিসি পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, সব জায়গা ঢুকে যায় ট্রান্সজেন্ডারবাদ, জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্ব, লিঙ্গ-বৈচিত্র্য মতবাদ। শুরু হলো ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম বিতর্ক, যেখানে অবিশ্বাস্যভাবে জড়িয়ে গেল বিশ্বের বিখ্যাত জায়ান্ট কর্পোরেট, টেক কোম্পানীগুলোও। বিনোদন ইন্ড্রাস্ট্রি হয়ে উঠল LGBTQ+-এর প্রচার এবং প্রসার কেন্দ্র।

আইনি বৈধতার পর সমকামী বান্ধব পলিসির ফলশ্রুতিতে LGBTQ+ পরিচয় গ্রহণ করা কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা হু হু করতে বাড়তে থাকে। ২০২৪ সালের জরীপ অনুযায়ী আমেরিকার জেনজি (Gen-Z) জেনারেশনের তরুণ-তরুণীদের এক তৃতীয়াংশ (৩০%) নিজেদেরকে LGBTQ+ পরিচয় দিচ্ছে[১২]। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের ওপর এক জরীপে দেখা গেছে, আমেরিকার তরুণদের মধ্যে ২০২২ সালে প্রতি ১০০০ জনে ২৮ জন নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় দেয়, যেটি

২০১৪ সালে ছিল প্রতি ১০০০ জনে ৬ জন[১৩]।

মেডিকেল সেন্টারের ডেটা অনুসারে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের ব্যবধানে শিশু-কিশোরদের মাঝে জেন্ডার ইতিবাচক চিকিৎসা সংখ্যা বেড়ে গেছে ৩ গুণের বেশী। ২০১৭ সালে চিকিৎসা প্রত্যাশী শিশুদের সংখ্যা ছিল ১৫,১৭২ এবং এটি বেড়ে ২০২১ সালে হয়েছে ৪২,১৬৭১৪।

অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ২০২৩ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুসারে ২০০০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ১৬ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয়দানকারীদের সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে[১৫]।

* ২০০০ সালে প্রতি ৭০,০০০ জনে ১ জন ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে নতুনভাবে সনাক্ত করা হয়
* ২০১৮ সালে বেড়ে প্রতি ১৩,০০০ জনে ১ জনে উন্নীত হয়।
* ২০০০ সালে প্রতি ১ লাখে ৪ জন থেকে বেড়ে তা ২০১৮ সালে প্রতি ১ লাখে ৭৮ জনে পৌঁছায় (১৬-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে)।

References

1. Inside the Gender Identity Industry. The 11th Hour Blog https://www.the11thhourblog.com/post/inside-the-gender-identity-industry.
2. Rashid, S. F., Standing, H., Mohiuddin, M. & Ahmed, F. M. Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh. Health Research Policy and Systems 9, S12 (2011).
3. Harry Benjamin | Endocrinologist, Sexologist & Gender Identity Pioneer | Britannica. https://www.britannica.com/biography/Harry-Benjamin (2024).
4. Inside Track: Phyllis Frye: The Grandmother of the Transgender Rights Movement: https://www.wisbar.org/NewsPublications/InsideTrack/Pages/Article.aspx?Volume=11&Issue=12&ArticleID=27122.
5. How trans CEO Martine Rothblatt transcended reality with the world in tow. https://www.theceomagazine.com/business/management-leadership/martine-rothblatt-gender-identity/.
6. Martine Rothblatt: A Founding Father of the Transgender Empire - Uncommon Ground Media. https://uncommongroundmedia.com/martine-rothblatt-a-founding-father-of-the-transgender-empire/#.

7. Stephen Whittle: "The Yogyakarta Principles provide guidance and are a constant reference point" | Heinrich Böll Stiftung. https://www.boell.de/en/2016/07/20/yogyakarta-principles-provide-guidance-and-are-constant-reference-point.

8. International Conference on Transgender Law and Employment Policy: Annual Proceedings and Newsletters - Digital Transgender Archive. https://www.digitaltransgenderarchive.net/col/44558d285.

9. Participation, E. Gender Recognition Act 2004. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents.

10. Yogyakarta Principles. Wikipedia (2024).

11. 11. President Obama Signs a New Executive Order to Protect LGBT Workers. whitehouse.gov https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/07/21/president-obama-signs-new-executive-order-protect-lgbt-workers (2014).

12. Nearly 30% of Gen Z adults identify as LGBTQ, national survey finds. NBC News https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/nearly-30-gen-z-adults-identify-lgbtq-national-survey-finds-rcna135510 (2024).

13. Twenge, J. M., Wells, B. E., Le, J. & Rider, G. N. Increases in Self-identifying as Transgender Among US Adults, 2014–2022. Sex Res Soc Policy (2024) doi:10.1007/s13178-024-01001-7.

14. Number of transgender children seeking treatment surges in U.S. https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-transyouth-data/.

15. Five-fold rise in UK rates of transgender identity since 2000, medical records suggest - BMJ Group. https://bmjgroup.com/five-fold-rise-in-uk-rates-of-transgender-identity-since-2000-medical-records-suggest/ (2023).

সমকামিতা প্রতিষ্ঠার কৌশল: গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রভাব বিস্তার

এইডস মহামারি: সমকামী আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট

আশির দশকের শুরুতে আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস মহামারি দেখা দেয়। গত ৪০ বছরের গবেষণার তথ্যানুসারে সমকামীদের মাঝে এইচআইভি-তে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কমপক্ষে ২৬ গুণ বেশি[১]। সিডিসি'র ডেটা অনুসারে আমেরিকায় এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর ৭১ শতাংশ পায়ুকামী[২]। এইডস পুরুষ সমকামীদের (gay) রোগ হিসেবে পরিচিতি পায় (Gay-Related Immune Deficiency, GRID) এবং তারা জনপরিসরে অবজ্ঞার শিকার হয়; অনেক অ্যাক্টিভিস্ট এইড্স-এ মৃত্যুবরণ করে। ফলশ্রুতিতে ৭০-এর দশকে তুঙ্গে থাকা সমকামী অধিকার আন্দোলনে ভাটা পড়ে।

এই অবস্থায় ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হোন দুজন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডিধারী সমকামী এক্টিভিস্ট মার্শাল কার্ক (নিউরোসাইকিয়াট্রির গবেষক) এবং ম্যাডসন হান্টার (জনসংযোগ তথা প্রপাগান্ডা বিশেষজ্ঞ) যারা *After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the '90s* নামক বই লিখেন, যা গে মেনিফেস্টো হিসেবে গণ্য করা হয়। এইচআইভি-তে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির দুর্বলতাকে পুঁজি করে দুজনে এক নতুন ধাঁচের কর্মপরিকল্পনার ছক আঁকেন, যার মাধ্যমে সমকামীদের ব্যাপারে জনগণের মনে সহানুভূতি বা সফট কর্নার তৈরী হয়। সমকামিতা নিয়ে মানুষের মাঝে 'পজিটিভ' মানসিকতা তৈরি করা যাতে এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মাঝে এক ধরনের উদাসীনতা তৈরি হয়। অর্থাৎ নেতিবাচক বিষয়টির প্রতি অসংবেদনশীল মনোভাব তৈরী করা, যাতে সমকামী আচরণকে স্বাভাবিক মনে করা হয়। তাদের ব্যাখ্যা মোটামুটি এরকম—

সমকামিতা একটি ভালো জিনিস, একেবারে শুরুতেই সাধারণ মানুষকে এটা

বিশ্বাস করানো যাবে না, এমন আশা করাও উচিত না। তবে তাদের মনে করাতে পারো, এটা ভিন্ন একটা জিনিস। এর মাধ্যমে সামাজিক ও আইনগত অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তুমি জিতে গেছো। আমি ফুটবল খেলা পছন্দ করি, তুমি করো ক্রিকেট। আমি আইসক্রিম খেতে পছন্দ করি, তুমি খেতে ভালোবাসো চকোলেট। আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে নিজেদেরকে ভিক্টিম হিসেবে মিডিয়ায় (নাটক, সিনেমায়) উপস্থাপন করা। সমকামীরা সারাজীবন সামাজিক অবহেলা এবং অবজ্ঞার শিকার হয়েছে, এখন তাদের 'সামাজিক স্বীকৃতি' প্রয়োজন।

কার্ক-হান্টার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। তন্মধ্যে সমকামীদের জনসমক্ষে প্রতিবাদী হিসেবে তুলে ধরার চেয়ে তাদেরকে সহজ-সরল ভদ্রলোক হিসেবে উপস্থাপন করা। এজন্য তারা মূলধারার সমকামী গ্রুপকে সমর্থন করেছেন এবং শিশুকামিতার সাথে জড়িত সমকামী গ্রুপদের পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে, সমকামিতাকে জন্মগত হিসেবে উপস্থাপন করা উচিৎ, কেননা এটি যদি পছন্দের বিষয় হিসেবে ধরা হয়, তাহলে নৈতিকতা ও পাপের প্রশ্ন ওঠে। তাই জনসমক্ষে এটিকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে দেখানো জরুরি। সমকামী আচরণের সামাজিকীকরণে ধর্মকে তারা সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাই মধ্যপন্থী গির্জার সমর্থন এবং রক্ষণশীল খ্রিষ্টান শিক্ষার বিরোধিতা করতে বলেছেন।

তাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের গোপন সমকামী হিসেবে তুলে ধরা এবং সমকামী বিরোধীদের খারাপভাবে উপস্থাপন করা। এখানে মনস্তত্ত্ব হচ্ছে, যারা অনেক আগে মরে গেছে তাদেরকে সমকামী বানিয়ে দেয়া হলে তা খণ্ডানো কঠিন। আসল কথা হলো আলোচনায় থাকা। আর যারা সমকামিতার বিরোধিতা করবে তাদেরকে ট্রান্সফোবিক/হোমোফোবিক হিসেবে ট্যাগিং দিয়ে বিপজ্জনক এবং অপ্রচলিত হিসেবে চিত্রায়িত করা এবং সমকামী অধিকারের পক্ষে কাজ করা ব্যক্তিকে আধুনিক এবং প্রগতির শক্তি হিসেবে দেখানো।

গত তিন দশকের কার্ক ও ম্যাডসেনের কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করার ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। সমকামীরা নিজেদের সাধারণ নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করে নৈতিকতার ইস্যু থেকে চোখ সরিয়ে সুচারুভাবে অধিকারের ইস্যুতে পরিণত করেছে।

কার্ক এবং ম্যাডসনের ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে গবেষণালব্ধ ডেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

* সমকামী গোষ্ঠী যে বৈষম্যের শিকার তা প্রমাণে পর্যাপ্ত তথ্য তৈরী করায় মনোযোগ দেয়া হয়
* মিডিয়া, কর্পোরেট, ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে তথা সমকামিতাবান্ধব ডাটা ভিত্তিক ইন্ডেক্স প্রবর্তন এবং সেগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন বা মনিটরিং করা
* এনজিও ভিত্তিক শক্তিশালী লবিং এবং এডভোকেসির মাধ্যমে পলিসি এবং প্রচলিত আইন নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করা

সমাজের মূলধারায় আসার আগ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে সমকামী অধিকার কর্মীরা আড়ালে থেকে কাজ করেছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিনোদন ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, লেখক, চিন্তক, সাংবাদিকসহ সমাজের প্রভাবশালীরা এক ছাতার নীচের আসার কারণে তারা শক্তিশালী এডভোকেসি বা প্রেসার গ্রুপ হিসেবে রাজনীতি এবং পলিসি পরিবর্তনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে।

এলজিবিটি বিশ্বায়নের কৌশল কীভাবে কাজ করে?

যেকোনো সাধারণ অধিকারের বিষয় (যেমন- বৈষম্য বিরোধী কোটা আন্দোলন) মাঠ পর্যায়ে অনেক অ্যাক্টিভিজমের পর জনসমর্থন আদায় করা। এরপর তা নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাব তৈরী করে। কিন্তু পরিবার এবং সমাজবিধ্বংসী সমকামিতা মতবাদ ঐতিহাসিকভাবে সমাজ গ্রহণ করেনি। হাল আমলের সমকামী অধিকার আন্দোলনের চরমপন্থী ভার্সন ট্রান্সজেন্ডারিজমের পক্ষে কেবল মাঠ পর্যায়ের অ্যাক্টিভিসম দিয়ে গ্রহণযোগ্য করা অসম্ভব। এই বাস্তবতা অনুধাবন করে এমন কৌশল নেয়া হয় যাতে সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করার আগেই গোপনে আইনের ফাঁক-ফোকর গলে পলিসি পর্যায়ে ঢুকে যায়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান ট্রান্সজেন্ডার ল সেন্টারের তখনকার নির্বাহী পরিচালক মাসেনডেভিস তার সমর্থকদের ২০১৩ সালে বলেছিলেন[৩],

> 'আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা বেশিরভাগ সাফল্য অর্জন করেছি গোপনে কাজ করে। এটি ট্রান্সজেন্ডার ল ফাউন্ডেশনের একটি গোপন বিষয়, এবং আজ আমি এটি প্রকাশ করছি। আমরা অনেক কিছু

করি, খুবই চুপিসারে। আমাদের কিছু বড় অর্জন আছে যা কেউই লক্ষ্য করেনি। আমরা খুবই নীরবে এবং চিন্তাশীলভাবে কাজ করি, কারণ আমরা প্রচার পাওয়ার চেয়ে জয়লাভ নিশ্চিত করতে বেশি আগ্রহী; এবং এটি বেশ কার্যকরও হয়েছে। আমরা একা নই, অনেক প্রতিষ্ঠানই এটি করেছে এবং আমরা অনেক কিছু করতে সক্ষম হয়েছি।'

তারা ফোকাস করে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যার প্রভাব সাধারণ মানুষ শুরুতে বুঝতে পারে না; এ কারণে অনেকে না বুঝে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে (যেমন কোনো দাবী আদায়ে গণস্বাক্ষর অভিযান)। জেন্ডার ধারণা অনেকের কাছে বোধগম্য হতো না, যদি না তারা এর বাস্তব প্রতিফলন দেখত। অলিম্পিকে, স্পোর্টসে ট্রান্সজেন্ডারদের জয়জয়কারে অনেকের টনক নড়েছে, ভাবিয়ে তুলেছে। তারা এমনভাবে এডভোকেসি বা লবিং করেছে যে, অলিম্পিক কমিটি পলিসি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এই পর্যায়ে আসতে তাদের প্রেসার গ্রুপগুলো কাজ করেছে।

এলজিবিটি বিশ্বায়নে থিংক-ট্যাংকরা (অর্থদাতা, বুদ্ধিজীবী, প্রভাবশালী ব্যক্তি ইত্যাদি) এমন কাজ করে যাতে সাধারণ মানুষ ধারণা না করতে পারে। পর্দার আড়ালে থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন জাতিসংঘ) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নেটওয়ার্ক তৈরীতে ফোকাস করে। অধ্যাপক বা গবেষকরা তাত্ত্বিক আলোচনার ব্যানারে সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করে বয়ান তৈরী করে। সমকামী ব্যক্তিরা যে বৈষম্যের শিকার তা পর্যাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক চাপ তৈরী করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে সুশীল সমাজ, এনজিও এবং মিডিয়ার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এতে কর্পোরেটও জড়িত হয়ে যায়। তাদের উদ্যোগগুলো কার্যকরি হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডাটা ভিত্তিক রেটিং সিস্টেম করা হয়, যার মাধ্যমে সব কর্মকাণ্ড মনিটর করা যায়।

LGBTQ+ বান্ধব নীতি-নির্ধারণে কার্যত জনগণের কোন ভূমিকা নেই। এনজিও-শিক্ষক-মিডিয়া নেক্সাস উন্নয়নশীল দেশের দুর্বল পলিটিক্যাল কাঠামোকে উপজীব্য করে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় কব্জা করে ফেলে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ইউএসএইডের যৌথ উদ্যোগে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়াটি ২০২৪ পাশ হওয়ার কথা ছিল। এই সব কিছু হয়েছে আমাদের চোখের সামনেই, শব্দের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে।

এলজিবিটি আন্দোলনের সফলতার মূলে রয়েছে বিভিন্ন প্রেসারগ্রুপ যারা ডেটা ভিত্তিক সবকিছু মনিটর করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেটিং বা মনিটরিং সংস্থার কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করছি:

গ্লাড (GLAAD- Gay & Lesbian Alliance Against Defamation)

এটি LGBT আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেসার গ্রুপ বা গণমাধ্যম (বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি, নিউজ মিডিয়া) পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা, যা ট্রান্সজেন্ডারদের যেকোনো ইস্যু বা দাবি লাইমলাইটে আনার মাধ্যমে জনমত গঠন করে এবং তাদের পক্ষে সমর্থন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থাটি প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রমোট করা বা চাপে রাখতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাদের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো সংবাদ, বিনোদন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা দ্রুততর করা এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নতুন সংস্কৃতি তৈরি করা ('Shaping the media narrative. Changing the culture')।

গ্লাডের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর মধ্যে একটি হলো নিউ ইয়র্ক পোস্টে প্রকাশিত ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে নেতিবাচক প্রতিবেদনকে বড় ইস্যু বানানো। ১৯৮৭ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসও তাদের সম্পাদকীয় নীতিতে পরিবর্তন আনে এবং LGBTQ সম্প্রদায়কে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করে।

এ সংস্থা গণমাধ্যমে সিনেমা, কার্টুন বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে কতটুকু সময় এবং কত ভাগ এলজিবিটিকিউ চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে: TV স্কোরকার্ড (১৯৯৬), নেটওয়ার্ক রেসপন্সিবিলিটি ইনডেক্স (NRI, ২০০৭), স্টুডিও রেসপন্সিবিলিটি ইনডেক্স (২০১৩) এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেফটি ইনডেক্স (SMSI)। এই মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া অনুসারে স্কোর দেয় এবং মিডিয়া মনিটরিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্টুডিও রেসপন্সিবিলিটি ইনডেক্সের মাধ্যমে, হলিউডের ছয়টি বৃহৎ প্রযোজনা সংস্থাকে (20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Columbia, Universal Pictures, The Walt Disney Studios, এবং Warner Brothers) প্রতিবছর মূল্যায়ন করা হয়—এতে কতগুলো সিনেমা LGBTQ+ সংক্রান্ত এবং কতটুকু সময় তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে, তা বিবেচনা করা হয়। ২০২২ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিরাপত্তা সূচকের (SMSI) মাধ্যমে

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ইউটিউব এবং টিকটকসহ পাঁচটি প্রধান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মূল্যায়ন করা হয়, যেখানে তারা ১০০-এর মধ্যে মাত্র ৫০ নম্বর পেয়েছে। এই ফলাফলে পারফরম্যান্সকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে গ্ল্যাড (GLAAD) ফেসবুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, যাতে তারা অতিরিক্ত ফিল্টারিং ব্যবস্থা নেয় এবং ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

মানবাধিকার ক্যাম্পেইন (Human Rights Campaign)

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ এনজিও ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম LGBTQ+ অধিকার সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি। HRC-এর মূল লক্ষ্য হলো LGBTQ+ সম্প্রদায়ের জন্য আইনগত অধিকার, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং বৈষম্যবিরোধী নীতির উন্নয়ন করা। সংগঠনটি LGBTQ+ জনগণের জন্য বৈষম্যবিরোধী আইন এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এর পাশাপাশি, এটি সমাজে LGBTQ+ জনগণের গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থন বৃদ্ধি করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করে। HRC বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে এবং LGBTQ+ সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো Corporate Equality Index, যা বিভিন্ন কোম্পানির LGBTQ+ বান্ধব নীতিগুলোর মূল্যায়ন করে এবং একটি বার্ষিক রেটিং প্রদান করে। এছাড়াও, HRC National Coming Out Day পালন করে, যা LGBTQ+ ব্যক্তিদের তাদের পরিচয় প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত করে। ২০০০ সালের মাত্র ৩টি বড় কর্পোরেট কোম্পানী এলজিবিটি বান্ধব ছিল। এই রেটিং ইন্ডেক্স এর আওতায় ৯০% এর ওপরে ফরচুন-৫০০ কোম্পানীকে LGBT বান্ধবে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

স্টোনওয়াল (Stonewall)

এটি ব্রিটিশ LGBTQ+ অধিকার সংস্থা, যা ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রচেষ্টা LGBTQ+ সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। স্টোনওয়ালের লক্ষ্য হলো সমাজে সমতা, সম্মান, এবং সমর্থন নিশ্চিত করা এবং LGBTQ+ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করা।

GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network)

একটি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা, যা LGBTQ+ শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে LGBTQ+ সংক্রান্ত বৈষম্য ও হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায়। GLSEN এর মূল কার্যক্রমগুলি হলো:

* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: শিক্ষক, স্কুল প্রশাসক এবং অন্যান্য শিক্ষা পেশাদারদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যাতে তারা LGBTQ+ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সমর্থনমূলক পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়।
* নীতি প্রণয়ন: স্কুল ও শিক্ষা নীতিতে LGBTQ+ সহায়ক পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করে এবং বৈষম্যবিরোধী নীতির উন্নয়নে প্রচারণা চালায়।
* শিক্ষার্থী সহায়তা: LGBTQ+ শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক প্রোগ্রাম, কর্মশালা, এবং সম্পদ সরবরাহ করে, যাতে তারা স্কুলে সুরক্ষিত এবং সমর্থিত বোধ করে।
* গবেষণা ও পরিসংখ্যান: LGBTQ+ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা করে এবং তথ্য সংগ্রহ করে।

IGLYO

IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Youth and Student Organisation) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা LGBTQI+ যুবক ও ছাত্রদের অধিকার ও সমর্থন প্রদান করে। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থা LGBTQI+ যুবকদের নেটওয়ার্কিং, শিক্ষা, অধিকার প্রচারণা এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করে। IGLYO বৈষম্য ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে।

ট্রান্স জার্নালিস্ট এসোশিয়েশন (Trans Journalist Association)

ট্রান্সজেন্ডার জার্নালিস্টের কর্মক্ষেত্রে সমঅধিকার, কিভাবে রিপোর্ট করতে হবে তার ট্রেইনিং এবং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার জন্য এই প্লাটফর্ম বা প্রেসার গ্রুপ কাজ করে।

এথলেট এলাই (Athlate Ally)

এই প্রেসার গ্রুপ ট্রান্সজেন্ডারদের স্পোর্টস ইভেন্টে সমঅধিকার আদায়, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অলিম্পিকে যেন তারা ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে অংশ নিতে পারে সেই দাবী বাস্তবায়নে সফল হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ১৪৮ জন ট্রান্সজেন্ডার অংশগ্রহণ করেছে; অনেকে পদকও জিতে। তাদেরকে নিয়ে যেন মিডিয়াতে সমালোচনা না হয় তা নিয়েও প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করে।

ইলগা (ILGA)

ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) হলো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যা LGBTQI+ ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার জন্য কাজ করে। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে LGBTQI+ সম্প্রদায়ের সমতা, অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য প্রচারণা চালায়। ILGA জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলে পরামর্শক মর্যাদাপ্রাপ্ত একটি এনজিও এবং বিভিন্ন দেশে LGBTQI+ অধিকার রক্ষার জন্য আইনি ও সামাজিকভাবে কাজ করে। সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে সদস্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে মিলে LGBTQI+ সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং সাম্যের পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

প্রাইড ইনডেক্স (Pride Index)

Pride Index একটি সূচক, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের LGBTQ+ বান্ধব নীতি এবং কর্মপরিবেশের মূল্যায়ন করে। এই সূচকটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা LGBTQ+ কর্মীদের জন্য তৈরি করা সুবিধা এবং নীতির প্রতি কতটা সমর্থন রয়েছে তা পরিমাপ করে[৪]। Pride Index সাধারণত বিভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করে, যেমন

বৈষম্যবিরোধী নীতিমালা, সমান সুযোগ প্রদান, কর্মপরিবেশে সংবেদনশীলতা, এবং LGBTQ+ কর্মীদের জন্য সাপোর্ট নেটওয়ার্ক। এটি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এবং আইনগত দায়বদ্ধতা, পাশাপাশি তাদের কর্মীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা মূল্যায়ন করে। এই সূচকটি সাধারণত LGBTQ+ অধিকার সংস্থা বা পেশাদার সংস্থাগুলোর দ্বারা তৈরি এবং আপডেট করা হয়। Pride Index প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের LGBTQ+ বান্ধব প্রচেষ্টা স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করে এবং কর্মক্ষেত্রে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে।

প্রাইড র‍্যাংকিং

স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলজিবিটি সামাজিকীকরণের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান র‍্যাংকিং ঘোষণা করে প্রাইড ইন্ডেক্স। তাদের মূল্যায়ন সূচক কেমন করছে তা নিয়ে গবেষণা হয়, জার্নালে পেপার প্রকাশিত হয়; যেমন- এই শিরোনামে (Improving the Campus Climate for LGBTQ Students Using the Campus Pride Index)[৫]। তাদের আরোপিত প্রাইড ইন্ডেক্স দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এলজিবিটি বান্ধব মাপকাঠি সেট করেছে। আমেরিকার নামকরা ইউনিভার্সিটিগুলো প্রাইড র‍্যাংকিং-এ (বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকের মতো) ভাল স্কোর (টপ পজিশন) করলে তা ফলাও করে প্রচার করা হয় তাদের ওয়েবসাইটে। এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকার বিখ্যাত George Mason ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট এই শিরোনামে খবর ছাপে—'Mason earns top honors from Campus Pride Index'। মেসন যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি, যাকে ক্যাম্পাস প্রাইড ইনডেক্স থেকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস প্রাইড ইনডেক্স দ্বারা 'ফাইভ-স্টার প্রিমিয়ার ক্যাম্পাস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মেসন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫৪টি মূল্যায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২৯টির একটি, যা ফাইভ-স্টার প্রিমিয়ার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে[৬]।

প্রাইড মান্থ: সমকামীদের গর্বের মাস

এটি একটি শক্তিশালী বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যার কারণে সমকামিতার দ্রুত সামাজিকীকরণ হয়। সমকামী গোষ্ঠী প্রতি বছর জুন জুড়ে প্রাইড মাস নামক

গর্বের মাস উদ্‌যাপন করে। এই মাসকে কেন্দ্র করে তারা তাদের গর্ব প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করে, তাদের নতুন অর্জিত স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করে এবং বিদ্যমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৭৮ সালে, অ্যাকটিভিস্ট গিলবার্ট বেকার রঙধনু পতাকা ডিজাইন করেন, যা LGBTQ+ সম্প্রদায় এবং প্রাইড মাসের একটি প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রাইড মাসের সময় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাইড ফ্ল্যাগ প্রদর্শন করে এবং ব্যক্তিরা রেইনবো পোশাক পরিধান করে সংহতির চিহ্ন হিসেবে অথবা LGBTQ+ সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে।

প্রাইড মাস জুড়ে বিভিন্ন ধরনের উদযাপন এবং ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়, যেমন- প্যারেড, শিল্প প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র স্ক্রীনিং এবং শিক্ষামূলক সেশন। অনেকে পুরো মাস জুড়ে বা শুধু প্রাইড ইভেন্টের জন্য LGBTQ+ গর্বের পোশাক পরিধান করে, তাদের সমর্থন বা সংহতি প্রকাশ করে। এছাড়াও, ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রাইড অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারে, যা অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে সহায়ক।

কয়েক দশক আগেও প্রাইড প্যারেডে মাত্র কয়েকশত মানুষ অংশগ্রহণ করত, বর্তমান তা বেড়ে হাজার হাজার হয়েছে। গত দশক পর্যন্ত, সমকামী বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় জুন মাসকে LGBT প্রাইড মাস হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে LGBTQ সম্প্রদায়ের বৈধ বিবাহ এবং দত্তক নেওয়ার অধিকার প্রদান করে।

সিইআই ইন্ডেক্স (CEI - Corporate Equality Index)

এটা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি মূল্যায়ন টুল, যা বিভিন্ন কোম্পানির কর্মক্ষেত্রে LGBTQ+ (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার) প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার মূল্যায়ন করে। ২০০২ সাল থেকে চালু হওয়া এই সূচকটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের LGBTQ+ কর্মীদের প্রতি সহায়ক নীতিমালার মূল্যায়ন করে এবং কোম্পানিগুলোকে স্কোর দেয়। CEI মূলত কোম্পানির কর্মক্ষেত্রে LGBTQ+ কর্মীদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে স্কোর নির্ধারণ করে। এতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে মূল্যায়ন করা হয়:

* কর্মীদের জন্য সুরক্ষা ও অধিকার: কর্মক্ষেত্রে LGBTQ+ কর্মীদের জন্য

সমান সুযোগ এবং বৈষম্য বিরোধী নীতিমালা থাকা বাধ্যতামূলক।

* স্বাস্থ্য সুবিধা: LGBTQ+ কর্মীদের এবং তাদের পরিবারদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা ও অন্যান্য সুবিধার সুযোগ প্রদান।
* অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা: কর্মীদের জন্য LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ।
* বাহ্যিক প্রচারণা ও সমর্থন: কোম্পানির LGBTQ+ অধিকার সংক্রান্ত বহিরাগত প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং LGBTQ+ সমর্থনে জনসমক্ষে প্রকাশ্য বক্তব্য।

CEI এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে LGBTQ+ কর্মীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ সূচকে ভালো স্কোর পাওয়া কোম্পানিগুলোকে LGBTQ+ অধিকার সুরক্ষায় বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়, যা তাদের সুনাম বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। Human Rights Campaign প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে তারা এই সূচকের মূল্যায়ন এবং কোম্পানির তালিকা দেয় যারা LGBTQ+ কর্মীদের সহায়তায় শীর্ষে রয়েছে।

ডিইআই ইন্ডেক্স (DEI Index - Diversity, Equity and Inclusion Index)

এটি হলো একটি সূচক যা প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থায় বৈচিত্র্য, সমতা, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মূল্যায়ন করে। এটি সংস্থার কর্মপরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের সাথে আচরণের স্বচ্ছতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। DEI Index-এর মূল উপাদান হলো:

* বৈচিত্র্য (Diversity): এটি একটি সংস্থায় বিভিন্ন জাতি, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, যৌন পরিচয় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব পরিমাপ করে। বৈচিত্র্য সূচক দেখায় সংস্থাটি কেমনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের চাকরির সুযোগ প্রদান করে।
* সমতা (Equity): এটি সংস্থার নীতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে তা যাচাই করে। এটি দেখে যে, সংস্থাটি সকল কর্মচারীর জন্য সমান সুযোগ প্রদান করছে কিনা এবং তাদের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং বেতন সমতাভিত্তিক কিনা।

* অন্তর্ভুক্তি (Inclusion): এটি সংস্থার সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিমাপ করে, যেখানে বিভিন্ন পটভূমির মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করা হয়। অন্তর্ভুক্তি সূচক একটি সংস্থার পরিবেশের ওপরে ভিত্তি করে কর্মচারীদের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা পরিমাপ করে।

DEI Index সাধারণত বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, এবং কনসালটিং ফার্ম দ্বারা তৈরি করা হয় এবং এটি সংস্থার DEI সম্পর্কিত নীতির কার্যকারিতা মূল্যায়নে সহায়ক। এই সূচকটি সংস্থাগুলো তাদের DEI কৌশলগুলো উন্নত করতে এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই সূচকগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা তৈরি এবং পরিচালিত হয় এবং তাদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হলো:

* Equileap: একটি প্রতিষ্ঠান যা বৈচিত্র্য ও সমতা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে। তাদের Equileap Gender Equality Global Report and Ranking এই সূচকটি নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়গুলো পরিমাপ করে।

* Deloitte: একটি কনসালটিং ফার্ম, যা Diversity and Inclusion Index এবং অন্যান্য বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত সূচক তৈরি করে এবং পরামর্শ প্রদান করে।

* Forbes: একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, যা Forbes Diversity and Inclusion Index প্রকাশ করে, যা কোম্পানির বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মূল্যায়ন করে।

* McKinsey & Company: একটি কনসালটিং ফার্ম যা Diversity Wins রিপোর্ট প্রকাশ করে, যা বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির ব্যবসায়িক প্রভাব পরিমাপ করে।

* Gallup: একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা Diversity and Inclusion Index নিয়ে কাজ করে, যা কর্মস্থলে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা পরিমাপ করে।

কেইস স্টাডি: প্রেসার গ্রুপ যেভাবে কাজ করে

এটা ২০০৫ সালের দিকে ঘটনা। আমেরিকার এন্টি-গে ফ্যামিলি এসোসিয়েশন এর সাথে বিখ্যাত মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানী ফোর্ড-এর সুসম্পর্কের গুজব রটে। Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) প্রেসার গ্রুপ ১৭টি সংস্থাকে একত্র করে ফোর্ড কোম্পানীকে চাপ প্রয়োগ করে। উচ্চ পর্যায়ে মিটিং-এর পর সিদ্ধান্ত হয়, ফোর্ড কোম্পানী প্রতিটি জাগুয়ার ব্র্যান্ডের গাড়ি বিক্রির ১০০০ ডলার LGBTQ+ অধিকার আদায়ে ফান্ডিং করবে। ২০০৩ সালে ফোর্ড কোম্পানী প্রতিটি ভলভো গাড়ি বিক্রির ৫০০ ডলার LGBTQ+ হিউম্যান রাইটস ক্যাম্পেইন গ্রুপকে প্রদান করে[৭]।

২০২২ সালে ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স এর ফিলোসফির প্রফেসর Kathleen Stock মন্তব্য করেছিলেন যে, লিঙ্গ (জেন্ডার) পরিচয়ের ভিত্তিতে আইন এবং পলিসি গ্রহণ সেক্সুয়াল (জন্মগত) পরিচয়ের বিকল্প হতে পারে না[৮]। এই একাডেমিক মন্তব্যের জের ধরে LGBTQ+ প্রেসার গ্রুপের কারনে চাকুরি থেকে ইস্তফা দিতে তাকে বাধ্য করা হয়।

সমকামী বান্ধব স্কুলের পাঠ্যপুস্তক এবং ক্যাম্পাস পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

কয়েক যুগের গবেষণায় জানা গেছে, শিশুদের এবং কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সমাজের মনোভাব, দৃষ্টিভংগী, নীতি-নৈতিকতা পরিবর্তন করা যায়। তাই LGBTQ+দের সামাজিকীকরণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কিন্ডারগার্ডেন, স্কুল এবং কলেজের) ক্যারিকুলামকেও ঢেলে সাজানো শুরু হয়েছে। প্রি-স্কুল থেকে তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা বড় হয়ে LGBTQ+বান্ধব হয় (LGBTQ-inclusive curriculum), তাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হয়। এজন্য পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত বিষয়াদী, শ্রেণিকক্ষে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের রিসোর্স তৈরী এবং শিক্ষক ট্রেইনিং-ও এর অংশ। কারিকুলামের কি থাকবে তা LGBTQ+প্রেসার গ্রুপ (প্রাইড ইন্ডেক্স, স্টোনওয়াল, IGYLO) গাইডলাইন তৈরী করে দিয়েছে এবং সেগুলো কার্যকরি হচ্ছে কিনা, তা মূল্যায়ন করে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ করছে। ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৭ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য দেশ

পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলামে তাদের ইস্যুগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এদের মধ্যে ১২টি দেশ তা ক্লাসে শিখতে বাধ্যতামূলক করেছে[৯]।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ২০১১ সালে প্রথম LGBTQ+বান্ধব কারিকুলাম তৈরীতে আইন পাশ করে। পাঠ্যপুস্তকে তা বাস্তবায়ন হয়েছে ২০১৭ সাল থেকে[১০]। কলেরেডো, নিউ জার্সি রাজ্যও একই রকম আইন পাশ করেছে ২০২০ সালে। এখন পর্যন্ত আমেরিকার ৭টি অঙ্গরাজ্যে এলজিবিটি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক পড়ানো বাধ্যতামূলক করেছে। এজন্য ন্যাশনাল সেক্স এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ড নামে একটি গাইডলাইন তৈরী করেছে যেটিকে অনুসরণ করতে হবে।

References

1. Men who have sex with men. https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/populations/men-who-have-sex-with-men.
2. CDC. Fast Facts: HIV and Gay and Bisexual Men. HIV https://www.cdc.gov/hiv/data-research/facts-stats/gay-bisexual-men.html (2024).
3. Masen Davis, Transgender Law Center, Transgender Europe, Ruth Hunt, below the radar. https://whatisawoman.uk/Belowtheradar.
4. Campus Pride Index. https://www.campusprideindex.org/.
5. Improving the Campus Climate for LGBTQ Students Using the Campus Pride Index - Garvey - 2017 - New Directions for Student Services - Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ss.20227.
6. Mason earns top honors from Campus Pride Index. George Mason University https://www.gmu.edu/news/2022-06/mason-earns-top-honors-campus-pride-index.
7. Despite boycott & losses, Ford still sponsoring homosexual activism | Baptist Press. https://www.baptistpress.com/ https://www.baptistpress.com/resource-library/news/despite-boycott-losses-ford-still-sponsoring-homosexual-activism/ (2007).
8. Adams, R. & editor, R. A. E. Sussex professor resigns after transgender rights row. The Guardian (2021).
9. LGBTQI-Inclusive-Education-Report-2022.
10. Gender identity lessons: What schools are teaching students - The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/education/2022/06/03/schools-gender-identity-transgender-lessons/.

এলজিবিটি অর্থায়ন এবং নেপথ্যের কারণ

বিশ্বের মাত্র ১ % মানুষ ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটিকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তারা এখন ৯৯% মানুষের ওপর খবরদারি করছে[১]। আজকের এলজিবিটি আন্দোলন আর নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের জন্য নয়; এটি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং আক্রমণাত্মক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, বিশেষত LGB (Lesbian, Gay, Bisexual) মুভমেন্টে "T" (Transgender) অধিকার যুক্ত হওয়ার পর। জাতিসংঘের মতো প্ল্যাটফর্মও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এই যৌন বিকৃতিকে মানবাধিকারের মোড়কে বিশ্বায়ন করার জন্য পশ্চিমা জোট সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। মিডিয়া, একাডেমিয়া, কর্পোরেট সেক্টর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এলজিবিটি গোষ্ঠীর প্রভাবের অধীনে চলে গেছে। বিশ্বের কিছু বিখ্যাত ধনকুবের এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি এই সমকামী আন্দোলনকে দ্রুত এবং অভাবনীয়ভাবে সাফল্য লাভ করানোর পেছনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এদের মধ্য থেকে অন্যতম কয়েকজন হচ্ছেন—

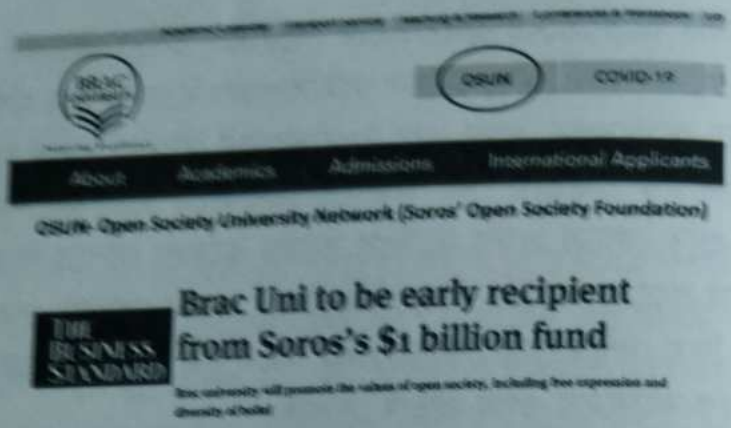
* জেনিফার প্রিটজকার (যিনি একজন পুরুষ, কিন্তু নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে দাবি করেন)
* মার্টিন রথব্ল্যাট (যিনি একজন পুরুষ, কিন্তু নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার এবং ট্রান্সহিউমানিস্ট হিসাবে দাবি করেন)
* টিম গিল (একজন সমকামী পুরুষ)
* জন স্ট্রাইকার (একজন সমকামী পুরুষ)
* মার্ক বোনহাম (একজন সমকামী পুরুষ) এবং
* রিক ওয়েইল্যান্ড (একজন মৃত সমকামী পুরুষ, যার দাতব্য কাজ এখনও এলজিবিটি-কেন্দ্রিক)
* ড্রুমন্ড পাইক
* ওয়ারেন এবং পিটার বাফেট
* জর্জ সোরোস

এলজিবিটি আন্দোলনের অর্থদাতাদের অনেকেই তাদের অর্থায়ন গোপনে বা ভিন্ন পথে করে থাকে। যেমন, টাইডস ফাউন্ডেশনের মতো গোপন অর্থায়ন সংস্থার মাধ্যমে বড় কর্পোরেশন, দাতা এবং সংগঠনগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করে। 'সামাজিক অন্তর্ভুক্তি' বা 'অধিকার'-এর নামে তারা ধর্ম, সংস্কৃতি, এবং সভ্যতার প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তাদের এজেন্ডা চাপিয়ে দিচ্ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলছে এবং অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিয়ে দেশীয় সহযোগীদেরও এই কাজে যুক্ত করছে, যা জাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলছে।

এলজিবিটি আন্দোলনের পেছনে থাকা শক্তি এবং অর্থের সোর্স বের করা অনেক সময়ের কাজ। এই ফিল্ডে শব্দের ধুম্রজাল এভাবে তৈরী করে যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এটা তো সমকামিতার সাথে জড়িত নয়। প্রসঙ্গত, জর্জ সরোস এলজিবিটি আন্দোলনের অনেক বড় অর্থদাতা এবং প্রভাবশালী বিলিয়নিয়ার। বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ সরোসের প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওবেসসাইটের (OSUN- Open Society University Network)। সরোসের এই বিলিয়ন ডলার প্রজেক্টে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক[২]। বাংলাদেশের পত্রিকায় শিরোনামের নীচের লেখা আছে—

> 'BRAC University will promotes the values of Open Society, including free expression and diversity of beliefs'
>
> অর্থাৎ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ওপেন সোস্যাইটির মূল্যবোধ প্রচার করবে, যার মধ্যে মুক্তচিন্তা এবং মতামতের বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত।

সরোসের ওপেন সোস্যাইটির অন্তর্নিহিত লিবারেল মূল্যবোধের মধ্যে সমকামী অধিকার অন্যতম। সাধারণ মানুষ, এমনকি উন্নয়নশীল দেশের পলিসিমেকারদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে এলজিবিটিকে বিভিন্ন ইতিবাচক শব্দের মোড়কে (যেমন- Climate Justice, Equity, Expression, Justice) প্যাকেট করে বাজারজাত করে। ওপেন সোস্যাইটি থেকে ফান্ডিং পেতে হলে সমকামিতা নামক নব্য লিবারেল মূল্যবোধের ইস্যুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আনতেই হবে। সরোসের ৩২ বিলিয়ন ডলারের ওপেন সোস্যাইটির ওয়েবসাইটে ফান্ডিং পলিসি[৩] এবং বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড Open Society and LGBTQI দিয়ে গুগল সার্চ বা চ্যাটজিটিপি সাহায্য নিয়ে বিস্তারিত জানা যাবে[৪]।


OSUN COVID-19

About Academics Admissions International Applicants

OSUN: Open Society University Network (Soros' Open Society Foundation)

THE BUSINESS STANDARD

Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund

Brac university will promote the values of open society, including free expression and diversity of belief

শুধু তাই নয়, সরোসের সংস্থা Self-identification আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই আন্দোলনের দাবি হচ্ছে, একজন ব্যক্তি মনের ইচ্ছাস্বাধীন নিজের জেন্ডার পরিচয় গ্রহণ করতে পারবে; এখানে শারীরিক লিঙ্গ তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, স্রেফ মনের ইচ্ছাই ছেলে বা মেয়ের পরিচয় নির্ধারণে মুখ্য বিষয়[৫]। সরোসের মূল্যবোধ অনুযায়ী কে কী পরিচয় নিবে এটা রাষ্ট্রের দেখার বিষয় নয়। ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য মেডিকেল থেরাপী (হরমোন/সার্জারী) শর্ত হতে পারে না। সরোসের ওপেন সোস্যাইটির ওয়েবসাইটে অনেক তথ্য রয়েছে। Self-ID আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী তা ওপেন সোস্যাইটি ফাউন্ডেশনের ভিডিওতে বিস্তারিত রয়েছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, বিশ্বে ২০টি দেশ ইতিমধ্যে জেন্ডার self-ID মতবাদ আইনি স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে[৬]। বাংলাদেশে প্রস্তাবিত খসড়া ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনটিও এই মতবাদের আলোকে খসড়া করা হয়েছে। হিজড়াদের পুনর্বাসনে সরকারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে হিজড়া শনাক্তকরণ ইস্যুতে মানবাধিকার সংস্থা কোর্টে রিট করেছে। তারা মেডিকেল টেস্টের ঘোর বিরোধী। Self-ID মতবাদ সম্পর্কে ওপেন সোস্যাইটি ফাউন্ডেশনের ২ মিনিটের ইউটিউব ভিডিও (No Government Should Get to Decide This) দেখে নিলে ভয়ংকর সভ্যতা বিরোধী এজেন্ডা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মাতে পারে[৭]।

ট্রান্সজেন্ডার তথা এলজিবিটি আন্দোলনের আন্দোলনের পেছনে থাকা শক্তি ও অর্থের উৎস নিয়ে বিশদভাবে অনেক বছরব্যাপী গবেষণা করেছেন আমেরিকান ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট, লেখক এবং অ্যাক্টিভিস্ট জেনিফার বিলেক (Jennifer Bilek)। বিলেকের লেখা ও কাজের মূল লক্ষ্য হলো এই আন্দোলনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তিনি 'The 11th Hour Blog' নামে একটি ব্লগ পরিচালনা করেন, যেখানে তিনি

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুগুলোর পেছনে থাকা কর্পোরেট অর্থায়ন এবং এজেন্ডার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য তুলে ধরেন। হঠাৎ করে পশ্চিমা সমাজে ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটির প্রসার এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। জেনিফার বিলেকের উল্লেখযোগ্য গবেষণাধর্মী কিছু প্রতিবেদন গুগল সার্চ করে পড়ে নিলে পুরো এলজিবিটি ইন্ড্রাস্ট্রি এবং তাদের গভীর নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়া যাবে। আমার এই পরিচ্ছেদে মূলত এই আর্টিকেলগুলোর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

* How a Handful of Billionaires Created the Transgender 'Movement': An Interview with Jennifer Bilek (2024) [৮]
* The Billionaire Family Pushing Synthetic Sex Identities (SSI) (2022) [৯]
* Foundations Are Setting the Transgender Agenda and Targeting Children (2021)[১০]
* The Billionaires Behind the LGBT Movement (2020)[১১]
* Who Are the Rich, White Men Institutionalizing Transgender Ideology?(2018)[১২]

এলজিবিটি বিলিয়নিয়ারদের তালিকা

তথ্য পাওয়ার জন্য বর্তমানের চ্যাটজিপিটি কার্যকরী টুল। চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে সমকামী পরিচয় নেয়া ধনকুবের বিলিয়নিয়ারদের লিস্ট। বিশাল অর্থের পাশাপাশি রয়েছে এসব ব্যক্তির শক্তিশালি সামাজিক এবং করপোরেট গ্রহণযোগ্যতা:

নাম	কোম্পানি / ভূমিকা	বিস্তারিত
Tim Cook	CEO of Apple	প্রথম প্রকাশ্য সমকামী CEO যিনি Fortune 500 কোম্পানির প্রধান। তিনি LGBTQ+ অধিকারের জন্য সক্রিয়ভাবে কথা বলেছেন এবং Apple-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে কাজ করেছেন।

নাম	কোম্পানি / ভূমিকা	বিস্তারিত
Chad Griffin	Former CEO of PayPal	প্রকাশ্য সমকামী Griffin একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং দাতা। তিনি American Unity PAC প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমকামী সমর্থক প্রার্থীকে সহায়তা করেছেন এবং Human Rights Campaign-এ $১০ মিলিয়ন দান করেছেন, যা সংস্থার জন্য একটি রেকর্ড।
David Geffen	Co-founder of DreamWorks	প্রকাশ্যে উভকামী Geffen LGBTQ+ কারণগুলোর প্রধান দাতা। তিনি GLAAD, Trevor Project-এর জন্য সমর্থন প্রদান করেছেন এবং UCLA-কে ১০০ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন একটি বৈচিত্র্যময় School of Theater, Film and Television-এর জন্য।
Jennifer Pritzker	Founder of Tawani Foundation	প্রথম প্রকাশ্য ট্রান্সজেন্ডার বিলিয়নিয়ার, Pritzker transgender অধিকারের জন্য একটি প্রধান কর্মী। তিনি Tawani Foundation প্রতিষ্ঠা করেছেন, ট্রান্সজেন্ডার এবং gender non-conforming ব্যক্তিদের সহায়তা করেছেন এবং Northwestern University-কে ১০০ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম endowed professorship-এর জন্য transgender studies-এ।
Domenico Dolce এবং Stefano Gabbana	Dolce & Gabbana	বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউসের প্রতিষ্ঠাতা যারা প্রকাশ্য সমকামী এবং LGBTQ+ থিমে ডিজাইন করা কালেকশন তৈরি করেছেন এবং LGBTQ+ চ্যারিটিতে সমর্থন প্রদান করেছেন।
Jon Stryker	Founder of Arcus Foundation	Stryker মেডিক্যাল সরঞ্জাম দান-সম্পদে একজন প্রকাশ্য সমকামী উত্তরাধিকারী এবং Arcus Foundation প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা বিশ্বব্যাপী LGBTQ+ অধিকারের জন্য একটি প্রধান দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

নাম	কোম্পানি / ভূমিকা	বিস্তারিত
Peter Thiel	Co-founder of PayPal	PayPal-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং Facebook-এর প্রাথমিক বিনিয়োগকারী, Thiel প্রকাশ্য সমকামী এবং LGBTQ+ অধিকারের সংগঠনে দান করেছেন।

নন-এলজিবিটি বিলিয়নিয়ারদের তালিকা

যারা এলজিবি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন না, তবে এলজিবিটি+ আন্দোলনের শক্তিশালী সমর্থক এবং অর্থদাতা:

নাম	কোম্পানি	বিস্তারিত
Jeff Bezos	Founder of Amazon	বেজোস এবং তার প্রাক্তন স্ত্রী ম্যাকেনজি স্কট ২০১২ সালে Washington state-এ সমলিঙ্গ বিয়েকে সমর্থন করতে ২.৫ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন। এটি বৈবাহিক সমতার সমর্থনে করা অন্যতম বড় দান ছিল।
Warren Buffett	CEO of Berkshire Hathaway	Buffett তার কোম্পানি Berkshire Hathaway-এর মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকারের সমর্থন করেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্পোরেট নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছেন এবং সমলিঙ্গের বিয়ের পক্ষে জনসমক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।
Bill Gates	Co-founder of Microsoft	Gates এবং তার Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, LGBTQ+ অধিকারের সমর্থনে স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস এবং বৈষম্যবিরোধী উদ্যোগে অর্থায়ন করেছেন।
Mark Zuckerberg	Founder of Facebook	Zuckerberg এবং Facebook বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকারের সমর্থন করেছেন, যেমন বৈবাহিক সমতার পক্ষে জনসমক্ষে সমর্থন, সমকামি যৌনসঙ্গীর জন্য সুবিধা প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মস্থল নীতিমালা বাস্তবায়ন।
George Soros	Founder of Open Society Foundations	Soros দীর্ঘকাল ধরে LGBTQ+ অধিকারের সমর্থক, তার Open Society Foundations মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকারসহ বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়মূলক কাজে তহবিল প্রদান করেন।

নাম	কোম্পানি	বিস্তারিত
Paul Singer	Hedge fund billionaire	Singer LGBTQ+ খাতের একজন বড় দাতা, বিশেষত তার American Unity PAC-এর মাধ্যমে, যা রক্ষণশীল মহলে LGBTQ+ অধিকারের উন্নতি সাধনে কাজ করে। তার সহায়তা New York-এ বৈবাহিক সমতা পাশ করতে সহায়ক ছিল।
Richard Branson	Founder of Virgin Group	Branson দীর্ঘকাল ধরে LGBTQ+ অধিকার এবং সমন্বয়ের সমর্থক। Virgin Group-এর মাধ্যমে তিনি LGBTQ+ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং অনুষ্ঠানে সমর্থন প্রদান করেছেন।
Larry Ellisn	Co-founder of Oracle	Ellison LGBTQ+ অধিকারের সমর্থক, এবং Oracle-এর কর্মস্থলে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বিভিন্ন LGBTQ+ কারণে দান করেছেন।

১৯৭০ সালে থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলজিবিটি অর্থায়নে টপ টেন সংস্থার লিস্ট করেছে এলজিবিটি ফান্ডারস নামক এক অর্গানাইজেশন:[১৩]

ফাউন্ডেশন	অনুদান (মিলিয়ন ডলার)	কার্যক্রম
Arcus Foundation	$১৮৪.৯৬	জন স্ট্রাইকার প্রতিষ্ঠিত, আর্কাস ফাউন্ডেশন সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে।
Ford Foundation	$১৩৪.৮১	বিশ্বের বৃহত্তম জনহিতকর ফাউন্ডেশন, LGBTQ+ আন্দোলনকে দীর্ঘকাল সমর্থন দিয়ে আসছে।
Gill Foundation	$১২৭.০৭	টিম গিলের প্রতিষ্ঠিত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমের LGBTQ+ সংস্থাগুলোকে সমর্থন করে।
Evelyn & Walter Haas, Jr. Fund	$৮৪.৪৮	সান ফ্রান্সিসকো ভিত্তিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

ফাউন্ডেশন	অনুদান (মিলিয়ন ডলার)	কার্যক্রম
Open Society Foundations	$৫৭.৫২	জর্জ সোরোসের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত, LGBTQ+ আন্দোলন সমর্থন এবং মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে।
Pride Foundation	$৫৭.২৬	যুক্তরাষ্ট্রে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পুরাতন ও বৃহত্তম কমিউনিটি ফাউন্ডেশন।
H. van Ameringen Foundation	$৪৮.২৭	ডাচ ব্যবসায়ী হান্স ভ্যান আমেরিঙ্গেন প্রতিষ্ঠিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে LGBTQ+ কে সমর্থন করে।
Tides Foundation	$৪৭.১১	জাতীয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠান, LGBTQ+ সংস্থার আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে।
Astraea Lesbian Foundation for Justice	$৩৬.০৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম লেসবিয়ান-কেন্দ্রিক ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায়বিচার সংগঠনকে অর্থায়ন করে।
Horizons Foundation	$৩২.৪৫	মিনেসোটা ভিত্তিক, LGBTQ+ সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষায় সহায়তা করে।

জেমস ওরফে জেনিফার প্রিটজকার, টাওয়ানি ফাউন্ডেশন

৬৩ বছর বয়সে কয়েক সন্তানের পিতা হয়েও নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঘোষণা দেন এবং বর্তমানে জেনিফার প্রিটজকার হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি তার টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারিজমের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থায়ন করে জেন্ডার আইডেন্টিটি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। জেনিফারের কিছু প্রতিষ্ঠান এবং তহবিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ এগুলো চিকিৎসা, আইন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সজেন্ডার আদর্শের দ্রুত প্রবর্তন ঘটিয়েছে। তিনি স্কোয়াড্রন ক্যাপিটাল নামে একটি অধিগ্রহণকারী কর্পোরেশন পরিচালনা করেন, যার ফোকাস মেডিকেল টেকনোলজি, মেডিকেল ডিভাইস এবং অর্থোপেডিক ইমপ্ল্যান্টের ওপর। তার তাওয়ানি ফাউন্ডেশন জেন্ডার ও মানব যৌনতা নিয়ে গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

জেনিফার প্রিটজকার ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার হিউম্যান সেক্সুয়ালিটি প্রোগ্রামের লিডারশীপ কাউন্সিলে আছেন, যেখানে তিনি গত দশ বছরে ৬.৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে শিকাগোর লুরি চিলড্রেন্স হসপিটাল, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর প্রিটজকার স্কুল অব মেডিসিন, এবং ইউনিভার্সিটি অব ভিক্টোরিয়ার ট্রান্সজেন্ডার স্টাডিজ চেয়ারকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছেন। এছাড়া, তার পরিবার প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ও আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনুদান দিয়ে থাকে, যা নারীদের প্রতি অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার এবং ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক।

জেনিফার প্রিটজকার সামরিক বাহিনীতে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করেছেন, Palm Center (যা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্তা বারবারা ভিত্তিক একটি LGBT থিঙ্ক ট্যাঙ্ক)-কে সামরিক বাহিনীতে ট্রান্সজেন্ডারদের অন্তর্ভুক্তির বৈধতা প্রমাণ করতে গবেষণা করার জন্য ১.৩৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন। এছাড়াও, তিনি Vermont এর Norwich University (যা একটি সামরিক একাডেমি এবং প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে Naval Reserve Officers' Training Corps প্রোগ্রাম চালু করেছে) কে ২৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন।

প্রিটজকারের অর্থায়ন শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং WPATH এর মাধ্যমে অন্যান্য দেশেও পৌঁছেছে, যেখানে ট্রান্সজেন্ডার সার্জারি নিয়ে অধ্যয়নরত চিকিৎসকদের জন্য সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থায়ন করা হয়।

প্রিটজকার কৌশলগতভাবে অর্থায়ন করে থাকেন এবং তার পরিবারও এই নীতি অনুসরণ করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দান করেন, যা তাদের আদর্শে প্রভাবিত হয় এবং তাদের শিক্ষার্থীরা ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু নিয়ে মেডিকেল জার্নাল এবং অন্যান্য স্থানে প্রবন্ধ লিখে।

প্রিটজকার অর্থায়ন প্রাপ্ত মেডিকেল স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী এবং সুবিধাভোগীদের বর্তমান কিছু কার্যক্রম এখানে উল্লেখ করা হলো[১২]:

* James Hekman লেকউড, ওহাইওতে LGBT মেডিকেল কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

* David T. Rubin আমেরিকার বৃহত্তম ফার্মাসিউটিক্যাল চেইন, Accordant/CVS Caremark-এর উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। CVS ২০১৫ সালে Target ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ফার্মাসিগুলো অধিগ্রহণ করে, যেটি ইউনিসেক্স বাথরুম নিয়ে সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু এবং Human Rights Campaign (HRC) এর ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে সক্রিয় একটি গ্রুপকে অর্থায়ন করে।

* Loren Schecter প্রথম ট্রান্সজেন্ডার সার্জারির সার্জিকাল অ্যাটলাসের লেখক এবং প্রো-ট্রান্স জার্নালের লেখক। তিনি ট্রান্সজেন্ডারদের আইনি সুরক্ষায় পুরস্কৃত হয়েছেন, পুনর্গঠনমূলক সার্জারি সম্পন্ন করেন এবং World Professional Association of Transgender Health (WPATH)-এর স্পন্সরকৃত ট্রান্সফেমিনাইন কনফারেন্সের পরিচালক।

* Robert Garofalo, একজন সমকামী পুরুষ, লুরি চিলড্রেন'স হসপিটালের জেন্ডার ক্লিনিকের পরিচালক এবং Northwestern University-র পেডিয়াট্রিক্সের অধ্যাপক, যা J.B. Pritzker-এর তহবিলে পরিচালিত।

* Benjamin N. Breyer সান ফ্রান্সিসকো জেনারেল হাসপাতালের ইউরোলজির প্রধান এবং University of California at San Francisco-এর অধ্যাপক, যিনি ট্রান্সজেন্ডার সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ।

* Nicholas Matte Mark Bonham Centre for Sexual Diversity Studies, University of Toronto-তে শিক্ষাদান করেন। তিনি ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ এবং Jennifer Pritzker দ্বারা অর্থায়নকৃত Bonham Centre এর সাথে জড়িত।

* Mark Hyman ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে প্রিটজকার ফাউন্ডেশনের চেয়ার ইন ফাংশনাল মেডিসিন এবং সেন্টার ফর ফাংশনাল মেডিসিনের পরিচালক। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক আমেরিকার প্রথম জরায়ু প্রতিস্থাপন করেছে।

* Baylor College of Medicine প্রিটজকার স্কুল অব মেডিসিনের 'pipeline programs'-এর সুবিধাভোগী। এই কলেজেই আমেরিকার প্রথম জরায়ু প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে।

এগুলো প্রিটজকার পরিবারের অর্থায়নের কিছু উদাহরণ, যা মেডিকেল,

শিক্ষাবিদ্যা এবং ট্রান্সজেন্ডার সার্জারি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করছে।

জর্জ সরোস, ওপেন সোস্যাইটি ফাউন্ডেশন

জর্জ সরোসের Open Society Foundations (OSF) LGBT অধিকার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প ও সংস্থায় আর্থিক সহায়তা প্রদান, লিঙ্গ পরিচয় স্বীকৃতির (Self-ID) আন্দোলনকে সমর্থন এবং আইনগত ও নীতিগত পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালানো। OSF বিশ্বব্যাপী LGBT সংগঠনগুলোকে সাহায্য করে, যেমন- ইউরোপে Transgender Europe এবং ILGA-Europe, আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ায় সচেতনতা ও আইনি সহায়তা প্রদান, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে The Movement Advancement Project (MAP)-এর মাধ্যমে প্রচারণা চালায়। এশিয়াতেও তারা LGBT অধিকার প্রসারে কাজ করছে, আইনগত ও সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

OSF-এর সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য LGBT নেতাদের মধ্যে আছেন আদ্রিয়ান কোমান (Adrian Coman), ২০১৩ সালে আদ্রিয়ান কোমান, যিনি জর্জ সরোস এর ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনস-এর একজন অভিজ্ঞ সদস্য (যা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচারে উদ্যোগ নিয়েছে), আর্কাস ফাউন্ডেশন এ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রোগ্রামের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এর আগে, কোমান ইন্টারন্যাশনাল গে অ্যান্ড লেসবিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এবং ২০১৫ সালে আর্কাস এবং নোভো ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে এবং অর্থায়ন করেছে ট্রান্সজেন্ডারিজমের জন্য। নোভো প্রতিষ্ঠাতা পিটার বাফেট, বিলিয়নিয়ার ওয়ারেন বাফেট-এর পুত্র।

OSF এর প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী LGBT অধিকার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে, সমাজে সমতা ও অধিকারের বার্তা ছড়িয়ে দিতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

টিম গিল (Tim Gill)

টিম গিল (জন্ম ১৮ অক্টোবর, ১৯৫৩) একজন আমেরিকান কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রামার, উদ্যোক্তা, দানশীল ব্যক্তি এবং LGBTQ অধিকার কর্মী। তিনি প্রথম ওপেনলি গে ব্যক্তি হিসেবে Forbes 400 তালিকায় স্থান লাভ করেন।

তিনি গিল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-চেয়ারম্যান, যা ডেনভারে ভিত্তিক একটি বেসরকারি দাতব্য সংস্থা যা LGBTQ আমেরিকানদের জন্য জাতীয় সিভিল রাইটস সুরক্ষায় সহায়তা করে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে LGBTQ অধিকার আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে বড় একক দাতা ছিলেন, ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ব্যক্তিগতভাবে $৫০০ মিলিয়নেরও বেশি অনুদান দিয়েছেন[১৪]।

গিল সফটওয়্যার কোম্পানি কুয়ার্ক, ইনক.-এরও প্রতিষ্ঠাতা। গিল ১৯৯৯ সালে কোম্পানির ৫০ শতাংশ শেয়ার $৫০০ মিলিয়নের বিনিময়ে বিক্রি করেন। কুয়ার্ক, ইনক.-এ তার শেয়ার বিক্রির পর, গিল তার সম্পদের ষাট শতাংশ – $৩০০ মিলিয়নেরও বেশি – LGBTQ অধিকার রক্ষায় বরাদ্দ করেন[১৫]।

তাকে একটি দূরদর্শী কৌশলবিদ এবং বৃহৎ দাতা হিসেবে প্রশংসা করা হয় যিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি প্রধান LGBTQ অধিকার বিজয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ২০০৩ সালের গুডরিজ বনাম পাবলিক হেলথ বিভাগের সিদ্ধান্ত যা ম্যাসাচুসেটসকে প্রথম মার্কিন রাজ্য হিসেবে এক লিঙ্গের বিবাহের অনুমতি দেয়, থেকে শুরু করে ২০১৫ সালের মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের Obergefell v. Hodges সিদ্ধান্ত যা পুরো দেশে এক লিঙ্গের বিবাহকে বৈধ করে, তার অবদান সর্বত্রই ছিল।

জন স্ট্রাইকার, আরকাস ফাউন্ডেশন

জন স্ট্রাইকার সমকামীদের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ দাতব্য দাতাদের একজন LGBT সম্প্রদায়ের জন্য। তার Arcus Foundation হলো যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ LGBT-নির্দিষ্ট দাতব্য সংস্থা। জন স্ট্রাইকার (Jon Stryker) হলেন Stryker Corporation-এর প্রতিষ্ঠাতার নাতি, যেটি একটি বিশাল সার্জিক্যাল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। মিশিগান-এর কালামাজু শহরের স্ট্রাইকার কর্পোরেশন ২০১৮ সালে ১৩.৬ বিলিয়ন ডলারের সার্জিক্যাল সরঞ্জাম ও সফটওয়্যার বিক্রি করেছে। জন স্ট্রাইকার

সমকামী, যিনি ২০০০ সালে Arcus Foundation প্রতিষ্ঠা করেন। এটি LGBT সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বড় দাতব্য সংস্থা[১১]।

* Arcus Foundation ২০০৭ এবং ২০১০ সালের মধ্যে LGBT সম্পর্কিত প্রকল্প ও সংস্থায় ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার দান করেছে, এবং Stryker নিজে ৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দান করেছেন।

* আরকাস ফাউন্ডেশন দশ বছরে (২০১০-২০২০) ১৬০ মিলিয়ন ডলারে বেশী এলজিবিটি অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেছে[১৬]।

* জন এর বোন রন্ডা স্ট্রাইকার (Ronda Stryker) উইলিয়াম জনস্টন-এর সাথে বিবাহিত, যিনি Greenleaf Trust-এর চেয়ারম্যান। রন্ডা এবং জনস্টন Spelman College-কে মোট ৩০ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন এবং সম্প্রতি সেখানে Queer Studies প্রোগ্রামের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। Ronda Kalamazoo College-এর ট্রাস্টি এবং Harvard Medical School-এর বোর্ড অব ফেলোদের সদস্যও।

* ২০১৫ সালের আগে, স্ট্রাইকার লিঙ্গ পরিচয় এবং ট্রান্সজেন্ডারিজমের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা করেছেন। ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় বহু দেশকে সাহায্য করেছেন। এর মধ্যে ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় ৫৪টি দেশ অংশগ্রহণকারী ILGA, একটি LGBT সংস্থা এবং ৪৩টি দেশ অংশগ্রহণকারী Transgender Europe অন্তর্ভুক্ত ছিল (Transgender Europe-এর ছোট সংস্থাগুলোর মধ্যে TENI, Transgender Equality Network Ireland ও অর্থায়ন করেছে)।

* ২০০৮ সালে আর্কাস আর্কাস অপারেটিং ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে, যা সম্মেলন, নেতৃত্বের প্রোগ্রাম এবং গবেষণা প্রকাশনা সংগঠিত করে।

LGBT কোর গ্রুপ গঠিত হয়েছে, যা জাতিসংঘে LGBT মানবাধিকার সমস্যা তুলে ধরে। কোর গ্রুপ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আর্কাস এর দ্বারা অর্থায়িত আউটরাইট অ্যাকশন আন্তর্জাতিক এবং হিউম্যান রাইটস কমিশন অন্তর্ভুক্ত। কোর গ্রুপ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আলবেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, এল সালভাদর, ফ্রান্স, জার্মানি, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, মোন্টেনেগ্রো, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত।

এই উদ্যোগগুলো রাজনৈতিক কর্মী, নেতৃত্ব, ট্রান্সজেন্ডার আইন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং নাগরিক অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে লিঙ্গ পরিচয় এবং ট্রান্সজেন্ডারিজম প্রচার করে। আর্কাস সমর্থিত সংস্থাগুলির মধ্যে

* ভিক্টরি ইনস্টিটিউট,
* দ্য সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেস,
* এসিএলইউ,
* ট্রান্সজেন্ডার ল ফাউন্ডেশন,
* ট্রান্স জাস্টিস ফান্ডিং প্রজেক্ট,
* আউটরাইট অ্যাকশন আন্তর্জাতিক,
* হিউম্যান রাইটস ওয়াচ,
* দ্য কাউন্সিল ফর গ্লোবাল ইকুয়ালিটি, জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, এবং GLSEN অন্তর্ভুক্ত। সেক্সুয়ালিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড এডুকেশন কাউন্সিল অব দ্য ইউএস (SIECUS),
* অ্যাডভোকেটস ফর ইয়ুথ, অন্সার, GLSEN, দ্য হিউম্যান রাইটস ক্যাম্পেইন (HRC) ফাউন্ডেশন এবং প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন অফ আমেরিকা (PPFA)

এই প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগগুলো লিঙ্গ পরিচয় মতবাদকে সমর্থন করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাসমূহ, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক অ্যাসোসিয়েশনসমূহ, পুলিশ বিভাগের প্রশিক্ষণ এবং গ্রেড স্কুল, হাই স্কুল (GLSEN, যার প্রতিষ্ঠাতা টিম গিল) এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (যেমন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেলম্যান কলেজ, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল) প্রচার করছে। আর্কাস, স্ট্রাইকার পরিবারের অংশ, সারা বিশ্বে LGBT অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এলজিবিটি ফান্ডিং এর ব্যাপকতা নিয়ে একটি ধারণা

বিশ্বব্যাপী এলজিবিটি মতবাদ প্রসারে কী পরিমাণে ফান্ডিং হয় তার নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করছি। আমেরিকার ফাউন্ডেশনগুলো নির্দিষ্ট টেমপ্লেট ব্যবহার করে

সরাসরি এলজিবিটি উদ্যোগে সরাসরি অনুদান দিয়ে থাকে। তাছাড়া আইআরএস ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি আইআরএস ফর্ম ৯৯০ ডেটা বিশ্লেষণ করা কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফাউন্ডেশনগুলো LGBTQ+ সম্প্রদায় এবং তাদের বিভিন্ন উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য মোট $২৫৮.১ মিলিয়ন ডলার অনুদান প্রদান করেছে[১৭]।

পশ্চিমা জনগণের ট্যাক্সের অর্থে এলজিবিটির বিশ্বায়ন

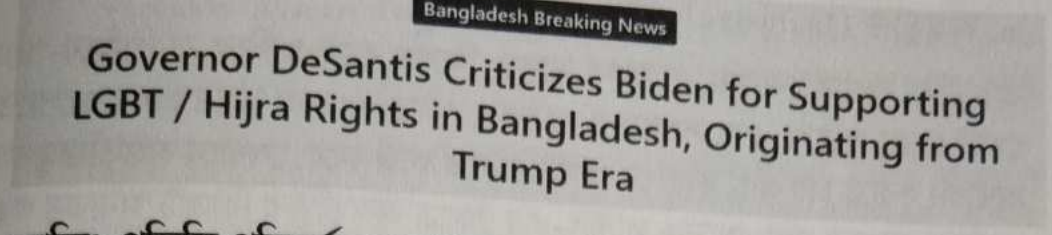
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক সমস্যাসহ বৈশ্বিক সমস্যা সত্ত্বেও বাইডেন প্রশাসন LGBT উদ্যোগগুলোতে গুরুত্ব দিয়েছে, গত তিন বছরে ৪.১ বিলিয়ন ডলার ফেডারেল তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক LGBT প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে[১৮]। এই বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে LGBT গ্র্যান্ট, প্রাইড মাস উদ্‌যাপন, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পাসপোর্ট এবং আন্তর্জাতিক LGBT কার্যক্রমের জন্য সহায়তা।

The U.S. Puts $4.1 Billion toward LGBT Causes Globally

Sarah Holliday | November 7, 2023

এলজিবিটি অধিকার কায়েমে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন কোলোনা ২০২৩ সালে জাতিসংঘে LGBTQ+ গোষ্ঠীর ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অধিবেশনে দুই মিলিয়ন ইউরো ($২.১ মিলিয়ন ডলার) তহবিলের ঘোষণা দেন[১৯]। ফ্রান্স ২০২২ সালে এলজিবিটি অধিকারের জন্য জাতিসংঘে একজন রাষ্ট্রদূতকে নিয়োগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এলজিবিটি অধিকারকে তার কূটনৈতিক অগ্রাধিকারের একটি প্রধান বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এবং তার প্রশাসন ২০২১ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে একজন বিশেষ দূত নিয়োগ করেছে।

ফ্লোরিডার রিপাবলিকান গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বাইডেন প্রশাসন ইউএসএইডের মাধ্যমে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে, যা জনগণের ট্যাক্সের অপচয়[২০]। তবে সিএনএন জানিয়েছে, এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে ২০১৮ সালে।


Bangladesh Breaking News

Governor DeSantis Criticizes Biden for Supporting LGBT / Hijra Rights in Bangladesh, Originating from Trump Era

ফান্ডিং পলিসি পরিবর্তনের মাধ্যমে এলজিবিটি প্রচার-প্রসার

প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি অর্থায়ন করা ছাড়াও বেশির ভাগ পশ্চিমা দাতব্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ইন্টারসেকশনালিটি (Intersectionality), বৈচিত্র্য (Diversity) এবং অন্তর্ভুক্তি (Inclusive) ব্যানারে যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নে এলজিবিটি ইস্যুকে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে পলিসি গ্রহণ করেছে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে এটা গুরুত্ব পাচ্ছে তার সম্পর্কে জানা দরকার।

১. ইন্টারসেকশনালিটি অন্যতম বিবেচনার বিষয়

ইন্টারসেকশনালিটি বলতে বোঝায়, একজন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিচয়ের অধিকারী—যেমন- বর্ণ, লিঙ্গ, যৌন অভিমুখ (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন), অর্থনৈতিক অবস্থা—যার ওপর ভিত্তি করে তারা বৈষম্যের শিকার হতে পারে। দাতারা এমন প্রকল্পে অর্থায়ন করতে চায় যেগুলো দেখায় যে, এই ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়গুলো সম্মলিত বা একত্রিতভাবে কিভাবে পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীকে (সমকামী) প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সংগঠন LGBTQ+ অধিকারের জন্য কাজ করে, তাদের বিবেচনা করতে হবে যে, ব্ল্যাক বা কৃষ্ণাঙ্গ LGBTQ+ ব্যক্তি একজন শ্বেতাঙ্গ LGBTQ+ ব্যক্তির চেয়ে ভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। জর্জ সরোসের Open Society Foundation এবং Ford Foundation এই ধরনের ইন্টারসেকশনাল বিষয়কে বিবেচনা করে প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়।

২. বৈচিত্র্য (Diversity) অগ্রাধিকার দেয়া

বৈচিত্র্য বলতে বোঝানো হয় সংগঠনের কর্মী, পরিচালনা এবং তাদের সেবাগ্রহণকারী সম্প্রদায়গুলোতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং পটভূমির প্রতিনিধিত্ব। দাতারা আশা করেন, যেসব প্রকল্পে নেতৃত্ব বা কার্যক্রম বৈচিত্র্যময়, সেগুলোই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে। যেমন- গেটস ফাউন্ডেশন বা ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন এমন প্রকল্পে তহবিল প্রদান করে যা দলগত বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৩. অন্তর্ভুক্তি (Inclusive) একটি অপরিহার্য শর্ত

অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায়, যেসকল মানুষ, বিশেষ করে প্রান্তিক বা পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীগুলো সুযোগ এবং সম্পদের অধিকার পাবে। দাতারা এমন প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করতে চায় এবং তারা যে কমিউনিটিতে কাজ করে, সেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম প্রাধান্য দেয়। অনেক ফান্ডিং-এর ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অন্যতম শর্ত হিসেবে দেয়া হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং LGBTQ+ ব্যক্তিদের প্রোগ্রাম বা সুবিধাভোগী হিসেবে এসব প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (SDGs) পূরণে এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যাতে বিশেষ করে SDG-10 তথা অসমতা হ্রাস এবং ইনক্লুসিভ নীতিমালা প্রসারে মনোনিবেশ করে(United Nations, Sustainable Development Goals, sdgs.un.org)।

বৃহৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান যেমন USAID এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমন প্রকল্পগুলোকে অর্থায়ন করে যা নারী, LGBTQ+ সম্প্রদায়, আদিবাসী গোষ্ঠী এবং কাঠামোগত বৈষম্যে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করে (USAID, LGBTQI+ Inclusive Development, usaid.gov)।

References

1. Global survey finds 9% of adults identify as LGBTQ. NBC News https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/global-survey-finds-9-adults-identify-lgbtq-rcna87288 (2023).
2. Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund | The Business Standard. https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/brac-uni-be-early-recipient-soross-1-billion-fund-39805.
3. Open Society's Commitment to Diversity, Equity, and Inclusion. https://www.opensocietyfoundations.org/employment/our-commitment-to-diversity.
4. Open Socity (LGBTQI). https://www.opensocietyfoundations.org/voices/topics/lgbtqi.
5. The Best Ways to Achieve Trans Equality (Open Society Foundation). https://www.opensocietyfoundations.org/publications/license-be-yourself.
6. Gender self-identification. Wikipedia (2024).
7. No Government Should Get to Decide This. (2014).
8. Maren, J. V. How a Handful of Billionaires Created the Transgender

'Movement': An Interview with Jennifer Bilek. https://europeanconservative.com/articles/interviews/how-a-handful-of-billionaires-created-the-transgender-movement-an-interview-with-jennifer-bilek/ (2024).

9. JB Pritzker, Jennifer Pritzker, & Synthetic Sex Identities. Tablet Magazine https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/billionaire-family-pushing-synthetic-sex-identities-ssi-pritzkers (2022).
10. Bilek, J. Foundations Are Setting the Transgender Agenda and Targeting Children. The American Conservative https://www.theamericanconservative.com/foundations-are-setting-the-transgender-agenda-and-targeting-children/ (2021).
11. The Billionaires Behind the LGBT Movement | Jennifer Bilek | First Things. https://www.firstthings.com/web-exclusives/2020/01/the-billionaires-behind-the-lgbt-movement.
12. Who Are the Rich, White Men Institutionalizing Transgender Ideology? https://thefederalist.com/2018/02/20/rich-white-men-institutionalizing-transgender-ideology/.
13. LGBTQ Philanthropy Since Stonewall: The Top Ten Funders of All Time. Funders for LGBTQ Issues https://lgbtfunders.org/newsposts/lgbtq-philanthropy-since-stonewall-the-top-ten-funders-of-all-time/.
14. Who Is Tim Gill? - 5280. https://www.5280.com/who-is-tim-gill/.
15. Meet Tim Gill, Megadonor Behind LGBTQ Rights Movement Wins - Rolling Stone. https://web.archive.org/web/20180628234005/https://www.rollingstone.com/politics/features/meet-tim-gill-megadonor-behind-lgbtq-rights-movement-wins-w489213.
16. Our Support | Social Justice and Great Apes & Gibbons Programs. https://www.arcusfoundation.org/our-support/.
17. 2022 Resource Tracking Report. Funders for LGBTQ Issues https://lgbtfunders.org/research-item/2022-tracking-report/.
18. Holliday, S. The U.S. Puts $4.1 Billion toward LGBT Causes Globally. https://washingtonstand.com/news/the-us-puts-41-billion-toward-lgbt-causes-globally (2023).
19. France sets up fund through embassies to defend LGBTQ rights. France 24 https://www.france24.com/en/europe/20230918-france-sets-up-fund-through-its-embassies-to-defend-lgbtq-rights (2023).
20. Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump | CNN Politics. https://edition.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html.

সমকামিতা বিশ্বায়নে জাতিসংঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের (United Nations) জন্ম হয়। আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) এবং চীন ছিল এর অন্যতম উদ্যোক্তা। ৫১টি দেশের প্রতিনিধিরা ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'লীগ অব নেশন্স' (League of Nations) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল। তবে এটি সফল না হওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমানে ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল—

* বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা
* মানবাধিকার রক্ষা করা
* যুদ্ধ প্রতিরোধ করা
* আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
* অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা

জাতিসংঘকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সমীহের চোখে দেখে। কিন্তু বাস্তবে জাতিসংঘের কর্মকাণ্ড এই সমীহ লাভের যোগ্য নয়। বিশ্বে শান্তি এবং মানবাধিকার কায়েমের লক্ষ্যে জন্ম নেয়া এই আন্তঃসরকার (Interovernmental organization) সংস্থা এখনও পর্যন্ত কোনো আশানুরূপ নজির স্থাপন করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, ১৯৪৮ সালের আগে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। পশ্চিমা প্রকল্প হিসেবে ফিলিস্তিনে এই দখলদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি ছিল মানবাধিকারের চরম লংঘন। চলমান গাজা-ইসরায়েল যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪২ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে ১৬,৫০০ জনই শিশু; আহত হয়েছে কমপক্ষে ৯৫ হাজার।

জাতিসংঘের সক্ষমতা আসলে কতটুকু

জাতিসংঘের রিকেমেন্ডেশনস বা সুপারিশগুলোর সাধারণত আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। এটা নির্ভর করে প্রস্তাবনার প্রকার এবং কোন সংস্থা থেকে এসেছে, তার ওপর। যেমন-

* জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবনা (UN General Assembly Resolutions) সাধারণত সুপারিশ হিসেবে গণ্য হয় এবং এর কোনো আইনি শক্তি নেই। এসব প্রস্তাবনা আন্তর্জাতিক নিয়ম ও নীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এগুলোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

* জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনায় (UN Security Council Resolutions) কিছু ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। বিশেষ করে শান্তি ও নিরাপত্তার ইস্যু নিয়ে প্রস্তাবনা হলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রেরা বাধ্যবাধক (বাইন্ডিং) সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন- নিষেধাজ্ঞা বা সামরিক হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয়া।

* জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সুপারিশ (UN Human Rights Council Recommendations) সাধারণত প্রস্তাবনা বা প্রতিবেদন আকারে থাকে। এগুলো কিছু ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে তবে এগুলো মানতে কোনো দেশ আইনগতভাবে বাধ্য না।

* জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রেরা যদি কোনো চুক্তি বা সম্মেলনে সম্মতি জানায়, তখন এসব চুক্তি (Treaties and Conventions) আইনগতভাবে বাধ্যবাধক হয়। উদাহরণস্বরূপ, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা নিজে আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, কিন্তু পরে গৃহীত চুক্তিগুলো, যেমন- আন্তর্জাতিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিগুলো বাধ্যবাধক।

মোট কথা, জাতিসংঘের সুপারিশগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জাতীয় নীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে; কিন্তু সাধারণত আইনগতভাবে বাধ্যবাধক নয়, যতক্ষণ না নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্যবাধক সিদ্ধান্ত নেয়।

টাইমলাইন: জাতিসংঘে সমকামী অধিকার যেভাবে মানবাধিকার ইস্যু হয়ে উঠল[1]

৮০'র দশকের শুরুতে এইচআইভি/এইডস মহামারী প্রতিরোধের লক্ষ্যে সমকামিতা নিয়ে জাতিসংঘে প্রথম আলোচনা হয়। ১৯৯৫ সালে নারী অধিকারের মোড়কে সমকামী অধিকারের দাবী জানান সাউথ আফ্রিকার এক লেসবিয়ান। তিনি বলেন, লেসবিয়ানদের অধিকার হচ্ছে নারী অধিকার।

জাতিসংঘের টাইমলাইন: সমকামী আচরণকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি

১৯৯৪

Toonen v. Australia: অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ায় সডোমি (পায়ুকামিতা) আইন বাতিল করা হয়। টুনেন তাসমানিয়ান এইডস কাউন্সিলের সাধারণ ব্যবস্থাপক থাকাকালীন সময়ে পায়ুসংগম আইনত অপরাধ ছিল। টুনেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির কাছে অভিযোগ করেন যে, এটি International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)-এর ১৭ এবং ২৬নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। জাতিসংঘে এই অভিযোগের কারণে টুনেন অস্ট্রেলিয়ায় তার চাকরি হারান। পরে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটিও বলে যে, তাসমানিয়ায় এই আইনের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার সরকার ICCPR লঙ্ঘন করেছে এবং জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়ায় অস্ট্রেলিয়া শেষমেশ তাদের সডোমি আইনটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

১৯৯৫

Bev Ditsie Speech at the Fourth Conference on Women in Beijing: দক্ষিণ আফ্রিকার সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট বেভারলি পালেসা ডিটসি ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে LGBTQ+ অধিকারের পক্ষে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,

'কোনো নারী তার যৌনতা নিজে নির্ধারণ করতে না পারলে জীবনের গতিপথও সে নির্ধারণ করতে পারে না। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা আমাদের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

এ বিষয়ে কাউকে বল প্রয়োগ করা ঠিক না। যার যেভাবে খুশি, সেভাবে নিজের যৌনজীবন বাছাই করুক। যে সত্যিকার অর্থে নারী অধিকারের প্রতি আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাকে স্বাধীনভাবে নারীর যৌনতা বাছাইয়ের অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। তাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। আপনারা স্বীকার করে নিন যে, লেসবিয়ানদের অধিকার হচ্ছে নারী অধিকার, আর নারী অধিকার সার্বজনীন এবং অপরিহার্য এক মানবাধিকার।'

২০০০

UN General Assembly Resolution: ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions বিষয়ক রেজল্যুশনে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি LGBTQ+ সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল এবং এখানে অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই রেজোলিউশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে তাদের অধীনে থাকা সকল প্রকার যৌনতার ব্যক্তিদের যৌন অধিকার রক্ষা করার আহ্বান জানায়, সেই সাথে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কারণে ঘটে যাওয়া সকল হত্যার বিষয়ে দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালানোর দায়িত্ব দেয়। এই রেজোলিউশনটি প্রতি দুই বছর অন্তর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। ২০১০ সালে রেজোলিউশন থেকে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কথাটি বাদ দেওয়ার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। সিভিল সোসাইটি এবং এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপক বিরোধিতার মুখেও রেজোলিউশনে 'সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন' বিষয়টিকে বহাল তবিয়তে রেখে দেয়া হয়।

২০০৫

Joint Statement on LGBT Rights: নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে মানবাধিকার কমিশনে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কেন্দ্রিক বৈষম্যকে নিন্দা জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি পেশ করা হয়। সকল রাষ্ট্রকে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

২০০৬

Joint Statement at Human Rights Council: নরওয়েতে গঠিত মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রথমবারের মতো যৌন এবং লিঙ্গ পরিচয়ভিত্তিক (Sexual Orientation and Gender Identity, SOGI) মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যৌথ বিবৃতি পেশ করা হয়।

২০০৮

Comprehensive Statement at General Assembly: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) ভিত্তিক বৈষম্য, সহিংসতা ও একে অপরাধীকরণ অবসানের দাবি জানিয়ে একটি বিস্তৃত বিবৃতি পেশ করা হয়। এই বছরেই জাতিসংঘের LGBTQ+ কোর গ্রুপ (LGBTQ Core Group) গঠিত হয়।

২০১১

Historic Resolution on SOGI: মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রথমবারের মতো যৌন অভিমুখিতা (sexual orientation) ও লিঙ্গ পরিচিতি (Gender identity) সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০১১ সালের ১৭ জুন মানবাধিকার কাউন্সিলে A/HRC/RES/17/19 নামক প্রথম প্রস্তাবটি গৃহীত করে, যেখানে যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচিতি (SOGI) সম্পর্কিত মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়। এই প্রস্তাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারকে SOGI-এর ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আইন ও কার্যকলাপ এবং সহিংসতার ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বের ২৩টি দেশের সমর্থনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এর ফলে SOGI-এর ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্যমূলক আইনসমূহের ব্যাপক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, যা জাতিসংঘের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত হয়।

২০১২

Gender Identity Added to UN Proposal: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিচারবহির্ভূত হত্যা বিষয়ক প্রস্তাবনায় জেন্ডার আইডেন্টিটি স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়।

২০১৩

Free & Equal Campaign Launched: সমকামিতা ও ট্রান্সফোবিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের বৈশ্বিক প্রচারাভিযান, 'ইউএন ফ্রি অ্যান্ড ইক্যুয়াল' ক্যাম্পেইনের সূচনা। এই ক্যাম্পেইনটি জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য অংশীদারদের সহায়তায় শুরু হয়। এটি একটি অনন্য বৈশ্বিক জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান, যার উদ্দেশ্য হলো LGBTQ+আই ব্যক্তিদের সমান অধিকার ও ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করা। এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিও, আকর্ষণীয় গ্রাফিক্স এবং সহজ ভাষার তথ্যপত্রের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষদের কাছে পৌঁছায়। বছরের পর বছর ধরে এতে বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন, যেমন—মার্কিন গায়ক রিকি মার্টিন, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীতশিল্পী ইভন চাকা এবং বলিউড অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি। ২০১৩ সাল থেকে এই ক্যাম্পেইনের আওতায় অসংখ্য প্রচারণা চালানো হয়েছে, যার মধ্যে LGBTQ+আই ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত গল্প এবং মানবাধিকারের শিক্ষামূলক উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০১৫

LGBT Rights Discussed at Security Council: ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো নিরাপত্তা পরিষদের আরিয়া ফর্মুলা বৈঠকে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়, যা চিলি ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল। এই বৈঠকে বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে LGBTQ+ ব্যক্তিদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই ঐতিহাসিক বৈঠকটি একটি বার্তা দেয় যে, যৌন অভিমুখিতা বা লিঙ্গ পরিচিতির ভিত্তিতে সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয় এবং LGBTQ+ ব্যক্তিদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

২০১৬

Independent Expert on SOGI: ২০১৬ সালের জুন মাসে, মানবাধিকার কাউন্সিল A/HRC/RES/32/2 প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, যা যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচিতির ভিত্তিতে সহিংসতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানে স্বাধীন বিশেষজ্ঞের ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠা করে।

এই স্বাধীন বিশেষজ্ঞের (SOGI) ম্যান্ডেট বিস্তৃত, যার মধ্যে মানবাধিকার মানদণ্ডের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, SOGI ভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণ চিহ্নিত করা এবং উত্তম পদ্ধতির উদাহরণ সংগ্রহ করা অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলো থিম্যাটিক রিপোর্টের মাধ্যমে মানবাধিকার কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। প্রথম স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন থাইল্যান্ডের ভিটিট মুন্তারভর্ন, এবং বর্তমানে এই পদে রয়েছেন কোস্টারিকার ভিক্টর মাদ্রিগাল-বোর্লোজ।

২০১৯

Intersex Issues at Human Rights Council: মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রথমবারের মতো খেলাধুলার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক পদ্ধতি এবং মহিলা ক্রীড়াবিদদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে আলোচনা হয়।

২০২১

Second Resolution on LGBT Rights at General Assembly: ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ A/RES/76/176 প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, যা যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচিতি সরাসরি উল্লেখ করা দ্বিতীয় প্রস্তাব। 'গণতন্ত্রায়নে জাতিসংঘের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ এবং নিয়মিত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উন্নয়ন' শিরোনামের এই প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে উত্থাপিত হয়। এতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচিতিসহ (অন্যান্য বিষয় ছাড়াও) জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় বৈষম্যমূলক আইন, নীতি ও কার্যক্রম বিলোপের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবটি ৮৭টি রাষ্ট্রের সহ-সমর্থনে গৃহীত হয়।

২০২২

CEDAW Ruling on Decriminalization in Sri Lanka: নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ কমিটি (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) রায় দিয়েছে যে, শ্রীলঙ্কা রোসানা ফ্লেমার-ক্যালডেরার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। ফ্লেমার-ক্যালডেরা

LGBTQ+আই সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় কাজ করা সংগঠন 'ইক্যুয়াল গ্রাউন্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক।

এই মামলাটি CEDAW-তে আনা হয় শ্রীলঙ্কার একটি আইনকে চ্যালেঞ্জ করে, যা সমলিঙ্গের যৌন কার্যকলাপকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। ফ্লেমার-ক্যালডেরা দাবি করেন, নারীদের মধ্যে সমলিঙ্গের যৌন কার্যকলাপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং এর ফলে গ্রেফতার ও বিচার প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা লিঙ্গ ও যৌন অভিমুখিতার ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং তার বৈষম্যমুক্ত থাকার অধিকার লঙ্ঘন করে।

CEDAW রায় দিয়েছে যে, ফ্লেমার-ক্যালডেরা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে CEDAW শ্রীলঙ্কাকে সমলিঙ্গের যৌন কার্যকলাপকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে, যা নারী বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক কনভেনশনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

জাতিসংঘ কীভাবে ফান্ড সংগ্রহ করে

জাতিসংঘ একটা 'রাষ্ট্র' বা বিজনেস প্রতিষ্ঠানের মতো নয়। এটা একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ক্লাবের মতো। এর কার্যক্রম এবং প্রকল্প পরিচালনা করতে বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা। যেমন-

* সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদা: এটি জাতিসংঘের ফান্ডিং-এর প্রধান উৎস। এসব চাঁদা প্রত্যেক দেশের মোট জাতীয় আয়ের (GNI) ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সাধারণ বাজেট এবং বিশেষ প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত কন্ট্রিবিউশান বা চাঁদা দেয়।

* ভলান্টারি ডোনেশন: নির্ধারিত চাঁদা ছাড়াও, সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থা বিশেষ জাতিসংঘ প্রোগ্রাম এবং এজেন্সিগুলোতে স্বেচ্ছায় দান করতে পারে। সাধারণত নির্দিষ্ট প্রকল্প বা উদ্যোগকে সহায়তা করতে এই সংগৃহীত ফান্ড বরাদ্দ দেয়া হয়।

* স্পেশালাইড এজেন্সি: জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি, যেমন UNICEF, WHO, এবং UNHCR, ফান্ড সংগ্রহের জন্য সদস্য রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ব্যক্তিগত দাতা (private donor) এবং দাতব্য ফাউন্ডেশন

(Philanthropic foundation) শরণাপন্ন হয়। জাতিসংঘের প্রতিটি এজেন্সি বা অনুসংস্থা তার নিজস্ব বাজেট এবং তহবিল সংগ্রহ পরিচালনা করে।

* আন্তর্জাতিক সংস্থা: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান, যেমন বিশ্বব্যাংক এবং রিজনাল ডেভেলোমেন্টাল ব্যাংক, জাতিসংঘের উদ্যোগ এবং প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, বিশেষ করে উন্নয়ন (Development) এবং মানবিক সহায়তার (humanitarian assistance) সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোতে।

* প্রাইভেট সেক্টরঃ ফান্ডিং এবং পার্টনারশীপে জন্য কর্পোরেট এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্পন্সরশীপ এবং কোলাবোরেশনের প্রকল্পের মাধ্যমে জড়িত হয়।

* দাতব্য ফাউন্ডেশন: ব্যক্তিগত দাতব্য ফাউন্ডেশনগুলো, যেমন LGBTQ+ প্রমোটকারী বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন, আরকাস ফাউণ্ডেশন জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং উন্নয়ন সেক্টরে।

* ক্রাউডফান্ডিং এবং জনসাধারণের দান: জাতিসংঘের কিছু এজেন্সি বা সংস্থা ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এবং সরাসরি জনগণের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে বিশেষ প্রকল্প বা উদ্যোগ পরিচালনার জন্য।

এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অ-ব্যবস্থাপনার সুযোগ ব্যবহার করে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন পশ্চিমা এজেন্ডা বা মূল্যবোধ (নারীবাদ, সমকামিতা) চাপিয়ে দিতে পারে।

জাতিসংঘের সিস্টার প্লাটফর্ম/সংস্থা LGBTQ+ অধিকার প্রসারে কাজ করে

১. মানবাধিকার কাউন্সিল (HRC) LGBTQ+ অধিকার-সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেখানে বৈষম্য, সহিংসতা এবং আইনি সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে, ২০১১ সালে HRC যৌন অভিমুখীতা (sexual orientation) ও লিঙ্গ পরিচয় (Gender

Identity) নিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে, যা LGBTQ+ অধিকারকে মানবাধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

২. জাতিসংঘ মহাসচিব জাতিসংঘ মহাসচিব প্রায়ই LGBTQ+ অধিকার সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করেন এবং LGBTQ+ বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো তুলে ধরেন। মহাসচিব সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং বৈশ্বিকভাবে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রচারণা চালান।

৩. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) বিভিন্ন কর্মসূচি ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকারকে সমর্থন করে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এটি আইনি সংস্কার প্রচার, বৈষম্য মোকাবিলা এবং LGBTQ+ ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করে।

৪. মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) LGBTQ+ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ করে, সরকারকে আইনি ও নীতিগত পরামর্শ প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে LGBTQ+ অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে।

৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) LGBTQ+ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেয়, যার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং সামাজিক কলঙ্ক মোকাবিলা অন্তর্ভুক্ত। এটি LGBTQ+ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য বিষয়গুলোর ওপর নির্দেশনা প্রদান করে এবং স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কাজ করে।

৬. ইউনিসেফ (UNICEF) LGBTQ+ শিশু এবং কিশোরদের অধিকার রক্ষা করে, তাদের সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে। এটি ব্যাপক যৌন শিক্ষা প্রচার করে।

৭. বিশেষ পদ্ধতি এবং ম্যান্ডেট (Special Procedures and Mandates) জাতিসংঘ LGBTQ+ বিষয়গুলোর ওপর নজরদারি করার জন্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করে, যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করে এবং অধিকার উন্নয়নের পথনির্দেশ করে।

৮. সিভিল সোসাইটির সম্পৃক্ততা (Civil Society Engagement) জাতিসংঘ LGBTQ+ ইস্যু নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাগুলোর

(NGO) সাথে সহযোগিতা করে, যাতে তাদের পক্ষে প্ল্যাটফর্ম, তহবিল এবং সমর্থন প্রদান করা যায় এবং তৃণমূল পর্যায়ের প্রচেষ্টা জোরদার হয়।

৯. আন্তর্জাতিক কাঠামো এবং কনভেনশন (International Frameworks and Conventions) জাতিসংঘ LGBTQ+ অধিকার প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো যেমন আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংস্থা (ICCPR)-এর মাধ্যমে LGBTQ+ ব্যক্তিদের সুরক্ষার ব্যাপারে কাজ করে।

১০. শিক্ষা এবং সচেতনতা (Educationa and Awareness) জাতিসংঘ LGBTQ+ অধিকারের বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ সরবরাহ করে, যাতে LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির জন্য নীতি ও চর্চা উন্নত হয়।

জাতিসংঘের উদ্যোগের উদাহরণ:

* Free & Equal Campaign: OHCHR দ্বারা চালু করা এই বৈশ্বিক জনশিক্ষা প্রচার LGBTQ+ অধিকার প্রচার করে এবং বৈষম্য ও কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

* UN Global Compact: UN Global Compact এর মানবাধিকার নীতির অংশ হিসেবে LGBTQ+ অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবসা এবং সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক চর্চা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

এই প্রচেষ্টাগুলোর লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী LGBTQ+ ব্যক্তিদের জন্য একটি আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শ্রদ্ধাশীল পরিবেশ তৈরি করা, যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিরোধ রয়ে গেছে। যেমন- জাতিসংঘের UNFPA-বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে সমকামী অধিকার আদায়ে (UNFPA for gay rights in Bangladesh)[২]।

জাতিসংঘে সমকামিতা নিয়ে শব্দের খেলা

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) এবং যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচয় (SOGI) সংক্রান্ত আলোচনা চলতে

থাকা বিতর্কগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ভাষাগত লড়াই[৩]। যেমন- সমানাধিকারের নামে LGBTQ+ সমর্থকরা পরিবারের (Traditional family) সংজ্ঞাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যেন ভিন্ন ধরনের পরিবারের মতবাদও (যেমন সমলিঙ্গ) অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০১৪ সালে জাতিসংঘে মানবাধিকার দিবসের একটি অনুষ্ঠানে PRA-এর কাপিয়া কাওমা বলেছিলেন, 'প্রথাগত পরিবার রক্ষা করা মানে যৌন সংখ্যালঘুদের নিন্দা করা।[৩]'

সমকামী অধিকার নিয়ে জাতিসংঘে পাল্টাপাল্টি অবস্থান

২০১১ সালের জুন ছিল LGBTQ+ মুভমেন্টের একটি ঐতিহাসিক সময়। দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে (UNHRC) সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং লিঙ্গ পরিচয়ভিত্তিক (gender identity) মানুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইনের ওপর একটি রিপোর্ট চেয়ে রেজল্যুশনে নেতৃত্ব দেয়[৩]। এবারও বিরোধিতার মুখে পড়ে এই রিপোর্ট। এই বিরোধিতাকে বলা হয় 'মানবাধিকার লঙ্ঘন'। এবং ইউএনের তৎকালীন হাই কমিশনার নাভি পিলায় এটাকে বৈষম্য আখ্যা দিয়ে এটার বিরুদ্ধে সার্বজনীন আইন করার কথা বলেন। যেসব আইন সমকামিতাকে অবৈধ করে, এমন সব আইন বাতিল করার কথাও বলেন তিনি[৩]। LGBTQ+ তথা সমকামিতাকে বিরোধিতা করে এমন কথা এবং কর্মসুচিকে তিনি 'অপরাধকর্ম' হিসেবে রেকর্ড করার কথা বলেন। পরবর্তীতে ১৯টি রাষ্ট্রের 'না' ভোটের বিপরীতে ২৩টি রাষ্ট্রের 'হ্যাঁ' ভোট পেয়ে রেজল্যুশনটি পাশ হয়। তিনটি রাষ্ট্র ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে।

২০১১ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তৎকালীন স্টেট সেক্রেটারী হিলারি ক্লিন্টন "Gay Rights Are Human Rights" শিরোনামে একটি ভাষণ দেন। তার এই ভাষণের ফলে ওবামা প্রশাসনের পলিসি পরিবর্তন হয়, সমকামীদের 'অধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন পলিসি প্রণয়ন করে ওবামা প্রশাসন। সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এটা ছিল আমেরিকা সরকারের প্রথম পদক্ষেপ। এখানে LGBTQ+দের বিরুদ্ধে যেকোনো কাজকে প্রতিরোধ করার কথা বলা হয়। সমকাম অথবা সমলিঙ্গের বিয়েকে অপরাধ গণ্য করে, এমন সব আইন এবং নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকার এজেন্সিগুলোকে একসাথে করে, বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করে, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে।

Equal Benefits (২০১৪): ২০১৪ সালে ইউএন সমকামী বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা দেয়। এই সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া এবং উরুগুয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে LGBTQ+ ক্রমবর্ধমান সমর্থনের কথা বলে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনে একটি রেজল্যুশনের নেতৃত্ব দেয়। এই রেজল্যুশন মানবাধিকারের হাই কমিশনারকে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের প্রতি ভায়োলেন্স এবং বৈষম্য দূরীকরণে এবং তাদেরকে সমাজে গ্রহণ করে নিতে ২০১১ সালের রিপোর্ট হালনাগাদ করার জন্য চাপ দেয়।

LGBTQ+ ইস্যুতে মুসলিম দেশগুলোর তীব্র বিরোধিতা

LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক কূটনীতি যে কোনোরকম বাধার সম্মুখীন হয়নি, তা না। ২০১৬ সালে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর ব্লক UN AIDS এর মিটিং-এ LGBTQ+ সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। ২০২৩ সালে Islamic Human Rights Commission পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর বৈশ্বিকভাবে LGBTQ+ মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। মিশর জাতিসংঘের এইডস মিটিংয়ে এগারোটি LGBTQ+ গ্রুপের অংশগ্রহণে আপত্তি জানিয়ে সাধারণ পরিষদে ওআইসির পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিয়েছিলো। বলা হয় যে, এটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্বকে হুমকিতে ফেলবে। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর এই বিরোধিতায় জাতিসংঘের LGBTQ+ তথা সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। তবে জাতিসংঘে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সামান্থা পাওয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এই পদক্ষেপকে জাতিসংঘের জন্য নেতিবাচক বলে মন্তব্য করেন। সামান্থা পাওয়ার আরো বলেন, LGBTQ+ সম্প্রদায়ের মানুষেরা অন্য সাধারণ মানুষদের থেকে ৪৯ শতাংশ বেশি এইডস ঝুঁকিতে থাকে। তাদের এই মিটিংয়ে থাকা জরুরী[৪]।

ওআইসির LGBTQ+ গ্রুপগুলোকে প্রবেশ করতে না দেয়ার বিরোধিতায় কানাডা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও জাতিসংঘের কাছে চিঠি দিয়েছিলো। শুধু যে মুসলিমপ্রধান দেশগুলো বিরোধিতা করেছে এমন নয়। বিরোধিতা করেছে সাংস্কৃতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ ধারণ করে এমন অন্যান্য দেশগুলোও। সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, সুদান, উগান্ডা ছাড়াও LGBTQ+ গ্রুপের মিটিংয়ে অংশ নেয়ার বিরোধিতা করেছে চীন, রাশিয়া, এবং আফ্রিকার কিছু দেশ।

২০১৪ সালে বান কি মুন বলেছিলেন, জাতিসংঘ তার কর্মীদের সমকামী বিয়েকে স্বীকৃতি দেবে এবং তাদেরকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করবে। জাতিসংঘের এই উদ্যোগ রাশিয়া, ভারত, চীন, সৌদি আরব, মিশর, পাকিস্তান এবং ইরানসহ ৪৩টি দেশকে সাথে নিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু ব্যর্থ হয়।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘে আফ্রিকান গ্রুপের ৫৪টি দেশ, অর্গানাইজেশ্যন অব ইসলামিক কো-অপারেশন, এবং বেলারুশ, মিশর, এবং কাতারের নেতৃত্বাধীন Group of Friends of the Family-তে থাকা ২৫টি সদস্য দেশ LGBTQ+ মতাদর্শকে প্রচার করে জাতিসংঘের ৬টি স্ট্যাম্পের প্রতিবাদ জানিয়েছিলো [৫]। তা স্বত্ত্বেও জাতিসংঘ এরকম কাজ থেকে সরে আসেনি। The Group of Friends of the Family LGBTQ+ মতাদর্শকে ঠেকাতে এবং পারিবারিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য সচেতনতামূলক একটি ছবি প্রদর্শনীও করেছিল, যেখানে লেখা ছিল—"Uniting Nations for a Family Friendly World"।

সমাজ এবং পরিবার বিধ্বংসী এই এজেন্ডার ভয়াবহতা সব দেশ বুঝলেও জাতিসংঘ এবং আমেরিকা বুঝেনি। নাকি বুঝেও সব না বোঝার ভান করে আছে! ইসলামিক হিউম্যান রাইটস কমিশন পশ্চিমাদের এই মানববিধ্বংসী এজেন্ডা সব দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদ করে। এবং তারা পরিবার ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে এই এজেন্ডার বাস্তবায়ন অবিলম্বে থামানোর জন্য মুসলিম দেশগুলোকে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর আহ্বান করে।

ওআইসির The Independent Permanent Human Rights Commission পারিবারিক জীবনের অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেয়; যেখানে সমকামিতা, লিঙ্গ রূপান্তরবাদ মতাদর্শ সার্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে প্রচার করার কড়া সমালোচনা করা হয়। এই ঘোষণাতে কিছু দাতা গোষ্ঠী এবং দেশ কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক মানবিক, উন্নয়ন এবং আর্থিক সহায়তার (Humanitarian, Development and Financial Assistance) ব্যানারে এবং সহায়তার শর্তস্বরূপ Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) চাপিয়ে দেয়ারও সমালোচনা করা হয়।



জাতিসংঘ ডাক প্রশাসন (UNPA) ছয়টি স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করেছে, যা UN Free & Equal প্রচারণাকে প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রচারণা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের সমকামী, উভকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার (LGBT) সমতার জন্য একটি উদ্যোগ, যা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক উচ্চ কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) দ্বারা চালু ও পরিচালিত হয়েছে।

ওআইসি ২০২২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এর বিশতম নিয়মিত অধিবেশন চলাকালে একটি বিষয়ভিত্তিক বিতর্কের পরে "*Right to Family Life: Islamic and Human Rights Perspectives to Counter Challenges to the Institution of Marriage*" টাইটেলে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। ঘোষণাপত্রটি কুরআনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোকে উদ্ধৃত করে আদম এবং হাওয়া (আ.) থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পরিবার রক্ষায় সারা বিশ্বকে আহ্বান জানায়। সেখানে আরো বলা হয়—পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌলিক ইউনিট এবং প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান।

লিঙ্গ মতবাদকে অস্বীকার করে সেখানে বলা হয়—স্বামী ও স্ত্রী সমান এবং মৌলিক মানবিক মর্যাদা এবং অধিকার ভোগ করে। পরিবার ও সমাজে উভয়ের আলাদা আলাদাভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। কিন্তু পছন্দের স্বাধীনতার নামে যেকোনো প্রকারের অশ্লীলতা, অবাধ এবং সীমাহীন যৌনতার অনুমতি, বিবাহের বাইরে বসবাস বা সহবাসের সম্পর্ক—যা পরিবারের অখণ্ডতাকে হুমকিতে ফেলে, তা সামাজিক কাঠামো এবং স্থিরতার জন্য ক্ষতিকর। তাই স্পষ্টভাবে এই মতবাদ প্রত্যাখ্যাত।

সব আব্রাহামিক ধর্ম এবং বিশ্বাসগুলোই এই কাজকে ঘৃণা করে। ইসলাম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি—সকল ধর্মেই সমকামিতাকে ঘৃণ্য এবং জঘন্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। ওআইসির ঘোষণাটিতে সমলিঙ্গের মিলনকে মানবসভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মক একটি ন্যারেটিভ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে; SOGI এবং তথাকথিত LGBTQ সম্প্রদায়গুলির নতুন এবং বিতর্কিত ধারণা সর্বজনীন তো নয়ই, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড দ্বারাও স্বীকৃত নয়।

ঘোষণাপত্রে ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে পরিবার-সমর্থক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা-সহ এই উঠতি সমস্যার বিরুদ্ধে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের সমচিন্তার দেশগুলোর সাথে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণাতে উল্লেখ করা হয়—বিয়ে এবং পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা, মানুষের স্বাস্থ্য এবং সমাজ ও বাচ্চাদের ভবিষ্যতের ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা এই সমস্যা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হবে। তাদের (ভঙ্গুর) পরিবার ব্যবস্থাকে আরো অস্তিত্ব সঙ্কটে ফেলে দিবে।

সারাবিশ্বে LGBTQ+ মতবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য, LGBTQ+ সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের জায়গা থেকে বিরোধিতাকে দমন করার জন্য জাতিসংঘে ২০১৬ সালে SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) বিশেষজ্ঞ পদ তৈরি করা হয়েছিলো। ২০১৮ সালের পহেলা জানুয়ারী প্রথম বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় কোস্টারিকার আইনজীবী ভিক্টর মাদ্রিগাল বোর্লোজ। নিয়মানুযায়ী তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল২০২০ সালে। কিন্তু তার মেয়াদ বাড়ানো হয় আরো তিন বছর। এ নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে (UNHRC) তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। তার পদাধিকারকে পুনঃনবায়ন করায় বাধ সাধে মুসলিম দেশ এবং চীন ও রাশিয়াসহ অন্যান্য রক্ষণশীল দেশগুলো। এই বিরোধিতার সময় সৌদি আরব, নাইজেরিয়া এবং মিশরের নেতৃত্বে আফ্রিকান এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর একটি দল 'Sexual orientation', 'Transgender' এবং 'Gay' ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহারেও ঘোরতর আপত্তি জানায়। যাই হোক, সেবার ১৭ ভোটের বিপরীতে ২৩টি ভোটের মাধ্যমে SOGI বিশেষজ্ঞের পদকে আরো তিন বছরের জন্য পুনঃনবায়ন করানো হয়।

জাতিসংঘের সাথে সংযুক্ত বা তাদের সমর্থিত কিছু উল্লেখযোগ্য LGBTQ+ গ্রুপ ও উদ্যোগ:

গ্রুপ/উদ্যোগ	বিবরণ
UN Free & Equal	জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর (OHCHR) দ্বারা চালু করা একটি বৈশ্বিক তথ্য প্রচারাভিযান, যা LGBTQ+ ব্যক্তিদের সমান অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ প্রচার করে।
UN LGBTI Core Group	একটি অনানুষ্ঠানিক আন্তঃআঞ্চলিক গ্রুপ, যা জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর LGBTQ+ অধিকার অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতে বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘের সংস্থা অন্তর্ভুক্ত।
OutRight Action International	একটি বৈশ্বিক LGBTQ+ অধিকার সংস্থা, যা জাতিসংঘের সাথে নীতি প্রভাবিত করার জন্য এবং LGBTQ+ বিষয়ক গবেষণা সরবরাহ করার জন্য প্রায়শই অংশীদারিত্ব করে।
ILGA World	জাতিসংঘের অংশ না হলেও ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের মাধ্যমে LGBTQ+ ব্যক্তিদের অধিকার উন্নয়নে কাজ করে।
UNAIDS	যদিও এটি মূলত HIV/AIDS-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাজ করে, UNAIDS LGBTQ+ সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণে গুরুত্ব দেয়।
UNDP LGBTI Inclusion Index	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি ট্র্যাক করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও চর্চা প্রচার করে।
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)	বর্তমানে OutRight Action International নামে পরিচিত, যা জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সাথে LGBTQ+ অধিকারের পক্ষে বৈশ্বিক প্রচারণায় অংশ নেয়।
OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights)	OHCHR বিশ্বব্যাপী LGBTQ+ অধিকার প্রচারে সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং LGBTQ+ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

জাতিসংঘের LGBTQ+ কার্মকাণ্ড এবং প্রকল্পের অর্থদাতা

অনেক ফাউন্ডেশন এবং দাতারা LGBTQ+ অধিকার প্রচারের লক্ষ্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। এই সহায়তা ফাউন্ডেশনগুলো জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রোগ্রাম (UNDP), UNAIDS, OHCHR, এবং অন্যান্য UN সংস্থার সাথে যৌথভাবে LGBTQ+ সমর্থন, আইনি সংস্কার, এবং LGBTQ+ ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। ধারনার জন্য কিছু উল্লেখ করা হলো:

ফাউন্ডেশন / দাতা	অবদান ও ভূমিকা
আর্কাস ফাউন্ডেশন	জন স্ট্রাইকার প্রতিষ্ঠিত, বৈশ্বিক LGBTQ+ অধিকারের অন্যতম বৃহৎ দাতা। OHCHR পরিচালিত UN Free & Equal ক্যাম্পেইনে এবং আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকায় LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির পক্ষে কাজ করে।
ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন (OSF)	জর্জ সোরোস প্রতিষ্ঠিত, বৈশ্বিক মানবাধিকার প্রচেষ্টায় অবদান রেখেছে। UNAIDS এবং OHCHR এর সাথে LGBTQ+ ব্যক্তিদের অধিকার এবং আইনি সংস্কারের পক্ষে কাজ করে।
গিল ফাউন্ডেশন	টিম গিল প্রতিষ্ঠিত, LGBTQ+ সমতা ও অধিকার নিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে।
ফোর্ড ফাউন্ডেশন	বৈশ্বিক LGBTQ+ অধিকার প্রচারে বিভিন্ন সংস্থা ও জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করে।
ইভলিন ও ওয়াল্টার হাস, জুনিয়র ফান্ড	LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তি ও সমতার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করে।
ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন	LGBTQ+ অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার পক্ষে বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর সাথে জাতিসংঘের সহযোগিতায় কাজ করে।
সিগ্রিড রাউসিং ট্রাস্ট	জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলসহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকার এবং সুরক্ষার পক্ষে কাজ করে।

কেস স্টোরি: যে সমকামী গ্রুপ জাতিসংঘের প্লাটফর্ম ব্যবহার করে

ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) সমকামী অধিকার আদায়ের জন্য বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক এনজিও প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ২০০০-এর বেশি এনজিও যুক্ত রয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি জাতিসংঘের সোসাইটাল এনগেজমেন্ট

মেকানিজমের সাথে যুক্ত এবং UN ECOSOC মর্যাদা অর্জন করেছে। ILGA বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থা ও কমিটিতে LGBTQI+ অধিকারগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে সারা বিশ্বে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের সামাজিকীকরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাবের সাথে কাজ করছে।

ILGA-এর (ইলগা) জাতিসংঘ-ভিত্তিক কর্মকাণ্ড

জাতিসংঘ সহযোগী প্রকল্প/ উদ্যোগ	বিবরণ	ILGA-এর ভূমিকা/ সহযোগিতা
UN Free & Equal Campaign	OHCHR কর্তৃক পরিচালিত একটি বিশ্বব্যাপী প্রচারণা, যা LGBTQ+ মানুষের সমান অধিকার ও সুবিচার নিশ্চিত করতে কাজ করে।	LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তি এবং বৈষম্য দূরীকরণে সমর্থন প্রদান।
Universal Periodic Review (UPR) Submissions	জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার রেকর্ড পর্যালোচনা করা।	LGBTQ+ অধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট এবং তথ্য প্রদান।
UN Economic and Social Council (ECOSOC)	পরামর্শমূলক অবস্থান, যা জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।	বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় LGBTQ+ অধিকারের পক্ষে সমর্থন প্রদান।
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)	LGBTQ+ শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের চাহিদা এবং অধিকার নিয়ে কাজ করে।	অবিচ্ছিন্ন সহায়তা ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের জন্য সমর্থন প্রদান।
UNDP – Being LGBTI in Asia and the Pacific	এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে LGBTQ+ মানুষের অধিকার ও অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন করে।	গবেষণা, নীতিমালা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান।
UN LGBTI Core Group	জাতিসংঘ ব্যবস্থায় LGBTQ+ অধিকার সুরক্ষায় মনোনিবেশ করা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক দল।	অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রচারে সমর্থন ও সংলাপে অংশগ্রহণ।

জাতিসংঘ সহযোগী প্রকল্প/ উদ্যোগ	বিবরণ	ILGA-এর ভূমিকা/ সহযোগিতা
Global LGBTI Human Rights Conference	বৈশ্বিক পর্যায়ে LGBTQ+ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সম্মেলন।	সর্বোত্তম অনুশীলন এবং নীতিমালা নিয়ে আলোচনায় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ।
OutRight Action International Collaboration	LGBTQ+ বিষয়গুলিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন।	CSW-তে অংশগ্রহণ এবং SDG-তে LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সমর্থন প্রদান।

ইলগা-এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় আগের চ্যাপ্টারে আলোচিত সেই বিলিনিয়ারদের অর্থায়নে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সরাসরি জাতিসংঘে ফান্ডিং করার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে ইলগা-এর মত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অর্থ জোগান দেয়[৬]। পুরো LGBTQ+ ইন্ড্রাস্ট্রি সম্পর্কে ধারণার জন্য ইলগা-কে অর্থায়ন করে এমন কিছু সংস্থার লিস্ট—

১. Arcus Foundation

২. Open Society Foundations (OSF)

৩. European Commission

৪. Global Equality Fund

৫. Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

৬. Dutch Ministry of Foreign Affairs

৭. Council of Europe

৮. Norwegian Ministry of Foreign Affairs

৯. U.S. State Department

১০. Astraea Lesbian Foundation for Justice

১১. Tides Foundation

১২. Ford Foundation

১৩. Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund

১৪. UN Development Programme (UNDP)

১৫. Oxfam International

References

1. LGBTI Milestones at the United Nations. UN LGBTI CORE GROUP https://unlgbticoregroup.org/home/lgbti-milestones-at-the-united-nations/.
2. UNFPA for gay rights in Bangladesh. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/laws-rights/38481/unfpa-for-gay-rights-in-bangladesh.
3. Montgomery, P. International Backlash. Political Research Associates (2016).https://politicalresearch.org/2016/11/14/international-backlash-the-religious-right-at-the-un
4. Muslim states block gay groups from U.N. AIDS meeting; U.S. protests | Reuters. https://www.reuters.com/article/sustainability/muslim-states-block-gay-groups-from-un-aids-meeting-us-protests-idUSKCN0Y827E/.
5. Martin. New stamps promoting LGBT equality worldwide unveiled at UN. United Nations Sustainable Development https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/02/new-stamps-promoting-lgbt-equality-worldwide-unveiled-at-un/ (2016).
6. ILGA annual report 2020: Funding info.

সমাজ-বিধ্বংসী জেনেও সমকামিতাকে এত সমর্থন কেন

LGBTQ+ আন্দোলন সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা হিসেবে শুরু হলেও এর ব্যাপকতা এখন অকল্পনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র, বড় বড় কর্পোরেশন, টেক জায়ান্ট, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিলিয়নিয়াররা। আমেরিকার মতো দেশের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও সমকামীদের অধিকার আদায়ে প্রয়োজনে সমালোচনা (...being bulllied) শুনতে রাজি আছেন।

প্রায় ৫০ বছর আগে, যখন বাইডেন সিনেটর হিসেবে রাজনীতি শুরু করেন, সমকামিতা প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এটিকে দেশের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি মনে করতেন। ১৯৭৩ সালে দ্য মর্নিং নিউজ (একটি ডেলাওয়্যার সংবাদপত্র)-এ তিনি মন্তব্য করেন, 'My gut reaction is that they (homosexuals) are security risks.'। সেই বাইডেনই ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথম এক্সিকিউটিভ অর্ডার সই করেন, যা সমকামী অধিকারের পক্ষে। বাইডেনের নতুন নীতির আলোকে আমেরিকার অনুদান (যেমন- USAID) পেতে হলে সমকামিতা ইস্যুকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং LGBTQ+ কমপ্লায়েন্ট হতে হবে[১]। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি হোয়াইট হাউজের ১৫০০ কর্মচারীর মধ্যে ১৪% সমকামী গোষ্ঠী থেকে নিয়োগ দেন[২]।

মানব ইতিহাসে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে এর আগে এত ক্ষমতাধরদের সমর্থন দেখা যায়নি। আমেরিকায় এক ছেলে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর, সে স্কুলে কোন বাথরুম ব্যবহার করবে, তা নিয়ে বিরাট বিতর্ক হয়। পুরুষ হয়ে নারীদের বাথরুম ব্যবহার করলে জন্মগত নারীরা আপত্তি করে। সেই ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম ইস্যুতে ২০১৭ সালে বিশ্বের বিখ্যাত ৫৩টি কোম্পানি ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকারের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়[৩]। এতগুলো কোম্পানির একসঙ্গে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ ইতিহাসে বিরল।

এসব ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট যে, এটা শুধু সমকামী অধিকার আদায়ের আন্দোলন নয়, এর সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে মুনাফা (বিজনেস), আদর্শ এবং ক্ষমতার নেটওয়ার্ক। LGBTQ+ আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে সমকামী ছাড়া অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অন্যতম—

* ব্যবসার সাথে যুক্ত মানুষরা
* নাস্তিক, ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠী (সংশবাদবাদী, আধ্যাত্মিক)
* জায়োনবাদি

CNN Apple, Microsoft, PayPal join legal fight for transgender rights

বিশ্বজুড়ে অনেক মানুষ সংগঠিত ধর্ম (খ্রিষ্টান, ইহুদি এবং মুসলিম) থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৩০% প্রাপ্তবয়স্ক ধর্মীয়ভাবে সংযুক্ত নন, যাদেরকে সাধারণত 'নোনস' বলা হয়, অর্থাৎ যারা নিজেদের নাস্তিক (মাত্র ৪%), সংশয়বাদী বা আধ্যাত্মিক বলে মনে করেন, কিন্তু ধর্ম পালন করেন না। দশ বছর আগে এই সংখ্যা প্রায় ২৩% ছিল, যা ক্রমশ ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে[৪]।

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধর্ম থেকে দূরে থাকার প্রবণতা বেশি। মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে দ্বিমত, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল বা LGBTQ+ সম্প্রদায়ের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন মতবাদের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় ৫০% LGBTQ+ ব্যক্তিরা তাদের শৈশবের ধর্ম ত্যাগ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কেলেঙ্কারিও অন্যতম কারণ, বিশেষ করে সাবেক ক্যাথলিকদের মধ্যে।

যখন কোনো ইস্যুতে আদর্শ এবং অর্থনৈতিক মুনাফা একীভূত হয়, তা একটি শক্তিশালী বল (ফোর্স) হিসেবে আবির্ভূত হয়। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এখানে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীরে আঘাত করেছে। ট্রান্সবাদের প্রভাবে নারী ও পুরুষের সংজ্ঞা তারল্য বা ফ্লুইড হওয়ার কারণে সমাজের আইন-কানুন ও নীতি-নৈতিকতায় আমূল পরিবর্তন আসবে। সহজ কথায়—LGBTQ+ আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবী একটি নতুন সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসা/মুনাফা: নতুন মেডিকেল ইন্ড্রাস্ট্রি, মেডিকেল এডুকেশন এবং ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস

LGBTQ+ বিলিয়নিয়ারদের একটা বড় অংশ ফার্মাসিউটিক্যাল এবং হেলথ কেয়ার ইন্ড্রাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করেছে, যা পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে। যারা ট্রান্সজেন্ডার সার্জারী এবং হরমোন চিকিৎসার পথ বেছে নেয় তাদেরকে সারাজীবন হরমোন বা ড্রাগসের ওপর নির্ভর করতে হবে।

আমেরিকান প্রিন্সিপলস প্রজেক্ট (APP)-এর নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রান্সজেন্ডার 'চিকিৎসা' ইন্ড্রাস্ট্রি একটি বিশাল ব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে, যেখানে ২০২৩ সালে ট্রান্সজেন্ডার ওষুধ ও সার্জারি থেকে মোট আয় ৪.৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, এই সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৭.৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে[৫]।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, আজীবন ক্রস-সেক্স হরমোন ব্যবহারের খরচ ৩,০০,০০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে, আর সার্জারির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের খরচ প্রায় ১,৫০,০০০ ডলার[৫]। এছাড়া, লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির ফলে ক্যান্সার, স্নায়ুর ক্ষতি, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, যৌন কার্যহীনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যার মতো ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যা আরও বেশি চিকিৎসা ব্যয়ের কারণ হতে পারে।

এতদিন বায়োলজিক্যাল নারী ও পুরুষের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা শিক্ষা, ড্রাগ ডিজাইন এবং ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস পরিচালিত হতো। এখন লিঙ্গ ভিত্তিক পরিচয়কে প্রাধান্য দিতে মেডিকেল ফিল্ডকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় ইতিমধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং মানুষ-সম্পর্কিত গবেষণায় জেন্ডারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে[৬]। যদি কোনো গবেষণায় সঠিকভাবে জেন্ডার অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তবে সেই গবেষণায় ফান্ডিং পাওয়া যাবে না—এটি ফান্ডিং এজেন্সিগুলোর একটি শর্ত। শুধু মেডিকেল ক্ষেত্রেই জেন্ডারকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। মেডিকেল শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসাও গড়ে উঠতে যাচ্ছে। আর্টস ডিসিপ্লিনের লোকজন এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে যে, তারা এখন মেডিকেল সায়েন্স এবং লাইফ সায়েন্সের ওপরও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করছে।

এমনকি বৈজ্ঞানিক জার্নালকে লিঙ্গভিত্তিক হিসেবে গড়ে তুলতে জার্নালসমূহ

নতুন নতুন নীতিমালা তৈরী করছে। CONSORT এবং PRISMA-এর মতো বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্দেশিকা/গাইডলাইন গবেষণার স্বচ্ছতা ও মানোন্নয়ন করেছে। জার্নালগুলো সেক্স ও জেন্ডারভিত্তিক বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিতে পারে এমন নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে, যা সেক্স ও জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করে। ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব মেডিকেল জার্নাল এডিটরস (ICMJE) এখন সুপারিশ করছে যে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সেক্স এবং জেন্ডারের তথ্য আলাদা করে বিশ্লেষণ করতে হবে[৭]।

এতদিন পর্যন্ত জেন্ডার ক্লিনিক বিশেষজ্ঞরা শুধুমাত্র তাদেরকেই চিকিৎসা দিতেন, যাদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হতো। তবে সম্প্রতি এই নীতিমালা উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখন জেন্ডার চিকিৎসা সমর্থনকারী গোষ্ঠীগুলো বিশ্বের শক্তিশালী লবিস্টদের সমর্থন পাচ্ছে। আমেরিকার হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলো প্রতি বছর ফেডারেল সরকারের লবিং-এ ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ওষুধ কোম্পানিগুলোর ব্যয় আরও বেশি। ২০২০ সালের মে মাসে *জেএএমএ ইন্টারনাল মেডিসিন*-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ওষুধ ও স্বাস্থ্যপণ্য শিল্প ফেডারেল সরকারের লবিংয়ে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এছাড়াও প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস প্রার্থীদের এবং জাতীয় কমিটিগুলোতে ৪১৪ মিলিয়ন ডলার[৮]।

সার্জারি এবং হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার খরচ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা:

চিকিৎসার ধরন	খরচের পরিমাণ (আনুমানিক)	বাংলাদেশি টাকা (আনুমানিক)
হরমোন থেরাপি (HRT):	প্রতি বছর $৩৬০ থেকে $২,৪০০	প্রতি বছরে ৩৯,৬০০ থেকে ২,৬৪,০০০ টাকা
বুক পুনর্গঠন সার্জারি (টপ সার্জারি):	$৫,০০০ থেকে $১০,০০০	৫,৫০,০০০ থেকে ১১,০০,০০০ টাকা
জননাঙ্গ পুনর্গঠন সার্জারি (বটম সার্জারি):	$১০,০০০ থেকে $৩০,০০০	১১,০০,০০০ থেকে ৩৩,০০,০০০ টাকা

চিকিৎসার ধরন	খরচের পরিমাণ (আনুমানিক)	বাংলাদেশি টাকা (আনুমানিক)
মুখ পুনর্গঠন সার্জারি (ফেসিয়াল ফেমিনাইজেশন সার্জারি):	$১০,০০০ থেকে $৮০,০০০	১১,০০,০০০ থেকে ৮৮,০০,০০০ টাকা
মানসিক স্বাস্থ্য সমর্থন (প্রতি বছর):	$১,২০০ থেকে $২,৪০০	১,৩২,০০০ থেকে ২,৬৪,০০০ টাকা
কণ্ঠ প্রশিক্ষণ (প্রতি বছর):	$১,২০০ থেকে $৩,৬০০	১,৩২,০০০ থেকে ৩,৯৬,০০০ টাকা
আনুমানিক খরচঃ ২৭,৭৬০ থেকে ১,২৮,৪০০ মার্কিন ডলার। এটা বাংলাদেশী টাকায় ৩১ লক্ষ থেকে এক কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ওপরে।		

জনসংখ্যা কমানো

বাংলাদেশে শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হলেও বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কমে গেছে। পরিবারে পিতা-মাতার স্থলাভিষিক্ত হতে হলে প্রতি পরিবারে কমপক্ষে দুজন (২.১) সন্তান থাকা প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন সুবিধা (সন্তান লালন-পালনের জন্য দীর্ঘ সময়ের ছুটি, ভাতা ইত্যাদি) দেওয়ার পরও অনেক নারী মা হতে চান না। সন্তান গর্ভে ধারণ করা এবং লালন-পালন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। জেন-জি প্রজন্মের মধ্যে বিয়ে এবং পরিবার গঠনের আগ্রহ অনেক কমে গেছে। উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার এখন নেতিবাচক; বেশিরভাগ দেশেই এটি ১.৫-এর নিচে নেমে গেছে। এমতাবস্থায় শিশু-কিশোরদের পরিবারবিধ্বংসী মতবাদ LGBTQ+ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পাঠ্যপুস্তক, বিনোদন শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এটি স্পষ্টতই জনসংখ্যা হ্রাস প্রকল্পের একটি অংশ।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তা হলে পৃথিবীর সিস্টেম চলবে কীভাবে, যদি মানুষই না থাকে। মানব সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন চলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে উনিশ শতকের সত্তর দশকে। গত দুই দশক ধরে ফিউচারিস্টরা (যারা বিশ্বের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কাজ করেন) নিয়মিত বলে আসছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের স্থান দখল করবে। একসময় বিষয়টি আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হলেও বর্তমানে চ্যাটজিপিটি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় আমরা এ প্রযুক্তির দক্ষতা ও সম্ভাব্য ক্ষমতা

বুঝতে পারছি। স
কোড এখন এত

কৃত্রিম বুদ্ধিম
আমাদের কাছে
থাকবে না। ফি
বছর ধরে বলে
জন্য কাজ থাব
জনগোষ্ঠী বে
জনসংখ্যা কম

র‍্যাংক	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	
১১	
১২	
১৩	
১৪	
১৫	
১৬	
১৭	
১৮	
১৯	

বুঝতে পারছি। সম্প্রতি গুগলের সিইও জানিয়েছেন, গুগলের প্রয়োজনীয় ২৫% কোড এখন এআই দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ সবে শুরু হয়েছে। আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে এটি আমাদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হবে। বর্তমানের মতো পড়াশোনা তখন থাকবে না। ফিউচারিস্ট ইউভাল নোয়া হারারি (যিনি প্রকাশ্য সমকামী) গত ১০ বছর ধরে বলে আসছেন যে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে ৯৯% মানুষের জন্য কাজ থাকবে না। পুরো সিস্টেম চালাতে মাত্র ১% মানুষই যথেষ্ট হবে। বিশাল জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে পড়লে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও হতাশা বাড়বে। অদরকারী জনসংখ্যা কমানোর জন্য সমকামী জীবনযাপন একটি ভালো সমাধান হতে পারে।

র‍্যাংক	দেশ	মোট প্রজনন হার
১	দক্ষিণ কোরিয়া	০.৮১
২	তাইওয়ান	১.০৭
৩	হংকং	১.০৫
৪	সিঙ্গাপুর	১.১৪
৫	ম্যাকাও	১.২০
৬	জাপান	১.৩৪
৭	ইতালি	১.৩৫
৮	স্পেন	১.৩৭
৯	পর্তুগাল	১.৩৮
১০	গ্রিস	১.৪০
১১	পোল্যান্ড	১.৪৪
১২	চেক প্রজাতন্ত্র	১.৫২
১৩	রাশিয়া	১.৫১
১৪	কানাডা	১.৫৩
১৫	অস্ট্রেলিয়া	১.৭৩
১৬	যুক্তরাজ্য	১.৭৬
১৭	নিউজিল্যান্ড	১.৭৫
১৮	নেদারল্যান্ডস	১.৬৭
১৯	বেলজিয়াম	১.৭০

র‍্যাংক	দেশ	মোট প্রজনন হার
২০	ফ্রান্স	১.৮৩

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেডিকেল খাতে এমন সব কাজ করা হচ্ছে যা সত্যিই অবাক করার মতো। সম্প্রতি ইলন মাস্কের নিউরোলিঙ্ক প্রকল্প সফলভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, যার মাধ্যমে হাত নাড়াতে অক্ষম ব্যক্তি চিন্তার মাধ্যমে লিখতে পারছেন। এমনকি অন্ধ ব্যক্তিরাও এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন। আর্টিফিশিয়াল গর্ভধারণ (Artifical womb) নিয়েও কাজ চলছে। এআই প্রযুক্তি মানুষের মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে শিখছে। ভবিষ্যতে হয়তো মানব মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হবে, যার মাধ্যমে মানসিক সুখ-দুঃখের অনুভূতিও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এটা সম্ভব হলে পরিবার এবং সমাজের জন্য মানুষের আত্মত্যাগ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে পারে।

ডিজিটাল অমরত্বে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

ট্রান্সজেন্ডারবাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো, নারীর বা পুরুষের পরিচয় শরীরের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটি মনকেন্দ্রিক, যার সাথে জৈবিক সম্পর্ক নেই। এই ধারণার ভিত্তিতে ট্রান্সহিউম্যানিজম মতবাদ গড়ে উঠছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ন্যানোটেকনোলজির সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টায় গবেষকরা কাজ করছেন। এআই বিশেষজ্ঞরা, যেমন রে কুর্জওয়েল এবং ইলন মাস্ক বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যতে মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনা, স্মৃতি, অনুভূতি এবং ব্যক্তিত্ব ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

বিখ্যাত ফিউচারিস্ট কুর্জওয়েল বিশ্বাস করেন নিকট ভবিষ্যতে ব্যক্তির চেতনাবোধ, স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্বকে ডিজিটাল ফরম্যাটে আপলোড করা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষের মস্তিষ্কের নিউরাল সংযোগগুলোকে ডিজিটালভাবে মানচিত্রায়িত (ডিজিটাল ম্যাপ) করা হবে। কুর্জওয়েল এটাকে 'অমরত্ব' হিসেবেও বিবেচনা করেন।

তবে, এই ধারণাটি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন এবং বিতর্ক রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রশ্ন হলো, এই ডিজিটাল রূপটি কি আসল ব্যক্তিই হবে, নাকি শুধুমাত্র তার একটি কপি? সামনের সময়ে এই নৈতিক বিষয়গুলো এবং সংশ্লিষ্ট আইনের পরিবর্তনে

ট্রান্সজেন্ডারবাদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

LGBTQ+: নব্য উপনিবেশবাদের টুল

কেন আমেরিকা, জাতিসংঘ এবং পাশ্চাত্য দেশগুলো LGBTQ+ মতবাদ প্রতিষ্ঠায় উঠেপড়ে লেগেছে, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে উগান্ডার রাজনৈতিক হুদু হুসেইনের লেখা থেকে। আফ্রিকার ওপর LGBTQ+ মতবাদকে চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে Daily Monitor-এ তিনি লেখেন[৯]—

> পশ্চিমারা মানবাধিকারের আড়ালে সমকামিতাকে অন্য দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয়ার কারণ মূলত দুইটা। প্রথমটা হচ্ছে—আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং স্বকীয়তা থেকে আলাদা করে একটি একক সংস্কৃতিতে রূপান্তর করার জন্য, যাতে আমাদেরকে তারা সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দ্বিতীয়তটি হচ্ছে—আফ্রিকান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা তাদের জন্য সম্ভাব্য হুমকি থেকে বাঁচতে চাচ্ছে।
>
> কুইয়ার স্কলার এবং অ্যাক্টিভিস্টরা এই আন্দোলনে ঔপনিবেশিক চরিত্র আছে বলে মত দিয়েছেন। উনিশ এবং বিশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান দেশগুলো অন্য দেশের ওপর আক্রমণ করা এবং দখল করাকে চিত্রিত করেছিল Civilizing mission, বা সভ্য করার মিশন হিসেবে। একই উপায়ে এখনো এই LGBTQ+ মতবাদকে সারা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে প্রগতি এবং আধুনিকতার নামে। যে এই মতবাদের বিরোধিতা করবে, গ্রহণ করতে চাইবে না, সে-ই আধুনিকতা এবং প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে। পণ্ডিত জিন হারিটওয়ারন, তামসিলা তৌকির এবং এসরা এরডেমের ভাষায়—এটার মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গরা আবারও নিজেদেরকে 'সভ্যতা', 'আধুনিকতা' এবং 'উন্নয়নের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে হাজির করছে।

LGBTQ+ মতবাদ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করায় ব্রিটিশ অ্যাক্টিভিস্ট পিটার ট্যাশেল মুসলিম দেশগুলোকে Islamo-fascist বলেও সম্বোধন করেছেন[১০]। উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদী টুল হিসেবে LGBTQ+ আন্দোলন দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কথা বলে। এক. যেসব দেশ এবং মানুষ তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির কারণে LGBTQ+ মতবাদ গ্রহণ না করে, এবং এর বিরোধিতা করে,

সেসব দেশ এবং মানুষেরা সেকেলে, বর্বর।

দুই. যারা এটা গ্রহণ করে, এটার জন্য আইন বানায়, এই সম্প্রদায়ের মানুষকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়, তারা আধুনিক এবং প্রগতিশীল। এখন দ্বিতীয়টার অধিকার আছে তাদের লিঙ্গ এবং যৌনতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণগুলো প্রথমটার ওপর চাপিয়ে দেয়ার। কিন্তু প্রথমটার কোনো অধিকার নেই এটার বিরোধিতা করার। এইভাবে LGBTQ+ পুরো পৃথিবীর সামনে দেখা দেয় নয়া সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র হিসেবে।

উগান্ডাকে অর্থনৈতিক সহায়তা স্থগিত করার হুমকি

উগান্ডাসহ আফ্রিকার ৩০টি দেশে সমকামী কার্যকলাপে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এজন্য এই দেশগুলোকে পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করছে LGBTQ+ অধিকার আদায়ে। উগান্ডায় প্রস্তাবিত আইনটি দ্বারা সমস্ত সমকামী আচরণকে অসম্মতিমূলক ঘোষণা, সমকামী-বিবাহকে অপরাধী ঘোষণা এবং একই লিঙ্গের মানুষের মাঝে বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করাকে বেআইনি করা হয়েছে[১১]। ২০২২ সালের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ফ্যাক্টশীট অনুসারে, উগান্ডা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকার 'নির্ভরযোগ্য অংশীদার' হওয়া সত্ত্বেও LGBTQ+ ইস্যুতে উগান্ডায় অর্থনৈতিক সহায়তা স্থগিত করার হুমকি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার strategic communications for the National Security Council-এর কো-অর্ডিনেটর জন কিরবি (John Kirby) বলেন, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত মানবাধিকারকে সমর্থন করে। তিনি বলেন,

> 'We ... are never going to shy away or be bashful about speaking up for those rights and for individuals to live as they deem fit, as they want to live," he said. "And that's something that's a core part of our foreign policy, and it will remain so.'

২০১৪ সালে LGBTQ+ বিরোধী নীতির কারণে কমপক্ষে ৩টি ইউরোপিয়ান দেশ (নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ডেনমার্ক) উগান্ডায় আর্থিক সহয়তা বন্ধ করে দেয়[১২]। এমনকি বিশ্ব ব্যাংক দেশটিকে টাকা ধার দিতেও দেরি করে। উগান্ডা বার্ষিক বাজেটের ২০ শতাংশ দাতা দেশগুলো থেকে পেয়ে থাকে।

২০১৯ সালে আমেরিকা LGBTQ+ ক্রিমিনালাইজেশন করে এমন ১১ টি দেশে আমেরিকার ৭.৪ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা ছাড়াও অনেক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রেসিডেন্ট বাইডেন LGBTQ+ অধিকারকে ফরেন নীতির অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে এক্সিকিউটিভ অর্ডার জারি করেন। মেমোতে তিনি বলেন, 'আমেরিকার কূটনীতি এবং বৈদেশিক সহায়তা LGBTQ সম্প্রদায়ের মানবাধিকার প্রচার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবেন' এবং বিভিন্ন দেশে সরকার কর্তৃক LGBTQ+ ক্রিমিনালাইজেশনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 'বিদেশে নিযুক্ত সমস্ত সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছেন'। LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ভিসা নিষিদ্ধ এবং অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহারের ঘোষণাও দেন[১৩]। আমেরিকান আর্থিক সহয়তা ফান্ড পেতে LGBTQ+ ইস্যুটি আমলে নিতে হবে।

কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আচরণ

২০২২ বিশ্বকাপে খেলা শুরুর আগে পশ্চিমা দেশগুলো একাট্টা হয়ে LGBTQ+ অনেক বড় ইস্যু হিসেবে উপস্থাপন করে। LGBTQ+ স্পোর্টস অ্যাক্টিভিস্টরা বিশ্বকাপ বয়কটের ডাকও দিয়েছিল। পশ্চিমা দেশগুলো যেখানে LGBTQ+ ডি-ক্রিমিনালাইজেশনে অনেক বিনিয়োগ করছে, সেখানে কাতারে সমকামী কার্যকলাপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড—এটা হজম করা কঠিন। পশ্চিমা মিডিয়ার নীতিই হচ্ছে LGBTQ+ বান্ধব। কিন্তু বিবিসি এই ইস্যুতে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিল। প্রতিবাদ হিসেবে তারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রচার করেনি যা বিশ্বকাপের ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনার মতো। পশ্চিমা মিডিয়া কাতারে স্টেডিয়াম বানাতে গিয়ে কত শ্রমিক নিহত হয়েছে, তা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেও মূল ইস্যু ছিল ট্রান্সজেন্ডার।

বিবিসি'র এত চরমপন্থী আচরণের নেপথ্যে রয়েছে কর্মরত ৪১৭ জন ট্রান্সজেন্ডার সাংবাদিক ও কর্মচারি। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, বিবিসি'র প্রধান কার্যালয়ে LGBTQ+ কর্মচার সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রায় ৪গুণ বেশী! অর্থাৎ বিসিসি'তে লিঙ্গ পরিচয়ধারীরা সংখ্যালঘু! বিসিসি (বাংলা) বাংলাদেশেও ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে প্রমোট করার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়[১৪]।

কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু শিরোনাম—

কাতার–বিরোধী অবস্থান নিতে খেলোয়াড়দের চাপ দেওয়া হচ্ছে (প্রথম আলো,

১৫ নভেম্বর ২০২২)

> 'ইউরোপের একাধিক দলের অধিনায়কেরাও প্রতিবাদ বার্তা নিয়ে হাজির হবেন কাতারে। বিশ্বকাপের নির্মাণকাজের সময় ছয় হাজার শ্রমিকের মৃত্যু, LGBTQ+ বিতর্ক নিয়ে অনেক দিন ধরে চলে আসা প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই কাতারে নিজেদের কণ্ঠ সোচ্চার করবে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়েরা।'

ফিফার হুশিয়ারির কারণে 'ওয়ান লাভ' আর্মব্যান্ড পরবেন না কেইনরা (২১ নভেম্বর ২০২২)[১৫]

> 'সমকামীসহ সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানাতে 'ওয়ান লাভ' আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইউরোপের দলগুলো। কিন্তু ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার কড়া হুঁশিয়ারির পর এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে তারা। ইংল্যান্ড, ওয়েলস, বেলজিয়াম, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও ইউরোপের বাইরের অস্ট্রেলিয়ার এই ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। অন্য কোনোভাবে হলেও এই দাবির পক্ষে নিজেদের সমর্থন জানাবে ইউরোপীয় দলগুলো, আমাদের খেলোয়াড় ও কোচরা হতাশ। তারা সমন্বয়বাদের পক্ষে শক্তভাবে আছে। অন্য কোনোভাবে তারা তাদের সমর্থন জানাবে।'

অবশেষে কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে ইউরোপের নৈতিকতা নিয়ে ডবল স্টান্ডার্ডের অভিযোগ করেন। ফিফার প্রেসিডেন্ট বলেন[১৬]

> 'কাতারে ফিফার বিশ্বকাপ শুরু হবার আগে দেশটিতে অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু এবং LGBTQ+ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতি দেশটির আচরণের বিষয়গুলো নিয়ে যেভাবে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, তা আসল টুর্নামেন্টকে ম্লান করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমিও ইউরোপীয়। আমরা তিন হাজার বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যা করেছি, নৈতিক শিক্ষা দেবার আগে আমাদের উচিত আগামী তিন হাজার বছর ধরে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা।'

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে এই সুযোগ নিয়ে কাতারকে কূটনৈতিক

চাপ প্রয়োগ করে। আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট, অ্যান্টনি ব্লিনকেন (Antony Blinken) ইউরোপিয়ান টিমের খেলোয়াড়দের বিশ্বকাপের মাঠে রঙধনু ব্যান্ড (LGBTQ+ প্রতীক) নিষিদ্ধ করা নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বলেন, এটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে[১৭]।

ইসরাইলও LGBTQ+ এজেন্ডা ব্যবহার করছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত জায়নবাদি এডভোকেসি সংস্থা আইপ্যাক (AIPAC) গাজায় বোমা বর্ষণের সময় টুইট করে (১৬ মে ২০২১)[১৮]

'Do you support LGBTQ+ rights? Hamas doesn't.

Hamas discriminates against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people.'

গাজায় সেই বোমা হামলার সময় ইসরাইলের এম্বাসিও LGBTQ+ পতাকা উড়িয়ে বড়াই করে—'Israel is one of the only countries in the Middle East with far reaching rights for #LGBT communities.'

References

1. Collins, M. Joe Biden helped a movement when he changed his mind on LGBTQ issues. Who advises him now? USA TODAY https://www.usatoday.com/story/news/politics/2023/08/19/joe-biden-gay-friendly-president-lgbtq-issues/70233287007/.
2. Biden says nearly 14% of his 1,500 agency appointees identify as LGBTQ | Reuters. https://www.reuters.com/world/us/biden-says-nearly-14-his-1500-agency-appointees-identify-lgbtq-2021-06-01/.
3. Apple, Microsoft, PayPal join legal fight for transgender rights. https://money.cnn.com/2017/02/24/technology/tech-transgender-amicus-brief/index.html.
4. America's nonreligious are young and liberal—but that's not the whole story. The Salt Lake Tribune https://www.sltrib.com/religion/2024/01/27/who-are-americas-nones-what-do/.
5. Miller, A. New report highlights 'booming' transgender surgery industry that is raking in billions: 'Damage being done'. Fox News https://www.foxnews.com/politics/new-report-highlights-booming-transgender-surgery-industry-that-is-raking-in-billions-damage-being-done(2024).
6. Government of Canada, C. I. of H. R. How to integrate sex and gender into

research - CIHR. https://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50836.html (2018).

7. Heidari, S., Babor, T. F., De Castro, P., Tort, S. & Curno, M. Sex and Gender Equity in Research: rationale for the SAGER guidelines and recommended use. Res Integr Peer Rev 1, 2 (2016).

8. Joyce, H. Trans: When Ideology Meets Reality. (Oneworld Publications, London, 2021).

9. Homosexuality is an imperial cultural colonialism tool | Monitor. https://www.monitor.co.ug/uganda/oped/commentary/homosexuality-is-an-imperial-cultural-colonialism-tool-4162356.

10. Beyond Gay Imperialism | Samuel Huneke. The Baffler https://thebaffler.com/latest/beyond-gay-imperialism-huneke (2021).

11. White House threatens to pull aid to Uganda over anti-LGBTQ bill. https://www.courthousenews.com/white-house-threatens-to-pull-aid-to-uganda-over-anti-lgbtq-bill/.

12. Uganda hit with foreign aid cuts over anti-gay law | Al Jazeera America. http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/27/uganda-hit-with-foreignaidcutsoverantigaylaw.html.

13. The Missing Realism of Biden's Pro-LGBTQ Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/03/04/the-missing-realism-of-bidens-pro-lgbtq-foreign-policy/.

14. BBC secret staff sex survey reveals 417 workers are transgender | Daily Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/news/article-5905129/BBC-chief-stunned-secret-staff-sex-survey-reveals-417-workers-transgender.html.

15. Staff, M. FIFA World Cup 2022: European teams abandon plans to wear 'One Love' armband supporting LGBTQ community. Maktoob media https://maktoobmedia.com/qatar-2022/fifa-world-cup-2022-european-teams-abandon-plans-to-wear-one-love-armband-supporting-lgbtq-community/ (2022).

16. কাতার বিশ্বকাপ ২০২২: ইউরোপের বিরুদ্ধে ভন্ডামির অভিযোগ করলেন ফিফার প্রেসিডেন্ট - BBC News বাংলা. https://www.bbc.com/bengali/articles/crg9759lwnjo.

17. The massive hypocrisy of the West's World Cup 'concerns' | Qatar World Cup 2022 | Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2022/11/28/the-massive-hypocrisy-of-the-wests-world-cup-concerns.

18. AIPAC USIL 🎗 [@AIPAC]. Stand up for what's right. Stand with Israel against Hamas. Text ACT to 73075. https://t.co/cyZ8JsLyZQ. Twitter https://x.com/AIPAC/status/1393959430346219522 (2021).

সমকামিতার 'ব্র্যাক মডেল'

ব্র্যাক মডেলের পটভূমি

বিকৃত যৌনতা (পায়ুকামিতা) যে মানবাধিকারের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে এবং বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্র, জাতিসংঘের মতো সংস্থা, কর্পোরেট কোম্পানী এই মতবাদ চাপিয়ে দেবে, তা সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই বিষয়ের গবেষক, একাডেমিশিয়ান এবং ফিউচারিস্টরা (ভবিষ্যৎ বিশেষজ্ঞ) ঠিকই ধারণা করতে পেরেছিলেন। সেই লক্ষ্যে তারা বিশ্বের নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ দিয়েছেন। উপমা দিলে বিষয়টি অনুধাবন করতে সহজ হবে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন মোবাইলের প্রচলন শুরু হয়নি, তখন পত্রিকায় মাঝে মাঝে খবর বের হতো, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ছাড়াও ছবি তোলা, ভিডিও দেখা, গান শোনা, নোট করা ইত্যাদি কাজ সমাধা করা যাবে। তখন অবাস্তব মনে হতো। ২০২৩ সালে জনপরিসরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাটজিপিটির সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। এমন বিপ্লব যে ঘটবে তা বিশেষজ্ঞরা জানতেন; ১০-২০ বছর আগ থেকে এই বিষয় নিয়ে তারা বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন।

সমকামিতা যে গ্লোবাল এজেন্ডা হতে যাচ্ছে, তা নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আঁচ করা যাচ্ছিল। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (International Conference on Population and Development, ICPD) আয়োজন করা হয়, যেখানে ১৭৯টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে প্রথমবারের মতো প্রজনন অধিকার (Reproductive Rights) আলোচনায় আসে। জাতিসংঘ এতদিনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রিক (পপুলেশন কন্ট্রোল) এজেন্ডা থেকে সরে এসে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে প্রজনন অধিকারকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে[১]। পরের বছর (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫) বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে Beverly Palesa Ditsie নামে এক সমকামী (লেসবিয়ান) নারী জাতিসংঘে LGBTQ+ অধিকার সম্পর্কে প্রথম খোলাখুলি বক্তব্য দেন[২]। সাউথ আফ্রিকার LGBTQ+

অধিকার কর্মী আপন সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন—

> 'No woman can determine the direction of her own life without the ability to determine her sexuality. Sexuality is an integral, deeply ingrained part of every human being's life and should not be subject to debate or coercion. Anyone who is truly committed to women's human rights must recognize that every woman has the right to determine her sexuality free of discrimination and oppression. I urge you to make this a conference for all women, regardless of their sexual orientation, and to recognize in the Platform for Action that lesbian rights are women's rights and that women's rights are universal, inalienable, and indivisible human rights.'

অর্থাৎ কোনো নারী তার যৌনতা নিজে নির্ধারণ করতে না পারলে জীবনের গতিপথও সে নির্ধারণ করতে পারে না। যৌনতা প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও গভীরভাবে প্রোথিত অংশ এবং এটি বিতর্ক বা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। যদি কেউ সত্যিকারে নারীর মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তবে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, প্রতিটি নারীর বৈষম্য ও চাপহীনভাবে তার যৌনতাকে নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, এই সম্মেলন যেন যৌন অভিমুখিতা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন) নির্বিশেষে সকল নারীর জন্য হয় এবং Platform for Action-এ এই স্বীকৃতি যেন দেয়া হয় যে, লেসবিয়ান অধিকার হলো নারী অধিকার এবং নারী অধিকার হলো সার্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য এক মানবাধিকার।

২০০০ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) বাস্তবায়ন কমিটি বিবৃতির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের ভিত্তিতে বৈষম্য না করার কথা অন্তর্ভুক্ত করে।

দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন (নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে) নিয়ে কাজ করার জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্র্যাক অন্যতম এনজিও হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতিসংঘের এজেন্ডা ভবিষ্যতে কোনোদিকে বিস্তৃত হবে তা ব্র্যাকের থিংক-ট্যাংক অবগত হওয়ার কথা, কেননা উন্নয়ন সেক্টরের বড় বড় সংস্থার (ইউএন এবং এর অন্তর্গত সংস্থা যেমন- ইউনিসেফ, ইউনেস্কো) সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্র্যাক কাজ করছে কয়েক দশক ধরে। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ব্র্যাক ১৯৯৫ সাল থেকে নারীর ক্ষমতায়নে যৌন শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করে। ২০০০ সালে ব্র্যাকের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে *Providing sex education to adolescents in rural Bangladesh: Experiences from BRAC*[৩]- এই শিরোনামে একটি নিবন্ধ Gender and Development জার্নালে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক মাসিকের যত্ন, স্বপ্নদোষ, যৌন সংক্রমণ সংক্রান্ত রোগ এবং যৌনতার প্রকাশ (যেমন- প্রেম-ভালবাসা) মতো ব্যাপারগুলো নিয়ে কিশোর-কিশোরী মাঝে সচেতনতার কাজ শুরু করে। এগুলো আপাতঃ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ভাল কাজ মনে হলেও এসবের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন।

> Gend Dev. 2000 Jul;8(2):28-37. doi: 10.1080/741923625.

Providing sex education to adolescents in rural Bangladesh: experiences from BRAC

S F Rashid

PMID: 12296150 DOI: 10.1080/741923625

উল্লেখ যে, ছেলেদের স্বপ্নদোষ ও মেয়েদের মাসিক—এসব ইসলামের পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত। পবিত্রতা যেকোনো ইসলামিক প্রথার (যেমন- সালাত আদায়) সাথে জড়িত। তাই শিশু-কিশোরদের বয়ঃসন্ধির সময় এসব বিষয়ে সচেতন করা ইসলামী সমাজের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। কিন্তু অধুনা অনুপ্রবেশ করানো পশ্চিমা যৌন শিক্ষার মূল লক্ষ্য পরিচ্ছন্নতা নয়। এটি নারীবাদের ইস্যু, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরের সর্বোভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা—আমার শরীরের মালিক আমি নিজেই, আমার যা খুশি তা-ই করব, অন্য কেউ বলার কে? অন্যের (ব্যক্তি হিসেবে) ক্ষতি হয় কিনা তা শুধুমাত্র বিবেচ্য; এখানে সমাজ, সংস্কৃতি কোনো বিষয় নয়। যৌন তৃপ্তি লাভ করাকে (তা যেভাবেই হোক, যেমন- সমলিঙ্গের যৌনতা, হস্তমৈথুন, পরকীয়া, পতিতালয়ের মাধ্যমে যৌন তৃপ্ত হওয়া ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমা মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়[৪]; যা আমাদের সমাজ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

ওপরোক্ত নিবন্ধের লেখক (ড. সাবিনা ফয়েজ রশিদ) পরবর্তীতে ব্র্যাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ অনুষদে বাংলাদেশের সমকামীদের অধিকার নিয়ে গবেষণা এবং ওকালতিতে (এডভোকেসি) আত্মনিয়োগ করেন। তাকে ঘিরেই ব্র্যাকের Centre for Excellence Sexual Reproductive Health Rights প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হয় এবং এই সেন্টারটি ২০০৭ সাল থেকে জনপরিসরে LGBTQ+ অধিকার আদায়ের গবেষণা, এডভোকেসি, লবিং এবং ট্রেইনিং-এর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কেন ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ

কওমে লুতের ঘটনার ৪০০০ বছর পর জার্মান আইনজীবী হাইনরিখ উলরিখস ১৮৬৭ সালে আইনজীবীদের সম্মেলনে পায়ুসঙ্গম আচরণকে ব্যক্তির অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেন। এটা তৎকালীন জার্মানীর মতো প্রগতিশীল সমাজের জন্যও অচিন্তনীয় বিষয় ছিল। পরবর্তীতে সমকামী গবেষক এবং অ্যাক্টিভিস্ট ম্যাগনাস হার্শফিল্ড, অধ্যাপক আলফ্রেড কিনসি, অধ্যাপক জন মানি, ড. হ্যারি বেনজামিন, হেফনার, হ্যারি হেই, অধ্যাপক জুডিথ বাটলার, ড. মার্টিনি রথব্লট, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং জো বাইডেনের হাত ধরে ১৫০ বছরের পরিক্রমায় সেই যৌন বিকৃতি অধিকার হিসেবে বিস্তার ঘটেছে ১৩২টি দেশে [৫]। এখন রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এটি উদ্‌যাপন করার সংস্কৃতিও দাঁড়িয়ে গেছে! অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে যাওয়া এই বিকৃত মতবাদ সার্বজনীন হওয়ার একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিম দেশগুলো। যৌন বিকৃতির এই বৈশ্বিক প্রকল্পের বুদ্ধিজীবী এবং কৌশলবিদরা উন্নয়নশীল মুসলিম দেশে কীভাবে এটিকে সামাজিকীকরণ করা যাবে তার রূপরেখা বা মডেল তৈরী করতে পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাখঢাক না রেখে প্রকাশ্যে পায়ুকামী আচরণ মানবাধিকারের ব্যানারে চাপিয়ে দিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ এবং জাতিসংঘের মতো সংস্থা, যা নিয়ে আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, এশিয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়নশীল মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি আরব দেশ, মালেশিয়া, ইরান এবং তুরস্কের মতো দেশে LGBTQ+ মতবাদ প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী চ্যালেঞ্জিং। তাই ইন্দোনেশিয়া (লোকসংখ্যা ২৭৫ মিলিয়ন), পাকিস্তান (২৩৬ মিলিয়ন) এবং বাংলাদেশের (১৭০ মিলিয়ন) মতো উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ সমকামিতা

বৈধকরণ এবং সামাজিকীকরণের ইস্যুতে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। সম্ভবত এই লক্ষ্যে পশ্চিমা রাষ্ট্র এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ৫০ বছর ধরে গড়ে ওঠা ব্র্যাক-এর মতো শক্তিশালী এনজিও প্রতিষ্ঠানকে (যার সারা দেশব্যাপী মজবুত নেটওয়ার্ক রয়েছে) নির্বাচন করা হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে তারা নিজেরাই সায়েন্টিফিক জার্নালে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলের গবেষকরা দাবী করেছেন যে, তাদের অভিজ্ঞতা ও কৌশল (রিসার্চ এবং এডভোকেসি) অন্যান্য উন্নয়নশীল রক্ষণশীল দেশে কার্যকরী হতে পারে। ব্র্যাকের গবেষকরা প্রতিবেদনের (Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh) সারাংশে লেখেন[৬]—

> However, we found that it is possible to creat a public space and dialogue on sexuality and rights in a conservative and challenging environment like Bangladesh by bringing together a diverse group of stakeholders - LGBT gropus, research, academics, NGO professionals, health providers, journalist and policymakers - to successfully challenge representations of sexuality in the public arena.

তবে, আমরা দেখেছি যে, জনপরিসরে যৌনতার উপস্থাপনাকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করতে LGBTQ+ গ্রুপ, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, এনজিও পেশাজীবী, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সাংবাদিক এবং নীতিনির্ধারকদের মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল এবং চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে জায়গা তৈরি করা এবং আলাপ তোলা সম্ভব।

আজ থেকে এক দশক আগে (২০১৩) ব্র্যাকের হিউম্যান রাইটস এবং লিগ্যাল এইড সার্ভিসের ডিরেক্টর Dr Faustina Pereira ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে সমকামী অধিকারের বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে ব্র্যাকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে মন্তব্য করেন[৭]—

https://web.archive.org/web/20200501101552/https://blog.brac.net/realising-the-next-barrier-to-human-rights/

10/10/24, 1:13 PM Realising the next barrier to human rights - Th

Sexuality is not a mainstream frontier of development work but is a gap in tackling the deeply embedded factors of poverty.

Today marks the 20th anniversary of celebrating Human Rights Day, posing the question, what are some of the most pressing human rights challenges of the next 20 years? Overcoming the taboo of sexuality is a big first step; recognising LGBT rights and needs will help

development interventions to have a lasting impact. As our society continues to change and open up the space for discussion, we must also take this revolution into account for own our programmes and interventions. Only then will we be on track to truly honour and continue Mandela's commitment to human rights and equality.

Dr Faustina Pereira is the director of BRAC Human Rights and Legal Aid Services. She is a lawyer, human rights activist and writer.

অর্থাৎ আজকের ২০তম মানবাধিকার দিবসে একটি প্রশ্ন, আগামী ২০ বছরে মানবাধিকার নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জিং ইস্যু কী হতে যাচ্ছে? যৌনতা নিয়ে সামাজিক বাধা অতিক্রম করা একটা বড় পদক্ষেপ; সমকামীদের অধিকার এবং প্রয়োজনের স্বীকৃতি প্রদান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব (ইতিবাচক) ফেলবে। যেহেতু আমাদের সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং তাদের নিয়ে আলাপের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হতে থাকবে , তাই আমাদেরকেও আমাদের সকল কার্যক্রম এবং মধ্যবর্তিতায় অবশ্যই এই আমূল পরিবর্তনকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

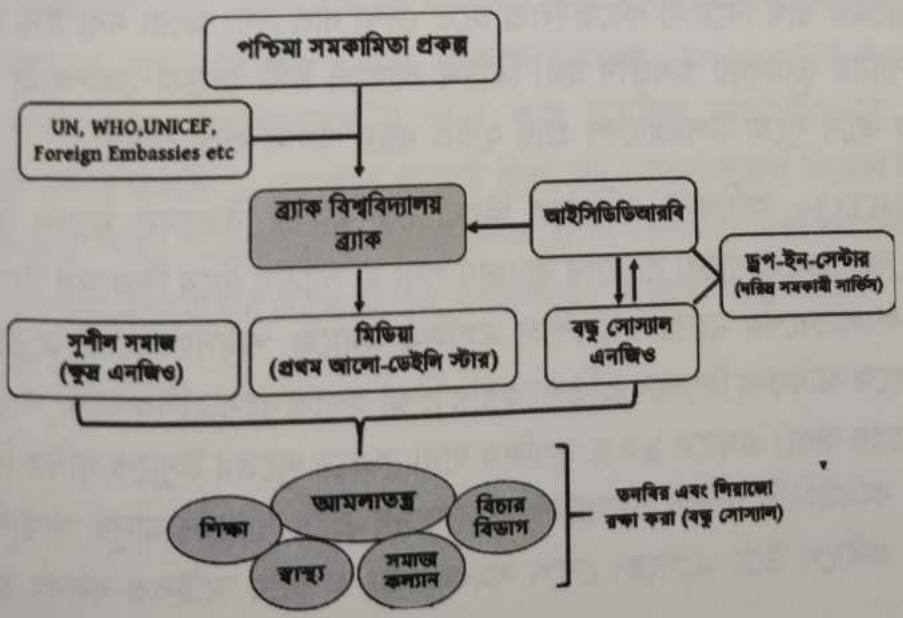
সমকামিতার সামাজিকীকরণ একটি ধীর প্রক্রিয়া

LGBTQ+ অন্য আর দশটা ইস্যুর মতো নয়। গণমাধ্যম এবং নারীবাদীদের প্রচারণার (We own our own body... my body, my choice) ফলে এক সময়ের সামাজিকভাবে নিন্দনীয় বিষয়গুলো (যেমন- পোশাক-আশাক, চাল-চলন) স্বাভাবিক হতে প্রায় ২০-৩০ বছর লেগেছে। লাইফস্টাইল কেন্দ্রিক সামাজিক পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে ঘটে। সেই তুলনায় সমকামিতার মতো ঘৃণিত যৌন আচরণকে 'অধিকার' হিসেবে রক্ষণশীল সমাজে স্বাভাবিকীকরণ কেমন চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন প্রকল্পের শুরুতেই

যদি বলা হয়, 'সমকামিতা মানসিক কোনো সমস্যা নয়, এটা হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার, সুস্থ স্বাভাবিক যৌনতার বিষয়', 'স্কুলের কিশোরদের কনডম পরা শেখানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব', 'নিরাপদ যৌনতা হচ্ছে হস্তমৈথুন', তাহলে কি সাধারণ মানুষ এগুলো স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করবে? অবশ্যই না, বরং এর বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ তৈরি হবে। তাই সমকামিতার সামাজিকীকরণ তাড়াহুড়ার বিষয় নয়; দীর্ঘমেয়াদী কৌশল অবলম্বন করা হয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে। ব্র্যাক বাংলাদেশে সেই এক্সপেরিমেন্ট করছে, যা আমরা সামনে দেখতে পাবো।

বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

নারী অধিকারের মোড়কে ("লেসবিয়ান অধিকার হলো নারী অধিকার") সমকামী অধিকার আন্দোলন জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মের মাধ্যমে মূলধারায় আসে। বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলন কার্যত শুরু হয়েছে ১৯৯৫ সালে ব্র্যাকের যৌন শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে, যদিও তখন সমকামিতা ইস্যু গ্লোবাল এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। সেই মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সমকামী অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্র্যাক দেশের এনজিও (বিশেষ করে আইসিডিডিআরবি, বন্ধু সোশ্যাল, ব্লাস্ট), গণমাধ্যম (প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং ঢাকা ট্রিবিউন) এবং সুশীল সমাজকে এক ছাতার নীচে আনতে সক্ষম হয়। পুরো সিস্টেমটা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য পাঠকদের প্রতিষ্ঠানের শক্তি এবং ব্র্যাকগ্রাউন্ড জানা উচিত।



সমকামী আন্দোলনের প্রধান কার্যালয়: ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক ৫০+ বছর ধরে কাজ করছে। এর সফলতার মূলে রয়েছে সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এবং এগুলোর তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে প্রকল্প গ্রহণ এবং সেগুলোর মূল্যায়ন করার সক্ষমতা। দেশের নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের সাথে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক যেকোনো বেসরকারী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারী সংস্থাগুলোর সুবিধা হচ্ছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত। তাই কোন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হয় যদি সরকারী বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারে। একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখা যায় সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা এবং বড় কর্মকর্তা—বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত—তাদের কনসালটেন্ট হিসেবে রিক্রুট করতে বিদেশী সংস্থাগুলোর বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতা এবং গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কগুলো নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজে লাগানো।

উন্নয়নশীল দেশে পশ্চিমা ফান্ডেড এনজিওগুলো সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করে। এরপর আস্তে আস্তে তাদের মূল্যবোধ সংক্রান্ত এজেন্ডাগুলো (যেগুলোকে নব্য উপনিবেশবাদের সফট টুল বলা যায়) চুপিসারে বাস্তবায়ন করে। সময়ের পরিক্রমায় দুর্বল রাজনৈতিক কালচারের সুযোগে এনজিওগুলোকে দেশ ও সমাজের স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায় এবং তারা নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ব্রিটিশ আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা করতে এসে পুরো উপমহাদেশ প্রায় ২০০ বছর শাসন করে গেছে।

LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে একটি বিজনেস মডেল হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। মানুষের ব্যবহার্য পণ্য বা সার্ভিস নিয়ে বিজনেস উদ্যোগের চেয়ে বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে পায়ুসগংগমের মতো যৌন আচরণকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করাও দুঃসাহসিক কাজ, বাস্তবায়ন তো পরের কথা। এখানে ৯২% মুসলিম যারা কওমে লুতের ইস্যুকে ঘৃণিত হিসেবে জানে। কমিউনিটি পর্যায়ে ইসলামিক স্কলারদের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থাশীল যা বিভিন্ন জরীপে উঠে এসেছে। দেশে সমকামিতা অপরাধ আইনও বলবৎ রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা রাষ্ট্র, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সহায়তায় এবং তাদের অর্থায়নে ব্র্যাক বাংলাদেশের সমাজের মূল্যবোধ এবং আইনবিরোধী এই চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প গ্রহণ করে।

২০০৪ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী পাবলিক হেলথ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জায়নবাদী রকফেলার ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফ, গেটস ফাউন্ডেশন, জেমস পি গ্রান্ট ট্রাস্ট এবং ব্র্যাকের নিজস্ব ফান্ডিং-এর সহায়তায় স্কুলটি যাত্রা শুরু করে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানানো দরকার। আলফ্রেড কিনসি'র নেতৃত্বে আমেরিকায় যৌন বিপ্লব ঘটাতে বিশাল অর্থায়ন করেছিল এই রকফেলার ফাউন্ডেশন (Funding a Sexual Revolution: The Kinsey Reports[৮])। ২০০৮ সালে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদকে রকফেলার ফাউন্ডেশন Rockefeller Leadership পুরষ্কার দেয়[৯] এবং ২০১১ সালে এই সংস্থা ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলে Centre for Universal Coverage of Health নামে একটি সেন্টার তৈরীতে অর্থায়ন করে[১০]। ২০১৩ সালে *Rebound: Building a More Resilient World by the Rockefeller Foundation* শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে ব্র্যাক কর্মকাণ্ডকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়[১১]।

ব্র্যাকের ভালো বন্ধু হিসেবে পরিচিত ইউনিসেফ (শিশুদের নিয়ে কাজ করা এই সংস্থা স্কুলের পাঠ্যক্রমে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে এলজিবিটি অন্তর্ভুক্ত করতে অনেক তৎপরতা)-এর সাবেক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের (১৯২২-১৯৯৫) সম্মানে স্কুলটির নামকরণ হয়, ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো (২০০২ এবং ২০০৩) ঘাটলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়েছিল সাদামাটাভাবে। কিন্তু পাবলিক হেলথ স্কুলটি যে স্পেশাল প্রজেক্ট ছিল, তা তাদের শুরুর দিকের বার্ষিক প্রতিবেদনেই স্পষ্ট। বিশ্বের স্বনামধন্য পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শ টিম গঠন করা হয়।

Box 1.1 : International Advisory Board

Prof. Allan Rosenfield, Dean, Mailman School of Public Health, Columbia University (Chair)
Dr. Jon Rohde, former UNICEF Representative for India (Co-Chair)
Mr. F.H. Abed, Chairperson and Founder of BRAC
Dr. Richard Cash, Harvard School of Public Health
Dr. Sadia Chowdhury, World Bank
Dr. Anwar Islam, CIDA and Carleton University
Prof. David Sack, Executive Director, ICDDR, B
Dr. Patrick Vaughan, Professor Emeritus, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Mr. Cole P. Dodge, formerly the head of UNICEF in Bangladesh, is a consultant to the School



ছবি: জর্জ সরোসের (ডান দিক থেকে প্রথম) বাংলাদেশ সফর, ২০০৬।

যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে (ডিএফআইডি) ২০০৫ (১১-১২ নভেম্বর) সালে ব্র্যাকের সাভার ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ হয়। সেখানে সেই স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন এনজিও – BRAC, NIPORT, ICDDRB, Gonoshatha Kendro, Population council, উন্নয়ন সহযোগী পার্টনার- DFID, World Bank, UNICEF and UNFPA এবং সরকারী ডিজি হেলথের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫-২০০৬, পৃষ্ঠা ৫৭)[১২]।

গ্লোবাল ফোরাম ফর হেলথ-এর উদ্যোগে গঠিত Alliance of Global Forum for Health Research -এর মেম্বারশীপ লাভ করে ব্র্যাক স্কুল অব

পাবলিক হেলথ। এটার ফান্ডিং-এ ছিল নরওয়ে সরকার, SIDA-SAREC (সুইডেন), ডিএফআইডি (ইউকে) এবং ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং রিসার্চ সেন্টার (কানাডা)। ৩ ডিসেম্বর ২০০৫, Realising Rights প্রজেক্টের ওপর প্রথম ওয়ার্কশপ আয়োজন করে ব্র্যাক পাবলিক হেলথ স্কুল। জাতীয় কন-সাল্টেশন ওয়ার্কশপে বিভিন্ন এনজিও, সরকারী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৫৭ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন[12]।

ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর ঈর্ষণীয় সক্ষমতা

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শুরু থেকেই ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ অত্যন্ত শক্তিশালী প্লাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই স্কুলটি কেন স্পেশাল? এই প্রশ্নের জবাবে স্কুলটির প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে যে পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছে—

* উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে শেখা এবং শিখানোর জন্য ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ হতে পারে বেশ ভালো 'সামাজিক ল্যাবরেটরি' (Social laboratory)।
* উন্নয়ন সংস্থা, ব্র্যাকের মতো এনজিও সাথে জড়িত, যার রয়েছে দেশব্যাপী শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ।
* আইসিডিডিআরবি'র মতো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত পাবলিক হেলথ রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের সাথে রয়েছে রিসোর্স পার্টনারশীপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে যেকোনো কাজে অন্যরকমের সুবিধা পাওয়া যায়। ২০০৭ সালে জনপরিসরে সমকামী অধিকার দাবী করার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজনের সময় এই বিষয়টা বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা ব্র্যাকের গবেষকরাই নিজেদের প্রকাশিত পেপারে উল্লেখ করেছে[৬]—

> July 2007 with prominent speakers and activists from Turkey, India, Pakistan, USA, United Kingdom, Kenya and Bangladesh who contributed papers, with over 150 participants attending. The workshop covered a range of topics such as society's prejudices towards minority groups, and issues faced by LGBT members in living in a heterosexually dominated society. As the conference was being held at the BRAC Centre and hosted by the University, this gave the subject matter legitimacy and credibility. We therefore decided to invite a diverse group of policy actors and practitioners (women's groups, activists, researchers, academics, media profes-

জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের তথ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের ১৫০টি সংস্থা অর্থায়ন করেছে[১৩]। তারা বর্তমানে এটি ১২৫টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা এবং ৭৫টি দেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে একসাথে কাজ করছে। তন্মধ্যে বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পার্টনার হিসেবে জড়িত রয়েছে। শুনতে অবাক মনে হলেও এমন শক্তিশালী একাডেমিক প্লাটফর্ম সম্ভবত বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মিলেও হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

আইসিডিডিআরবি: ব্র্যাকের পার্টনার

ঢাকার মহাখালিতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল রিসার্চ, বাংলাদেশ। এটির নাম আইসিডিডিআরবি হলেও জনগণ এটিকে চেনে কলেরা হাসপাতাল হিসেবে। অনেকে সেন্টারটিকে বাংলাদেশের রিসার্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানলেও এটি বাংলাদেশের নয়; আইসিডিডিআরবি হচ্ছে আন্তর্জাতিক এনজিও প্রতিষ্ঠান (icddrb is an international health research centre based in Dhaka, Bangladesh ওয়েবসাইট অনুযায়ী[১৪])। বিশ্বে কমিউনিজমের প্রভাব সামরিকভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে ৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার উদ্যোগে ন্যাটোর মতো একটি জোট গঠিত হয়, যা সিয়াটো চুক্তি (The Southeast Asia Treaty Organization, SEATO) নামে পরিচিত। এই জোটে ৮টি দেশ জড়িত ছিল—অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান (তৎকালীন), ফিলিপাইন্স, থ্যাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা। সামরিক সহযোগিতার পাশাপাশি শিক্ষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে সমন্বয়ের জন্যও এই চুক্তি হয়। পরে (১৯৭৭ সালে) সিয়াটো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যরা পেটের পীড়ায় বেকাদায় পড়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানে ১৯৬২ সালে সিয়াটো চুক্তি অনুযায়ী তৎকালীন পাকিস্তানের সম্মতিতে Cholera Research Laboratory প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইসিডিডিআরবি'র যাত্রা শুরু হয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিয়ে। ডায়রিয়া তখন দক্ষিণ এশিয়ায় ভয়ানক মহামারী হিসেবে দেখা দিত। বার বার পাতলা পায়খানা করার ফলে পানি শূন্যতা দেখা দিত। এর ব্যবস্থাপত্র হিসেবে খাবার স্যালাইন কার্যকর

কিনা তা প্রমাণ করতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালিত হয় আইসিডিডিআরবি'র মতলব সেন্টারে ১৯৬৮ সালে। এই ট্রায়াল সফল হওয়ার ফলে কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ডায়রিয়া বা পেট খারাপ হলে যে খাবার স্যালাইন খেতে হয় তা কীভাবে ঘরেই তৈরী করা যায়—ব্র্যাকের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঘরে ঘরে স্যালাইন তৈরী করা শিখে যায়। তাই ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাকেরও অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মনে করে, আইসিডিডিআরবি স্যালাইন আবিষ্কার করেছে; কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়[১৫]।

পশ্চিমা অর্থায়নের প্রকল্পে ব্র্যাক এবং আইডিডিআরবি শুরু থেকেই পার্টনার হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে তারা সমকামিতা নিয়েও একসাথে কাজ করছে। দেশের মূলধারার গণমাধ্যম এদেরকে শুরু থেকেই প্রমোট করে আসছে। তাই ব্র্যাক এবং আইসিডিডিআরবি'র কার্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের সাধারণ জনগণ রয়েছে অনবহিত।

আইসিডিডিআরবি নিয়ে কিছু তথ্য জানা দরকার

যদিও এই বিদেশী এনজিও রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে, কিন্তু এটি সমাজ এবং আইন বিরোধী LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৭ সাল থেকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

কোভিডের সময় (২০২০ সালে) দেশের এক ভুঁইফোঁড় কোম্পানীর প্রেস কনফারেন্সে তারা আবেগে কেঁদে ঘোষণা দিল—'আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কোভিডের টিকা আবিষ্কার করেছি'। এটা ছিল বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা, যখন ৫০+ বছরের স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আইসিডিডিআরবি গ্লোব ফার্মা (যাদের পূর্বের কোনো টিকা বা কোনো কেমিকেল ড্রাগ তৈরীর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না)-এর মতো কোম্পানীর টিকা ট্রায়াল দিতে চুক্তি করে।

টিকা যেহেতু মিলিয়ন মিলিয়ন সুস্থ মানুষকে দেয়া হয়, তাই সেটি যদি অনিরাপদ হয়, তাহলে অসংখ্য মানুষ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। এই শঙ্কা থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী গবেষকদের টিম এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করে গণমাধ্যমে বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আইসিডিডিআরবি'র সিনিয়র পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া বিস্মিত হওয়ার মতো ছিল [১৬] । পরবর্তীতে গ্লোবের টিকার

ট্রায়াল থেকে আইসিডিডিআরবি সরে আসে[১৭]। অবশেষে সেই টিকা আলোর মুখ দেখেনি।

২০১৫-২০১৭ সালে আইসিডিডিআরবি'র অনিয়ম নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আইসিডিডিআরবি'র কর্মী মঙ্গল সংস্থার সাধারণ সম্পাদক গণমাধ্যমে কিছু সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করেন[১৮]—

> 'প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশীদের ইউএন স্তর ও বাংলাদেশীদের ইউএন স্তরের সমতুল্য বেতন সুবিধাদিসহ দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যাক্স-ভ্যাট ফ্রি যন্ত্রাংশ ও রসদ আমদানি, সরাসরি সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া মানব নমুনা পৃথিবীর যেকোনো দেশে প্রেরণ এবং অন্যান্য গবেষণাবান্ধব বিশেষ ব্যবস্থার ক্ষমতা দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত সতেরো (১৭) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ বোর্ড অব ট্রাস্টিসের ওপর অর্পণ করে। সেখানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক এই তিনজন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।
>
> গবেষণার সিংহভাগ বিদেশীদের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে, দেশের চাহিদা মেটাতে নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসকল বাঙালী-বিদেশী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আইসিডিডিআরবি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ইমেজ সঙ্কটে পড়েছে। বর্তমানে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা করায় গবেষণা ক্ষেত্রগুলো বৈশ্বিক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।
>
> জন ক্লিমেন্স প্রশাসন আইসিডিডিআরবির মৌলিক গবেষণা সঙ্কুচিত করে শত শত লিটার মানব নমুনা বিদেশে প্রেরণ করছেন, যেখানে পাশের দেশ ভারত থেকে এক মিলিলিটার রক্তের নমুনাসহ মানব নমুনা বিদেশে প্রেরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বে এসব নমুনার ভীষণ সঙ্কট আছে এবং সংগ্রহে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে, এদেশের গরিব মানুষদের গিনিপিগ বানিয়ে বিদেশীদের নমুনা সংগ্রহ করার কাজে আইসিডিডিআরবিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।'
>
> 'তিনি জানান, আইসিডিআরবির ম্যানেজমেন্ট বোর্ড অবৈধভাবে ৪০

হাজার ৫শ স্কয়ার ফিটের একটি ভবন ব্র্যাককে বছরে এক টাকা ভাড়ায় ৪৯ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে।'

কলেরার খাবার স্যালাইনের কারণে আইসিডিডিআরবি'র প্রতি সাধারণ মানুষের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে। বাংলাদেশে এমন মানুষ নেই, যে কলেরা বা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়নি। সামনে আমরা দেখতে পাবো, সেন্টারটি তার ইতিবাচক ভাবমূর্তি ব্যবহার করে দেশের সমাজ এবং আইন-বিরোধী LGBTQ+ এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্র্যাকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোস্যাইটি: ব্র্যাকের সহযোগী

ভারতের অশোকা ফাউন্ডেশনের সাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিবানন্দ খান ১৯৯৬ সালে LGBTQ+ নেটওয়ার্ক গড়ার জন্য বাংলাদেশে আসেন[১৯]। শিবানন্দ খান ব্রিটেনে পড়াশুনার সময় সমকামী এক্টিভিস্ট হিসেবে দক্ষিণ এশীয় সমকামী নারী ও পুরুষদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'শক্তি' নামক সংগঠন। তিনি নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে LGBTQ+ নেটওয়ার্ক তৈরিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন; তৈরী করেন নায ফাউন্ডেশন (NAZ Foundation International) নামে এনজিও। শিবানন্দ খান Asia Pacific Coalition on Male Sexual (APCOM) নামে আরেকটি আঞ্চলিক প্লাটফর্ম গড়ে তোলেন[২০]। এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্র, জাতিসংঘ সিস্টেম এবং সিভিল সোসাইটিকে একত্রিত করে এইচআইভি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর কাজে নেতৃত্ব দেন। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সমকামীদের (এমএসএম) মাঝে এইচআইভি সমস্যাটি অন্তর্ভুক্ত করতে ভূমিকা রাখেন[২১]। শিবানন্দ খানের মেন্টরশীপ এবং উৎসাহে সমকামী পুরুষদের 'যৌন স্বাস্থ্যসেবা' ও 'সচেতনতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যকে সামনে রেখে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেরার সোস্যাইটি ১৯৯৭ সালে এনজিও নিবন্ধন করে।

সমকামীদের প্রতি সহানুভূতি তথা বৈষম্যের ন্যারেটিভ তৈরী করতে আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে একটি প্রকল্প ('Strategic response to the reproductive and sexual health needs of MSM in Dhaka') পরিচালিত হয়; সেই প্রজেক্টে অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেন বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সালেহ আহমেদ। সমকামীদের জন্য নিরাপদ জায়গা (Safe space) তৈরী এবং সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে আইসিডিডিআরবি'র সহযোগী

বন্ধু সোশ্যাল পশ্চিমা LGBTQ+ এজেন্ডা বাস্তবায়নে দেশে পশ্চিমা এজেন্ডার তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে আসছে।

বন্ধু সোশ্যাল জাতীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির কারণে সমকামিতা ভিন্ন নামে, এমএসএম (MSM-Man sex with man) জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে ঢুকে যায়। নীতিতে এমএসএম শব্দ অন্তর্ভুক্তির ফলে সমকামিতা প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রমে আর আইনত বাধা থাকল না। অর্থাৎ, দেশের সমকামিতা অপরাধ আইন (পেনাল কোড ৩৭৭) 'টেকনিক্যালি' তাদের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম যে ভবিষ্যতে সমাজ বিধ্বংসী LGBTQ+ তথা যৌনবৈচিত্র্য অধিকার আদায়ের মতো ইস্যু হতে পারে, তা নিয়ে সম্ভবত সরকারী নীতিনির্ধারকরা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এটা ইস্যু হওয়ারও মতো ব্যাপারও ছিল না, কেননা LGBTQ+ আন্দোলন তখনো মূলধারায় আসেনি।

২০০৭ সাল থেকে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলের নেতৃত্বে

shale's work gained momentum in 1997 when he was able to put msm and transgender issues on the national health strategy agenda. though the bondhu welfare society was not invited to the 1997 meetings in which the health plan was to be drafted, shale determinedly enlisted the help of unaids and gained access to the meeting where he first proposed that the kothi, transgender, and msm communities be integrated into the national health strategy. after much debate, these communities were finally included in the document for the first time. towards the end of 1997, through the

https://www.ashoka.org/en-bd/fellow/shale-ahmed#accordion

বন্ধু সোশ্যাল সুসংগঠিত হয়ে মূলধারায় পায়ুসংগম অধিকার (ভিন্ন ভিন্ন শব্দে যেমন যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য, জেন্ডার ডাইভার্স পপুলেশন ইত্যাদি) নিয়ে এডভোকেসি (ওকালতি) শুরু করে। বন্ধু সোশ্যালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্যমতে তারা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, আইন), কর্পোরেট, গণমাধ্যম এবং বিনোদন গণমাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ, তথা লবিং-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস

বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়

* প্রথম ধাপ: যৌন স্বাস্থ্যসেবা এবং সচেতনতা (১৯৯৬-২০০৬)
* দ্বিতীয় ধাপ: জনপরিসরে সমকামী অধিকার দাবী এবং নেটওয়ার্ক তৈরি (২০০৭-২০১৩)
* তৃতীয় ধাপ: প্রকাশ্যে সমকামিতা অ্যাক্টিভিজম(২০০৮-২০১৬)
* চতুর্থ ধাপ: হিজড়ার আড়ালে ট্রান্সজেন্ডারিজম অ্যাক্টিভিজম (২০১৫-বর্তমানে চলমান)
* পঞ্চম ধাপ: পলিসিতে তথা পাঠ্যপুস্তক, জনশুমারী, যৌন শিক্ষা, ট্রান্সজেন্ডার আইনে প্রভাব বিস্তার (২০২০-২০২৩)

বাংলাদেশে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে মূলত জার্নাল পেপারের রেফারেন্স ব্যবহার করায় জোর দিয়েছি। পাঠকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা জরুরী—সমকামিতা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতা তৈরী হওয়ার কারণে ব্র্যাক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল-প্রমাণ তাদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলেছে। এই ধরনের লুকোচুরি করার প্রবণতা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। পশ্চিমা এজেন্ডা তারা জেনে-বুঝে বাস্তবায়ন করছে। তবে এটাও জানা দরকার যে, বর্তমানে অনলাইন থেকে সহজে কোনো তথ্য ডিলিট করা যায় না। এসব বিবেচনা করে সায়েন্টিফিক জার্নালে প্রকাশিত তথ্যগুলো অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে, কেননা এগুলো সহজে সরিয়ে ফেলা যায় না।

যে জার্নাল পেপারগুলো সমকামিতা সামাজিকীকরণে প্রচেষ্টার ইতিহাস তুলে ধরেছে সেগুলো হচ্ছে—

১. Providing sex education to adolescents in rural Bangladesh: Experiences from BRAC. Gender & Development. 2000;8:28–37.

২. Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh. Health Research Policy and Systems. 2011;9:S12.

৩. The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh. Culture, Health & Sexuality, 2017;

17: 1418-1431

৪. Section 377, Same-sex Sexualities and the Struggle for Sexual Rights in Bangladesh. Australian Journal of Asian Law. 2019; 20:1–11.

৫. Experiencing shame: An affective reading of the sexual and reproductive health and rights classroom in Bangladesh

শব্দের কারসাজী: বাংলাদেশে মানুষদের যেভাবে বোকা বানানো হয়

LGBTQ+ অধিকার আন্দোলনের সফলতায় শব্দের মারপ্যাঁচ নিয়ে দুটি চ্যাপ্টার বইতে যুক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলন দাঁড়িয়ে আছে মানুষের অসচেতনতাকে পুঁজি করেই, যেখানে শব্দচয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মতো সমাজে প্রকাশ্যে সেক্স ও যৌনতা সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের লজ্জা কাজ করে। এটা আইন বিরোধী কাজও হতে পারে। এগুলো নিয়েও পশ্চিমা অর্থায়নে ব্র্যাক পাবলিক স্কুল নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছে। এই বিষয়টা এতই সংবেদনশীল যে, এনজিওরা বিভিন্ন কর্মসূচী বা নামের ক্ষেত্রে সেক্স ও সেক্সুয়ালিটি শব্দের পরিবর্তে প্রজনন এবং পপুলেশন হেলথ সার্ভিস, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন (adolescent development), জেন্ডার জাস্টিস, ডাইভার্সিটি এবং বডি রাইটস ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকে[২৩]। Comprehensive Sexuality Education (CSE) ২০০৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যৌনতাকে (Sexuality) প্রথমবারের মত বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে[২৪]-

'Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviors, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, social, economic, political,

cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual factors.'[১]

অর্থাৎ যৌনতা জীবনব্যাপী মানবিক অস্তিত্বের একটি কেন্দ্রীয় দিক। যৌনসম্পর্ক, লিঙ্গ পরিচয় ও ভূমিকা, যৌন অভিমুখিতা বা রুচি, রতি, আনন্দ, ঘনিষ্ঠতা এবং প্রজনন যৌনতার অন্তর্গত। যৌনতা চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা, বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ, আচরণ, অভ্যাস, ভূমিকা এবং সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অনুভূত এবং প্রকাশিত হয়। যদিও যৌনতা এই সবকয়টি মাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, তবে সবগুলো সর্বদা অনুভূত বা প্রকাশিত হয় না। যৌনতা জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আইনী, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ফ্যাক্টরগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই বিস্তৃত সংজ্ঞার আলোকে সব ধরনের বিকৃতি, যেমন- সমকামিতা, পশুকামিতা, শিশুকামিতা ইত্যাদি যৌন রুচি বা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হতে পারে; এমনকি পরস্পর চকলেট শেয়ার করার মাধ্যমেও যৌনতা প্রকাশ পেতে পারে। বাংলাদেশে সরাসরি সমকামী বা LGBTQ+ শব্দ ব্যবহার করে কাজ করা কঠিন, তাই শুরু থেকেই বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিক শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আশ্রয় নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার কারণে LGBTQ+ আন্দোলন আজকের অবস্থায় এসেছে। সমকামিতা নিয়ে শব্দের কারসাজি সহজে অনুধাবন করতে একটি উদাহরণ হতে পারে 'পানি' নামক শব্দটি।

> পানির প্রতিশব্দ কমপক্ষে ১৪টি (বারি, সলিল, অম্বু, অপ, নীর, উদক, উদ, তোয়, প্রাণদ, ইরা ইলা, পুষ্কর, জীবন ইত্যাদি) থাকলেও বাস্তবে জিনিস একটাই (পানি), শুধু ভাব ও প্রকাশের ভিন্নতা রয়েছে।

ব্ল্যাক, আইসিডিডিআরবি এবং বন্ধু সোশ্যাল থেকে প্রকাশিত জার্নাল পেপার, মনোগ্রাফ, রিভিউ পেপার এবং ওয়ার্কশপে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে LGBTQ+ ইস্যুতে শব্দগুলোকে যেভাবে ফ্রেমিং বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলো তুলে ধরছি[২৫], [২৬]—

* MSM (Men Who Have Sex With Men/পুরুষ-পুরুষে যৌনতায় লিপ্ততা)
* Gender Identity (মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)—এটা নারী পুরুষ ছাড়াও আরো ১০০+ পরিচয় হতে পারে

* SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights/যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার)
* SOGI (Sexual Orientation [যৌন রুচি], Gender Identity/ মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)
* SOGISEC (Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristic)
* CSE (Comprehensive Sexuality Education/যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা)
* Gender diversity, gender minority[২৫]
* যৌন স্বাস্থ্য, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়
* পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
* যৌন অধিকার, লিঙ্গ-বৈষম্য, লিঙ্গ সমতা, সমতন্ত্র

যদিও আপাতভাবে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, এসব আলোচনা মূলত ব্যক্তিগত যৌন আচরণের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছামতো নিজের যৌন পরিচয় নির্ধারণের অধিকার এবং তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রচার করে। যদিও কিছু শব্দ হয়তো নতুন বা জটিল মনে হতে পারে, এগুলো বোঝার জন্য কিছু সাধারণ সূত্র মেনে চলতে পারেন:

* যখন যৌনতা সম্পর্কিত কোনো আলোচনায় 'অধিকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন সাধারণত বিকৃত বা অবাধ যৌন আচরণের সামাজিক ও আইনি বৈধতার প্রসঙ্গ ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার' বলতে এখানে বিকৃত যৌন আচরণের স্বাধীনতা বোঝানো হচ্ছে। বিষয়টি আরো সহজে বুঝতে—ধরুন, ৫০ কেজি আম অর্ডার করলেন। সেই পার্সেলে এক-দুইটা পচা আম সচরাচর থাকে।
* এখন আমের পার্সেল নিয়ে আলোচনায় পচা আমের কথা ইস্যু নয়। এমন যে হয়, তা ধরেই নেয়া হয়, তাই বলার প্রয়োজন পড়ে না।
* যখনই 'বৈচিত্র্য' শব্দটি আলোচনায় আসে, বুঝতে হবে এটি বিকৃত যৌন পরিচয় অথবা আচরণের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, 'বৈচিত্র্যময় যৌন পরিচয়' বলতে সমকামী বা উভকামী সম্পর্ককে ইঙ্গিত করা হয়।
* একইভাবে, 'বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় বলতে নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী বোঝানো হয়।

এইডস প্রতিরোধের আড়ালে যৌন স্বাস্থ্যসেবা এবং সচেতনতা

১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি শনাক্ত হয় এক সমকামী ব্যক্তির দেহে। এর আগে সমকামী শব্দটি সমাজে অপরিচিত ছিল। নব্বইয়ের শেষ দিকে বিদেশী এনজিও 'এইডস প্রতিরোধ'-এর ব্যানারে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার বা প্রিভেইলেন্স খুবই কম (০.১% এর নীচে)। গত ৩০ বছরে (১৯৮৯-২০২১) বাংলাদেশে এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৮,৭৬১ জন। এদের মধ্যে ১৫৮৮ জন এইডস-এ মারা গেছে[২৭]। সেইসময় থেকে বর্তমান সময় অবধি বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস ব্যবহারকারী। সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত মানুষদের তুলনায় উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন গোষ্ঠীতে এইডস-এর হার প্রায় ৩৯ গুণ বেশী (HIV prevalence remains about 3.9% among the key population mostly in PWID as per 2016)। কাজেই এইডস নিয়ে কাজ করা কার্যত ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা।

সমাজে এইডস-এর প্রতি অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বিবেচনা করে জনপরিসরে এনজিওগুলো সরাসরি সমকামী বা হোমোসেক্সুয়াল শব্দ পরিহার করে MSM (Men who have sex with men, অর্থাৎ পুরুষে-পুরুষে যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়) ব্যবহার করে সমকামিতা বিষয়টাকে আড়াল করতে সমর্থ হয়।

এইচআইভি মহামারির আশংকায় বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে জাতীয় এইডস কমিটি গঠন করে[২৭]। ১৯৯৭ সালে এইচআইভি/এইডস এবং যৌন সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধে কম্প্রিহেনসিভ স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করা হয়। এমএসএম পরিভাষা নিয়ে শুরুর দিকে অস্বস্তি তৈরী হয়। এমএসএম গোষ্ঠীকে এমন পুরুষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যারা অন্য পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, কিন্তু যৌন পেশায় জড়িত নয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সমকামী আচরণে জড়িত পুরুষেরা

নিজেদেরকে 'এমএসএম' মনে করে না এবং এই পরিভাষা তাদের পছন্দও নয়; বরং এ শব্দটিতে তারা বিরক্ত হয়। তা সত্ত্বেও, যেহেতু এই অভ্যাসটি ভাইরাস সংক্রমণের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ, তাই বাংলাদেশে 'এমএসএম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়২৭।

২০১৮ সালের সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী আইসিডিডিআরবি, ইউনিসেফ এবং সেইভ দ্যা চিল্ড্রেন-এর সাথে কিছু দেশী এনজিও (বন্ধু সোশ্যাল এর অন্যতম) ২৮,০০ এমএসএম এবং ৪০৬২ হিজড়াদের (যাদেরকে ট্রান্সজেন্ডারও বলা হয়েছে) এইচআইভি প্রতিরোধ সেবা দিয়েছিল[২৮]।

বাংলাদেশে এইডস/এইচআইভি কার্যক্রম আমাদের সরকারের তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হলেও অর্থায়ন করে আসছে বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ এবং দাতা সংস্থা। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা (UNAIDS, UNICEF, UNFPA and WHO), গ্লোবাল ফান্ড (পশ্চিমা দেশ এবং বিল গেটস-এর মতো দাতাদের সমন্বয়ে এইচআইভি মোকাবেলায় বিশেষ ফান্ড), World Bank; DFID; German Technical Cooperation (GTZ); USAID অন্যতম[২৭], [২৮]।

সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের এইডস কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দ বিদেশী অর্থায়নে মূলত ৩টি আন্তর্জাতিক এনজিও'র (আইসিডিডিআরবি, সেইভ দ্য চিল্ড্রেন এবং কেয়ার-বাংলাদেশ) লিডারশীপে পরিচালিত হয়। ২০০৮ সালের রিভিউ পেপারে প্রকাশিত তথ্য অনুয়ায়ী ২৩৫টি স্থানীয় এনজিও সেই বড় এনজিওগুলো পরিচালিত প্রকল্পে সহযোগী হিসেবে কাজ করে[২৭]। এদের মধ্যে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেরার সোস্যাইটি এবং লাইটহাউজ অন্যতম।

বাংলাদেশসহ এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সমকামিতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক। এইচআইভি মহামারী নিয়ে এমন ভীতিকর অবস্থা তৈরী করা হয় যে, সমকামিতাকে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করা হলেও এইডস প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগে এসব দেশের সরকার নীতিমালা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়[৬]।

বিভিন্ন স্তরের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এই কর্মকাণ্ড হচ্ছিল এমন একটি সামাজিক এবং আইনি প্রেক্ষাপটে, যেখানে সমকামী যৌনতা একই সাথে নিষিদ্ধ এবং অপরাধমূলক ছিল। যদিও সরকারের মধ্য থেকে পুরুষ-পুরুষ যৌনতা এবং যৌন স্বাস্থ্যের বিষয়টি উত্থাপন করা নিয়ে কোনো বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়নি, কেননা

পুরুষে-পুরুষে সমকামিতা এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে বড় একটি ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করে মোকাবেলা করার প্রয়োজন ছিল[২৯]।

এখানে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এইচআইভি এবং যৌনাঙ্গে সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধের কার্যক্রমকে সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের পথ সুগম করার আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় এজেন্ডার অংশ হিসাবে দেখা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এইচআইভি কার্যক্রম দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির পুরুষদের লক্ষ্য করে ফোকাস করা হয়, এর ফলে দারিদ্র্য এবং এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতার মধ্যে একটি সরাসরি সংযোগকে জোর দেয়া হয়েছিল।

যদিও বন্ধু সোশ্যাল তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোতে তাদের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করার প্রয়াস প্রতীয়মান হয়। বাস্তবতা হলো, তাদের মতো সদ্য রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত অপরিপক্ক এবং পর্যাপ্ত রিসোর্সহীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইচআইভি/এইডস প্রজেক্ট সামনে থেকে পরিচালনার করার সক্ষমতা ছিল না; তারা মূলত আইসিডিডিআরবি'র পার্টনার হিসেবে কাজ করে।

আইসিডিডিআরবি মাঠ পর্যায়ে সমকামীদের মাঝে এইচআইভি'র ঝুঁকি, আর্থ-সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ডেটা তৈরী করে এবং এগুলো পরবর্তীতে নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে বয়ান তৈরীতে অবদান রাখে[২৯]। বন্ধু সোশ্যাল এই সময়টাতে কেয়ার বাংলাদেশ (CARE Bangladesh)-এর সহযোগী হিসেবেও কাজ করতে শুরু করে।

পরবর্তী কয়েক বছরে বন্ধু সোশ্যাল ফান্ডিং পায় ইউএসএইড, নেদারল্যান্ডের দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (DFID) থেকে। অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমা ফান্ডিং-এ আইসিডিডিআরবির তত্ত্বাধানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমকামী পুরুষদের জন্য ড্রপ-ইন সেন্টার (ডিআইসি) নামে ওয়ান স্টপ ক্লিনিক খুলতে থাকে বন্ধু সোশ্যালসহ অন্যান্য এনজিওগুলো[২৯]। এসব ড্রপ-ইন-সেন্টারগুলোতে যে সাপোর্টগুলো দেয়া হয়, সেগুলো হলো—

* সমকামীদের স্বাস্থ্য চেকআপ (এইচআইভি স্ক্রিনিং)
* 'নিরাপদ' পায়ুসঙ্গমের জন্য বিনামূল্যে কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করা
* এই সেন্টারগুলো যৌন সঙ্গী খোঁজা এবং নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্র হয়ে উঠে
* অনেক ড্রপ-ইন-সেন্টার পুরুষদের জন্য নাচগান এবং ক্রসড্রেসিং (নারী

সাজা)-এর মতো কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে

* এইডস/এইচ আই ভি এবং যৌন রোগ সংক্রমন প্রতিরোধে সচেতনতা
* সাম্প্রতিক সময়ে ড্রপ-ইন-সেন্টারে নাকি LGBTQ+ দিবসও উদ্‌যাপন করা হয়

১৯৯৭ থেকে শুরু করে গত সাতাশ বছরে বন্ধু সোশ্যাল বিভিন্ন ড্রপ-ইন-সেন্টারের মাধ্যমে ৫০ লাখেরও বেশি কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করেছে সমকামীদের মধ্যে (বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২)। পাশাপাশি ভূমিকা রেখেছে সমকামীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি ত্রিশটিরও বেশি জেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধু সোশ্যাল তাদের দুই যুগের কর্মকাণ্ড (১৯৯৬-২০১৬) নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এই শিরোনামে—*A tale of two decades- 20-year achievement leading to impacts*। তাদের প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৯৬-২০০৬ সাল পর্যন্ত বন্ধু সোশ্যালের স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল না (*Mission was not articulated at this stage, Bandhu began with a clear goal and objective*)। এতদিন সংস্থাটি সমকামীদের ড্রপ-ইন-সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা এবং তাদের নিরাপদ মেলামেশায় সহযোগিতা করেছে। ২০০৫ থেকে ব্র্যাক পাবলিক হেলথ স্কুল সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করার পর ব্র্যাকের সুপারভিশনে এডভোকেসি এবং লবিয়িং-এ প্রচেষ্টা চালায়।

এসময় বন্ধু সোশ্যালের কলাবরেটিভ পার্টনার আইসিডিডিআরবি সমকামীদের যৌনতা ও যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করে। আইসিডিডিআরবি'র গবেষণায় জানা যায়, বাংলাদেশে যারা হিজড়া হিসেবে পরিচিত, তারা আদতে পুরুষ (অর্থাৎ নকল হিজড়া, কিন্তু সামাজিকভাবে হিজড়ারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত) এবং সমকামী যৌনতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। সমকামীদের মাঝে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকায় হিজড়ারা এইডস প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ২০০০ সাল থেকে হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ শুরু করে আইসিডিডিআরবি, কেয়ার বাংলাদেশ এবং বন্ধু'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো[৩০]। ২০১৫ সালের পর ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচার এবং প্রসারে হিজড়া ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখতো পাবো।

বাংলাদেশে ব্র্যাকের সমকামী অধিকার দাবী

ব্র্যাকের পর্যাপ্ত রিসোর্স (ফান্ড, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং মাঠ পর্যায়ের ৩০+ বছরের অভিজ্ঞতা) থাকলেও বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে জনপরিসরে পায়ুসঙ্গম অধিকার দাবী করে তা বাস্তবায়ন করতে বছরের পর বছর লেগে থাকার মতো যোগ্য মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিকৃত যৌনতা-কেন্দ্রিক সমাজ পরিবর্তনের এই দুঃসাহসিক প্রকল্পে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ব্র্যাক তেমনি একজনকে নির্বাচন করে। ড. সাবিনা ফাইজ রশিদ, উচ্চবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্তান, বাংলাদেশী বাবা, যিনি বাংলাদেশের বিদেশী দূতবাসের কর্মকর্তা ছিলেন[৩১]। সেই সুবাদে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কালচারে মেলামেশার কারণে তার মাঝে অন্য ধরনের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠার সম্ভাবনাই বেশী।

ড. সাবিনা ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে মেডিকেল এনথ্রোপোলজিতে আন্ডারগ্রাজুয়েশন (১৯৯২) এবং মাস্টার্স (১৯৯৫) করেন। ব্যাচেলর শেষে তিনি ব্র্যাকের সাথে কাজ শুরু করেন (১৯৯৩)। ড. সাবিনা ২০০৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন (পিএইচডি করেন মেডিকেল এনথ্রোপোলজি এবং পাবলিক হেলথে)[৩২]। ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এ জয়েন করেই World Health Organization (WHO) থেকে তিনি স্পেশাল রিসার্চ গ্রান্ট পান (২০০৫)। এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং গ্রান্টের (*Special Programme of Research Development and Research Training in Human Reproduction*) মাধ্যমে তিনি ট্রেইনিং সেন্টার বাননোর প্রাথমিক কাজ শুরু করেন।

একই বছর বাংলাদেশে LGBTQ+ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে UK Department for International Development (DFID) ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথকে পাঁচ বছর মেয়াদী (২০০৫-২০১০) প্রজেক্টে (Realising Rights: Improving Sexual and Reproductive Health for Poor and Vulnerable Populations) অর্থায়ন করে[১২]। এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং গ্রান্টের মাধ্যমে স্কুলে LGBTQ+/সমকামিতা অধিকারের প্লাটফর্ম যাত্রা শুরু করে। রিয়েলাইজিং রাইটস ('অধিকার অনুধাবন করা') প্রজেক্টটি মাল্টিন্যাশনাল যেখানে

আফ্রিকা, কেনিয়া, আমেরিকা এবং ইউকে এর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান জড়িত ছিল।

ড. সাবিনা সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত ২০০৫-এর এপ্রিলে Realising Rights-এর প্রথম প্ল্যানিং মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং সেক্সুয়াল রাইটস নিয়ে টক দিতে যান একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ডিসেম্বরে দ্বিতীয় প্ল্যানিং মিটিং করেন[১২]। যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে বাংলাদেশের চকোরিয়াতে একটি পাইলট প্রজেক্ট করেন (An exploratory study of sexual concerns and informal service provision in Chakaria, Bangladesh), যা ফাইনাল প্রোপোজাল উন্নত করতে ভূমিকা রাখে।

বিলিয়নিয়ার জর্জ সরোস এবং ব্র্যাকের সখ্যতা

বড় এনজিও প্রতিষ্ঠান হওয়ার সুবাদে ব্র্যাকের সাথে সেক্যুলার গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সুসম্পর্ক অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে The Bangladesh Health Watch ম্যাগাজিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে। এই অনুষ্ঠানে ডেইলি স্টার পত্রিকার মাহফুজ আনাম, খুশী কবির (এসো নিজেরা করি), ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেন এবং ইহুদী ধনকুবের জর্জ সরোস বাংলাদেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন[৩৩]। এখান থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, এই স্কুলের অত্যন্ত শক্তিশালী আন্তর্জাতিক এবং লোকাল নেটওয়ার্ক রয়েছে।

সরোসের সাথে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদের সম্পর্ক অনেক গভীর এবং পুরোনো। ব্র্যাকের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জর্জ সরোসের বক্তব্যের মাধ্যমেও তা প্রতিফলিত হয়[৩৪]। দুজনে ভিন্ন দেশে বাস করলেও তারা একই মূল্যবোধ লালন করেন। ২০১৩ সালে সরোসের প্রতিষ্ঠান ফজলে হাসান আবেদকে ওপেন সোসাইটি পুরস্কার প্রদান করে[৩৫]। ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য সরোস ১০ মিলিয়ন ডলার ফান্ডিং করে; এর ৮ মিলিয়ন ডলার ব্র্যাককে অনুদান দেয় রোহিঙ্গাদের জন্য ব্যয় করতে[৩৬]। এছাড়াও, ২০১৩ সালে জর্জ সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন ১ বিলিয়ন ডলারের (বর্তমান বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা) একটি তহবিল তৈরি করে। এই তহবিলের জন্য পৃথিবীর ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোনীত করা হয়। এই কাজের জন্য ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথও মনোনীত হয় [৩৭]।

বিলিয়নিয়ার সরোসের ওপেন সোস্যাইটি ফাউন্ডেশন LGBTQ+ মতবাদ প্রসারে অত্যন্ত সক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান। ফাউন্ডেশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী ২০০৮ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া) সমকামী অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে[৩৮]। তারা সমকামী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনী সহায়তা দেয়। সম্প্রতি তাইওয়ানে সমলিঙ্গের বিয়ের আইন পাশের ক্ষেত্রে সরোসের ফাউন্ডেশনের ভূমিকা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মানব ইতিহাসের অন্যতম টেক এন্ট্রাপ্রেনার এবং বিখ্যাত ধনকুবের ইলন মাস্ক সম্প্রতি সরোসকে মানবসভ্যতার শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (*Elon Musk says George Soros 'fundamentally hates humanity,' erodes 'fabric of civilization'*)[৩৯]} । বিশ্বে LGBTQ+ অধিকারসহ লিবারেল মতবাদ বাস্তবায়নে অন্যতম অর্থ জোগানদাতা এই সরোস।

সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যম

প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে আলোচনা বিশ্বের অনেক দেশের মতো আমাদের সমাজেও অশালীন এবং লজ্জার বিষয়। ২০০০ সালের আগে মূলধারার সংবাদমাধ্যমে যৌন অধিকার, যৌন বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা হতো না। এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যৌনতা নিয়ে নেতিবাচক অর্থে রোগের ঝুঁকি হিসেবে আলোচনা হতো। কিন্তু পায়ুসংগম অধিকারবাদীদের দাবী হচ্ছে, সমকামিতাকে ইতিবাচক এবং স্বাভাবিক মনে করতে হবে। এই লক্ষ্যে ২০০৬ সালের মার্চে রিয়েলাইজিং রাইটস ('অধিকার উপলব্ধি করা') প্রকল্পের অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের যৌনতা এবং যৌন অধিকার সম্পর্কে সংবেদনশীল করতে ট্রেইনিং দেয়া হয়[৩৩]। এই ট্রেইনিং-এ সাংবাদিকদের মোটিভেশনের জন্য দেয়া হয় সালমা সোবহান ফেলোশীপ; অর্থাৎ স্কলারশীপের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা। ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ১৩ জন সাংবাদিক স্থানীয় এবং জাতীয় সংবাদপত্রে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে ৫ জনকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা তৈরী করা হয়। নির্বাচিত ৫ জনের আর্টিকেল Bangladesh Health Watch-এ প্রকাশিত হয়।

এই ফেলোশীপ ব্র্যাক এবং অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগ। এই ফেলোশীপ নামকরণ করা হয়েছে সালমা সোবহান-এর সম্মানে। তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী (অর্থনীতিবিদ) রেহমান সোবহানের প্রয়াত স্ত্রী। রেহমান

সোবহানের সন্তান জাফর সোবহান 'ঢাকা ট্রিবিউন' ইংলিশ পত্রিকার সম্পাদক। ব্র্যাকের LGBTQ+ অধিকার আন্দোলনে গণমাধ্যম পার্টনার হচ্ছে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং ঢাকা ট্রিবিউন। এই সংবাদমাধ্যমগুলো ছাড়াও দেশের প্রায় সব গণমাধ্যম (বিনোদনসহ) দেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ স্বাভাবিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার নিয়মিত গোলটেবিল মিটিং আয়োজন করে LGBTQ+ এজেন্ডার পলিসি লেভেলে চাপ প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

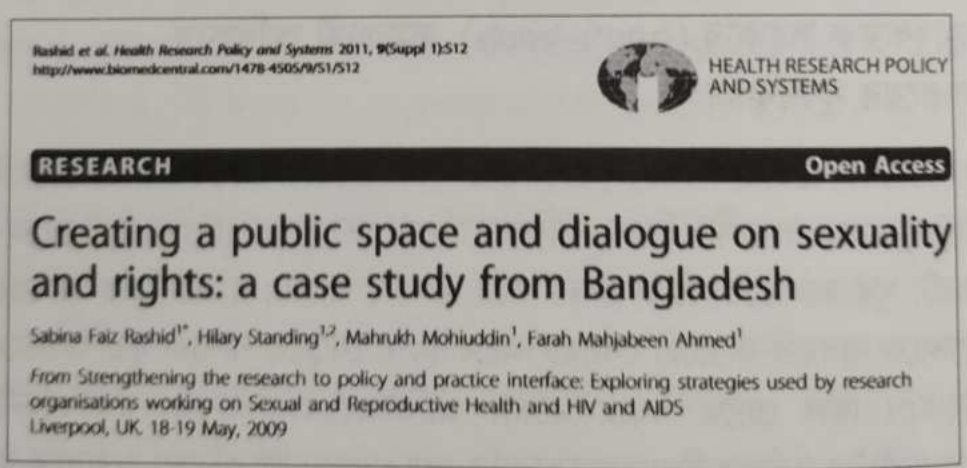
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (আদতে পুরুষ) নিয়ে আবেগঘন বিশেষ প্রতিবেদন ছাপানোর মাধ্যমে কমপক্ষে ১৫ জন ট্রান্সজেন্ডারকে মূলধারায় আনে, যারা অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করে সমাজে সমকামিতা স্বাভাবিকীকরণে ভূমিকা রাখছে। ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টদের আর্থিক সহায়তা এবং স্বীকৃতি পুরস্কারের মাধ্যমে সাংবাদিকদের নিজেদের পক্ষে আনার জন্য যে কৌশল ব্র্যাক গ্রহণ করেছিল, সেই একই কৌশল সমকামী সংস্থা বন্ধু সোশ্যাল পরবর্তীতে গ্রহণ করে। তাদের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৬-২০১৬) অনুসারে তারা ১৪৭ জন সাংবাদিককে ফেলোশিপসহ অন্যান্য সম্মাননা দিয়েছে (Bondhu social report ২০১৭: A tale of two Decades)।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৯): সমকামী অধিকার আদায়ের সুবর্ণকাল

বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল মুসলিম দেশে সমকামিতা নিয়ে কেবলমাত্র আলোচনা করাই খুব সংবেদশনশীল বিষয়, অধিকার চাওয়া তো দূরের ব্যাপার। তাই ব্র্যাক এই বিষয়টা খুব ভালমতো চিন্তাভাবনা করে ২০০৭ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগকে ব্যবহার করেছে। সেসময় আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা দূতাবাসগুলোর দৌড়ঝাঁপ ছিল চোখে পড়ার মতো। জাতিসংঘের নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীতে বাংলাদেশী সৈন্য নিতে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেয় পশ্চিমা থিংকট্যাঙ্ক। অবশেষে আর্মি জরুরী আইন জারি করে ক্ষমতা নেয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বানায়। সেই সময় প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের সম্পাদকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারাও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে মাইনাস-টু ফর্মুলা নিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে সক্রিয় ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে ২ জন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন, আরেকজন ছিলেন ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালে ট্রাস্টিবোর্ড

মেম্বার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানও ব্র্যাকের অনুকূলে ছিলেন, ফজলে আবেদ এবং প্রবাসী বাংলাদেশী ফখরুদ্দিন দুজনেই পশ্চিমা মূল্যবোধ লালন করতেন। তখন জনমত গঠনে প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। বলা যায়, পুরো গণমাধ্যম (সংবাদ মাধ্যম এবং বিনোদন) তাদের পক্ষে। মাইনাস-টু ফর্মুলা বাস্তবায়নে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ইউনুসকে জনপরিসরে আনা হয়েছিল। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, সেই সরকারটি ছিল মূলত এনজিও-নির্ভর।

সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের এই সময়কার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ২০১১ সালের BMC এর Health Research Policy and Systems নামক জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেলে যার শিরোনাম ছিল—*Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights: A Case Study From Bangladesh*। এ জার্নাল আর্টিকেলেরা লেখকরা সবাই ব্র্যাকের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কার্যরত ছিলেন অথবা আছেন। এই নিবন্ধ থেকেই তাদের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরছি। প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ অনুবাদ করা হবে। তবে অনুরোধ থাকবে, যাদের পক্ষে সম্ভব, তারা যেন মূল প্রতিবেদনটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ দিলে বিনামূল্যে আর্টিকেলটি ডাউনলোড করতে পারবেন[৬]।


Rashid et al. Health Research Policy and Systems 2011, 9(Suppl 1):S12
http://www.biomedcentral.com/1478-4505/9/S1/S12

HEALTH RESEARCH POLICY AND SYSTEMS

RESEARCH Open Access

Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh

Sabina Faiz Rashid[1*], Hilary Standing[1,2], Mahrukh Mohiuddin[1], Farah Mahjabeen Ahmed[1]

From Strengthening the research to policy and practice interface: Exploring strategies used by research organisations working on Sexual and Reproductive Health and HIV and AIDS
Liverpool, UK. 18-19 May, 2009

যৌন রোগ (এইডস) প্রতিরোধ নাকি বিকৃত যৌনতার অধিকার

ব্র্যাকের এই নিবন্ধে অধিকার ফ্রেইমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। আমাদের সমাজে এইডস রোগটির মূলে যৌন বিকৃতিকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হতো। ব্র্যাকের গবেষকরা মূলত এই বিষয়টাকেই চ্যালেঞ্জ করে। তাদের দাবি—সমকামী

আচরণ খারাপ নয়; বরং এটা তাদের অধিকার। কিন্তু তাদেরকে প্রাণঘাতী এই রোগ থেকে রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। যৌন রোগের কারণে সৃষ্ট সমস্যার তথ্য-উপাত্ত এবং প্রতিরোধের কথা বলে মানবাধিকার কর্মী এবং সংস্থারা বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে রোগ প্রতিরোধের চেয়ে সমলিঙ্গের যৌনতার সামাজিক এবং আইনগত বৈধতা আদায় করাই হলো অধিকার ফ্রেইমের মূল লক্ষ্য। ব্র্যাকের প্রকাশিত নিবন্ধেও এর পক্ষে গবেষকরা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন—

> 'While many of these activists would argue that not all the demands of sexuality can be addressed by a focus on health, they acknowledge that the AIDS epidemic has forced open spaces for debate about sexuality to gain greater prominence and has been a useful vehicle for raising awareness of different sexualities and sexual rights.'

অর্থাৎ, অনেক অ্যাক্টিভিস্ট (সমকামী) যুক্তি দেখান, স্বাস্থ্যকে ফোকাস করে যৌন অধিকার সংক্রান্ত সব দাবী পূরণ হবে না, আবার এটাও ঠিক যে, এইডস মহামারি যৌনতা নিয়ে আলাপ তোলার সুযোগ তৈরী করেছে এবং এটা বিভিন্ন ধরনের যৌনতা এবং যৌন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কার্যকরী মাধ্যম।

অন্যদিকে, ব্র্যাকের গবেষকদের মতেও এইডস প্রতিরোধকে প্রধান লক্ষ্য বানানোর কারণে আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে, এইচআইভি সংক্রমণে সমকামীদের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপ হিসেবে গণ্য করা। এতে নেতিবাচক মনোভাব কাজ করে। নব্বইয়ের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজিতে মাস্টার্স করছিলাম। সেসময় কনফারেন্সে এইচআইভি খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক ছিল। এইচআইভি প্রতিরোধে ধর্মের অনুশাসন মানা দরকার, এমন আলোচনা সাধারণ ছিল। জাতীয় এইডস প্রতিরোধ কমিটির সদস্য (যিনি আমাদের স্যার) কনফারেন্সে সমকামিতার কারণে কওমে লুত যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে মৃত সাগরের ছবিও দেখিয়েছেন। তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক এইচআইভি প্রতিরোধ আলোচনা সমকামীদের কাঙ্ক্ষিত অধিকারের বিরুদ্ধে যায়। এ কারণে রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং সরকার সমকামীদের বিরুদ্ধে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সেই নিবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে এটা অনুধাবন করা যায়—

> ... this has also led to problematizing of sexuality into a sexual health and HIV/AIDS issue with a focus on certain (implicitly high risk) groups. The open space therefore often remains circumscribed, and while the concept of sexual rights has gained momentum in the last decade, there has also been increasing resistance from traditionalist forces, including religious bodies as well as governments।

অর্থাৎ, এভাবে যৌনতাকে কেবল যৌন স্বাস্থ্য ও এইচআইভি/এইডস সমস্যা হিসেবে সংকীর্ণ করা হয়েছে, ফলে নির্দিষ্ট কিছু (পরোক্ষভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ) গোষ্ঠীকেই এই সমস্যার কেন্দ্রে রাখা হয়। এ কারণে খোলা আলোচনার পরিধি প্রায়ই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। যদিও গত দশকে যৌন অধিকারের ধারণা গতি লাভ করেছে, তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারসহ রক্ষণশীল শক্তিগুলোর বাধাও ক্রমেই বাড়ছে।

আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে যে চ্যালেঞ্জিং ইস্যু নিয়ে ব্র্যাকের গবেষকরা খুব শঙ্কিত ছিলেন, সেটা হচ্ছে সমকামিতা অপরাধ আইন (সেকশন ৩৭৭)। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যৌনতা তথা পায়ুসঙ্গমের শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড। এসব চ্যালেঞ্জিং ইস্যুকে সামাল দিতে কেয়ারটেকার সরকারের সময়কাল একটি বড় সুযোগ হিসেবে হাজির হয়।

সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতা নিয়ে (তাদের ভাষায় 'যৌন বৈচিত্র্য' নিয়ে) সমাজে আলাপ তোলার জন্য ২০০৭ থেকে ব্র্যাক বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে শুরু করে। বিষয়টাকে তারা উপস্থাপন করে মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে। সমকামিতার সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার' (Sexual And Reproductive Health & Rights - SRHR) নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা। ব্র্যাকের গবেষকদের ভাষায়—

> 'The specific impetus to push this agenda forward came from an initial international meeting on this topic at the Institute of Development Studies in the UK in 2005. The first author, inspired by this and after returning to Dhaka, took the first step of locating interested persons and holding a small local workshop in January 2007.'

অর্থাৎ এই এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুনির্দিষ্ট অনুপ্রেরণা আসে ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সভা থেকে। (এ নিবন্ধের) প্রথম লেখক এতে অনুপ্রাণিত হন এবং ঢাকায় ফিরে আসার পর আগ্রহী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে প্রথম পদক্ষেপ নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে একটি ছোট স্থানীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করেন তিনি।

যৌনতা নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম ওয়ার্কশপ (২০০৭)

ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথের ড. সাবিনা ফয়েজ রশিদের নেতৃত্বে 'রিয়েলাইজিং রাইটস' প্রজেক্টের অধীনে প্রথম ওয়ার্কশপটি (১৬ জানুয়ারী ২০০৭) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ওপর ভিত্তি করে LGBTQ+ নেটওয়ার্কের ভিত্তি গড়ে উঠে। মোট ত্রিশ জনের মতো গবেষক, সমকামী এবং অ্যাকটিভিস্ট অংশগ্রহণ করেন। এই ওয়ার্কশপ নিয়ে প্রকাশিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের Monograph series-6 report [৪০]-এ তিনটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—

> ...the objectives of the conference were the following: i) to build partnerships with key persons/organizations interested in working together to create a platform of awareness and advocacy in the area of Sexuality and Rights ii) share resources and learn from each other, and iii) possibly work together in training, research and advocacy activities in the future.

অর্থাৎ—

* যৌনতা এবং যৌন অধিকার নিয়ে সচেতনতা তৈরী করতে আগ্রহী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি মঞ্চ বা প্লাটফর্ম তৈরী করা।
* নিজেদের মধ্যে রিসোর্স শেয়ার করা এবং একে অন্যের কাছ থেকে শেখা।
* প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং এডভোকেসি কার্যক্রমে একসাথে কাজ করা।

এই ওয়ার্কশপের প্রথম আলোচক আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া-এর রিসার্চ এসোসিয়েট ড. দিনা সিদ্দিকি বলেন—

> 'Fear of an AIDS epidemic has significantly helped open

up the dialogue regarding sexuality. However this is a narrow and medicalized discourse. Sexuality continues to be attached to socially "deviant" groups such as sex workers or MSM. There is an urgent need to talk about sexuality in a broader social scheme.'

'...women who chose to remain single, who openly have sexual relations outside of marriage or who have children outside marriage, transgress heteronormative ideology. Thus they are frequently labeled deviant, bad or immoral.'

অর্থাৎ এইচআইভি মহামারি ভীতির ফলে যৌনতা নিয়ে আলোচনার পথ উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু এটা মেডিকেল-সংক্রান্ত আলোচনা। যৌনতাকে এখন পর্যন্ত সামাজিকভাবে 'বিকৃত' (নোট- ইনভার্টেড কমার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তিনি এটা একমত নন) গ্রুপের সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। জরুরী ভিত্তিতে বিস্তৃত সামাজিক প্রকল্পে যৌনতার (LGBTQ+ অধিকার) আলাপ প্রয়োজন।

... মেয়েদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, প্রকাশ্যে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রয়েছে, বিবাহবহির্ভূত সন্তান রয়েছে- এগুলো সমাজের হেটেরোনর্মেটিভ (ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক) মতবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই তাদেরকে প্রায়ই বিচ্যুত (বিকৃত), খারাপ এবং অনৈতিক হিসেবে দেখা হয়।

এই ওয়ার্কশপে মানবাধিকার সংস্থা 'আইন ও শালিশী কেন্দ্র'-এর পক্ষ থেকে যৌন অধিকার মৌলিক মানবাধিকারের খুঁটি হিসেবে বিবেচনা করে ২০০৫ সালে সমকামীদের ওপর পরিচালিত এক জরীপের ফলাফল নিয়ে বক্তব্য দেন মিস বড়ুয়া। সমকামিতা অপরাধ আইন (সেকশন ৩৭৭) এবং যৌনতা বিষয়ে ভাষাগত অপরিচিতি বা দুর্বোধ্যতা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। যৌনতা সম্পর্কিত শব্দ বা টার্মকে এক ধারায় কীভাবে আনা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়। পরবর্তীতে ব্র্যাক যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ট্রেইনিং সেন্টার বানাবে।

সেকশন ৩৭৭ আইনটি বাতিল হওয়া কি প্রয়োজন? এই প্রশ্নের জবাবে আইসিডিডিআরবি'র গবেষক ড. সরফুল ইসলাম খান (বন্ধু সোশ্যাল যার অধীনে এমএসএম/সমকাম নিয়ে কাজ শুরু করে) মনে করেন, এই আইনটিকে বাতিল করতে হবে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে যৌন অধিকার ফ্রেমে কাজ করতে চাই। সমকামীদের প্রতি বৈষম্য নিয়ে পর্যাপ্ত ডেটা সংগ্রহ করতে তিনি বন্ধু সোশ্যালকে উপদেশ দেন।

'Is there a need for repeal for Sec. 377? Dr. Khan believes section 377 has to be challenged if we really want to work in the framework of sexual rights. However, there are many political issues around 377 in Bangladesh. It is needed to build a platform of civil society, advocates, law enforcement agents, researchers, academics, politicians, and NGO professionals to work on 377 in future. Dr. Khan suggested that Bandhu (Social) should continue to document not only in numbers but also in a comprehensive manner about the incidents of abuse and violence that are occurred against MSMs and Male Sex Workers.'

৩৭৭ ধারা বাতিলের কোনো প্রয়োজন আছে কি? ড. খান বিশ্বাস করেন, যৌন অধিকারের কাঠামোয় সত্যিকারের কাজ করতে হলে ৩৭৭ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তবে, বাংলাদেশে ৩৭৭ ধারা নিয়ে অনেক রাজনৈতিক বিষয় রয়েছে। ভবিষ্যতে ৩৭৭ ধারা নিয়ে কাজ করার জন্য সুশীল সমাজ, সমর্থক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং এনজিও পেশাজীবীদের একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা প্রয়োজন। ড. খান পরামর্শ দেন যে, বন্ধু (সোশ্যাল-কে MSM এবং পুরুষ যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতন ও সহিংসতার কেবল সংখ্যা নয় বরং ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নথিপত্রীকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

এই ওয়ার্কশপের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সিদ্ধান্ত হয়—

* সবার মধ্যে যোগাযোগ এবং আইডিয়া আদানপ্রদানের জন্য ইমেল লিস্ট বানানো
* সমকামী অধিকার আদায়ের উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে পরস্পর রিসার্চ এজেন্ডা শেয়ার করা
* দেশের বাইরের নেটওয়ার্ককে বিস্তৃত করতে পাবলিক হেলথ স্কুলকে কাজ করা
* ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের যৌন শিক্ষা অধিকার নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা

ইনসেস্ট (অজাচার) নিয়েও আলোচনা!

একটা বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করা দরকার। যৌনতা নিয়ে প্রথম ওয়ার্কশপেই ইনসেস্ট বা অজাচার (ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে, ছেলে-মা মাঝে যৌন সম্পর্ক) বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এ দিকটা বিবেচনা করা উচিত। এটা সমাজে হচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ্যে আলোচনা করা হয় না। এই বিষয়ে ইউনিসেফের আগের গবেষণা নিবন্ধে এই বিষয়ে অনেক কিছু জানা যাবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অজাচারকে লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনৈতিক মনে করা হয় না; বরং যৌন বিপ্লবের জনক আলফ্রেড কিনসি-সহ অনেকে এটাকে উৎসাহিত করেছেন। যদি যৌনতা হিসেবে সমকামিতা গ্রহণযোগ্য হয়, তবে অজাচার হতেও কোন বাধা নেই। Appendix-I (Page ১২) এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ২০টির বেশী দেশে অজাচার বৈধ।

> "Incest should also be considered. It is very prevalent however it is not discussed openly. Look at UNICEF's previous research on this topic. There will be a resource bibliography made that discusses prior research."

"অজাচারের কথাও চিন্তা করা উচিত। এটি খুবই প্রচলিত কিন্তু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয় না। এই বিষয়ে ইউনিসেফের পূর্বের গবেষণাগুলো দেখুন। পূর্বের গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা একটি রিসোর্স গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা হবে।"

সমকামী অধিকার দাবীতে ব্র্যাকের প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স (২০০৭)

প্রথম ওয়ার্কশপের সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ছয় মাস পর ২০০৭ এর জুলাইয়ে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের উদ্যোগে ব্র্যাক সেন্টারে 'জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি' (লিঙ্গ ও যৌনতা)-এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, কেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বক্তা ও অ্যাক্টিভিস্টরা। আলোচনা হয়, সমকামীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ LGBTQ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে আয়োজিত হবার কারণে এ কনফারেন্স ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এনজিও, নারীবাদী এবং সমকামী গ্রুপের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করে দেশের নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ।

> 'As the conference was being held at the BRAC Centre and hosted by the University, this gave the subject matter legitimacy and credibility. We therefore decided to invite a diverse group of policy actors and practitioners (women's groups, activists, researchers, academics, media professionals, students, and health providers, NGOs and gay, lesbian and transgender groups)' ... *Rashid et al 2011*

> যেহেতু কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্র্যাক সেন্টারে এবং আয়োজক ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, তাই (কনফারেন্সের) বিষয়বস্তু বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। আমরা তাই নীতিনির্ধারক এবং প্র্যাকটিশানারদের (নারীবাদী, অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, মিডিয়া প্রফেশনাল, ছাত্র, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, এনজিও, গে বা পুরুষ সমকামী, লেসবিয়ান বা নারী সমকামী এবং ট্র্যান্সজেন্ডার) বিভিন্ন গ্রুপকে আমরা আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিই।

এই কনফারেন্সের পর পর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC)

নামে একটি এনজিও ব্র্যাকের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের সাথে নিজেরা যোগাযোগ করে বাংলাদেশে 'যৌন অধিকার'-সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনুদান দেয়। IWHC-এর দেয়া অনুদানের অর্থ দিয়ে তিনটি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যার মধ্যে দুটি ছিল প্রশিক্ষণের জন্য আর তৃতীয়টি ছিল ফলোআপ। প্রশিক্ষণে তিন ধরনের মানুষকে টার্গেট করা হয়,

* একটি গ্রুপ ছিল ঢাকার বাইরের অ্যাকাডেমিকরা। যাতে তারা ঢাকার বাইরে যৌনতা প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম (sexuality dissemination activities) তৈরী করতে উৎসাহিত হন এবং ঢাকার বাইরের অ্যাকাডেমিক ও ছাত্রদের আলোচনা করার জায়গা করে দেন...

* আরেকটি গ্রুপ ছিল সাংবাদিক এবং বিজ্ঞাপণী সংস্থা। যাতে করে তারা যৌনতা নিয়ে লিখতে উৎসাহিত হন এবং মিডিয়া ও বিজ্ঞাপণে যৌনতার নির্মাণ এবং উপস্থাপনা (এবং যথাযথ উপস্থাপনার অনুপস্থিতি) নিয়ে আলোচনা করেন...

* তৃতীয় গ্রুপটি ছিল LGBTQ+ সম্প্রদায়, যারা মূলত ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড। (বাংলাদেশে) কেবল অল্প কিছু এমএসএম এবং ট্র্যান্সজেন্ডার গ্রুপ আছে যারা এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে কাজ করে। (তাদের টার্গেট করার) উদ্দেশ্য ছিল এই non-conforming বা বিকৃত যৌন গ্রুপগুলোকে ক্ষমতায়ন করা, তাদের জায়গা করে দেয়া, যাতে তারা তাদের কথিত মৌলিক অধিকার নিয়ে লড়াই করার জন্য নিজস্ব এজেন্ডা গঠন, প্রশিক্ষণ, অ্যাডভোকেসি করতে পারে।

অর্থাৎ, একদিকে ব্র্যাক অ্যাকাডেমিক ও মিডিয়ার লোকজনকে LGBTQ+র পক্ষে কথা বলতে উৎসাহিত এবং প্রশিক্ষিত করছিল, অন্যদিকে সমকামীদের বিভিন্ন সংগঠনকে দিচ্ছিল কাজ করার সুযোগ ও প্রশিক্ষণ।

গণমাধ্যমের আশাতীত সমর্থন

প্রকাশিত নিবন্ধের তথ্যানুযায়ী, সমকামী অধিকার নিয়ে আয়োজিত ২০০৭ সালের কনফারেন্স নিয়ে গণমাধ্যমে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া (Backlash) হতে পারে, তা তাদের বিবেচনাতেই ছিল না; সাদাসিদা চিন্তা করেছিল! কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। এমন আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণ হচ্ছে, এই প্রকল্প শুরুর

আগেই গণমাধ্যমকে পক্ষে নিয়েছে তারা, যা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। ব্র্যাকের সাথে প্রভাবশালী গণমাধ্যমের সুসম্পর্ক জন্মলগ্ন থেকেই রয়েছে। তাই যা আশা করেছিল, তাই হয়েছিল। সমকামীদের (তাদের ভাষায় যৌন সংখ্যালঘু) অধিকার নিয়ে আয়োজিত কনফারেন্সের প্রতি গণমাধ্যমের ব্যাপক ইতিবাচক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক আমলের প্রভাবশালী বাংলা এবং ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমগুলো (প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউনসহ প্রায় সব গণমাধ্যম) ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গণমাধ্যমর এই পরিবর্তনটা ছিল নতুন, গণমাধ্যমগুলো এতদিন এইডস/এইচআইভি নিয়ে প্রতিবেদনে সমকামী পুরুষ এবং হিজড়াদের নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করত। প্রকাশিত সেই জার্নাল আর্টিকেলের ভাষায়[৬]—

> 'Given that historically there had not been a conference like this in Dhaka city, we were rather naïve and did not even think of the possibilities of a backlash from the audience or the media. In fact, there was widespread positive interest and coverage of the conference and of sexual minorities in some of the leading English and Bengali newspapers in the country. This was new, given that much of the representation in these newspapers is either HIV/AIDS related when speaking of gay men or focused on hijra communities with negative stereotypes prevailing.' ... *Rashid et al 2011*

ঢাকা শহরে ঐতিহাসিকভাবে এ ধরনের কোনো সম্মেলন না হওয়ায় আমরা কিছুটা সরল ছিলাম এবং দর্শক বা গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করিনি। আসলে, দেশের কিছু শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে এই সম্মেলন এবং যৌন সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ব্যাপক ইতিবাচক আগ্রহ এবং কাভারেজ ছিল। এটি নতুন ছিল, কারণ এই সংবাদপত্রগুলোতে সমকামী পুরুষদের কথা বলার সময় বেশিরভাগ উপস্থাপনা এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত হয় অথবা হিজড়া সম্প্রদায়ের ওপর নেতিবাচক ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মিডিয়াতে সমকামিতাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া

হয়। ২০০৬ সালের সাংবাদিকদের ট্রেইনিং এবং এসাইনমেন্টের অভিজ্ঞতার আলোকে পুরস্কার-ভিত্তিক এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করে তারা। একই কৌশল পরবর্তীতে বন্ধু সোশ্যাল প্রয়োগ করে। এ কৌশলটা সম্পর্কে তাদের ভাষায় জানা যাক—

> 'we set up an awards system to actively encourage journalists to write news stories on sexuality and rights in local and regional newspapers, by giving a small monetary award for any news item/story published. Initial reports indicate that at least five regional journalists had written pieces on Sexuality and Rights, which were published in local newspapers, and one journalist had developed a radio story to be broadcast.' ... *Rashid et al 2011*
>
> এছাড়া, যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাতে সাংবাদিকদের লেখালেখি করতে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রকাশিত প্রতিটি নিউজ আইটেম বা গল্পের জন্য সামান্য কিছু আর্থিক পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা চালু করি। প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত করে যে, অন্তত পাঁচজন আঞ্চলিক সাংবাদিক যৌনতা এবং অধিকারের ওপরে লিখেছেন, এবং সেগুলো স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর একজন সাংবাদিক রেডিওতে প্রচার করার জন্য একটি গল্প তৈরি করেছেন।

২০০৭ সালের কনফারেন্সের আলোচনার নির্যাস বুকলেট আকারে ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশের ১৫০ জন 'স্টেকহোল্ডারের' কাছে। যৌন অধিকার নিয়ে কোন ধরনের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনার জন্য ২০০৮ সালে অ্যাকাডেমিক, LGBTQ+ সমর্থক এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং করে ব্র্যাকের গবেষকরা।

২০০৭-২০০৯ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আনুকূল্যে ধারাবাহিকভাবে অনেক কার্যক্রম চলতে থাকে। এই সময়ের কাজকর্মের বর্ণনা পাওয়া যায় জার্নালে প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ থেকে—

'Throughout this period, we initiated small meetings

and forums and hosted some series of films on sexual diversity, inviting students and partners to attend. We also hosted a meeting to discuss the implications of the Bangladesh penal code 377, and more recently a meeting on a South Asian network working on human rights for LGBT communities across South Asia.'

এই পুরো সময় জুড়ে, আমরা বিভিন্ন ছোট ছোট মিটিং এবং ফোরাম শুরু করি। আমরা যৌন বৈচিত্র্যের ওপর কিছু সিনেমা (প্রদর্শনের) আয়োজন করি। অংশীদারদের এবং ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানাই। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার তাৎপর্য নিয়েও একটি মিটিং আয়োজন করি আমরা। সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য একটি দক্ষিণ এশীয় নেটওয়ার্ক নিয়েও আমরা মিটিং-এর আয়োজন করেছি।

২০০৭ সালের কনফারেন্সের আলোচনার নির্যাস বুকলেট আকারে ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশের ১৫০ জন 'স্টেকহোল্ডারের' কাছে। নেটওয়ার্কিংয়ের এই কৌশল থেকে ৫০টি ইমেল এবং ৬০-৭০ ফোন কল পায় ব্র্যাকের LGBTQ+ অধিকার গবেষক টিম।

ব্র্যাকের প্রাথমিক প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হওয়ার কিছু প্রমাণ

১. যৌন এবং প্রজনন অধিকার নিয়ে তৈরী হয় নতুন সেন্টার (২০০৮)

বাংলাদেশকে সমকামী বান্ধব রাষ্ট্র এবং উন্নয়নশীল রক্ষণশীল দেশসমূহের জন্য অনুসরণীয় 'সমকামিতা অধিকার মডেল' তৈরী নিয়ে আরও গোছানো এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য ২০০৮ সালে ব্র্যাকের জেমস পি গ্র্যান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল আলাদা একটি সেন্টার বা কেন্দ্র তৈরি করে, যার নাম Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights। এই কেন্দ্র তৈরির ফান্ডিং আসে জাতিসংঘের একটি সংস্থা (UNAID)-এর কাছ থেকে। এই সেন্টারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন অধিকার নিয়ে গবেষণা, ট্রেইনিং, নেটওয়ার্কিং, লবিং এবং এডভোকেসির মাধ্যমে দেশের পলিসিতে প্রভাব তৈরী করা যাতে বিকৃত যৌন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. যৌন অধিকার নিয়ে গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং রিসার্চ প্রজেক্ট

দেশে সমকামী অধিকার নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে যারা আগ্রহী তাদের নিয়ে ২০০৮ সালে একটি ব্রেইনস্টর্মিং মিটিং আয়োজন করা হয়। এই মিটিং-এ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছে—মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন LGBTQ+ গ্রুপ, স্টুডেন্ট, জার্নালিস্ট, অটিনজীবী, হেলথ এজুকেটর এবং এক্টিভিস্ট। কোন ধরণের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ তা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে। এই মিটিং-এর আউটকাম ছিল একটি রিসার্চ প্রজেক্ট। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, সমকামী পুরুষ, সমকামী মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, নারী, গার্মেন্টসের নারীকর্মী, এনজিও এবং উন্নয়ন সংস্থার স্টাফরা যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে এবং এই বিষয় জ্ঞান কেমন তা জানা। এই গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে যৌনতা সংক্রান্ত ট্রেইনিং কারিকুলাম প্রস্তুত করা এবং এডভোকেসিতে ব্যবহার করা।

৩. ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিকৃত যৌন অধিকার নিয়ে কাজ করার আগ্রহ

ব্র্যাকের কার্যক্রম এবং নেটওয়ার্কিং-এর প্রভাব ছড়িয়ে যেতে থাকে সাড়া বাংলাদেশ জুড়ে। ২০০৭ এর কনফারেন্স এবং ২০০৯-এর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ঢাকার বাইরের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের অধিকার নিয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স বা মডিউল চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন তারা। আগ্রহ দেখান নিজ নিজ অঞ্চলে যৌন বিকৃতির অধিকার নিয়ে আলাদা কনফারেন্স আয়োজনেও। অ্যাকাডেমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু শিক্ষার্থী LGBTQ+ সামাজিকীকরণ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে পড়ে। ব্র্যাকের প্রকাশিত নিবন্ধের ভাষায়—

> Given a combination of the resources we had available and our positioning as an academic institution, the principal focus of the work was to use research and informed debate to challenge representations of sexuality and rights in the public domain.

অর্থাৎ, রিসোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের

মূল লক্ষ্য হচ্ছে গবেষনা এবং তথ্যভিত্তিক বিতর্কের মাধ্যমে জনপরিসরে যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা (অর্থাৎ বিকৃত যৌন অধিকার দাবী করা)।

৪. সমকামীদের নিজের মধ্যে নেটওয়ার্কিং এবং ঢাকায় কোয়ালিশন অফিস প্রতিষ্ঠা

ব্র্যাকের প্রচেষ্টায় সমকামীদের কথা বলার মতো যে একটা জায়গা তৈরী হয়েছে সেটা ব্র্যাকের গবেষকরা নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলে ২০০৯ সালে আয়োজিত বিভিন্ন মিটিংয়ে উপস্থিত সমকামী গোষ্ঠীর নারী ও পুরুষরা নিজেদের অভিজ্ঞতা মিটিং-এ সবার মাঝে শেয়ার করে। ওয়ার্কশপ এবং মিটিং-এর ফলে বিভিন্ন সমকামী গোষ্ঠী নিজেদের মাঝেও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

আলোচ্য নিবন্ধের তথ্যে ব্র্যাকের গবেষকরা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে সমকামী গোষ্ঠীদের কাছে আস্থাভাজন হয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০০৭ সালের আগে LGBTQ+ গোষ্ঠীর (গে এবং লেসবিয়ান রাইটস গ্রুপ) লোকেরা নিজেদের কমিউনিটির বাইরে সব কিছু আড়ালে রাখত। কিন্তু ব্র্যাকের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল পাবলিক হেলথের অধিকার আন্দোলন শুরু করার পর LGBTQ+ গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে এমন আস্থা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে যে, ২০০৯ সালের মার্চে আয়োজিত দুই দিনের গোপন ওয়ার্কশপে (Sexual Diversity and Coalition Building) এই নিবন্ধের দুজন ব্র্যাকের গবেষককে তারা আমন্ত্রণ জানায়।

বাংলাদেশে প্রথম গে গ্রুপ—*বয়েজ অব বাংলাদেশ* ২০০৮ সাল থেকে ব্র্যাকের সাথে রিসার্চে জড়িত হওয়া শুরু করেছে তা আমরা সামনে জানতে পারব। সেই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, গে এবং লেসবিয়ানরা কীভাবে প্রকাশ্যে কার্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে, তার কৌশল নির্ধারণ করা। LGBTQ+ গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজেদের একটা জোট গঠনে ট্রেইনিং কারিকুলাম তৈরিতে এবং ট্রেইনিং ও মিটিং আয়োজনের জন্য ভেন্যু সাপোর্টের জন্য ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথের শরণাপন্ন হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে আমরা জানতে পারব—*বয়েজ অব বাংলাদেশ*-এর কয়েকজন তাদের সাথে রিসার্চ এবং প্রজেক্ট পার্টনার হিসেবে কাজ করবে এবং বর্তমানে চলমান প্রজেক্টেও তারা জড়িত রয়েছে ভিন্ন নামে। নিবন্ধে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, LGBTQ+ গ্রুপের সাথে তাদের এতই আস্থার সম্পর্ক যে, ঢাকার লালমাটিয়াতে LGBTQ+ কোয়ালিশন অফিস উদ্বোধন করার সময় তারা ব্র্যাকের কর্মচারীদের দাওয়াত দিয়েছিল। পশ্চিমা দাতা গোষ্ঠী অফিস প্রতিষ্ঠার

জন্য ফান্ডিং করেছে।

> 'Gay and lesbian rights groups who had primarily been very reserved and cautious in terms of allowing access to people outside of their communities have gained confidence through the research activities undertaken by the Centre. Two of the authors of this study were invited to a two-day workshop on Sexual Diversity and Coalition Building organized by a gay rights activists group in March 2009. This was an unpublicized meeting with important representatives from the LGBT communities aiming to build a network and come up with strategies for gaining positive visibility in society. The LGBT communities are setting up a Coalition and have approached the School to provide venue support for their trainings and access to resource materials for training of their members. Given the level of trust and close relationship with many members of the Coalition, staff members were invited to the first ever historic inauguration of a registered office for the Coalition of LGBT in Bangladesh in August 2009. Donors have recently provided support to fund the establishment of an office for the Coalition of LGBT in Dhaka.'

২০০৫-২০০৭ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক প্রচেষ্টার সার্বিক মূল্যায়ন

রিয়েলাইজিং রাইটস প্রকল্প DFID (যুক্তরাজ্য)-এর ফান্ডিং শুরু হয়েছিল ২০০৫ সালে। প্রায় দুই বছর ব্যয় হয়েছে প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজনে, যেখানে জনপরিসরে পায়ুসঙ্গম অধিকার দাবী করে ব্র্যাক। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং ফলাফল নিয়ে তাদের নিজেদের মূল্যায়ন দেখা যাক। ২০০৭ সালে শুরু করা কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের নিবন্ধে বলা হয়েছে—

'...(এ উদ্যোগের) লক্ষ্য ছিল যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে বিতর্ক উত্থাপন করা এবং (বাংলাদেশের) চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে নীতি নির্ধারকসহ অন্যান্য

গুরুত্বপূর্ণ স্টেইকহোল্ডারদের সামনে বৈষম্যের মতো ইস্যুগুলোকে আরও দৃশ্যমান করে তোলা।'

অর্থাৎ তাদের নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ীই—ব্র্যাকের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনপরিসরে সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌন বিকৃতির (তাদের ভাষায় 'যৌনতা ও অধিকার') আলাপ তোলা, এবং নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ। আর এই কাজটা তারা করেছে অধিকারের বুলি ব্যবহার করে। তাদের ভাষায়—

> '...the team hosted meetings, workshops, forums and public dialogues to open up discussions of sexuality among a wide range of stakeholders using positive and human rights framings...'
>
> '...ইতিবাচক এবং মানবাধিকারের ফ্রেইমিং ব্যবহার করে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যৌনতা নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা) টিমটি বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ, ফোরাম এবং জনসংলাপের আয়োজন করেছে। ...'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এবং LGBTQ+ অ্যাক্টিভিসমকে সমকামিতার মোড়কে উপস্থাপন করার ইতিবাচক দিকের কথা উল্লেখ করে এ নিবন্ধে বলা হয়েছে—

> 'It was felt that, as a school of public health, we were well positioned in terms of academic legitimacy to play this kind of role and to begin to challenge the silence and discrimination which characterises this important aspect of human experience.'
>
> '...এটি অনুভূত হয়েছিল যে, (একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের) জনস্বাস্থ্য অনুষদ হিসাবে এই ধরনের ভূমিকা পালনে অ্যাকাডেমিক বৈধতার দিক থেকে আমরা ভালো অবস্থানে ছিলাম।'

এই উদ্যোগের ফলে কী কী অর্জিত হয়েছে, তার আলোচনা করতে গিয়ে ব্র্যাকের গবেষকরা তিনটি কাঠামোগত ক্ষেত্রে অগ্রগ্রতির কথা উল্লেখ করেছেন।

The first was widening and strengthening the base of support for advocacy on sexuality and rights through bringing together key actors who were in a position to influence the wider climate, such as the media. The second was strengthening alliances, through providing platforms and spaces for allies to come together. This was done by assessing strategic opportunities and building sustained alliances and partnerships with media, activists, academics and sexual minority groups. The third was through contributing to shifts in social norms around sexuality through creating a more open climate of discussion and dialogue in a wider range of arenas.

* প্রথমত, এই উদ্যোগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা বিভিন্ন মানুষকে একত্রিত করা গেছে, যারা নিজেদের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে (যেমন- গণমাধ্যমের লোকজন)। এতে 'যৌনতা এবং অধিকারের' (পড়ুন, LGBTQ+ এজেন্ডা বাস্তবায়নের) জন্য সমর্থনের ভিত্তি মজবুত এবং প্রসারিত হয়েছে।

* দ্বিতীয়ত, এই উদ্যোগের ফলে মিডিয়া, সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক এবং LGBTQ+ গ্রুপগুলোর মধ্যে 'মৈত্রী' এবং 'অংশীদারিত্বের সম্পর্ক' গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে তাদের একত্রিত হবার এবং আলোচনা করার প্ল্যাটফর্ম ও জায়গা করে দিয়েছে ব্র্যাক।

* তৃতীয়ত, এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনপরিসরে LGBTQ+-সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে আরও খোলামেলাভাবে কথা বলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যা যৌনতার ব্যাপারে সামাজিক চিন্তা এবং নিয়মগুলো পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

ব্র্যাকের এই গবেষকরা তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

It is possible to create a public space and dialogue on sexuality and rights in a conservative and challenging environment like Bangladesh by bringing together a diverse group of stakeholders LGBT groups, research,

academics, NGO professionals, health providers, journalists and policymakers – to successfully challenge representations of sexuality in the public arena.

আমরা দেখেছি যে LGBTQ+ গ্রুপ, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, এনজিও, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সাংবাদিক এবং নীতিনির্ধারকদের মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে, জনপরিসরে যৌনতার উপস্থাপনাকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে, বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল এবং চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে জায়গা তৈরি করা এবং আলাপ তোলা সম্ভব।

LGBTQ+ সফলতা নিয়ে অধ্যাপক সাবিনা ফয়েজ রশিদের সাক্ষাৎকার

২০২০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বুলেটিনে (*Bull World Health Organ. 2020 Jul 1; 98(7): 447–448*) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর ডীন অধ্যাপক সাবিনা ফয়েজ রশিদ LGBTQ+ ইস্যুতে নিজের সাফল্য তুলে ধরেন[৩১]—

Q: Sexual and reproductive health right have been at the core of your work with BRAC university. What do you consider your main achievements?

A: The establishment of the Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights would have to be one. The centre was set up in 2008 and has developed over the years to carry out a wide range of research, policy, advocacy and training activities. Since 2014, the centre has been running training programmes aimed at different groups of professionals, with topics including health rights, consent and choice, sexuality, sexual diversity, masculinity, and so on. Government front-line health workers are among the groups we have trained. For most participants, it is the first time they have been introduced

or exposed to such topics. Workshops and training programmes are delivered using films, animations, and photography and are followed by discussions. Our aim is to promote understanding and conceptual clarity through a human rights-based framework.... Another headline achievement for the centre is getting the topic of sexuality, including sexual diversity, in the National Institute of Population Research and Training (NIPORT) educational curriculum in 2018.

প্রশ্ন: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আপনার কাজের মূল বিষয় হচ্ছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার। আপনি আপনার প্রধান অর্জন কী বলে মনে করেন?

উত্তর: একটি (অর্জন) হচ্ছে সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস প্রতিষ্ঠা করা। এই কেন্দ্রটি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গবেষণা, নীতিমালা (পলিসি), স্বার্থ সমর্থন (এডভোকেসি) ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বছরের পর বছর ধরে উন্নতি লাভ করে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রটি বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অধিকার, সম্মতি ও পছন্দ, যৌনতাবোধ, যৌনবৈচিত্র্য, পুরুষত্ব ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারি প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মীরা আমাদের প্রশিক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটিই ছিল প্রথমবারের মতো এমন বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত বা মুখোমুখি হওয়া। ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন এবং ফটোগ্রাফির মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং এর পরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের লক্ষ্য হলো, মানবাধিকার-ভিত্তিক (Human rights-based) কাঠামোর মাধ্যমে বোঝাপড়া এবং ধারণাগত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

কেন্দ্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো—২০১৮ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপর্ট) এর শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রমে যৌনতাবোধ (Sexuality), যৌনবৈচিত্র্য (Sexual diversity)-সহ যৌনতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

Q: Can you say more about that?

A: NIPORT is an autonomous national research institute that

works on family planning and trains the 85,000 family welfare assistants and volunteers who are employed by the government to disseminate sexual and reproductive health information and services door-to-door. It is important to bear in mind that section ৩৭৭ of the Bangladesh Penal Code still criminalizes "unnatural" sex, so the inclusion of this content in the NIPORT curriculum was a huge step.

প্রশ্নঃ আরেকটু বিস্তারিত বলতে পারবেন কি?

উত্তরঃ নিপর্ট একটি স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট, যা পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ৮৫,০০০ সহকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবককে ঘরে ঘরে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশের দণ্ডবিধানের ৩৭৭ ধারা (সমকামিতা অপরাধ আইন) এখনও 'অপ্রাকৃতিক' যৌন সম্পর্ককে অপরাধ বলে গণ্য করে, তাই নিপর্টের পাঠ্যক্রমে এই বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তকরণ একটি বিরাট পদক্ষেপ ছিল।

Q: How does the NIPORT curriculum address issues such as sexual orientation?

A: The curriculum defines the terms sexuality and sexual diversity and explains that sexual orientation or desire varies and that people with different orientations are not bad or mentally ill. The content also clearly defines the terms homosexuality, bisexuality, heterosexuality and intersexuality. The content was developed by the centre with the assistance of technical advisors from Creating Resources for Empowerment in Action, a feminist human rights organisation based in New Delhi, India.

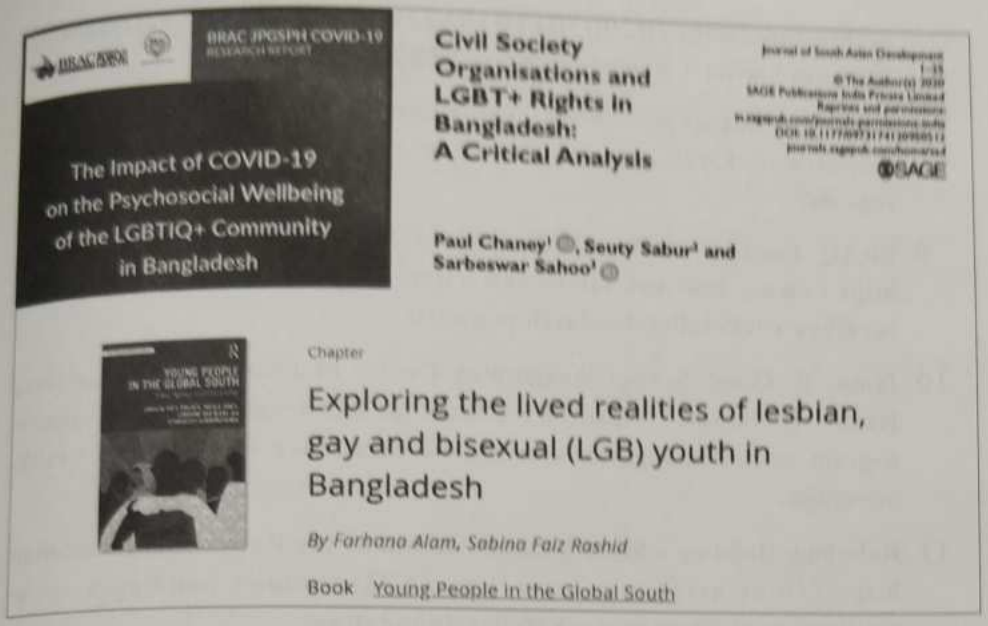
প্রশ্ন: নিপর্টের পাঠ্যক্রম sexual orientation (যৌন অভিমুখিতা)-এর মতো বিষয়গুলোকে কীভাবে মোকাবেলা করে?

উত্তর: পাঠ্যক্রমটি যৌনতাবোধ এবং যৌন বৈচিত্র্য শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে এবং ব্যাখ্যা করে যে, যৌন অভিমুখিতা বা আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন ধরণের হয় এবং

বিভিন্ন অভিমুখিতাধারী মানুষেরা খারাপ বা মানসিকভাবে অসুস্থ নয়। বিষয়বস্তুগুলো স্পষ্টভাবে সমকামিতা, উভকামিতা, বিষমকামিতা এবং আন্তঃলিঙ্গত্ব শব্দগুলোও সংজ্ঞায়িত করে। সেন্টার বিষয়বস্তুগুলো তৈরি করেছিল ভারতের নয়া দিল্লিভিত্তিক নারীবাদী মানবাধিকার সংগঠন ক্রিয়েটিং রিসোর্সেস ফর এমপাওয়ারমেন্ট ইন অ্যাকশন (Creating Resources for Empowerment in Action)-এর প্রযুক্তি উপদেষ্টাদের সহায়তায়।

ব্ল্যাক ওবেসসাইটে প্রকাশিত আরেকটি সাক্ষাৎকারে সমকামিতা প্রকল্পের সফলতা প্রসংগে অধ্যাপক ফয়েজ রশিদ বলেন[৪১]—

> 'I have also focused on gender, sexual and reproductive health, and the health needs of people in urban slums. In 2008, I established a Centre for Gender and Sexual and Reproductive Health and Rights with seed funding from a UN organization, pushing for laws to stop child marriage; providing a safe space for LGBTQI communities and working to develop online resources on sensitive topics that bypass traditional gatekeepers such as parents and teachers.'
>
> অর্থাৎ, আমি লিঙ্গ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং শহুরে বস্তিবাসীরর স্বাস্থ্য চাহিদার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছি। ২০০৮ সালে, জাতিসংঘের একটি সংস্থার সীড ফান্ডিং নিয়ে আমি লিঙ্গ ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, যা বাল্যবিবাহ বন্ধের আইনের জন্য চাপ সৃষ্টিতে, LGBTQ+ সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ জায়গা তৈরী করতে এবং বাবা-মা ও শিক্ষকদের মতো প্রথাগত নিয়ন্ত্রকদের এড়িয়ে যৌন সংক্রান্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে অনলাইন রিসোর্স উন্নয়নে কাজ করে।



ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কিছু নিবন্ধের শিরোনামের স্ক্রিনশট

References

1. International Conference on Population and Development. https://www.unfpa.org/icpd.
2. LGBTI Milestones at the United Nations. UN LGBTI CORE GROUP https://unlgbticoregroup.org/home/lgbti-milestones-at-the-united-nations/.
3. Rashid, S. F. Providing sex education to adolescents in rural Bangladesh: Experiences from BRAC. Gender & Development 8, 28–37 (2000).
4. Coleman, E., Corona-Vargas, E. & Ford, J. V. Advancing Sexual Pleasure as a Fundamental Human Right and Essential for Sexual Health, Overall Health and Well-Being: An Introduction to the Special Issue on Sexual Pleasure. International Journal of Sexual Health 33, 473–477 (2021).
5. Criminalisation of consensual same-sex sexual acts | ILGA World Database. https://database.ilga.org/criminalisation-consensual-same-sex-sexual-acts.
6. Rashid, S. F., Standing, H., Mohiuddin, M. & Ahmed, F. M. Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh. Health Research Policy and Systems 9, S12 (2011).
7. Realising the next barrier to human rights - The Good Feed. https://web.

archive.org/web/20200501101552/https://blog.brac.net/realising-the-next-barrier-to-human-rights/ (2020).

8. Funding a Sexual Revolution: The Kinsey Reports - REsource. https://resource.rockarch.org/story/funding-a-sexual-revolution-the-kinsey-reports/.
9. BRAC Founder Fazle Abed receives Rockefeller Leadership Award. https://www.brac.net/latest-news/item/347-brac-founder-fazle-abed-receives-rockefeller-leadership-award.
10. James P. Grant School inaugurates Centre of Excellence for Universal Health Coverage. https://www.brac.net/latest-news/item/443-james-p-grant-school-inaugurates-centre-of-excellence-for-universal-health-coverage.
11. Rebound: Building a More Resilient World by the Rockefeller Foundation. https://brac.net/latest-news/item/572-rebound-building-a-more-resilient-world-by-the-rockefeller-foundation.
12. Health (JPGSPH), J. P. G. S. of P. Annual Report (JPGSPH) : February 2005 - January 2006. Incorporating graduation of the first batch of MPH (2006).
13. 13. BRAC James P Grant School of Public Health. https://bracjpgsph.org/our-donor-partner.
14. icddr,b - icddr,b– its history and legacy. https://www.icddrb.org/news-and-events/press-corner/media-resources/icddrb-its-history-and-legacy.
15. খাবার স্যালাইন তৈরীতে অবদান রাখার জন্য হেমেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জীকে স্বীকৃতি দেয়া হোক - Sorowar2010's bangla blog. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/Sorowar2010/29417370.
16. OP-ED: Sinovac vaccine trial debate: A response to icddr,b. Dhaka Tribune https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/220627/op-ed-sinovac-vaccine-trial-debate-a-response.
17. Banglanews24. আইসিডিডিআরবির সঙ্গে গ্লোবের ভ্যাকসিন ট্রায়াল চুক্তি বাতিল. banglanews24.com https://www.banglanews24.com/health/news/bd/826913.details (2020).
18. জনকণ্ঠদৈনিক. অভিমত ॥ আইসিডিডিআরবির কথিত কথন. দৈনিক জনকণ্ঠ || Daily Janakantha https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/282277.
19. Shale Ahmed| Ashoka. https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed.
20. H, K. Remembering Shivananda Khan, APCOM's founder on Human Rights

Day - APCOM. https://www.apcom.org/remembering-shivananda-khan-apcoms-founder-on-human-rights-day-2/, https://www.apcom.org/remembering-shivananda-khan-apcoms-founder-on-human-rights-day-2/ (2021).

21. Vaness. RIP Shivananda Khan: A Tribute from APCOM - APCOM. https://www.apcom.org/rip-shivananda-khan-a-tribute-from-apcom/, https://www.apcom.org/rip-shivananda-khan-a-tribute-from-apcom/ (2023).

22. I feel proud to be a part of history - APCOM. https://web.archive.org/web/20230601215146/https://www.apcom.org/i-feel-proud-to-be-a-part-of-history/.

23. Roodsaz, R. Probing the politics of comprehensive sexuality education: 'Universality' versus 'Cultural Sensitivity': a Dutch–Bangladeshi collaboration on adolescent sexuality education. Sex Education 18, 107–121 (2018).

24. Defining sexual health. https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research/key-areas-of-work/sexual-health/defining-sexual-health.

25. Psychosocial Wellbeing of the LGBTIQ+ Community in Bangladesh.

26. Islam, S. BRAC Careers. BRAC Careers https://careers.brac.net/.

27. Azim, T. et al. HIV and AIDS in Bangladesh. J Health Popul Nutr 26, 311–324 (2008).

28. Annual Report_2018_ AIDS-STD Programme.pdf.

29. Hossain, A. Section 377, Same-sex Sexualities and the Struggle for Sexual Rights in Bangladesh. Australian Journal of Asian Law 20, 1–11 (2019).

30. Full article: The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2017.1317831.

31. Sabina Faiz Rashid: research on community resilience. Bull World Health Organ 98, 447–448 (2020).

32. Sabina Faiz Rashid CV (April 2024)| LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/sabina-faiz-rashid-5229671aa/overlay/1713679057717/single-media-viewer/?profileId=ACoAADDoZCoBCgJvuzXHdEq2_29E3Etgry3FtgE.

33. Health (JPGSPH), J. P. G. S. of P. Annual Report (JPGSPH) : February 2006 - February 2007. Innovation in public health education (2007).

34. BRAC at 50: George Soros' Message | BRAC. (2022).

35. Sir Fazle Hasan Abed's acceptance speech for the Open Society Prize. https://www.brac.net/latest-news/item/612-sir-fazle-hasan-abed-s-acceptance-speech-for-the-open-society-prize.

36. An Emergency Fund for Displaced Rohingya in Bangladesh. https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-and-brac-sound-alarm-rohingya-ahead-monsoon-season.

37. Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund | The Business Standard. https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/brac-uni-be-early-recipient-soross-1-billion-fund-39805.

38. Open Society Foundation-LGBTQI. https://www.opensocietyfoundations.org/voices/topics/lgbtqi.

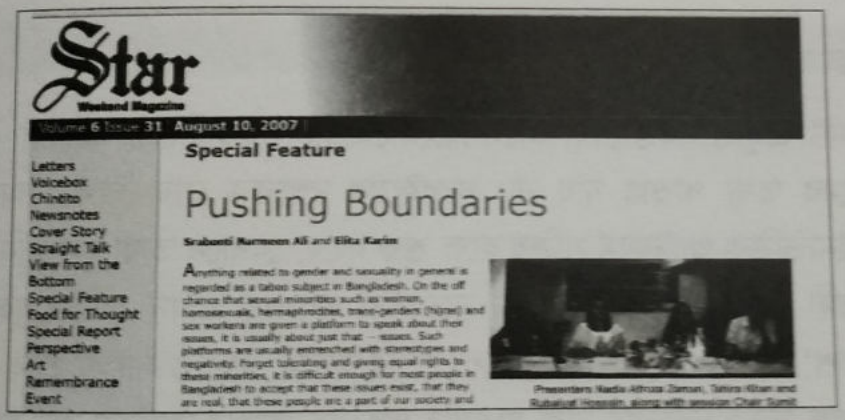
39. Elon Musk slams George Soros on 'The Joe Rogan Experience'. https://nypost.com/2023/11/01/business/elon-musk-slams-george-soros-on-the-joe-rogan-experience/.

40. Ahmed, N. & Fellow, F. BRAC-Sexuality and rights workshop (2007). (2007).

41. Meet the two professors working together to improve the lives of vulnerable populations in Bangladesh. https://www.brac.net/brac-in-the-media/item/1155-meet-the-two-professors-working-together-to-improve-the-lives-of-vulnerable-populations-in-bangladesh.

বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামিতা নিয়ে অ্যাক্টিভিসম

অরাজনৈতিক পরিবেশে তত্ত্বধায়ক সরকারের শাসনামলের শুরুতে (২০০৭) আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল দেশে জনপরিসরে সমকামী অধিকার দাবী করা যেকোনো মুসলিম দেশের প্রেক্ষাপটে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। স্যার ফজলে হাসান আবেদ এর মত বিখ্যাত মানুষের প্রতিষ্ঠান অধিকারের মোড়কে সমকামিতার পক্ষে সক্রিয়ভাবে (রিসোর্স, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক) নেতৃত্বে আসায় পর্দা আড়ালে থাকা সমকামী গোষ্ঠীগুলো প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করতে দারুণভাবে উৎসাহিত হয়। ডেইলি স্টার পত্রিকা সমকামী অধিকার আন্দোলনের ঘোষণার সম্মেলন নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন (Pushing Boundaries) প্রকাশ করে ২০০৭ সালে।



Star
Weekend Magazine
Volume 6 Issue 31 August 10, 2007

Special Feature

Letters
Voicebox
Chintito
Newsnotes
Cover Story
Straight Talk
View from the Bottom
Special Feature
Food for Thought
Special Report
Perspective
Art
Remembrance
Event

Pushing Boundaries

Srabonti Nurmeen Ali and Elita Karim

Anything related to gender and sexuality in general is regarded as a taboo subject in Bangladesh. On the off chance that sexual minorities such as women, homosexuals, hermaphrodites, trans-genders (hijras) and sex workers are given a platform to speak about their issues, it is usually about just that -- issues. Such platforms are usually entrenched with stereotypes and negativity. Forget tolerating and giving equal rights to these minorities, it is difficult enough for most people in Bangladesh to accept that these issues exist, that they are real, that these people are a part of our society and

Presenters Nadia Afroza Zaman, Tahira Khan and Ruhaliyat Hossain, along with session Chair Sumit

মনে রাখতে হবে ইন্টারনেট প্রযুক্তি প্রসারের ফলে অনলাইনে পুরুষ সমকামীদের এক্টিভিটি কিছুটা দৃশ্যমান থাকলেও তারা বয়সে ছিল তরুণ। LGBTQ-এর দুর্বোধ্য ভাষায় সমাজের মূল্যবোধ-বিরোধী কাজে কৌশল নির্ধারণ করা সেই তরুণদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ স্কুল LGBTQ+ অ্যাক্টিভিসজমের মেন্টর হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা আড়ালে থেকে পরামর্শ এবং রিসোর্স দিয়ে সমর্থন দিয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছে মধ্যবিত্ত

এবং উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণ সমকামীদের গ্রুপ। বয়েজ অব বাংলাদেশ এবং 'রূপবান' ব্যানারে তারা দেশে এক্টিভিসম চালায়।

দেশের নারী সমকামীদের (লেসবিয়ান) দৃশ্যমান করতে ব্র্যাক পাবলিক হেলথ মনোযোগী হয়। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে 'প্রজেক্ট ধী' সচেতনতা প্রজেক্ট শুরু হয়। ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ যে তাদের ট্রেইনিং এবং রিসোর্স দিয়ে সমর্থন দিয়েছে, সে সম্পর্কে আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে ব্র্যাকের গবেষকদের প্রকাশিত জার্নাল পেপার (Rashid et al 2011)[১] থেকে স্ক্রিনশট যুক্ত করা হলো—

> for gaining positive visibility in society. The LGBT com- munities are setting up a Coalition and have approached the School to provide venue support for their trainings and access to resource materials for training of their members. Given the level of trust and close relationship with many members of the Coalition, staff members were invited to the first ever historic inauguration of a registered office for the Coalition of LGBT in Bangla- desh in August 2009. Donors have recently provided support to fund the establishment of an office for the Coalition of LGBT in Dhaka.

'বয়েজ অব বাংলাদেশ'

ইন্টারনেট প্রযুক্তি বিস্তারের আগে বাংলাদেশের সমকামীদের প্রকাশ্য কোনো কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায় না। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে, সমকামীরা অনলাইনভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় হতে শুরু করে, যেখানে তারা মূলত নিজেদের যৌন সঙ্গী খুঁজে পেত। রেঙ্গু নামে নৃগোষ্ঠীর একজন প্রবাস ফেরত যুবক 'গে বাংলাদেশ' নামে প্রথম অনলাইন গ্রুপ তৈরি করেন ১৯৯৯ সালে। তবে ২০০৪ সালে রেঙ্গু সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর এই গ্রুপের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। রেঙ্গুর তৈরি করা গে বাংলাদেশ গ্রুপ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০২ সালে আবির্ভাব ঘটে আরেকটি ই-গ্রুপের, যার নাম ছিল বয়েস অব বাংলাদেশ (Boys of Bangladesh/BoB)। ২০০৮ সালে একটি অস্ট্রেলিয়ান নিউজপেপার বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা তাদের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডের কিছু ধারণা দেয়[২]।

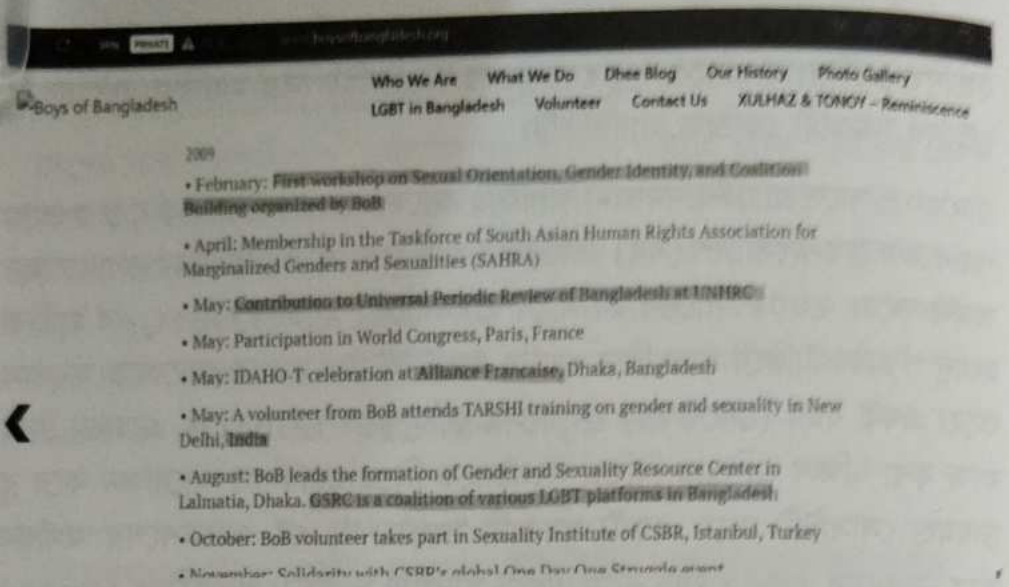
বয়েস অব বাংলাদেশ শুরু থেকেই অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও গোপনে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেমন- 'গেট টুগেদার' এবং 'ডিজে পার্টি'

আয়োজন করা। এই প্ল্যাটফর্মের সদস্যরা (গে) মূলত ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। অন্যদিকে, বন্ধু সোশ্যালের টার্গেট ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং ঢাকার বাইরের সমকামী কেন্দ্রিক অ্যাক্টিভিটি।

২০০৭ সালে ব্র্যাকের সমকামী অধিকার আন্দোলনের নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পর *বয়েজ অব বাংলাদেশ* (বব) উজ্জীবিত হয়ে প্রকাশ্যে অ্যাক্টিভিসম করার সাহস অর্জন করে। ২০০৮ সালের মে মাসে প্রথমবারের মতো LGBTQ+র প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙ্গিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে অনুষ্ঠান করে। একই বছর (সেপ্টেম্বর) নেপালের কাঠমুণ্ডুতে LGBTQ+ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটি নামে একটি সমকামী সংগঠন[৩]। এই ওয়ার্কশপের অর্থায়ন করে নরওয়ের এলএলএইচ নামে একটি সমকামী সংগঠন। পরবর্তীতে (২০০৯) এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশেও সমকামী অ্যাক্টিভিসমের অর্থায়ন করে। ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটি নেপালের সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিলে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। ২০০৭ সালে তাদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করার হয় এবং ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালে নেপালে সমকামী বিবাহ আইনত বৈধতা পায়।



২০০৮ সাল থেকে *বয়েজ অব বাংলাদেশ* ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়, তাদের আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও গবেষণাতেও অংশ নেয়া শুরু করে[৩]। এসআরআই (সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ) নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও-এর সহায়তায় *বয়েজ অব বাংলাদেশ* ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ করতে আবেদন করে। ২০০৯ সালে জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে ৩৭৭ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়।


Boys of Bangladesh

Who We Are What We Do Dhee Blog Our History Photo Gallery
LGBT in Bangladesh Volunteer Contact Us XULHAZ & TONOY – Reminiscence

2009

• February: First workshop on Sexual Orientation, Gender Identity, and Coalition Building organized by BoB

• April: Membership in the Taskforce of South Asian Human Rights Association for Marginalized Genders and Sexualities (SAHRA)

• May: Contribution to Universal Periodic Review of Bangladesh at UNHRC

• May: Participation in World Congress, Paris, France

• May: IDAHO-T celebration at Alliance Francaise, Dhaka, Bangladesh

• May: A volunteer from BoB attends TARSHI training on gender and sexuality in New Delhi, India

• August: BoB leads the formation of Gender and Sexuality Resource Center in Lalmatia, Dhaka. GSRC is a coalition of various LGBT platforms in Bangladesh.

• October: BoB volunteer takes part in Sexuality Institute of CSBR, Istanbul, Turkey

• November: Solidarity with CSBR's global One Day One Struggle event

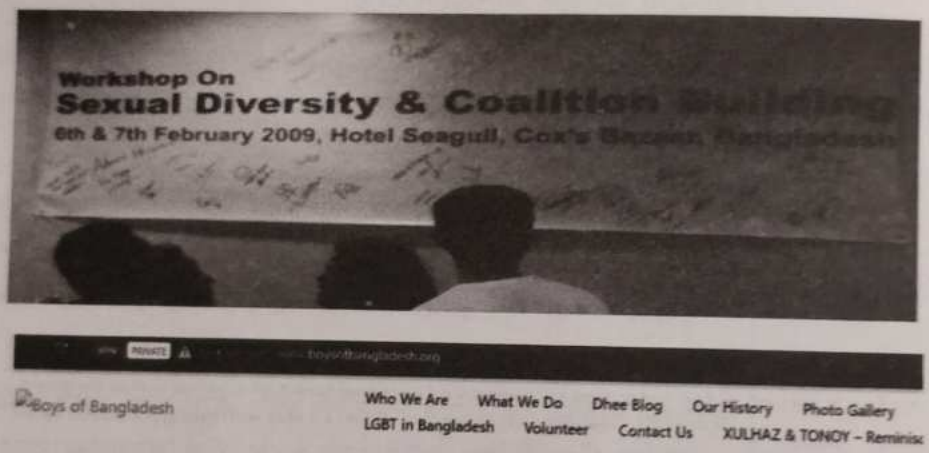
বয়েজ অব বাংলাদেশ-এর কিছু কার্যক্রম যেগুলো তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল—

সাল	ঘটনা/কর্মকাণ্ড
১৯৯৯	রেঙ্গু 'গে বাংলাদেশ' নামে প্রথম অনলাইন গ্রুপ তৈরি করেন, যা ছিল বাংলাদেশের প্রথম সমকামী অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। ২০০৪ সালে রেঙ্গুর মৃত্যুর পর এই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
২০০২	কাজী হক 'Boys of Bangladesh (BoB)' ই-গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা 'গে বাংলাদেশ' থেকে অনুপ্রাণিত।
২০০৫	BoB, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণায় কাজ করে, তবে ফলাফল প্রকাশিত হয়নি।
২০০৭	ব্র্যাকের জেম পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে BoB অংশগ্রহণ করে, যা তাদের কার্যক্রমের গতিপথ পরিবর্তন করে এবং অ্যাক্টিভিজমের দিকে ধাবিত করে।
২০০৮	BoB ধানমন্ডির জার্মান ইনস্টিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে LGBTQ+ প্রতীক রেইনবো পতাকা টাঙিয়ে প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এটি বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশ্য সমকামী অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান।

সাল	ঘটনা/কর্মকাণ্ড
২০০৯	BoB কক্সবাজারে বাংলাদেশে প্রথম সমকামী ওয়ার্কশপ আয়োজন করে, যেখানে বিভিন্ন LGBTQ+ সংগঠন, হিজড়া সম্প্রদায়, মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়। জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে ৩৭৭ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়, যেখানে BoB সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
২০০৯	বয়েস অব বাংলাদেশ South Asian Human Rights Association for Marginalized Genders and Sexualities (SAHRA)-এর সদস্যপদ লাভ করে। এটি একটি আঞ্চলিক LGBTQ+ প্ল্যাটফর্ম।
২০১০	BoB নেপালে ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটির একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে এবং নরওয়ের এলএলএইচ এর সমর্থনে বাংলাদেশে সমকামী অ্যাক্টিভিজমের অর্থায়ন শুরু হয়। ধানমন্ডিতে আয়োজিত আন্ডার দা রেইনবো উৎসবে অংশগ্রহণ করে।
২০১১-২০১২	BoB এবং বন্ধু যৌথভাবে সাহরার একটি মিটিং আয়োজন করে এবং জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে বেশ কিছু শিল্প প্রদর্শনী ও উৎসবে অংশগ্রহণ করে।
২০১৩	BoB জাতিসংঘের ইকোসকের উপদেষ্টা মর্যাদা পাওয়া ইলগার এশিয়ান শাখার সদস্য হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে বাংলাদেশের ব্যাপারে BoB-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।
২০১৩-২০১৫	হিউম্যান রাইটস ফোরামের সদস্যপদ লাভ করে এবং সমকামী ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যৌথ আয়োজন করে। ২০১৪: সমকামীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ডেটিং অ্যাপের সাথে সহযোগিতায় কাজ শুরু করে।
২০১৪-২০১৫	মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে 'প্রজেক্ট ধী' নামে একটি প্রকল্প শুরু হয়, যেখানে ধী রেসিডেন্সি নামে দুটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ২০১৫ সালে BoB-এর সদস্য শওকত ইমাম রাজীব ইলগা এশিয়ার বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন।
২০১৫	আইনী ক্ষমতায়ন নিয়ে ব্লাস্ট (Bangladesh Legal Aid and Services Trust) এর সাথে যৌথভাবে কাজ করে, এবং BoB-এর প্রতিনিধি শওকত ইমাম রাজীব ইলগা এশিয়ার বোর্ডের সদস্য হন।
২০১৬	BoB ময়মনসিংহে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করে সমকামীদের বৈধতা এবং সামাজিকীকরণের জন্য ৫ বছরের একটি স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

সী গাল কোয়ালিশন বিল্ডিং ওয়ার্কশপ

২০০৯ সালে, বয়েস অব বাংলাদেশ (BoB) একটি কর্মশালা আয়োজন করে যা নরওয়ের একটি তহবিলের মাধ্যমে সমর্থিত ছিল। এই কর্মশালায় লেসবিয়ান এবং সমকামী গ্রুপের বেশ কয়েকজন সদস্য, পুরুষ-পুরুষ (এমএসএম, Man sex with man) যৌনতা নিয়ে কাজ করা এনজিও, হিজড়া সম্প্রদায়, মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে ব্র্যাকের দুজন গবেষক উপস্থিত ছিলেন১। সেবারই প্রথমবারের মতো এই দলগুলো একত্রিত হয়ে তাদের কার্যক্ষেত্র এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। এমএসএম যৌনতা নিয়ে কাজ করা এনজিও এবং হিজড়াদের সমাজে উপস্থিতি থাকলেও, নারী ও পুরুষ সমকামী গ্রুপগুলোর সমাজে কোনো দৃশ্যমানতা ছিল না[৩]।



2014

- March: Presentation on sexual rights at Asian University for Women (AUW), Chittagong
- March,: Regular event on psychosocial counselling 'Amra Achi' started its journey
- April: Participation in a workshop 'Masculinities, Care Work and Art' organized by Center for Social and Gender Transformation (CGST), BRAC University
- May: A second installment of Pronoynama staged
- May: BoB takes part in the National Seminar on SRHR at AUW
- October 2014: BoB successfully applies for the US federal grant for Project Dhee
- October: ILGA World Conference, Mexico City, Mexico
- December: AIDS day celebration together with Link Up
- December: BoB and Roopbaan jointly conducts the country's first-ever LGB Need Assessment Survey

সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিলের প্রচেষ্টা

ব্র্যাক পাবলিক হেলথ স্কুল আয়োজিত প্রথম ওয়ার্কশপে (আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আগে, ২০০৭) সমকামী অপরাধ আইন বাতিল করা নিয়ে আলোচনা হয়। ২০০৯

সালের সী গাল ওয়ার্কশপে সমকামী গোষ্ঠীগুলো সেকশন ৩৭৭ নিয়ে আলোচনা তোলেন, কারণ তারা এটি তাদের অস্তিত্ব এবং সমাজে প্রকাশ্যে সংগঠিত হওয়ার পথে একটি সরাসরি বাধা হিসেবে দেখছিলেন। যদিও এই এনজিওগুলো এইচআইভি/এইডস এবং পুরুষ সমকামী (এমএসএম) যৌনস্বাস্থ্যে সক্রিয় ছিল, তারা সেকশন ৩৭৭ বাতিলের প্রয়োজন নিয়ে কোনো অবস্থান নেননি, কারণ এই আইন তাদের কার্যক্রমের ওপর কোনো সরাসরি হুমকি তৈরি করেনি। নারী সমকামী গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিরাও সেকশন ৩৭৭ নিয়ে কোনো অবস্থান নেননি, কারণ এটি তাদের জন্য সরাসরি প্রযোজ্য ছিল না।

তবে, হিজড়ারা সেকশন ৩৭৭ বাতিলের যেকোনো প্রচারণায় বেশ সরব ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, হিজড়ারা তাদের অধিকারের জন্য সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং সরব ছিল। তাদের জন্য অধিকার শুধুমাত্র সেকশন ৩৭৭ বা যৌনতার বিষয় ছিল না, বরং এতে তাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতির দাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

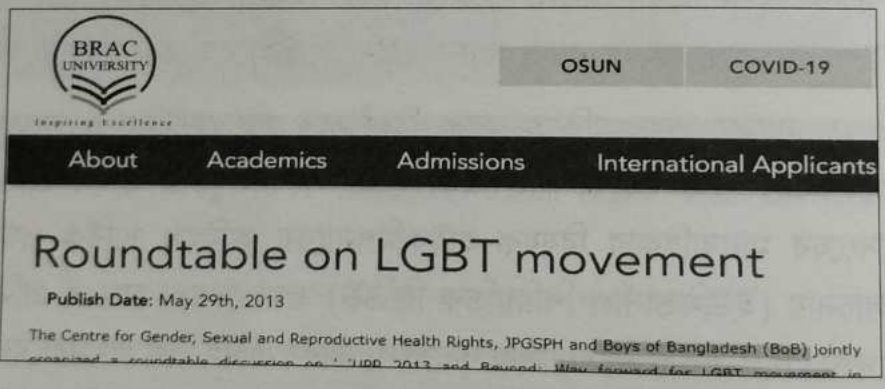
২০০৯ সালে দিল্লি উচ্চ আদালত কর্তৃক ৩৭৭ ধারার কিছু অংশকে ভারতের সংবিধানের মূলনীতির লঙ্ঘন হিসেবে রায় দেওয়া হয়েছিল। এর প্রভাব বাংলাদেশসহ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে যৌন অধিকারের আন্দোলনে পড়ে।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টরিং-এ *বয়েজ অব বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে লিঙ্গ এবং যৌন সংখ্যালঘুদের প্রথম প্রতিবেদন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিসে সার্বিক পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনায় (ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ) জমা দেওয়া হয়। এ প্রতিবেদন জমা দেওয়া ছিল একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ; কারণ এটাই ছিল প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে লিঙ্গ ও যৌনতার বিষয়টি কোনো উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়। তবে বাংলাদেশ সরকার সমকামিতা অপরাধ আইন ৩৭৭ ধারা বাতিল করার সুপারিশ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এছাড়াও, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই রিপোর্টের আলোচনায় সমকামিতার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন।

একই বছর (২০০৯ সালের ২ জুলাই) ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এই বিষয় (To Act or Not to Act? Section 377 of the Bangladesh Penal Code) নিয়ে মিটিং আয়োজন করে। এই আলোচনা পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের হিউম্যান রাইটস এবং লিগাল সার্ভিস

সেন্টারের ডিরেক্টর ড. ফস্টিনা পারেরা (Dr. Faustina Piereira)। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ৩৭৭ ধারা বাতিল করায় বাংলাদেশের জন্য সুযোগ তৈরী হয়েছে বলে উপস্থিত সবাই মনে করেন। কেননা আমাদের দেশেও ব্রিটিশদের করে যাওয়া একই ধারা বিদ্যমান। *বয়েজ অব বাংলাদেশ*, আইসিডিডিআরবি, বন্ধু সোশ্যাল এবং আরো অ্যাক্টিভিস্ট আলোচনায় উপস্থিত ছিল।

২০১৩ সালে জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে বাংলদেশ সরকারকে ৩৭৭ নম্বর সেকশন বাতিল করতে বলা হয়। বাংলাদেশ এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না। এরপর এপ্রিল ও মে মাসে ব্র্যাক জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ আর বয়েস অফ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দুটি গোলটেবিল বৈঠক হয়। বাংলাদেশে LGBTQ+ অধিকার আন্দোলনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আলোচনা হয় তা নিয়ে। এ অনুষ্ঠানে সমকামী সংগঠনগুলোর সদস্য এবং ব্র্যাকের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দূতাবাস এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও।


BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

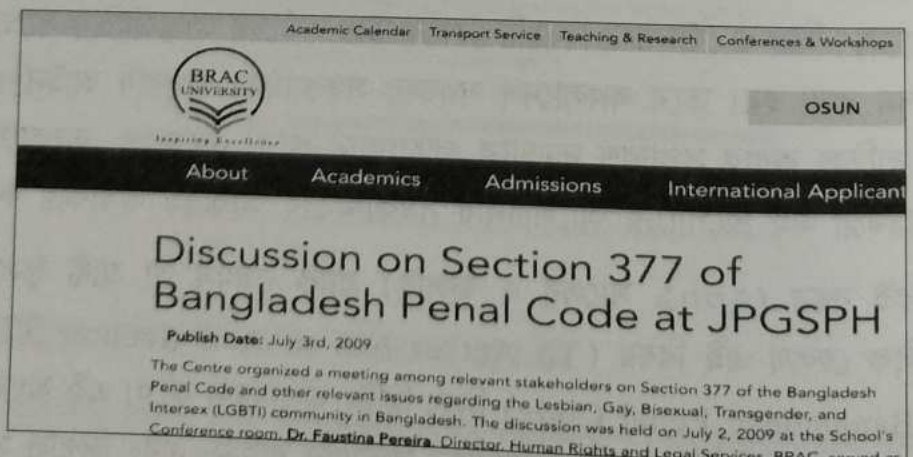
OSUN COVID-19

About Academics Admissions International Applicants

Roundtable on LGBT movement

Publish Date: May 29th, 2013

The Centre for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights, JPGSPH and Boys of Bangladesh (BoB) jointly


Academic Calendar Transport Service Teaching & Research Conferences & Workshops

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

OSUN

About Academics Admissions International Applicant

Discussion on Section 377 of Bangladesh Penal Code at JPGSPH

Publish Date: July 3rd, 2009

The Centre organized a meeting among relevant stakeholders on Section 377 of the Bangladesh Penal Code and other relevant issues regarding the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex (LGBTI) community in Bangladesh. The discussion was held on July 2, 2009 at the School's Conference room. **Dr. Faustina Pereira**, Director, Human Rights and Legal Services, BRAC, served as

সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৭৭ ধারা বাতিলের প্রচারাভিযান নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন যে, এমন প্রচারণা শুরু করলে তা যৌন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগে রূপ নিতে পারে; অন্যরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, একটি ধাপে ধাপে এগোনোর পদ্ধতি, যেখানে ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জের আগে জনসচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরি করার প্রয়োজন।

নারী সমকামিতা নিয়ে সচেতনতা: প্রজেক্ট ধী

শুরু থেকেই (২০০৭) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামিনা ফয়েজ রশিদ, নারী সমকামীদের দৃশ্যমানতার বিষয়ে কাজ করেন। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে ব্র্যাকের যৌন শিক্ষা প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের সম্মেলনে নারী অধিকারকে নারী সমকামী অধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো হয়েছে। অধ্যাপক সাবিনা এটা ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি রিয়েলাইজিং রাইটস (অর্থাৎ সমকামী অধিকার অনুধাবন) প্রজেক্টের শুরুর অভিজ্ঞতা জার্নাল পেপারে তুলে ধরেছেন[১]—

> Owing perhaps to the strongly patriarchal relations in Bangladesh, no visible female same sex subculture exists and even in 'LGBT' (Lesbian, Gay Bisexual and Transgender) identified groups most of which are still internet based there are very few lesbian identified members. There is some evidence from the informal meetings, research and workshop activities held as part of this project that suggests same sex female sexual orientation exists in Bangladesh with numbers involved reportedly running to more than a 1000 in Dhaka city alone, but they exist in secrecy. This was found to be the case in an informal meeting on November 15, 2009, with sex workers, transgenders and lesbian women from poorer socio-economic backgrounds, and they shared that a network existed of more than a 1000 women (including students, young girls, sex workers,

housewives), but very few were willing to come forward to talk about their sexual identity.

অর্থাৎ, বাংলাদেশের শক্তিশালী পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কের কারণে কোনো দৃশ্যমান নারী সমকামী উপসংস্কৃতি বিদ্যমান নেই, এবং এমনকি 'LGBT' (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার) পরিচিতি সম্পন্ন গ্রুপগুলোর মধ্যে, যেগুলোর বেশিরভাগই এখনও ইন্টারনেট ভিত্তিক, সেখানে খুব কমই লেসবিয়ান পরিচিত সদস্য রয়েছেন। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত অনানুষ্ঠানিক সভা, গবেষণা এবং কর্মশালার কার্যক্রম থেকে কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে বাংলাদেশে নারী সমকামী যৌন প্রবৃত্তি বিদ্যমান, এবং ঢাকায় এই সংখ্যা ১০০০-এর বেশি হতে পারে বলে জানা গেছে, তবে তারা গোপনে থাকে। ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে, যেখানে যৌনকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার এবং দরিদ্র সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমির লেসবিয়ান নারীরা অংশ নেন। তারা জানিয়েছেন যে ১০০০-এরও বেশি নারীর একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে (যার মধ্যে শিক্ষার্থী, তরুণ মেয়ে, যৌনকর্মী এবং গৃহিণী রয়েছে), কিন্তু খুব কমই তাদের যৌন পরিচয় সম্পর্কে কথা বলতে ইচ্ছুক।

নারী সমকামী তথা লেসবিয়ান বিষয়টি দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে ১৪ মাসের প্রজেক্ট ধী শুরু হয়[৩]। ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশের প্রথম নারী সমকামী কমিক চরিত্র—ধী লঞ্চ করা হয়। ডেইলি স্টার এই বিষয়টির প্রতিবেদনে এভাবে উপস্থাপন করে—

> 'সমকামিতা সর্বদা একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়েছে। এটি উপেক্ষিত হয়েছে এবং অতীতকাল থেকে অগণিত অপ্রকাশিত গল্পে পূর্ণ। আজ, সময় পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু কিছু মানুষের চাহিদার তুলনায় তাড়াতাড়ি নয়। তবে, অনেকেই এই ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলতে সামনে আসছেন। ধী বাংলাদেশে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের প্রতি অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ'

ইভেন্টে বক্তা হিসেবে ছিলেন আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক আন ম্যাককোনেল, ঢাকা অ্যাম্বাসি, খুশি কবীর ('এসো নিজেরা করি'-এর সমন্বয়কারী) এবং ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরও অনেকে। ধী'র কাহিনী একটি কমিক স্ট্রিপে বর্ণিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য রঙিন ফ্ল্যাশকার্ড

ব্যবহার করা হয়েছে। বংলাদেশের LGBTQ+ আন্দোলন পুরুষ কেন্দ্রিক, তাই *বয়েজ অব বাংলাদেশ* পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে চেয়েছে।

কমিক সিরিজের প্রধান চরিত্র 'ধী' একজন সমকামী মেয়ে। বাংলা 'ধী' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আরেকজন মেয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে ধী। যেহেতু আমাদের সমাজ এখনো সমকামিতাকে মেনে নেয়নি এবং এটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই একসময় ধী বুঝে উঠেতে পারে না, সে কী করবে? ধী-এর জীবনের এই টানাপড়েন নিয়েই গল্পটি সাজানো হয়েছে।

এই প্রজেক্টের মাধ্যমে ধী প্রকল্পের উদ্যোগে 'টিম বিল্ডিং' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মুন্সিগঞ্জের একটি রিসোর্টে দুইদিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যেখানে বর্তমান সময়ের LGBTQ+ মিডিয়া সেলিব্রেটিদের অনেকে যোগদান করে। প্রজেক্ট ধী নিয়ে বিবিসি, ডয়েচে ভ্যালে, ঢাকা ট্রিবিউনসহ অনেক পত্রিকায় প্রচারণা চালানো হয়[৩]।

প্রজেক্ট ধী মাঠ পর্যায়ে *বয়েজ অব বাংলাদেশ* কাজ করলেও এর নেপথ্যে ছিল ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথের টিম। ধী কনটেন্ট ক্রিয়েটর ছিল সাদ আদনান খান (নীচের স্ক্রিনশট) যিনি অধ্যাপক সাবিনা ফয়েজ রশিদের সুপারভিশনে কাজ করছেন। স্কুলের শিক্ষার্থীদের LGBTQ+ সচেতন করতে যৌন শিক্ষার কন্টেন্ট তৈরী এবং মাঠ লেভেলে পরীক্ষা করে জার্নালে পেপারও প্রকাশ করেছেন।

Dhee: Unknowability and Queering Realities in Bangladesh
Written by Saad Adnan Khan

Saad Adnan Khan currently works as a researcher at the BRAC Institute of Educational Development, BRAC University. He has a Master's degree in Gender studies from Linkoping University, Sweden. His master's thesis was a qualitative research on bullying inside Bangladeshi classrooms, in which he explored bullying in the context of intersectional gender pedagogy and other themes of sexuality and affects. He has worked as a reporter at The Daily Star, Bangladesh for a year and St. Louis Magazine, USA for six months. He has given lectures on masculinity and transnational feminist studies at BRAC University, Bangladesh. He has won a small grant from the EMK center, in collaboration with James P Grant School of Public Health, BRAC University to carry out a project entitled "Photo/narratives and workshops on masculinity in Bangladesh". He has worked as a content developer for Project Dhee to bring out an LGBT comic strip in Bangladesh.

'এসো নিজে করি' সমন্বয়ক খুশী কবীর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে LGBTQ+



ছবি- ফটোগ্রাফি কোর্সের ফ্লাইয়ারে নারী সমকামী

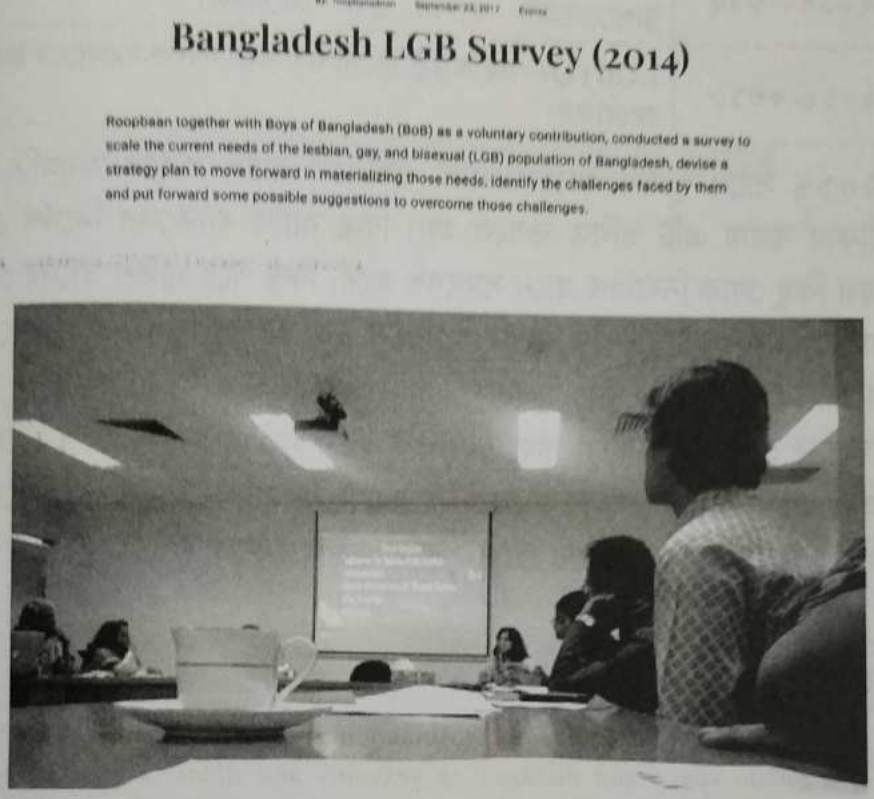
অধিকার স্বীকৃতি বাদী করে বলেন, 'আমরা আর কোনো বাক্সের মধ্যে আটকে থাকতে চাই না। আমরা আমাদের মনকে মুক্ত করতে চাই[৪]।' ২০১৬ সালে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল LGBTQ+ বিষয়কে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে তুলে ধরার ট্রেইনিং বিজ্ঞপ্তিতে সমকামী নারীদের মাঝে যৌনতাকে বিশেষভাবে হাইলাইট করা হয়েছে।

রূপবান: বাংলাদেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আরেকটি সমকামী প্লাটফর্ম 'রূপবান', ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন হিসেবে 'রূপবান' প্রকাশের মধ্য দিয়ে এটি পরিচিতি পায়। এর প্রচারণা চলে প্রিন্ট মিডিয়া (যেমন- ডেইলি স্টার-এ বিজ্ঞাপন) এবং অনলাইনে[৫]। ব্রিটিশ কাউন্সিলে রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ম্যাগাজিনটির খবর ফলাও করে প্রচার করে ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম। রূপবান শুধু একটি ম্যাগাজিনই ছিল না, বরং এটি যৌন অধিকারের পক্ষে সক্রিয়তা এবং বাংলাদেশ জুড়ে তরুণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরির জন্য একটি প্ল্যাটফর্মও হয়ে ওঠে[৬]।

রূপবানের প্রধান উদ্যোক্তা জুলহাস মান্নান মার্কিন দূতাবাসের প্রাক্তন কর্মকর্তা ছিলেন এবং তার সম্পর্ক ছিল ইউএসএইডের সাথে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টোরিং-এ বয়েজ অব বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে রূপবান বাংলাদেশে সমকামীদের নীড এসেসমেন্ট নিয়ে একটি গবেষণায় অংশ নেয়। রূপবান এর ওয়েবসাইটের ছবি অনুযায়ী (দুজন ব্র্যাকের গবেষক আছেন—Prof Sabina Faiz

and Dr Suchi Karim) সেই গবেষণামূলত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারভিশনেই হয়েছে[৭]।



রূপবান, বয়েজ অব বাংলাদেশের মতো সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট তৈরির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল *রূপবান ইয়ুথ লিডারশীপ প্রোগ্রাম*। প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে রূপবান অনেকাংশে বয়েজ অব বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যায়। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে রূপবান রঙধনু র‍্যালি আয়োজন করে, যেখানে হিজড়া ও সমকামী পুরুষরা শাহবাগে রংবেরঙের পোশাক পরে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এসময় রূপবান দুটি ফ্যাশন শো ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যার মূল থিম ছিল ট্র্যান্সজেন্ডার ও ক্রসড্রেসিং।

সাল	কার্যক্রম
২০১৪	বয়েজ অব বাংলাদেশ (BoB)-এর সাথে জাতীয় জরিপ পরিচালনা।
২০১৪-২০১৫	'পিংক স্লিপ' নামে যৌন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন।
২০১৫-২০১৬	ঢাকায় যুব নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচি আয়োজন।

সাল	কার্যক্রম
২০১৪-২০১৫	রেইনবো র‍্যালি প্রাইড প্যারেড, ড্রাগ শো, এবং হিজড়া/ ট্রান্সভেস্টাইট ফ্যাশন শো আয়োজন।
২০১৩-২০১৫	LGBTQ+-সহ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে বার্ষিক রমজানের ইফতার আয়োজন।

২০১৬ সালে পুলিশ আয়োজকদের রেইনবো র‍্যালি করতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করায় এটি স্থগিত করতে হয়। কিন্তু র‍্যালি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক নির্ধারিত স্থানে সমাবেশ করে; কিন্তু পরে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। রূপবানের দুই মুখপাত্র, জুলহাস মান্নান এবং মাহবুব রাব্বি তনয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এর দশ দিন পর, জুলহাস মান্নান এবং মাহবুব রাব্বি তনয়কে তাদের বাসভবনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের LGBTQ+ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তৈরি করে এবং এর ফলে যৌনতা ও লিঙ্গকেন্দ্রিক অধিকার কর্ম এবং সক্রিয়তায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে[৬]।

References

1. Rashid, S. F., Standing, H., Mohiuddin, M. & Ahmed, F. M. Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh. Health Research Policy and Systems 9, S12 (2011).
2. Writers, S. Getting connected in Bangladesh. Star Observer https://www.starobserver.com.au/news/getting-connected-in-bangladesh-2/585 (2008)
3. Adnin, N. N. The Story of Dhee. The Daily Star https://www.thedailystar.net/the-star/human-rights/the-story-dhee-140974(2015).
4. First-ever Bangladeshi lesbian comic character launched. Dhaka Tribune https://www.dhakatribune.com/bangladesh/bangladesh-others/108808/first-ever-bangladeshi-lesbian-comic-character.
5. Online, N. First local magazine for gays launched. The Daily Star https://www.thedailystar.net/first-local-magazine-for-gays-launched-7611 (2014).
6. Hossain, A. Section 377, Same-sex Sexualities and the Struggle for Sexual Rights in Bangladesh. Australian Journal of Asian Law 20, 1–11 (2019).
7. roopbanadmin. Bangladesh LGB Survey (2014). https://roopbaan.org/2017/09/23/bangladesh-lgb-survey-2014/ (2017)

হিজড়ার আড়ালে ট্রান্সজেন্ডারবাদের উত্থান

ঘটনা যেভাবে শুরু হয়—

১৯ মে ২০১৭, বাংলাদেশে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে।

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পত্রিকায় শিরোনাম হয় ২৭ সমকামীকে আটক করার খবর। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে দেশে সমকামী অধিকার দাবী করে ২০০৭ সালে। এরপর থেকে প্রকাশ্যে অনেক অ্যাক্টিভিজম, ব্র্যাকের উদ্যোগে বিভিন্ন এম্বেসীর কর্মকর্তাদের দৌড়ঝাপ শুরু হয়। আমেরিকার এম্বেসীর উদ্যোগে ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রথম নারী সমকামী কমিকস 'ধী'-এর মোড়ক উন্মোচন হয় (২০১৪) এবং প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন 'রূপবান' এর যাত্রা শুরু হয়। এগুলো নিয়ে অধিকারের ব্যানারে অনেক ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, ডেইলি স্টার পত্রিকার কিছু শিরোনাম—*Pushing Boundaries (2007)*[১], *The Story of Dhee (2015)*[২], *First local magazine for gays launched (2014)*[৩]। এ ধরনের অনেক দৃশ্যমান এক্টিভিজমে মানবাধীকার কর্মী হিসেবে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বিশেষভাবে উপস্থিত থাকতেন, যা পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এক দশকে (২০০৬-২০১৬) দেশে সমকামী অধিকারের বয়ান পলিসি পর্যায়ে অনেক দূর অগ্রগতি হলেও দেশের গণমাধ্যম খুব সচেতনভাবে এসব ঘটনা এড়িয়ে গেছে। মূলধারার গণমাধ্যম LGBTQ+ তথা জেন্ডার ইস্যুতে কীভাবে শব্দ চয়ন, ফোকাস করবে তা নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকদের ট্রেইনিং দেয়। এক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা (ফেলোশীপ) যে খুব কার্যকরী সেই অভিজ্ঞতাও ব্র্যাকের গবেষকরা জার্নাল আর্টিকেলে প্রকাশ করেছে[৪]।

সেই আটকের ঘটনায় মূলধারার গণমাধ্যমে সমকামিতা অপরাধ আইন, সেকশন ৩৭৭ নিয়ে প্রথম আলোচনায় আসে। এই আইনটি ১৫০ বছর ধরে থাকলে এ

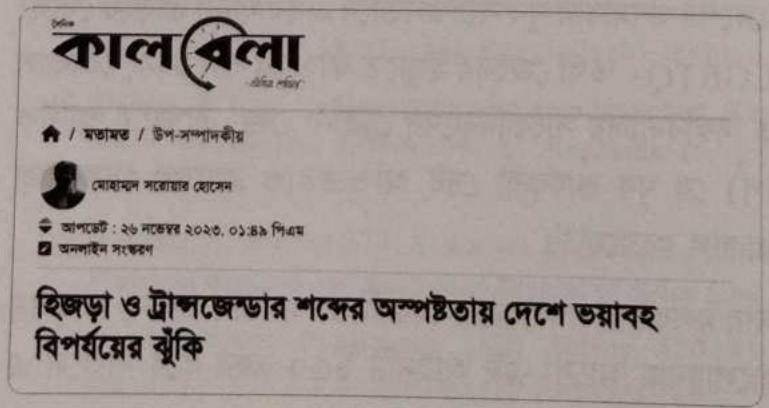
পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়নি। এ বিষয়ে চ্যানেল আই তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে[৫]—

> আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও আইনে সমকামিতাকে সমর্থন করা হয় না। বিশ্বের অনেক দেশই সমকামিতাকে বৈধতা দিলেও বাংলাদেশে এটি অপরাধ। বাংলাদেশের আইন সমকামিতাকে এখনো প্রকৃতি বিরুদ্ধ মনে করে এবং এর শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পায়ুমৈথুন শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ, যার শাস্তি দশ বছর থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে।

২০০৯ সালে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এই আইনটি কীভাবে বাতিল করা যায়, তা নিয়ে বিশেষ মিটিং-এর আয়োজন করে। সেই বিশেষজ্ঞ আইনজীবী এবং এক্টিভিস্টদের মিটিং-এ সেকশন ৩৭৭-কে এটম বোমার সাথে তুলনা করা হয়, যা প্রয়োগ না করা হলেও উপস্থিতিই ভয় সঞ্চার করে। তাদের মধ্যে শংকা কাজ করত যদি সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ ৩৭৭ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়।

আটকের আগের বছর (২৯ এপ্রিল ২০১৬) রূপবানের প্রতিষ্ঠাতা জুলহাস হত্যাকান্ড বাংলাদেশে উদীয়মান সমকামী অধিকার কর্মীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে। অনেকেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়, অনেকে চলে যায় আত্মগোপনে। এছাড়া, বন্ধু সোস্যালের মতো এনজিওগুলো যারা পুরুষ-পুরুষ (এমএসএম) যৌন স্বাস্থ্যের আড়ালে এতদিন কাজ করে আসছিল তারাও বাধার সম্মুখীন হয়, পুলিশ তাদের ওপর বাড়তি নজরদারি শুরু করে[৬]।

২০১৭ সালের পর থেকেই মূলত হিজড়াদের আড়ালে LGBTQ+'র চরমপন্থী ভার্সন ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন শুরু হয় বাংলাদেশে, যার মূল পুঁজি হচ্ছে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে পলিসিমেকারদের অস্পষ্ট ধারণা এবং জনসাধারণের অসচেতনতা। ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু কেন্দ্র করে নর্থ


কালবেলা

/ মতামত / উপ-সম্পাদকীয়

মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৩, ০১:৪৯ পিএম

অনলাইন সংস্করণ

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অস্পষ্টতায় দেশে ভয়াবহ বিপর্যয়ের ঝুঁকি

সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (অক্টোবর ২০২৩) একটি ইস্যু দেশের মূলধারার মিডিয়ায় তোলপাড় হয়। সেই ঘটনার পর সচেতনতা তৈরী করতে 'কালবেলা' পত্রিকা আমার লেখা প্রকাশ করেছিল, যার জন্য পত্রিকায় কোনো এক এডিটরকে ব্যক্তিগতভাবে বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। LGBTQ+ মতবাদের বিরুদ্ধে যায় এমন আর্টিকেল মূলধারার পত্রিকা প্রকাশ করতে চায় না। হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দের বিষয় নিয়ে এটিই মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রথম লেখা[৭]।

'ঢাকায় সমকামী ক্লাব'

সমকামিতার নেতিবাচক হালহকিত নিয়ে দেশে মূলধারার গণমাধ্যমের মধ্যে মানবজমিন প্রথম একটি অনুসন্ধানমূলক বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপে ২০১৮ সালে, 'ঢাকায় সমকামী ক্লাব' শিরোনামে[৮]। এই প্রতিবেদনের (৩ মার্চ) অংশ বিশেষ ইতিহাসের দলিল হিসেবে তুলে ধরছি—

> 'সমকামী ক্লাবে যোগ দিয়েই বদলে ফেলে নাম। সমকামীদের নিয়ে আড্ডা, বসবাস, বেড়ানো সবই করে তারা। নিজ পরিবারও এ বিষয়ে থাকে অবগত। কিন্তু তারা লোক লজ্জার ভয়ে থাকে নীরব। ইদানীং রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সমকামীরা ক্লাব খুলে তাদের কাজ করছে। কেউ কেউ এক সঙ্গে থাকছে। এমন একাধিক সমকামী সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এসব সংগঠন গোপনে চালাচ্ছে কার্যক্রম। কিছু এনজিও দিচ্ছে তাদের সহায়তা। ফেসবুক, টুইটার, ইমো, হোয়াটস অ্যাপসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে এরা এখন সরব। সাংকেতিক কোড ব্যবহার করে বাড়াচ্ছে সদস্য সংখ্যা।...
>
> এদিকে একসময় ড্যানির পরিচয় হয় তার 'গে'কমিউনিটির আরো একাধিক সদস্যের সঙ্গে। তিনি তার কমিউনিটির কাজ ছড়িয়ে দিতে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করেন। গড়ে তোলেন 'ওয়ার্ক ফর মাইনরিটি (LGBTQ+) নামের একটি সংগঠন'। এখানে সদস্য সংগ্রহ করেন ভিন্ন উপায়ে। কাজ করেন তার এবং আরো সমগোত্রীয় যে কয়টি সমকামী গোষ্ঠী রয়েছে তাদের নিয়ে। ড্যানি জানান, তার সংগঠন লিঙ্গগত বৈষম্যের শিকার হওয়া ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে ট্রেনিং দেন। সদস্য সংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি করবে তারও ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে। আর তার

সংগঠনকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করে বিদেশি কয়েকটি এনজিও...

এদিকে পুরুষ সমকামীর পাশাপাশি একইভাবে নারী সমকামীরাও তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করছে। তবে পুরুষ সমকামীদের থেকে তাদের কার্যক্রম চলে অনেক বেশি গোপনে। তারা সমাজে তো দূরে থাক পরিবারের কাছে প্রকাশ করেন না। তবে ছেলেদের তুলনায় তারা পরস্পরে সহজে মিলিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের পরিবার জানতে পারেন না। তারা একে অন্যের সঙ্গে এ সম্পর্ক গোপনভাবেই রক্ষা করে চলেন। সমাজে তারা খুব একটা পরিচিতি পেতেও চান না। ছেলে সমকামীদের ভেতর দ্রুত বিয়ের একটা প্রবণতা কাজ করলেও মেয়েদের মধ্যে বিয়ের আগ্রহটা থাকে অনেক কম।...

২০১৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি দেশে সমকামীদের পত্রিকা 'রূপবান' প্রকাশিত হলে তুলকালাম সৃষ্টি হয়। চারদিকে এগুলোকে নির্মূল করার আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তীতে সমকামীদের পত্রিকা রূপবান এবং বয়েজ অফ বাংলাদেশ (বিওবি) নামে একটি সংগঠন দেশে সমকামীদের প্রকৃত সংখ্যা নিরুপণ করতে জরিপ চালায়। জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেখানে তারা বলছে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ সমকামী জনগোষ্ঠী রয়েছে। জরিপে তৃতীয় লিঙ্গকে আওতায় নেয়া হয়নি। এছাড়াও পরবর্তীতে ৬০০ সমকামী এবং উভয়কামী নারী-পুরুষের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখেছে তারা পরিবারের কাছেই তাদের সম্পর্কের কথা গোপন রাখেন।

২০১৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ কাউন্সিলে একটি সমকামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেদিন ২০০-এর বেশি সমকামী তরুণ-তরুণী জড়ো হয়েছিল। যেখানে 'ধী' নামে একটি সমকামী কমিক উপস্থাপন করা হয়েছিল। আর এর চরিত্র ধারণ করেছিলেন দেশের খ্যাতনামা এক সাংস্কৃতিক দম্পতির মেয়ে। সেদিনকার সমাবেশে সমকামীদের অধিকারের পক্ষে 'নিজেরা করি' এনজিওর সমন্বয়কারী নানা কথা বলেছিলেন। এ কারণে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বৃটিশ কাউন্সিলের সমকামীদের সে সমাবেশের খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশে নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। এর আগে ২০১৩ সালের ২৯শে এপ্রিল জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'ইউনিভার্সাল

পিরিয়ডিক রিভিউতে' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমকামীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলায় দেশে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ২০১৭ সালের আগস্টে কেরানীগঞ্জ থেকে এক গোপন বৈঠক চলাকালে ২৮ সমকামীকে পুলিশ আটক করে। এ ঘটনা নিয়েও দেশজুড়ে তোলপাড় হয়।'

হিজড়া পুনর্বাসনের লক্ষ্য না থাকলেও কেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল

পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরে হিজড়া নিয়ে কিছু বিষয় এখানে স্মরণ করানো দরকার মনে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে হিজড়াদের রয়েছে দুই হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস। তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজচ্যুত করা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে। মিডিয়ার বদৌলতে সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট এবং সুশীলরা অবহেলিত হিজড়াদের এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, তারা হিজড়া দরদী, তাদের পুনর্বাসন করাই তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু আদতে হিজড়াদের পুনর্বাসন তাদের লক্ষ্য ছিলই না।

১৯৯৭ সাল থেকে বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেরার সোস্যাইটি এনজিও'র মাধ্যমে সমকামী পুরুষদের (MSM, men who have sex with men) স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার প্রকল্প শুরু হয় পশ্চিমা অর্থায়নে। হিজড়ারা সামাজিকভাবে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত। সমকামী পুরুষদের নিয়ে এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাই-প্রডাক্ট হিসেবে জানা গেল, হিজড়ারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী নয় এবং তারা সমকামী যৌন পেশায় জড়িত। সমকামী পুরুষরা (MSM) হিজড়াদের সাথে পায়ুসঙ্গম করে যেখানে হিজড়ারা সচারাচর মেয়েদের (receiver) ভূমিকা পালন করে।

আইসিডিডিআর,বি সমকামীদের জন্য 'নিরাপদ' জায়গা ড্রপ-ইন-সেন্টার পরিচালনা করার সময় বাংলাদেশের হিজড়াদের যৌন আচরণ নিয়ে কিছু নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করে। এগুলো পরবর্তীতে LGBTQ+ অধিকার বয়ানের রেফারেন্স হিসেবে দেখানো হয়৬। সেসময় জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ এবং পলিসি পেপারে হিজড়াদেরকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে দেখিয়ে ব্র্যাকেটে 'হিজড়া' লেখা শুরু হয়, Transgender (Hijra)। অর্থাৎ, হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হতো (স্ক্রিনশট দেখুন)।

J Health Popul Nutr. 2009 Aug; 27(4): 441–451.
doi: 10.3329/jhpn.v27i4.3395
PMCID: PMC2928093
PMID: 19507372

Living on the Extreme Margin: Social Exclusion of the Transgender Population *(Hijra)* in Bangladesh

Shariful Islam Khan,[1*] Mohammad Shahriar Hossain,[1] Shakila Parveen,[1] Mahmudul Islam Bhuiyan,[1] Gautam Goswami,[1] Golam Faruk Sarker,[1] Shahanaz Sharmeen Murshid,[2] and Jorna Sikder[3]

২০১০ সালের আগ পর্যন্ত সমকামিতার ট্রান্সজেন্ডার ভার্সন বিশ্ব এজেন্ডার ছিল না। ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগোকার্তা নামক দ্বীপে বিশ্বের LGBTQ+ অ্যাক্টিভিস্টরা একত্রিত হয়ে সার্বজনীন মানবাধিকার আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালা খসড়া করা হয়। সেটি LGB (গে, লেসবিয়ান এবং বাইসেক্সুয়াল) কেন্দ্রিক সমকামী সম্মেলন ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই সম্মেলন শুরুর জাস্ট আগ মুহূর্তে ব্রিটিশ ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট আইনস্ত্র স্টিফেল হুইটেলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়[১১]। উনার উপস্থিতি মূলত এলজিবি (LGB) মুভমেন্টে ট্রান্সজেন্ডার (T) যুক্ত হয়ে যায়—সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি (SOGI) ব্যানারে।

সেই গেইম চ্যাঞ্জিং সম্মেলনে ২৯ জন LGBTQ+ এক্টিভিস্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেপালের সমকামী এক্টিভিস্ট সুনীল বাবু পান্ত[১০]। সেই সুনীলের গুরু ছিলেন ভারতীয় সমকামী এক্টিভিস্ট শিবানন্দ খান, যিনি আবার বাংলাদেশের বন্ধু সোস্যাল-এর নির্বাহী পরিচালক সালেহ আহমদেরও গুরু ছিলেন[১১]। শিবানন্দ খানের হাত ধরেই সমকামী এক্টিভিসম দক্ষিণ এশিয়ায় আমদানী হয়। ইন্দোনেশিয়ার সেই সম্মলেনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়াদের মধ্যে বেশ-ভূষা, চাল-চলনে মিল রয়েছে। হিজড়া লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে সমাজে পরিচিত, অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু শারীরিক কোনো অক্ষমতার সাথে জড়িত নয়। তাই উপমহাদেশে হিজড়ার আড়ালে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে ওঠে।

ইন্দোনেশিয়ায় মিটিং-এর পরের বছরই (২০০৭) নেপালে হিজড়াকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে সুনীল পান্ত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একই সাথে নেপালে সমকামিতা অপরাধ আইনও বাতিল করা হয়। এশিয়ার মধ্যে নেপাল হচ্ছে প্রথম দেশ যেখানে সমকামী অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি

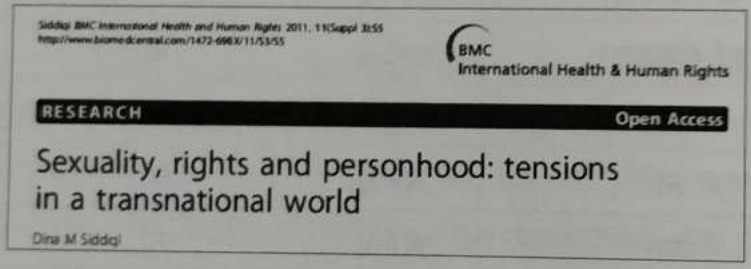
গায়। ইন্দোনেশিয়ায় সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীরও (Asma Jahangir) অংশ নিয়েছিলেন। নেপালের পর পাকিস্তানের হিজড়াদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় ২০০৯ সালে। এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে জনগণ পলিসিমেকার হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য বুঝে ওঠার আগেই তড়িঘড়ি করে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন পাশ করা হয় ২০১৮ সালে। সংসদে পাশ হওয়ার পর পাকিস্তানের সংসদ সদস্যরা অনুধাবন করতে পারেন যে, তারা বড় একটি ভুল করে ফেলেছেন। এই প্রসঙ্গে সামনে আলোচনা করব।

দেশ	তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি	তৃতীয় লিঙ্গ স্বীকৃতির বছর	সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিল (সমকামিতা লিগ্যাল)
নেপাল	হ্যাঁ (হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার)	২০০৭	হ্যাঁ (২০০৭)
ভারত	হ্যাঁ (হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার)	২০১৪	হ্যাঁ (২০১৮)
পাকিস্তান	হ্যাঁ (হিজড়া)	২০০৯	না
বাংলাদেশ	হ্যাঁ (হিজড়া)	২০১৩	না
ভুটান	না	N/A	হ্যাঁ (২০২১)
শ্রীলঙ্কা	না	N/A	না
মালদ্বীপ	না	N/A	না

বাংলাদেশে তখনো হিজড়ার স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়নি। নেপাল এবং পাকিস্তানের স্বীকৃতির প্রভাবে বাংলাদেশে ২০১১ সালে হিজড়া ইস্যু আলোচনার টেবিলে আসে। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শুরু হওয়া সমকামী আন্দোলনে হিজড়া এবং ট্রান্সেজন্ডার তেমন আলোচনায় ছিল না। বাংলাদেশে এমএসএম নাকি গে/লেসবিয়ান মডেল হবে তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। ব্রাকের গবেষণা, এডভোকেসির অন্যতম লক্ষ্য ছিল মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত কেন্দ্রিক গে/লেসবিয়ান মডেলকে জনপরিসরে আনা।

বাংলাদেশে LGBTQ+ আন্দোলনের মডেল নিয়ে বিতর্ক

সমকামী আন্দোলনের মডেল বা ফ্রেমওয়ার্ক (এমএসএম/গে) নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর (নৃবিজ্ঞান বিভাগ) জার্নালে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন[১২]। তিনি LGBTQ+ সেক্টরে ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কিত রাজনীতির গ্যাপ অনুসন্ধান করেছেন। সেই নিবন্ধের নির্যাস হলো—পাবলিক হেলথ সার্ভিস প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং আন্তর্জাতিক দাতারা কৌশলগত কারণে এমএসএম (যে পুরুষরা পুরুষদের সাথে যৌনসম্পর্ক করে) শব্দ ব্যবহার করে। অন্যদিকে মানবাধিকার কর্মী ও এনজিওগুলো 'গে' বা 'লেসবিয়ান' শব্দগুলো ব্যবহার করে। কিন্তু এই ধরনের পরিচয়গুলো সবসময়ই বাংলাদেশে মানুষের লিঙ্গ ও যৌনতা বোঝার জটিল ও প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলোকে ঠিকমত প্রকাশ করে না। সামাজিক শ্রেণী অবস্থানও এই আন্তর্জাতিক পরিচয়গুলোকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এ কারণে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার (এইডস) ব্যানারে কাজ করা এমএসএম কেন্দ্রিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার (যেমন- বন্ধু সোস্যাল, আইসিডিডিআর,বি) কর্মীদের সাথে LGBT পরিচয় নেয়া এমন মানুষ বা প্লাটফর্মের (*বয়েজ অব বাংলাদেশ*) মাঝে বিতর্কের কারণে উত্তেজনা তৈরির ঘটনা ঘটেছে LGBTQ+ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সময়টাতে।


Siddiqi BMC International Health and Human Rights 2011, 11(Suppl 3):S5
http://www.biomedcentral.com/1472-698X/11/S3/S5

BMC International Health & Human Rights

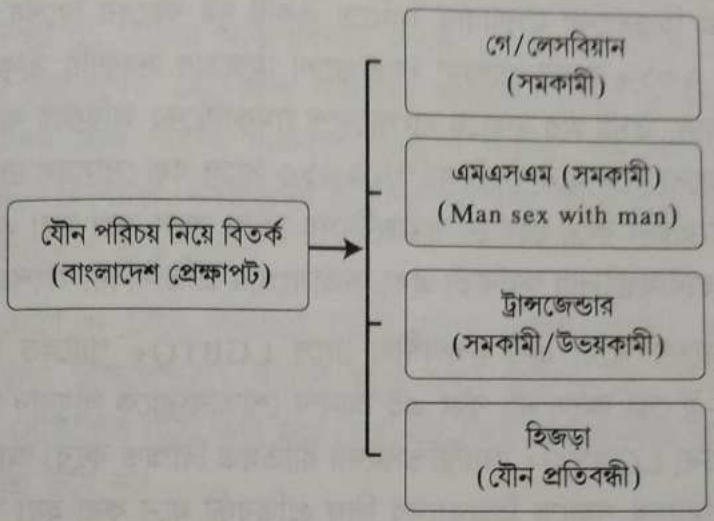
RESEARCH Open Access

Sexuality, rights and personhood: tensions in a transnational world

Dina M Siddiqi

অবহেলিত হিজড়াদের নিয়ে আলোচনা হলেও তাদের সত্যিকারের পূর্ণবাসন নিয়ে আলোচনা হয় না। 'বাঁধন হিজড়া সঙ্ঘ' নামে প্রথম হিজড়া এনজিও গড়ে ওঠে ২০০০ সালে যার অর্থায়ন করে কেয়ার এনজিও। এর পরের বছর 'সুস্থ জীবন' নামে একটি এনজিও তৈরি করে বন্ধু সোশ্যাল[১৩]। ২০০৭ সালে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ এর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের পর হিজড়ারা অধিকার নিয়ে প্রথম সচেতন হয়। ২০০৯ সালে ব্র্যাকের আয়োজিত এক ওয়ার্কশপে ব্যাপক আলোচনা হয়, কোন পরিভাষাকে (এমএসএম নাকি গে/লেসবিয়ান) LGBTQ+ অধিকার আন্দোলনের কৌশল তৈরীতে সামনে রাখবে। হিজড়ারা অবহেলিত হলেও সমাজে তাদের শক্তিশালী দৃশ্যমান অবস্থান রয়েছে। অন্যদিকে সমকামীরা (গে/লেসবিয়ান)

মধ্য এবং উচ্চবিত্তদের গোষ্ঠীর হলেও সমাজে তাদের দৃশ্যমান অবস্থান নেই। হিজড়া এবং সমকামীরা কীভাবে নিজেদের সামর্থ্যগুলোকে সমন্বয় করে LGBTQ+ আন্দোলনকে প্রাগ্রসর করে তুলবে, তা নিয়ে সেই ওয়ার্কশপে ব্যাপক আলোচনা



হয়[৪]।

অন্যদিকে বন্ধু সোশ্যাল যারা এমএসএম নিয়ে কাজ করে, তাদের এই বিষয় নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। দৃশ্যমান LGBTQ+ কর্মকাণ্ড তথা যৌন বিকৃতি সামাজিকীকরণে মূল বাধা হচ্ছে সমকামিতা অপরাধ আইন (সেকশন ৩৭৭)। এমএসএম-এর ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই, এটা এইডস/এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—তাদেরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সবাই বিকৃত যৌনাচার লালন করে।

LGBTQ+ প্রমোট করার জন্য এইডস/এইচআইভি প্রতিরোধের নামে প্রচুর পশ্চিমা ফান্ডিং আসা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত এনজিও তথা সুশীল সমাজের লোকজন হিজড়াদের নতুন নতুন এনজিও তৈরী করতে উৎসাহিত করে। ২০১০ নাগাদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এনজিওগুলোর কাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সুশীলদের মধ্যে 'এনজিও হিজড়া' নামে একটা নামই চালু হয়ে যায়[১৩]।

হিজড়া প্রাইড নাকি LGBTQ+ প্রাইড

২০১১ সালে বাংলাদেশের সংসদে হিজরা বিষয়টি আলোচনা করা হয় এবং তাদের 'অক্ষম' হিসাবে পুনর্বাসনের প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে হিজরাদের মূলধারায় আনতে একটি দুই বছরের বিশেষ প্রকল্প চালু করা হয়। ২০১৩ সালে পশ্চিমা সংস্থাগুলো হিজড়ার সরকারি স্বীকৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে, তারা এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার কায়েমের পথ উন্মোচন হলো বলে মনে করছিল।[১৩]। ২০১৫ সালে বন্ধু সোস্যাল ঢাকায় হিজড়া প্রাইড আয়োজন করে যেখানে সমকামীদের ফ্ল্যাগ বহন করা হয়। এই প্যারেডে পশ্চিমা দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তা এবং দাতাসংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের মতো এত রক্ষণশীল দেশে LGBTQ+ প্যারেড হচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছু-ই তো বলল না; বরং এই আনন্দ শোভাযাত্রাকে সাধুবাদ জানায়। এই ঘটনা পশ্চিমা LGBTQ+ অ্যাক্টিভিস্টদের রীতিমত বিস্মিত করে। আসল কাহিনী হলো—আমাদের সমাজে হিজড়াদের লিঙ্গ প্রতিবন্ধী মনে করা হয়। তাই তাদের সামাজিক পুনর্বাসনে সাধারণ মানুষ সমর্থন করে। এই ঘটনার পর পশ্চিমাদের হিজড়া 'সহানুভূতি'র আসল উদ্দেশ্য উন্মোচন হয়ে যায়।

হিজড়া নিয়ে এনজিওদের গোমড় ফাঁস

স্বীকৃতি দেয়ার পর হিজড়াদের পুনর্বাসন করার জন্য সরকার কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে। তাদেরকে চাকুরী দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। ২০১৫ সালে সত্যিকারের হিজড়ারা যেন সুযোগ পায় সেজন্য হিজড়া শনাক্তকরণে মেডিকেল পরিক্ষা করা হয়। টেস্টে দেখা যায় ঢাকার ১২ জনের মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে[১৩], [১৪]; তারা সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। বাকি একজনও ছিল জন্মগতভাবে সুস্থ পুরুষ, এই টেস্টের বছর দুই আগে স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের লিঙ্গ আর অন্ডকোষ অপসারণ করেছে। এর ফলে তাদের চাকুরি দেয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

এই ঘটনায় দেশের কতিপয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিষাদের ছায়া পড়ে এবং তোলপাড় হয়। তাদেরকে মেডিকেল টেস্ট করার মাধ্যমে অপমান করা হয়েছে, মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে বলে বিবৃতি দেয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো। দুটি জাতীয় মানবাধিকার সংগঠন মেডিকেল টেস্ট বাদ দিতে কোর্টে দাবী জানায়[১৫]। মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য হচ্ছে—

'ডাক্তারি পরীক্ষার নামে হিজড়া লিঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করা হয় এবং অনেক সময় হিজড়ার নামে যে হয়রানি করা হয়, তা যৌন নির্যাতনের শামিল। যেহেতু কোনো নারী বা পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো মেডিকেল পরীক্ষা করতে হয় না, তাদের আত্মপরিচয়ই যথেষ্ট, সেহেতু হিজড়াদের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণেও মেডিকেল পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় হিজড়াদের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণে ডাক্তারি পরীক্ষা বন্ধ করা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে তারা।'

অর্থাৎ, ছেলে ও মেয়ে নির্ধারণে যেমন মুখের কথাই যথেষ্ট, তেমনিভাবে হিজড়াও (তথা ট্রান্সজেন্ডার) পরিচয় হতে হবে। উল্লেখ্য যে, বুয়েট, আর্মি, বিসিএস-এ মেডিকেল টেস্ট করা হয়। কিন্তু এটা নিয়ে মানবাধিকার ইস্যু হয় না, বৈষম্যের প্রশ্ন উঠে না।

LGBTQ+ এর নতুন বয়ানে শব্দজুটি: 'হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার'

হিজড়ার শনাক্তকরণে মেডিকেল টেস্ট, রুপবান ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা হত্যাকান্ড এবং সমকামী আটকের ঘটনায় বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে সমকামী আন্দোলনের গে/লেসবিয়ান এবং এমএসএম মডেল কেন্দ্রিক কার্যক্রম অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠে। অন্যদিকে ২০১৫ সালে আমেরিকায় সমলিঙ্গের বিয়ে বৈধ হওয়ার ফলে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ LGBTQ+ আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০+ বছর ধরে এমএসএম (পুরুষে-পুরুষে যৌন সম্পর্ক) মডেল নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোস্যাল এনজিও 'হিজড়ার মোড়কে ট্রান্সজেন্ডার' মডেল গেলাতে পশ্চিমা ফান্ডিং-এ মিডিয়ায় প্রচুর এক্টিভিজম শুরু করে ২০২১ সাল থেকে। শুরু থেকেই LGBTQ+ আন্দোলনের মিডিয়া ফ্রন্ট—প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং ঢাকা ট্রিবিউনসহ অন্যান্য LGBTQ+ সংগঠনগুলো দাবিতে পরিবর্তন আনে—

* প্রথমত, হিজড়ার পাশাপাশি ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা সামনে আনতে শুরু করে।
* দ্বিতীয়ত, 'হিজড়া কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি।'

লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মোড়কে নতুন শব্দজুটি 'হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার'-এর আবির্ভাব

হিজড়া শব্দকোষ নামক বইয়ে (পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৬) প্রকাশিত তথ্যানুসারে—

'২০১৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ-এ জনশুমারিতে লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় *ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী: প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় কেন জরুরি* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক (এবং টিভি উপস্থাপক) রোবায়েত ফেরদৌস; এ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর দু'শরও বেশি বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকার পরও এ সম্প্রদায় সামাজিকভাবে বর্জিত একটি গোষ্ঠী। এদের জীবন-যাপন দরিদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে পৃথিবীর পশ্চাৎপদ অন্য রাষ্ট্রের মতো যেন দেশেও তারা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা, চাকরি, অভিবাবসন, আইনি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। এর একটি বড় কারণ হলো, তাদের প্রকৃত সংখ্যা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। তাই এই জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্যে আগে একটি নির্ভরযোগ্য শুমারির মাধ্যমে তাদের প্রকৃত সংখ্যা ও বর্তমান জীবনমান সম্পর্কে জানা দরকার।

সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মহাপরিচালক ড. কৃষ্ণা গায়েন, পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক হাবিবুর রহমান, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর পরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ, বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারপার্সন আনিসুল ইসলাম হিরো, নির্বাহী পরিচালক সালেহ আহমেদসহ মানবাধিকার কমিশন ও বিবিএস-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও অন্যান্য বৈচিত্র্যময় লিঙ্গীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনশুমাররিতে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয় মানবাধিকার আযাকটিভিস্টসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি মুক্তপ্রান্ত মতামত পেশ করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সৌসাইটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বলা হয়, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে তথ্য

প্রস্তুত ও প্রদানে বিবিএস-এর দায়বদ্ধতা রয়েছে। সভায় বাংলাদেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সঠিক সংখ্যা ও তাদের জীবনমান সম্পর্কে জানতে এ গোষ্ঠীর ওপর একটি শুমারি পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে রূপান্তরিত নারী বা ট্রান্সওমেন, রূপান্তরিত পুরুষ বা ট্রান্সমেন, ইন্টারসেক্স , রপান্তরকামী, ট্রান্স সেক্স, সজ্জাকামী, বৃহন্নলা—এমন আরো বৈচিত্র্যময় লিঙ্গীয় পরিচয়ের ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে।

বলা হয়, হিজড়া শব্দটি আমাদের সমাজে নেতিবাচকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং এটি ওই ব্যক্তিদের জন্য কখনো কখনো অবমাননাকরও বটে। উপলব্ধ হয়, 'হিজড়া' ঠিক লিঙ্গ নয়; বরং একটি 'সংস্কৃতি'। এজন্য বৈচিত্র্যময় সব লিঙ্গের মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস উক্ত সভায় পৃথিবীর অন্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে নারী ও পুরুষের বাইরে যেসব অন্য লিঙ্গের মানুষ আছে, তাদের জন্য একটি কমন পরিচিতিমূলক শব্দ হিসেবে ইংরেজিতে 'ট্রান্সজেন্ডার' আর বাংলায় 'রূপান্তরিত লিঙ্গ' বা 'রূপান্তরিত' বা কেবল 'রূপান্তর' প্রত্যয় ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রোবায়েৎ ফেরদৌস এই বিষয়টি নিয়ে প্রথম আলো পত্রিকায় কলাম লেখেন (১৮ আগষ্ট, ২০১৯)।

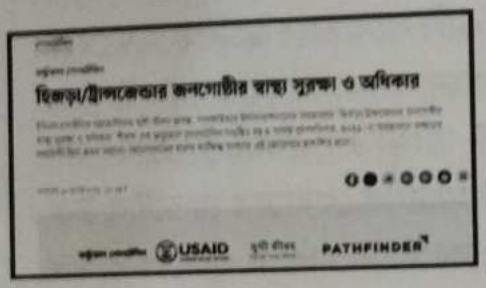
১৯ নভেম্বর ২০১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, জোবাইদা নাসরীন প্রথম আলো'র কলামের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু তুলে ধরেন ('বৈচিত্র্য মেনে নিতে হবে') এভাবে[১৬]-

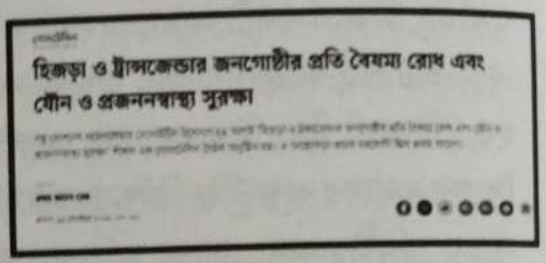
> *'বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে এই মানুষদের 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সরকারি সংজ্ঞানুযায়ী 'এরা জন্মগতভাবে যৌন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের দৈহিক বা জেনেটিক কারণে নারী-বা পুরুষ কোনো শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এবং সমাজে এই জনগোষ্ঠী হিজড়া হিসেবে পরিচিত।'এটি একটি ভুল সংজ্ঞা। 'হিজড়া কোনো পরিচিত নয়, এটি একটি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে কোনো কোনো লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের মানুষ বেড়ে ওঠে।'*

২০২১ সালে বছরের শেষের দিকে প্রফেসর রোবায়েত ফেরদৌস বন্ধু সোস্যাল

আয়োজিত চ্যানেল বাংলা ভিশনে ৫ পর্বের 'ট্রান্সটক' টকশো-তে ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া বয়ান তুলে ধরেন[১৭]।

৫ আগস্ট ২০২১ সালে ইউএসএআইডির সহযোগিতায় সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে *হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অধিকার* শীর্ষক এক ভার্চুয়াল গোলটেবিল অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে সম্প্রচার সহযোগী ছিল প্রথম আলো[১৮]। আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।





বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ২৯ আগস্ট ২০২২ 'হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষা" শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে প্রচার সহযোগী ছিল প্রথম আলো[১৯]।

২০২২ সালের পর থেকে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটিদের মিডিয়ায় হাজির করিয়ে বার বার বলানোর চেষ্টা করে—হিজড়া লিঙ্গ পরিচয় নয়, হিজড়া হচ্ছে সংস্কৃতি। কয়েকটি মিডিয়া, কিছু সুশীল কলাম লেখক এবং এনজিওদের অল্প দিনের প্রচেষ্টায় 'হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার' বয়ান দাঁড়িয়ে গেল। তাদের বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ ছিল না। জনগণের অসচেতনতার সুযোগে পশ্চিমা ফান্ডিং-এ বলীয়ান হয়ে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে আসছে।

LGBTQ+ এক্টিভিস্টরা যেহেতু হিজড়াকে সংস্কৃতি মনে করে, তাই তাদের সংজ্ঞার আলোকে সকল হিজড়া নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু সব ট্রান্সজেন্ডার চাইলেও হিজড়া হতে পারবে না, কেননা হিজড়া হতে হলে দলগতভাবে গুরুর অধীনে বাস করে ভিক্ষা (হিজড়াগিরি) করতেই হবে। এই প্রেক্ষাপটে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে বড় একটি ছাতার মতো, সেখানে 'হিজড়া' আশ্রয় নিতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ট্রান্সজেন্ডাররা

হিজড়া পরিচয় নিতে চায় না, অন্যদিকে অশিক্ষিত হিজড়ারা আবার ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় নেওয়ার ঘোর বিরোধী। সরকারের নিবন্ধের সময় এদেরকে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের নামে পরিচয় করাতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি।

উচ্চবর্ণের ট্রান্সজেন্ডার	নিম্নবর্ণের ট্রান্সজেন্ডার
এরা দলবদ্ধভাবে ঢেরায় বাস করে না, হিজড়াগিড়িও করে না। জাস্ট মনে মনে নারী অনুভূতি হলেই এরা নিজেদের নারী দাবী করতে পারে। এই ক্যাটাগরিতে কোনো কোনো মেয়ে নিজেকে পুরুষও দাবী করতে পারবে। অর্থনৈতিকভাবে এরা তুলনামূলকভাবে অবস্থাসম্পন্ন। এরা এনজিও এবং সুশীল সমাজের মদদপুষ্ট।	এরা হিজড়া কালচারে অভিযোজিত ট্রান্সজেন্ডার (অর্থাৎ এই ধরনের ট্রান্সজেন্ডাররা হিজড়া মহল্লায় বাস করে হিজড়াগিরি করে।
পড়াশোনা এবং চাকরিতে কোটার এরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করা শুরু করেছে। এদেরকে 'এনজিও হিজড়া'-ও বলা যেতে পারে।	এরা অশিক্ষিত ও গরিব। অবহেলিত।

'হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার' শব্দজুটি বয়ানের সুবিধা কী?

বাংলাদেশের LGBTQ+ গোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, বামপন্থীরা চায়—সুস্থ দেহের পুরুষ নিজেকে নারী পরিচয় দিলে সমাজ ও রাষ্ট্রকে তাকে নারী হিসেবে মেনে নিতে হবে। একইভাবে সুস্থ দেহের নারী নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিলেও সমাজ ও রাষ্ট্র সেটা মেনে নিতে হবে। কোনো শারীরিক পরীক্ষা থাকবে না (জর্জ সরোসের স্ব-পরিচয় বা self-ID মতবাদ), কেউ দাবি করলেই সে স্বীকৃতি পাবে। প্রসংগত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন প্রথম আলো পত্রিকায় কলাম লেখেন (৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সালে) *হিজড়া-ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে কেন এত বিতর্ক* শিরোনামে। তিনি মনে করেন—

'ট্রান্সজেন্ডার হলেন তারা, যাদের জন্ম থেকে প্রাপ্ত যৌনপরিচয় ও লিঙ্গীয় পরিচয় এক নয়। যেমন পুরুষ (Male) হয়ে জন্মগ্রহণ করলেই সবাই ম্যান (Man) হবে, তা নয়। পুরুষ (Male) হয়েও কেউ কেউ ওম্যান (Woman) বোধ করতে পারেন। ঠিক একইভাবে নারী (Female) হয়ে জন্মগ্রহণ করেও কেউ নিজেকে ম্যান (Man) ভাবতে পারেন। তাদের অনেকেই (সবাই নয়) হিজড়া সংস্কৃতিতে বড় হয় বলে তাদের হিজড়া বলা হয়[২০]।'

LGBTQ+ নেটওয়ার্ক এবং এই গ্লোবাল এজেন্ডার অর্থদাতা পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান এবং দেশগুলো ভেবেছিল হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদের পথ উন্মোচিত হবে। কিন্তু সরকারীভাবে হিজড়াকে যেহেতু 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তাই এতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো না।

অন্যদিকে একটা ইন্টারেস্টিং অবজার্বেশন খেয়াল করুন—একদিকে 'হিজড়া'-কে লিঙ্গ পরিচয় হিসেবে দেশের LGBTQ+ এক্টিভিস্টরা মানছে না, বলছে, এটা একটা কালচার। অন্যদিকে সরকারের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিতে চাইছে, কিন্তু মেডিকেল টেস্ট তথা শারীরিক পরীক্ষার ঘোর বিরোধী। যেখানে হিজড়াদের স্বীকৃতি দেয়াই হচ্ছে 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হবার কারণে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষা আবশ্যক। কোনো মানুষ যদি অন্ধ বা সাধারণ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক) হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পায়, ভাতা পায়, তাহলে সে আসলেই অন্ধ বা বধির কিনা, তা যাচাই করা জরুরি। কাজেই হিজড়াদের শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে এই আপত্তি একেবারেই অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

হিজড়া শব্দের ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক:

* তাদের প্রতি সমাজে সহানুভূতি রয়েছে, যেহেতু তারা যুগ যুগ ধরে অবহেলিত।
* সমাজ এবং রাষ্ট্র হিজড়াদের লিঙ্গ প্রতিবন্ধী তথা শারীরিক অক্ষম হিসেবে দেখে বা সংজ্ঞায়িত করে।
* হিজড়াদের উপদ্রব (চাঁদাবাজি, দেহব্যবসা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড) নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তবু সমাজ তাদের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কেননা তাদের শারীরিক অক্ষমতা জন্মগত, এই অবস্থার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। এ কারণে উপদ্রব মনে হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সবাই মেনে নিয়েছে। সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।

এ অবস্থায় কোনো সুস্থ মানুষ যদি হিজড়া সংস্কৃতি (ভিক্ষা করা এবং গুরুর অধীনে দলগত বসবাস) ভালোবেসে নিজেকে হিজড়া পরিচয় দেয়, তবে সেই মানুষকে সবাই ধান্ধাবাজ বলবে, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য হিজড়া পরিচয় দিচ্ছে বলে মানুষ মনে করবে।

ট্রান্সজেন্ডার শব্দকে হিজড়ার শব্দের পাশে ব্যবহারে এনজিওরা এত মরিয়া যে কারণে—

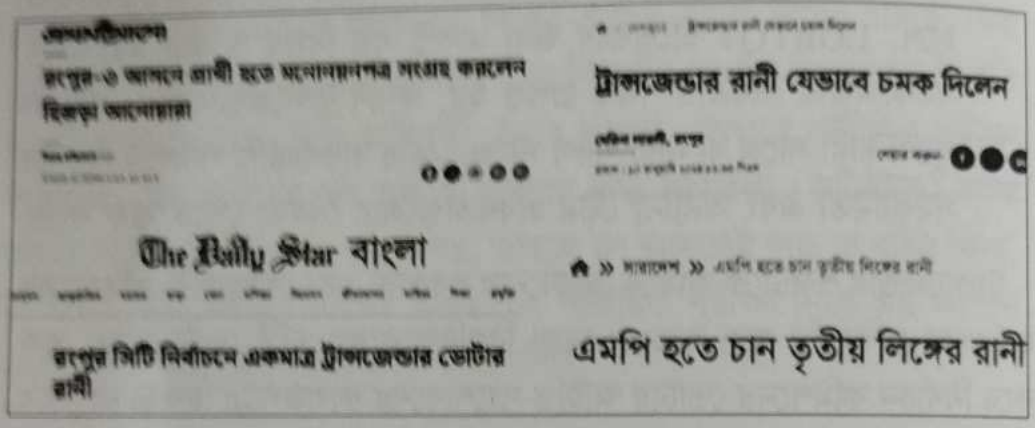
* ট্রান্সজেন্ডার শব্দকে হিজড়ার সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব এবং এটি একাডেমিক্যালি আইসিডিডিআর,বি শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণ মানুষ হিজড়াকে জন্মগত সমস্যা হিসেবে দেখে এবং এর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য সহানুভূতি তৈরি হয়।
* আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকে আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, LGBTQ+ এজেন্ডার জন্য একটি বড় বিজয় অর্জিত হয়। এতে সমকামিতার বৈধতার পথও প্রশস্ত হয়, কারণ ট্রান্সজেন্ডারবাদ—যেখানে পুরুষ নারী সাজে বা নারী পুরুষ সাজে—তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌন প্রবণতাগুলোর বৈধতা পেতে শুরু করে।

ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে আইনে ঢোকানোর সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ফর্মগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কোটা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের ভোটার আইডি সংশোধনের কাগজপত্রে হিজড়া না লিখে ট্র্যান্সজেন্ডার লেখা হচ্ছে।

হিজড়া শব্দের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনে সহানুভূতি আদায়ের কৌশল

২০২৩ সালের সংসদ নির্বাচনে সাধারণ মানুষের আগ্রহ না থাকলেও প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ সব মূলধারার মিডিয়া ট্রান্সজেন্ডার আনোয়ার ইসলাম রানীকে বিশেষভাবে হাইলাইট করেছে। গুগল সার্চ করে দেখা যায়, কয়েকশত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে রংপুর-৩ আসনের নির্বাচন নিয়ে। তিনি একজন সুস্থ পুরুষ, যার নাম ছিল আনোয়ার হোসেন রানা। দেশের LGBTQ+'র মিডিয়া মুখপাত্র প্রথম আলো রানীকে উপস্থাপন করেছে হিজড়া হিসেবে, অন্যদিকে ডেইলি স্টারসহ অন্যান্য মিডিয়া বলেছে ট্রান্সজেন্ডার, তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে। অসচেতন জনগণের কাছে রানী নিজেকে হিজড়া হিসেবে উপস্থাপন করে অবহেলিত হিজড়ার বিশেষ সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে সমকামী অধিকার আন্দোলনে রংপুর বিভাগ বিশেষভাবে জড়িত। বন্ধু সোস্যাল সোস্যাইটির সুপারভিশনের অনেক এনজিও এই অঞ্চলের অভাবী মানুষকে টার্গেট করে

কাজ করছে সমকামিতা প্রচারে। নির্বাচনের পর সংরক্ষিত মহিলা আসনে সাংসদ বানাতেও প্রথম আলোসহ মিডিয়া কাজ করেছে। 'আমি নিজেকে মেয়ে মনে করি'- হাইলাট করে প্রথম আলো ভিডিও প্রচার করেছে[২১]। শুধু তাই নয়, প্রথম আলোর সাংবাদিক মানসুরা হোসাইন, যিনি ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে বিশেষ ফোকাস করছেন, তিনি নির্বাচনের সময় ট্রান্সজেন্ডারদের ভোট দেয়া নিয়ে বড় প্রতিবেদন তৈরী করেছেন। ছেলে এবং মেয়েদের লাইনের পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য কেন আলাদা লাইন নেই, সেই বিষয়টিও বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন[২২]।



পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের সহানুভূতি আদায়ে ট্রান্সজেন্ডারকে হিজড়া হিসেবে দেখানো হয়েছে

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে শরীফার গল্প প্রকাশিত হয়। সেখানে নজরুল ইসলাম ঋতুকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয় প্রথম নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে। এই খবরটি নিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন তৈরী হয়, বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিকীকরণ হচ্ছে, সেই তথ্য দেয়া হয়। নজরুল ইসলাম একজন সুস্থ পুরুষ মানুষ, যিনি ট্রান্সজেন্ডার নারী হয়েছিলেন। তিনি লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিজড়া নন। নজরুল ট্রান্সজেন্ডারের পাশে শাম্মী রানী চৌধুরীকে এক সফল হিজড়া হিসেবে স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ২৫ বছর কাজ করা বন্ধু সোস্যাল এনজিও-এর জনসংযোগ ও যোগাযোগ কর্মকর্তা ঢাকা ট্রিবিউনে *রূপান্তরের দ্বন্দ্ব এবং অদ্ভুত আঁধার এক!* শিরোনামে প্রকাশিত (৩ জানুয়ারী ২০২২) কলামে লিখেছেন—

'গত ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ

নির্বাচনে ঝিনাইদহের ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নজরুল ইসলাম ঋতু। নজরুল ইসলাম ঋতু একজন রূপান্তরিত মানুষ। তিনি নজরুল ইসলাম থেকে ঋতু হয়েছেন। তাই তার এই বিজয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, বিদ্যমান দ্বান্দ্বিক লিঙ্গ কাঠামোর বাইরে এসে নতুনত্ব বা বাস্তবতাকে গ্রহণের এই উদারতা প্রকৃত উন্নয়নের দৃষ্টান্ত। একই সঙ্গে লৈঙ্গিক পরিচয়ের চেয়ে মানবিকতা বড়, বহুর পরে আরও একবার তা প্রমাণিত হলো।

নজরুল ইসলাম ঋতুর জয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো (বিশেষ করে বাংলা গণমাধ্যমগুলো) খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে, যা খুব ইতিবাচক। প্রায় সব গণমাধ্যমেই নজরুল ইসলাম ঋতুকে 'থার্ড জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আমি লক্ষ করেছি, এই গণমাধ্যমগুলোই সংবাদ পাঠক তাসনুভা আনান শিশিরকে নিয়ে লেখার সময় 'ট্রান্সজেন্ডার' লিখে থাকে, আবার কোথাও কোথাও কাউকে 'হিজড়া' হিসেবে উল্লেখ করে। এই ভিন্নতাকে আমি 'জেন্ডার বা লৈঙ্গিক (সামাজিক বিনির্মাণ অর্থে)' ডিসকোর্স থেকে দেখার চেষ্টা করছি।'



যুগান্তর

সর্বশেষ জাতীয় রাজনীতি অর্থনীতি

সারাদেশ

দেশের প্রথম হিজড়া চেয়ারম্যানের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

প্রকাশ: ০৯ জানুয়ারি ২০১৯, ০১:৩১ পিএম





ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অন্যদিকে রানী চৌধুরী বন্ধু সোস্যালের কর্মী যিনি নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় দেন[২৩]। পাঠ্যপুস্তকে এমন বিকৃত তথ্যের সন্নিবেশ করা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পশ্চিমা অর্থায়নে সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোস্যাল এনজিও লবিং করে পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারে হিজড়াদের সহানুভূতি কাজে লাগিয়েছে।

বন্ধু সোস্যাল যে পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ঢুকাতে লবিং করেছিল, তা তারা নিজেদের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। সেই পাঠ্যপুস্তকের নজরুল ইসলাম ট্রান্সজেন্ডার চেয়ারম্যানের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল হয়[২৪]।

দেশে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা কত

লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে হিজড়াদের স্বীকৃতি দেয়ার আগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তাদের সংখ্যা নিয়ে জরীপ করে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা প্রায় ৯২৮৫ জন[২৫]। বিবিসি'তে প্রকাশিত বেসরকারী রিপোর্টে ২০১৩ সালে হিজড়া সংখ্যা ১৫,০০০ [২৬]। বিখ্যাত থমসন রয়টার ফাউণ্ডেশনের মিডিয়া এবং স্কিলডস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রতিবেদন অনুসারের হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা ৫ লক্ষের মতো[২৬]।

বাংলাদেশে সমকামী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৮-২০২১ সালের আমেরিকার USAID-এর সাড়ে ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার ($৮,৫০,০০০) বন্ধু সোস্যালকে ফান্ডিং করে। প্রকল্পটির নাম হচ্ছে "Rights for Gender Diverse Populations (RGDP)"। এই প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে জাতীয় আদমশুমারিতে তৃতীয় লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি করা হয়। এটি ছিল ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের আইনি ও সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রজেক্টের অংশ হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের ড্রাফট বন্ধু সোস্যালের পক্ষ থেকে সরকারকে দেয়া হয়েছিল। সেটি ২০২৪ সালে সংসদে পাশ হওয়ার কথা ছিল।

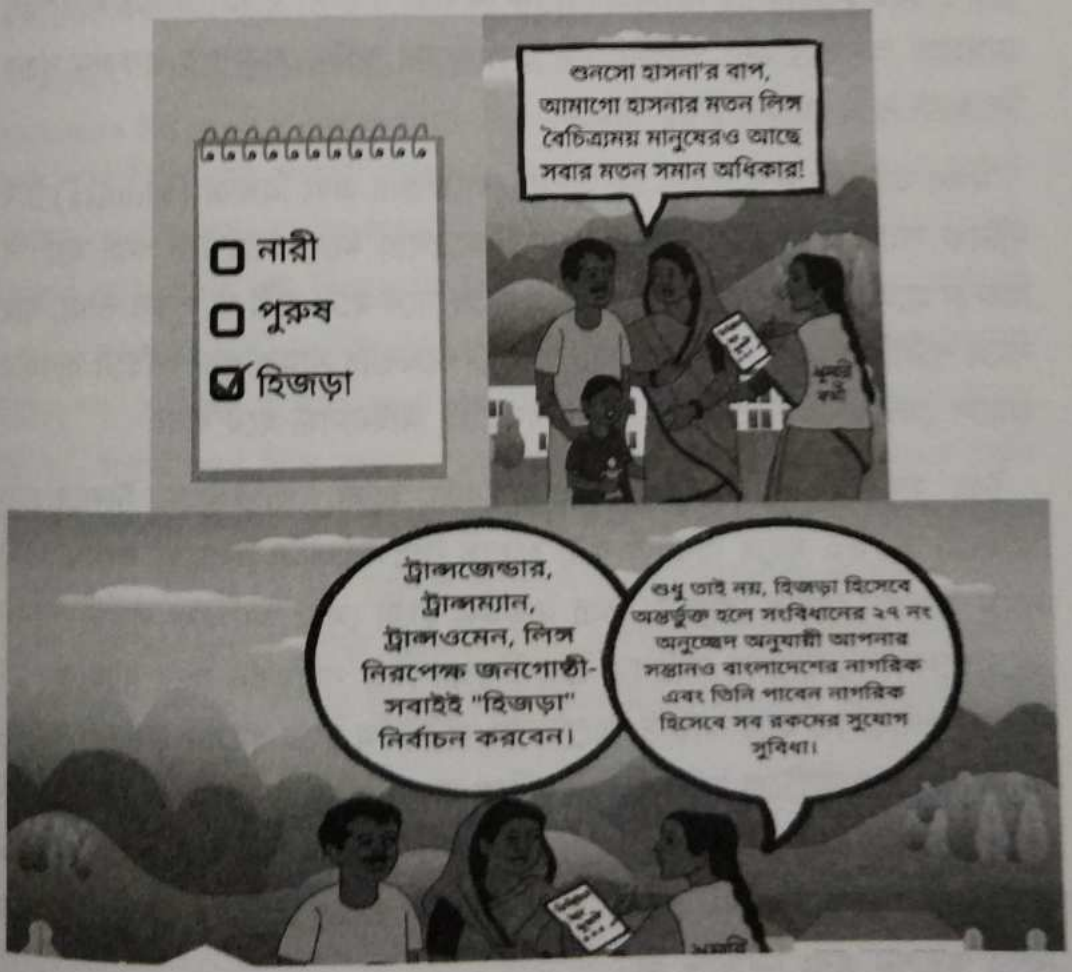
বন্ধু সোস্যালের প্রজেক্ট হিসেবে জনশুমারিতে ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া অন্তর্ভুক্ত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর রোবায়েত ফেরদৌস ধারণাপত্র তৈরী করে প্রেজেন্টেশন দেন ২০১৮ সালে, যেখানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), এনজিও ব্যুরো, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের টপমোস্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এর ফলো-আপ হিসেবে ৭ মার্চ ২০১৯ বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে জনশুমারিতে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ভাবনা ও মতামত গ্রহণের জন্য আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভাতেও সিদ্ধান্ত হয়—

'জনশুমারি বিভিন্ন সার্ভে বা অফিসিয়াল বিভিন্ন ফরমে লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষ ও নারী-এর পাশে রূপান্তর/রূপান্তরিত নামে একটি ঘর থাকবে। রূপান্তর/রূপান্তরিত- এর সাধারণ বা পরিচিতিমূলক কমন নামের সাথে বিভিন্ন সাব-ক্যাটাগরি যেমন : ট্রান্সম্যান, ট্রান্সওমেন এবং হিজড়া শব্দগুলো থাকবে' (হিজড়া শব্দকোষ, পৃষ্ঠা ১৭৯)।

একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে জাতীয় জনশুমারীতে ট্রান্সজেন্ডারের অধীনে হিজড়া, ট্রান্সওমেন, ট্রান্সম্যান ফর্মে থাকার কথা ছিল। কিন্তু অবশেষে জরীপ ফর্মে শুধু হিজড়া অপশন রাখা হয়। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মূলে সম্ভবত হিজড়া সহানুভূতির ব্যাপারটি শেষ মুহূর্তে বিবেচনা করে ফর্মে শুধু হিজড়া লেখা হয়।

২০২২ সালের জনশুমারিতে প্রাথমিক প্রতিবেদনে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা বলা হয়েছিল ১২৬২৯ জন[২৮], কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিবেদনে (প্রকাশনা তারিখ নভেম্বর ২০২৩) এই সংখ্যা হচ্ছে ৮,১৪২ জন[২৯]।

২০২২ সালের জনশুমারিতে ট্রান্সজেন্ডাররা যেন হিজড়া হিসেবে নিবন্ধন করে



সেজন্য বন্ধু সোস্যালসহ আরো কিছু এনজিও মাঠ পর্যায়ে প্রচারণা চালায়। মোদ্দা কথা বাংলাদেশে সব ট্রান্সজেন্ডার হিজড়া হিসেবে জরীপে অংশ নেয়। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার সংখ্যা নিয়ে একটা হাইপ LGBTQ+ গোষ্ঠী তৈরী করেছিল।

পাকিস্তান কেস স্টাডি: হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মারপ্যাঁচে সৃষ্ট অস্থিরতা

হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মাঝে মারপ্যাঁচ অনুধাবন করতে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনা ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে। পাকিস্তানে হিজড়া (খুনসা/খাজা সিরা) সম্প্রদায়কে ২০০৯ সালে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় LGBTQ+ অ্যাক্টিভিস্ট এবং লিবারেল মিডিয়ার সহায়তায় ২০১৮ সালে 'ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন' সংসদে বিনা বিরোধিতায় পাশ হয়[৩০]। আইনটি পাশ হওয়ার পর যখন বিশ্ব মিডিয়া পাকিস্তানকে ট্রান্সজেন্ডার আইনটি সবচেয়ে উদারপন্থী (Most progressive) হিসেবে ব্যাপক প্রশংসা শুরু করে, ঠিক তখনই ইসলামপন্থি সংসদ সদস্যদের টনক নড়ে ওঠে। এজন্য অনেক পার্লামেন্ট মেম্বাররা অনুতপ্ত হন। পাকিস্তানের ট্রান্সজেডার আইন অনুসারে একজন পুরুষ নিজেকে নারী ঘোষণা দিতে পারবে।

যখন আইনটি পাশ করার হয় তখন ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া (khunsa) টার্ম দুটিকে সমার্থক হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার আমব্রেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়[৩১]! হিজড়া হচ্ছে জন্মগত আর ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে মনে মনে নারী বা পুরুষ ভাবা, যার সাথে শারীরিক ত্রুটি সম্পর্কিত নয়। তাই ট্রান্সজেন্ডার নামক শব্দ আইনে ব্যবহার করলে জেন্ডার আইডেন্টিটির পুরো বিষয়টিই আইনসিদ্ধ হয়ে যায়।

বৈধ সমকামী বিয়ে! দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার আইনটি ২০২০ সালে ব্যবহার করা হয়েছে বৈধ সমকামী বিবাহে। আসমা বিবি নামে একজন মহিলা শিক্ষিকা তার একজন ছাত্রী নেহা আলিকে লালন-পালন করেছিলেন[৩২]। তারপর আইনত তার নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে বাহ্যিকভাবে পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে আইডি কার্ডে নাম পরিবর্তন করে রাখেন আকাশ আলি। এভাবে সেই ছাত্রীটিকে 'আইনিভাবে' বিয়ে করার অনুমতি দেয়। এই লেসবিয়ান বিয়ে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠে। অবশেষে নেহা আলির বাবা রাওয়ালপিন্ডি হাইকোর্টে মামলা করেন। পরবর্তীকালে আকাশ আলি আইনত মহিলা হিসেবে ফিরে আসেন এবং নিখোঁজ হয়।



ছবি: ট্রান্সজেন্ডার আইন ব্যবহার করে পাকিস্তানে লেসবিয়ান বিয়ে। বাম পাশের ছবির মেয়েটি ট্রান্সজেন্ডার 'পুরুষ' দাবী করে নিজের ছাত্রীকে পাকিস্তানের ট্রান্সজেন্ডার আইন অনুসারে বিয়ে করেছিল।

ভাবা যায়! পাকিস্তানের মতো রক্ষণশীল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে এমন ঘটনা ঘটেছে শুধু শব্দের মারপ্যাঁচে। বিলটির খসড়া রহস্যময় 'আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের' দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং জাতীয় পরিষদ ও সিনেট দ্বারা বেশ তাড়াহুড়ো করে পাস হয়েছিল। ঘাটাঘাটি করে জানা যায়, এই আইনটির ড্রাফট তৈরীতে আমেরিকার ইউএসএইড জড়িত ছিল (USAID helped to draft a National Strategic Framework for transgender protection and political inclusion through a consultative process with all stakeholders.....)[৩৩]। পরবর্তীতে সেই সংস্থাটি বাংলাদেশেও ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরিতে জড়িত হয়। রহস্যজনকভাবে সেই সময়ে মূলধারার রাজনৈতিক দলের কোনো প্রতিনিধিও এই বিলের বিরোধিতা করেননি। সিনেটর মহসিন আজিজ ২০১৮ সালে আইনটি অনুমোদনের সময় বিরোধিতা না করার জন্য অনুশোচনা করেন[৩৪]। আজিজ বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আইনে সংশোধনী আনা উচিত'; সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'যত বিলম্ব হবে, আল্লাহর গজব তত বেশি হবে।' অবশেষে দীর্ঘ ৫ বছর আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গত বছর (২০ মে ২০২৩) 'ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন' বাতিল করে সেখানে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের পরিবর্তে খুনসা (ইন্টারসেক্স) শব্দ যুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়[৩৫]। একজন সত্যিকারে হিজরা তথা জন্মগত সমস্যা আছে কিনা, তা প্রমাণে আদালত মেডিকেল টেস্ট বাধ্যতামূলক করে।

হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দের স্পষ্ট পার্থক্য জানা জরুরী

হিজড়া	ট্রান্সজেন্ডার
* হিজড়া জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল সমস্যা, ল্যাব টেস্ট করে এটি প্রমাণ করা যায়। * খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি ৫০০০-১০,০০০ শিশুর একজন হিজড়া হতে পারে।	* এই পরিচয় হচ্ছে আত্ম-অনুভূত মানসিক অবস্থা, যার সাথে জন্মগত লিঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই। একজন ছেলে বা মেয়ে নিজেকে 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে' বলে মনে করে। * ল্যাব টেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না। এটা স্ব-ঘোষিত ব্যাপার (self-identified)
* অস্পষ্ট বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি, এমনকি ২০-২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন হতে পারে। * প্রকৃত মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকা কেউ পুরুষ (জেনেটিক) হিসেবে শনাক্ত হতে পারে, যখন বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাসিক বা রক্তস্রাব শুরু হচ্ছে না। * হরমোন বা সার্জারী করে পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষ হওয়া যায় না, যারা সন্তান জন্ম দিতে পারে।	* শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন (যেমন- পুরুষ থেকে নারীর নাম), সর্বনাম পরিবর্তন (He থেকে She, অথবা They), বেশভূষা পরিবর্তন করে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দেয়া যায়। * সার্জারী করে জরায়ু বানানো যায় না, আবার কার্যকরি পেনিসও তৈরী করা যায় না যা দিয়ে বীর্যপাত হয়। * মেডিকেল চিকিৎসার মাধ্যমে বাহ্যিক কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও ৯৭% এর ট্রান্স নারীর পেনিস থাকে, ট্রান্স পুরুষের যোনি থাকে। * যৌনতায় সমকামী, উভয়কামী।

ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন

বন্ধু সোশ্যালের উদ্যোগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতায় আমেরিকার (ইউএসএইড) ফান্ডিং-এ ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত হয় ২০২১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে (বন্ধু সোশ্যালের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১)।

২০২২ সালের ১০ মার্চ নিউজ বাংলা ২৪ *ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন* এই শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপে

'উপপরিচালক রবিউল ইসলাম (জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) বলেন, 'ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতের জন্য ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য এই জনগোষ্ঠী ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী মাসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সবার মতামত নিয়ে একটি আইন তৈরি করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর এটি সংসদে উপস্থাপন করা হবে। তারপর বাস্তবায়ন করা হবে।'

২০২৩ সালের ২১ সেপ্টম্বরে আমার কাগজ পত্রিকায় *ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে* শিরোনামে উল্লেখ করা হয়—

'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।'

৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ইত্তেফাক পত্রিকা *সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা* প্রতিবেদনে উল্লেখ করে—২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাশ করা হবে, নতুন সরকারের (৭ জানুয়ারী নির্বাচনের পর) প্রথম সংসদ অধিবেশনের আইনটি পাস করানোর জন্য প্রথম অধিবেশনে উঠানো হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়—

'*ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩* শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করারা জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার চায় এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় হোক। তাই এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।'

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনটির খসড়া তারা প্রস্তুত

করেছে বলে দাবী করলেও আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে বন্ধু সোশ্যাল। ২০২৪ সালে জানুয়ারী মাসে আমেরিকার নির্বাচনী প্রচারণার সময় মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা এবং ফ্লোরিডার রাজ্যের গভর্নর রন ডিস্যান্টিস বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে আমেরিকার জনগণের দেয়া ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করছে। ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাত দিয়ে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন সেখানে বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার বাস্তবায়নের বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে তারা সহায়তা দিচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথমবারের মতো তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া)-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত করা হয়েছে। ইউএসএইডের প্রতিবেদন, 'Final Perfromance Evaluation for Rights for Gender Diverse Populations (RGDP) Activity'-এ এই তথ্য ডকুমেন্টশন করা হয়েছে (বইয়ের শেষে QR Code এর মাধ্যমে গুগল ড্রাইভের লিংক থেকে ভিজিট করে ইউএসএইড এর রিপোর্টসহ বন্ধু সোশ্যালের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো সংগ্রহ করা যাবে)।

৫ আগস্ট ২০২১ প্রকাশিত ইউএসএইড সেই প্রকল্পকে হাইলাইট করতে প্রকাশিত প্রতিবেদন *5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World*-এ তৃতীয় লিঙ্গ এবং ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা খসড়া আইনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে—

'The program also strengthened nine CSOs (Civil Society Organizations) across Bangladesh and convened stakeholders, including human rights activists, journalists, medical professionals, and religious leaders. Through these efforts, the National Human Rights Commission agreed to include a third gender option in Bangladesh's 2021 National Census for the first time. Civil society participants in the Rights for Gender Diverse Populations also submitted a draft Transgender Law to the National Human Rights Commission to increase protections and other rights for gender diverse people.'

বন্ধু সোশ্যাল ২০২২-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে (পৃ. ৯) বলা হয়েছে—

'সমাজসেবা অধিতফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধু সোশ্যালের সাথে কলাবোরেশন করে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে।'

মোদ্দাকথা, বাংলাদেশের বন্ধু সোস্যাল এলজিবিটি বৈশ্বিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজ করছে।

'সমতার' নামে LGBTQ+ নীলনকশা: সহযোগিতায় বন্ধু সোশ্যাল

বাংলাদেশে সমকামিতার প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে আমেরিকার USAID। সমতা (Equity) প্রজেক্ট হচ্ছে USAID এর একটি পাঁচ বছরব্যাপী চলমান (২০২২-২০২৭) প্রজেক্ট যার বাস্তবায়নে রয়েছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি[১]। এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: *Promoting Gender Diverse Population (GDP) tolerance towards building an inclusive society in Bangladesh.* ওয়ার্ক প্ল্যানের ভূমিকাতেই বলা হয়েছে: Gender Diverse Populations (GDPs) herein after referred as LGBTQI+ community elsewhere in the world.... ।

তার মানে, GDP বলতে LGBTQ-কে তথা সমকামী গোষ্ঠীকেই বুঝানো হচ্ছে। আর একথা এখন আর অজানা নয় যে, inclusive society বা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বলতে সেই সমাজকেই বোঝায়, যে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমকামীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে তথা সমকামী-বান্ধব সমাজ। কাজেই সোজা কথায় বলা যায় সমকামীদের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি সমকামী-বান্ধব সমাজ গড়ে তোলাই এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য।

৮টি বিভাগীয় শহরেই তাদের এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা এবং উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় সমকামী জনগোষ্ঠীকেও এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ৮টি বিভাগীয় শহরের বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রিটারির সহায়তায় এর সদস্যদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যাতে করে বার এসোসিয়েশন সদস্যদের সমকামী গোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীল করা যায় এবং তাদের মাধ্যমে সমকামী গোষ্ঠী আইনী সহায়তা পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে হিজড়াদের দেখিয়ে ট্রান্সজেন্ডারের মাধ্যমে সমকামিতা নিয়ে কাজ করছে।

নতুন সহকারী জজদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র JATI (Judicial Administration Training Institute)-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়

যার উদ্দেশ্য JATI-এর ট্রেনিং কারিকুলামে LGBT ইস্যুটি ঢুকিয়ে দিয়ে নতুন সহকারী জজদের সমকামীদের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা।

NLASO (National Legal Aid Services Organization) বা জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সহযোগিতায় সংস্থার ৬৪টি জেলা কমিটি তথা DLAC (District Legal Aid Committee)-র অফিসারদের সাথে জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যেন DLAC অফিসারদের সমকামী গোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীন করে আইনী সহায়তা লাভের পথ সুগম করা যায়।

বিভাগীয় পর্যায়ে লিগ্যাল এইড ক্লিনিক তথা ক্যাম্প আয়োজনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এজন্য ড্রপ-ইন-সেন্টার (DIC) অথবা CBO (Community Based Organization) ও SHG(Self Help Group) সমূহের নিরাপদ পরিসরকে বেছে নেওয়া হয়।

৬৪ জেলায় ওয়াচডগ গ্রুপকে পুনর্গঠন ও সক্রিয়করণের পাশাপাশি বন্ধু সোশ্যালের লিগ্যাল হেল্পলাইন 'আইন-আলাপ'-এর মাধ্যমে সমকামী গোষ্ঠীকে আইনী সহয়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সরকারী ও বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যাতে বিশেষ প্রয়োজনে সমকামীদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা যায়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে এডভোকেসি মিটিং করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যাতে করে সমকামীদের সাংস্কৃতিক দল 'Essene of Soul'-কে সরকারের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে মূলধারার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিয়ে এসে সমকামী গোষ্ঠীর পক্ষে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।

বন্ধু সোশ্যাল একদিকে প্রেসার গ্রুপ সৃষ্টির লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম যথা- APFSD, UPR, Regional Flora, ILGA, CEWAD ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে, যার ফলশ্রুতিতে এসব ফোরাম LGBT ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণীতে বিশেষ দৃষ্টি দেবার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও 'ট্রান্সজেন্ডার আইন' পাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কনসালটেশন মিটিং করে ট্রান্সজেন্ডার আইন ত্বরান্বিত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (MOWCA) সাথে এডভোকেসি মিটিং করে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় LGBT

অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়ার্ক প্ল্যানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষত আলিমদের প্রতিবাদকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সেটি মোকাবেলা করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে বন্ধু সোশ্যালের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যাতে তাদের সহযোগিতায় আলিমদেরকে লিঙ্গবৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী তথা সমকামীদের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা যায়।

কার্যক্রম	LGBT সহায়তায় প্রত্যাশিত অভিমুখীকরণ	LGBT অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ
LGBT দের আইনী সহায়তা বৃদ্ধিকল্পে মিটিং ৮ বিভাগের বিভাগীয় আইনজীবী সমিতির সদস্যদের সাথে মিটিং	৮০ জন আইনজীবি	-
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা (NLASO)-এর মাধ্যমে ৬৪টি জেলা কমিটি (DLAC) এর সদস্যদের সাথে মিটিং	২০ জন DLAC অফিসার	-
ZATI (জুডিশিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট)-এর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন (ZATI নতুন সহকারী জজদের ট্রেনিং সেন্টার)	১৫ জন নতুন সহকারী জজ	ZATI ট্রেনিং কারিকুলামে LGBT অন্তর্ভুক্তকরণ
প্রেসার গ্রুপ সৃষ্টির লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম যথা- APFSD, UPR, Regional Flora, ILGA, CEWAD ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ	-	LGBT ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণীতে বিশেষ দৃষ্টি দেবার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও 'ট্রান্সজেন্ডার আইন' পাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়(MOWCA)-এর সাথে এডভোকেসি মিটিং	১০ জন গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ	জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় LGBT অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কনসালটেশন মিটিং	১০ জন গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ	ট্রান্সজেন্ডার আইন ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ

References

1. Star Weekend Magazine (Pushing Boundaries). https://archive.thedailystar.net/magazine/2007/08/02/sfeature.htm
2. Admin, N. N. The Story of Dhee. The Daily Star https://www.thedailystar.net/the-star/human-rights/the-story-dhee-140974(2015).
3. Online, N. First local magazine for gays launched. The Daily Star https://www.thedailystar.net/first-local-magazine-for-gays-launched-7611 (2014).
4. Rashid, S. F., Standing, H., Mohiuddin, M. & Ahmed, F. M. Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh. Health Research Policy and Systems 9, S12 (2011).
5. সরকারচিররঞ্জন. 'সমকামী' সন্দেহে আটক ২৭ তরুণের ভবিষ্যৎ তাহলে কী? চ্যানেল আই অনলাইন https://www.channelionline.com/সমকামী-সন্দেহে-আটক-২৭-ত/ (2017).
6. Hossain, A. Section 377, Same-sex Sexualities and the Struggle for Sexual Rights in Bangladesh. Australian Journal of Asian Law 20, 1–11 (2019).
7. কালবেলা. হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অস্পষ্টতায় দেশে ভয়াবহ বিপর্যয়ের ঝুঁকি | কালবেলা. কালবেলা | বাংলা নিউজ পেপার https://www.kalbela.com/opinion/sub-editorial/39283.
8. ঢাকায় সমকামী ক্লাব. মানবজমিন https://mzamin.com/article.php?mzamin=107312.
9. Stephen Whittle: "The Yogyakarta Principles provide guidance and are a constant reference point" | Heinrich Böll Stiftung. https://www.boell.de/en/2016/07/20/yogyakarta-principles-provide-guidance-and-are-constant-reference-point.

10. Yogyakarta Principles. Wikipedia (2024).

11. How Sunil Pant ignited a queer rights movement in Nepal. https://caravanmagazine.in/reportage/spark.

12. Siddiqi, D. M. Sexuality, rights and personhood: tensions in a transnational world. BMC Int Health Hum Rights 11, S5 (2011).

13. Hossain, A. The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh. Culture, Health & Sexuality 19, 1418–1431 (2017).

14. ডাক্তারি পরীক্ষার পর ১২ 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত. BBC News বাংলা https://www.bbc.com/bengali/news/2015/07/150701_sa_bd_hijra_job_controversy (2015).

15. হিজড়াদের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণে প্রয়োজনে ডাক্তারি পরীক্ষা. Bangla Tribune https://shorturl.at/4awFs

16. বৈচিত্র্য মেনে নিতে হবে | প্রথম আলো. https://shorturl.at/itthS

17. ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে বন্ধু'র বিশেষ আয়োজন | Trans Talk | Ep 01. (2021).

18. ডেস্কপ্রথম আলো. হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অধিকার. Prothomalo https://www.prothomalo.com/roundtable/হিজড়াট্রান্সজেন্ডার-জনগোষ্ঠীর-স্বাস্থ্য-সুরক্ষা-ও-অধিকার (2021).

19. ডেস্কপ্রথম আলো. হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষা. Prothomalo https://www.prothomalo.com/roundtable/ei1f8vpteg (2022).

20. হোসাইনমানসুরা. হিজড়া-ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে কেন এত বিতর্ক. Prothomalo https://www.prothomalo.com/bangladesh/g0fgxhhtxn (2024).

21. (148) 'আমরাও নিজেদেরকে মহিলা দাবি করি' | Anowara Islam Rani - YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qoO4x98hQLg&t=11s.

22. হোসাইনমানসুরা. তানিশা–আরিফা–পার্বতীরা নিজের পরিচয়ে এবারই প্রথম ভোট দিলেন. Prothomalo https://www.prothomalo.com/bangladesh/r1y8b4g916 (2024).

23. সংসদ সদস্য হতে যাচ্ছে হিজড়া রানী চৌধুরী | Rani Chowdhury | Transgender Rani | রানী | ট্রান্সজেন্ডার. (2021).

24. দেশের প্রথম হিজড়া চেয়ারম্যানের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল. https://www.jugantor.com/index.php/country-news/759889.

25. দেশে হিজড়ার সংখ্যা ৯৮৯২ | প্রথম আলো. ln.run/pUjn2

26. বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠী. BBC News বাংলা https://www.bbc.com/bengali/multimedia/2013/07/130728_fp_bd_hizra (2013).

27. From the fringes to the margins: The Hijra dilemma | The Business Standard. https://www.tbsnews.net/features/panorama/fringes-margins-hijra-dilemma-534046.

28. দেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ১২৮২৯ জন, jagonews24.com https://www.jagonews24.com/national/news/846398.

29. Population-and-Housing-Census - বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. https://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/Population-and-Housing-Census.

30. National Assembly passes bill seeking protection of transgender rights - Pakistan - DAWN.COM. https://www.dawn.com/news/1406400.

31. Activists Aghast As Pakistan Rights Panel Seeks To Replace 'Transgender' With 'Khunsa'. https://www.outlookindia.com/international/acivists-aghast-as-pakistan-s-human-rights-standing-committee-replaces-transgender-with-khunsa-in-the-transgender-bill-news-262608.

32. Batool, Z. Asma Bibi's Claim To Be A Boy Is 'Fake' - Divorces Wife Instead Of Proving Gender. Parhlo https://www.parhlo.com/asma-bibi-divorces-wife/ (2020).

33. USAID/PAKISTAN GENDER AND SOCIAL INCLUSION FACT SHEET.

34. Senate chairman refers proposed amendments in transgender rights' act to standing committee for debate - Pakistan - DAWN.COM. https://www.dawn.com/news/1712074/senate-chairman-refers-proposed-amendments-in-transgender-rights-act-to-standing-committee-for-debate.

35. FSC strikes down transgender law for being 'against Islam' - Pakistan - DAWN.COM. https://www.dawn.com/news/1754516/fsc-strikes-down-transgender-law-for-being-against-islam.

বাংলাদেশের মিডিয়া এবং ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি প্রকল্প

ট্রান্সজেন্ডারময় মিডিয়া

বাংলাদেশে LGBTQ+ আন্দোলনে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তিনটি গণমাধ্যম (প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং ঢাকা ট্রিবিউন) সরাসরি জড়িত। এরা সুপরিকল্পিতভাবে লিঙ্গবৈচিত্র্য (ট্রান্সজেন্ডারবাদ) এবং সমকামিতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে। ব্র্যাক এবং পশ্চিমা দাতা সংস্থার তত্ত্বাবধায়নে সাংবাদিকতায় জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি গ্রহণে ট্রেইনিং, গোলটেবিল বৈঠক, অধিকার বঞ্চিতদের মোড়কে ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি তৈরীর মাধ্যমে LGBTQ+ আন্দোলন অনেক দূর এগিয়েছে। এটা বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য যে, মিডিয়ার পার্টনারশীপে দেশের হাতেগোনা কয়েকজন বুদ্ধিজীবী (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর) এবং এনজিও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের ড্রাফট প্রস্তুত করে ২০২৩ সালে। গত নির্বাচনের আগে গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল যে, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই (২০২৪) ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে এবং এই বছরের শেষ নাগাদ সেটি বাস্তবায়নের কাজও শুরু হবে[১]।

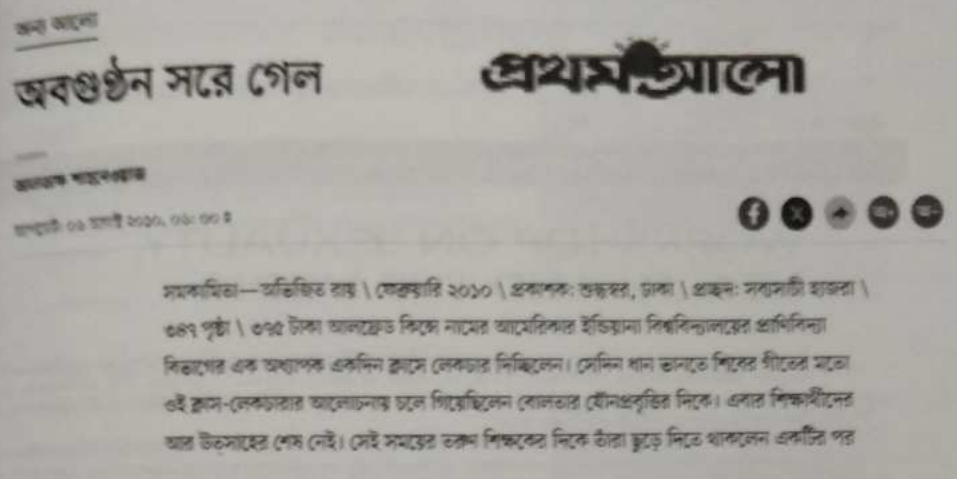
প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার একই পাবলিকেশন হাউজ থেকে প্রকাশিত একই মতাদর্শের বহুল প্রচারিত নিউজ পেপার। মজার ব্যাপার হচ্ছে LGBTQ+ নিয়ে রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে পত্রিকা দুটি নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। ডেইলি স্টার-এর টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে সমাজের এলিট অংশ এবং পশ্চিমা বিশ্ব। এটা ২০০৭ সাল থেকেই সরাসরি LGBTQ+, হোমোসেক্সুয়ালিটি, গে, লেসবিয়ান শব্দগুলো প্রতিবেদনে ব্যবহার করে আসছে।

ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার রক্ষায় আইন হচ্ছে

রাবেয়া বেগী
প্রকাশ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০২:৫৫



অন্যদিকে প্রথম আলো LGBTQ-এর বাংলা শব্দ, যেমন- সমকামিতা, পায়ুসংগম ইত্যাদি শব্দ পরিহার করতে যথেষ্ট যত্নবান ছিল। তারা জানে, এই শব্দগুলো ব্যবহার করে সমকামিতা প্রচার করতে গেলে জনগণের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এটির অনলাইন আর্কাইভে সুনির্দিষ্ট শব্দ দিয়ে সার্চ করলে আপনি নিজেই প্রমাণ করতে পারবেন। প্রথম আলোর অনলাইন পোর্টালের আর্কাইভ সিস্টেমে ২০০৯ সালের আগের তথ্য পাওয়া যায় না, কেননা তাদের নতুন সিস্টেম শুরু হয়েছে এই সময়ে। পত্রিকাটি ২০০৯ সালে 'সমকামিতা' শব্দ প্রথম ব্যবহার করলেও তা বাংলাদেশ-সংক্রান্ত কোনো বিষয় ছিল না; পশ্চিমা বিশ্বের খবর হিসেবে সেই শব্দ এসেছে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথম আলো টিম নিজেদের আবেগ আর ধরে রাখতে পারেনি। ২০১০ সালে প্রকাশিত মুক্তমনা অভিজিত রায়ের 'সমকামিতা' বইটির মার্কেটিং করেছে তারা, সাহিত্য পর্যালোচনা নামে সেই বইটির খবর দেশের লক্ষ লক্ষ ঘরে পৌঁছে দিয়েছে প্রথম আলো[২]!



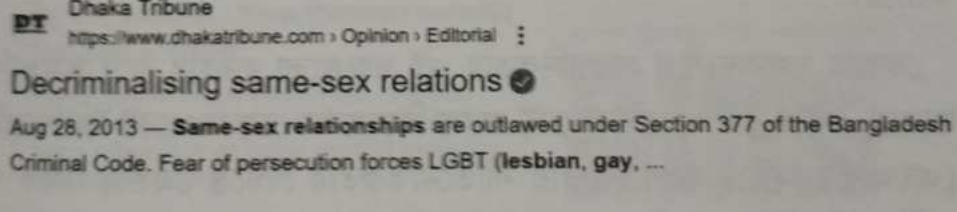
প্রথম আলো

অবগুণ্ঠন সরে গেল

সমকামিতা—অভিজিৎ রায় \ ফেব্রুয়ারি ২০১০ \ প্রকাশক: শুদ্ধস্বর, ঢাকা \ প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা \ ৩৪৭ পৃষ্ঠা \ ৩৭৫ টাকা আলফ্রেড কিন্সে নামের আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের এক অধ্যাপক একদিন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। সেদিন ধান ভানতে শিবের গীতের মতো ওই ক্লাস-লেকচারার আলোচনায় চলে গিয়েছিলেন বোলতার যৌনপ্রবৃত্তির দিকে। এবার শিক্ষার্থীদের আর উৎসাহের শেষ নেই। সেই সময়ের তরুণ শিক্ষকের দিকে তাঁরা ছুড়ে দিতে থাকলেন একটির পর

ডেইলি স্টার এবং ঢাকা ট্রিবিউন শুরু থেকেই LGBTQ+, হোমসেক্সুয়ালিটি সরাসরি প্রমোট করছে। ডেইলি স্টার ২০০৭ সালে 'Pushing Boundaries' নামে সমকামী অধিকারের বিষয়টি স্পেশাল প্রতিবেদন করেছে।

২৮ আগস্ট ২০১৩ সালে ঢাকা ট্রিবিউন সমকামিতা নিরাপদকরণ করতে প্রথম কোনো গণমাধ্যম, যা সম্পাদকীয় বিবৃতি ছেপেছে[৩]।

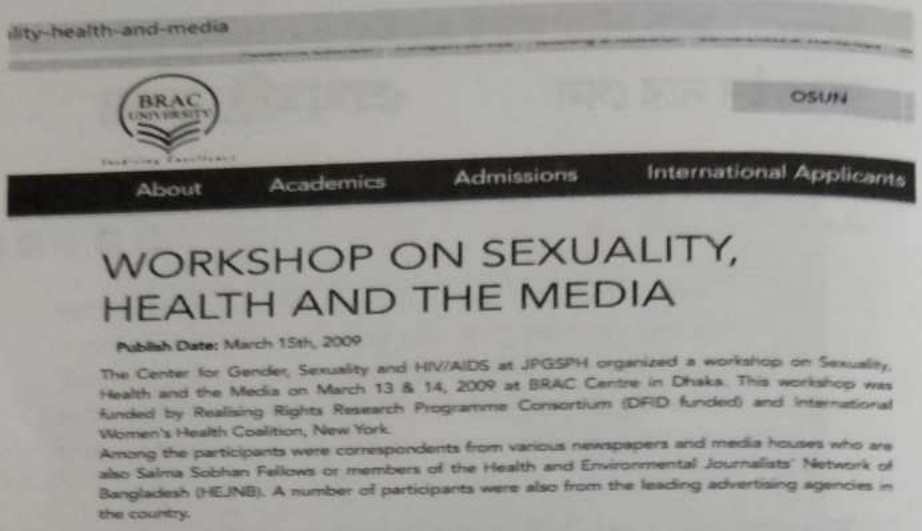


DT Dhaka Tribune
https://www.dhakatribune.com › Opinion › Editorial

Decriminalising same-sex relations

Aug 28, 2013 — **Same-sex relationships** are outlawed under Section 377 of the Bangladesh Criminal Code. Fear of persecution forces LGBT (**lesbian**, **gay**, ...

গণমাধ্যম সমকামী অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের উদ্যোগ। LGBTQ+ ইস্যুটি গণমাধ্যমে কীভাবে উপস্থাপন করা উচিত, তা নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ স্কুল সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ২০০৯ সালে। 'রিয়েলাইজিং রাইটস' (২০০৫-২০১০) প্রকল্পের মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এমনকি সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়ার কৌশলও যে বেশ কার্যকরী, তা তারা জার্নালে আর্টিকেল ছেপে জানিয়েছে[৪]।



ility-health-and-media

BRAC UNIVERSITY

OSUN

About Academics Admissions International Applicants

WORKSHOP ON SEXUALITY, HEALTH AND THE MEDIA

Publish Date: March 15th, 2009

The Center for Gender, Sexuality and HIV/AIDS at JPGSPH organized a workshop on Sexuality, Health and the Media on March 13 & 14, 2009 at BRAC Centre in Dhaka. This workshop was funded by Realising Rights Research Programme Consortium (DFID funded) and International Women's Health Coalition, New York.

Among the participants were correspondents from various newspapers and media houses who are also Salma Sobhan Fellows or members of the Health and Environmental Journalists' Network of Bangladesh (HEJNB). A number of participants were also from the leading advertising agencies in the country.

LGBTQ+ মুভমেন্টের সফলতায় সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে ভাষা। জেন্ডার সংবেদশনশীল সাংবাদিক তৈরী করতে বিদেশী দাতা সংস্থা, এনজিওরাও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে অনেক বছর ধরে। অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও পশ্চিমা দেশগুলো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসেবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষার প্রচলন শুরু করেছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমও লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দের ব্যবহার গ্রহণ করা শুরু করেছে।

জেন্ডার সংবেদনশীল সাংবাদিকতায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করে অনুপ্রাণিত করেছে এক এনজিও, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)। *সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার দিগন্তে জেন্ডার* নামক পথ খোঁজার নির্দেশিকা তৈরী করেছে এনজিওটি[৫]।

LGBTQ+ আন্দোলনে দৃশ্যমান এক্টিভিজমে 'ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া' মডেল সামনে আসায় প্রথম আলো এটি নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। হাতে-গোনা কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে কলাম প্রকাশ করা এবং অনেক গোলটেবিল মিটিং-এর আয়োজন করে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে। হিজড়াদের প্রতি সামাজিক সহানুভূতিকে ব্যবহার করে প্রথম আলো একদল ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি/এক্টিভিস্ট গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করে।

প্রথম আলো

গোলটেবিল বৈঠক • পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন জরুরি



দলিত, সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, ট্রান্সজেন্ডার, চা-শ্রমিকসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। এই সব জনগোষ্ঠীর মানুষের সমস্যার সমাধানে সরকারকেও

০২ এপ্রিল ২০২২

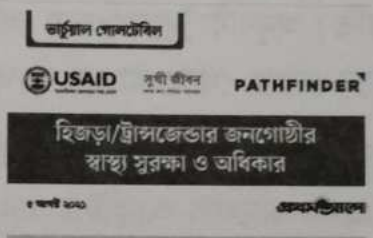
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বৈষম্য বিলোপ আইন অনুমোদন এখন সময়ের দাবি



ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় ক্রিশ্চিয়ান এইড, নাগরিক উদ্যোগ ও প্রথম আলোর আয়োজনে ২ এপ্রিল ২০২২ এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০ এপ্রিল ২০২২

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার • স্বাস্থ্যসেবা হিজড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার



হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন সেবা পেতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয় বা সেবা পায় না। সরকারের আইন থাকলেও হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য সরকারের

০৬ আগস্ট ২০২১

ভার্চুয়াল গোলটেবিল • হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অধিকার



ইউএসএআইডির সহযোগিতায় সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে 'হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অধিকার' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল গোলটেবিল অনুষ্ঠিত হয় ৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার, ২০২১

১৪ আগস্ট ২০২১

গোলটেবিল বৈঠক • ইতিবাচক পদক্ষেপ চান ট্রান্সজেন্ডাররা



শিশু বয়স থেকেই ট্রান্সজেন্ডারসহ লিঙ্গবৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিরা পরিবারে বড় হতে পারলে, তাঁদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য অনেকটাই কমে যাবে। শিক্ষা, চাকরি, সম্পত্তির অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার পাওয়ার পথটি

৩০ আগস্ট ২০২২

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষা



বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ২৯ আগস্ট 'হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

LGBTQ+ মিডিয়া সেলিব্রেটি

কোভিডের পর থেকে (২০২১-২০২৩) প্রথম আলো এক ঝাঁক নির্বাচিত ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্টকে বিশেষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এই কাজের জন্য মানসুরা হোসাইন নামক এক সাংবাদিককে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথম আলোর প্রায় সব প্রতিবেদন তার মাধ্যমে হয়েছে। পত্রিকা যাদেরকে সামনে এনেছে, তারা সবাই ট্রান্সজেন্ডার, কেউ হিজড়া ছিলেন না এবং এদের প্রায় সবাই কোনো-না-কোনভাবে বন্ধু সোশ্যাল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইসিডিডিআরবি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত। এদেরকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেইনিং-এর মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে। হিজড়াদের সামাজিকভাবে অবহেলা, বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ পুশ করা হয়েছে। LGBTQ+ গোষ্ঠীর নিজেদের বানানো হিজড়া ডেফিনেশন (এটা লিঙ্গ পরিচয় নয়, এটা একটি সংস্কৃতি) অনুযায়ী ট্রান্সেজন্ডার সেলিব্রেটিরা কেউ হিজড়া নয়, কেননা তারা গুরুর অধীনে ঢেরায় থেকে রাস্তায় ভিক্ষা করে না।

সব মিলে ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটিদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ জনের বেশী হবে না। প্রথম আলোর আর্কাইভ এনালাইসিস করে এটি দেখা গেছে। একটা মজার দিক হচ্ছে, যাদেরকে বেশী হাইলাইট করা হয়েছে তাদের সবাইকে কোভিডের সময় মানবাধিকার কর্মী হিসেবে পত্রিকায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন তিন জন ট্রান্সজেন্ডার নারী সেলিব্রেটি নিয়ে পর্যালোচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি—

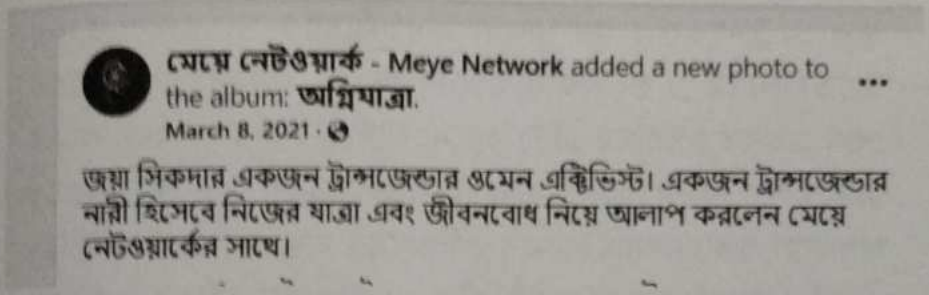
* জয়া সিকদার (পুরুষ নাম: জয় সরকার)
* তাসনুভা আনান শিশির (পুরুষ নাম: কামাল হোসেন)
* হোচিমিন ইসলাম (পুরুষ নাম: রোকন)

জয়া সিকদার: উত্থানের নেপথ্যে আইসিডিডিআর,বি

এই নাম দিয়ে গুগল সার্চ করলে জয়া সিকদার নামটি সবার উপরে চলে আসে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম, গোলটেবিল মিটিং, টকশো, সরকারী মিটিং—সব জায়গায় জয়া সিকদারকে বিশেষজ্ঞ বা এক্টিভিস্ট হিসেবে প্রচার করা হয়। জয়া সিকদার পটুয়াখালি থেকে ১৬ বছর বয়সে ঢাকা এসে পুরুষ যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, নারী যৌন কর্মী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যদিও তিনি

একজন পুরুষাঙ্গ-ওয়ালা মানুষ। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, জয়া সিকদারের কমিউনিকেশন ভালো। আন্তর্জাতিকভাবে তিনি আইসিডিডিআর,বি গবেষক হিসেবেও পরিচিত[৬]। তিনি হিজড়া নেত্রীও ছিলেন[৭], কিন্তু এখন নিজেকে বলেন ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্ট।

জয়া সিকদার নিজের সম্পর্কে 'নারী' নামক এক ফেসবুক পেইজে দীর্ঘ সাক্ষাতকার দিয়েছেন। সেখানে থেকে কিছু পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি[৮]—



■ মেয়ে: ঢাকায় এলেন কবে? কীভাবে?

জয়া: ঢাকায় যখন এসেছি তখন আমার বয়স ষোল। গ্রামে লোকজনের গঞ্জনা আর মা-বাবার কষ্ট সইতে না পেরে একরকম পালিয়ে রাতের অন্ধকারে লঞ্চে করে ঢাকায় এলাম। এটা ১৯৮৯ সালের কথা। সদরঘাটে রাতটা কাটালাম। সেই রাতটাও ভীতিকর ছিলো।..... অবশেষে আমি তাদের সাথে যৌনপেশায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই কিংবা নিতে বাধ্য হই। এরপর আমি দুই বছর ভাসমান যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করেছি ঢাকায়...।

■ মেয়ে: আজ তো আপনি একজন মানবাধিকারকর্মী। সেটা কীভাবে হলো?

জয়া: যৌনপেশায় আমার যখন দুই বছরের মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই সময় বাংলাদেশ সরকার এইচআইভি ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য জাতিসংঘের সাথে একটা চুক্তি সই করে। জাতিসংঘ এইচআইভি ভাইরাস বিস্তারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যেসব জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে ছিলো সুই দিয়ে মাদক নেয় এমন ব্যক্তি এবং নারী ও ট্রান্সজেন্ডার যৌনকর্মীরা। হিজড়া যৌনকর্মীরাও এই ট্রান্সজেন্ডার আমব্রেলায় আওতাতেই পড়েন।

সেই সময় আমার যোগাযোগ হয় কেয়ার বাংলাদেশের সাথে। কেয়ার বাংলাদেশ তখন শক্তি প্রকল্প নামে বিশাল একটা প্রজেক্ট চালাচ্ছিল নারী যৌনকর্মীদের নিয়ে। তাদের একজন পিয়ার এডুকেটর দরকার ছিলো যে যৌনকর্মীদেরকে বন্ধু হিসেবে বিভিন্ন ব্যাপার বুঝাতে, শিখাতে পারবে। আমি যেহেতু মোটামুটি লেখাপড়া জানতাম, সেহেতু তারা আমাকে এই কাজটা করার প্রস্তাব দেয়।

নারী যৌনকর্মীদের মধ্যে কনডম বিতরণ করতে গিয়ে আমার মনে হলো যে ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া যৌনকর্মীদেরও কনডম ব্যবহার করা উচিত। কনডম যে শুধু জন্মনিরোধনের জন্য না, কনডম যে যৌনবাহিত রোগ ঠেকাতেও দরকার এইটা তখনো অনেকে জানত না। ফলে আমার ট্রান্সজেন্ডার কিংবা হিজড়া যৌনকর্মী বন্ধুরা আমার কথা শুনে শুরুতে হাসাহাসি করত। আমি আমার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিয়ার আউটরিচ ওয়ার্কার হিসেবে আমার কমিউনিটির ৩০ জন যৌনকর্মীর রক্ত পরীক্ষা করার প্রস্তাব দেই।

এই প্রকল্পের সাথে আইসিডিডিআর,বি যুক্ত হলো। সেই ৩০ জনের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল তাদের মধ্যে ২৯ জন যৌনবাহিত রোগে ভুগছেন। এভাবে কেয়ার বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে করতে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়ে আমি একজন অধিকারকর্মী হয়ে উঠলাম। চার বছর কেয়ারে কাজ করার পর আইসিডিডিআর, বি'র একটা গবেষণা প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ের গবেষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয় আমার। গবেষণাটা ছিলো ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে।

এই গবেষণার অংশ হিসেবে আরো অনেক ট্রান্সজেন্ডার মানুষের সাথে কথা বলে, তাদের গল্প শুনে আমি বুঝতে পারি যে আমি একাই ভুক্তভোগী না। আমার মতো আরো অনেক মানুষ আছেন যাদের আত্মপরিচয় আর অধিকার আদায় করা বাকি। এরপর আমি 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, হাসাব (HIV Aids and STD Alliance Bangladesh)-এ কাজ করেছি। আমি ছয় বছর বাংলাদেশের সেক্সওয়ার্কারস নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। জাতীয় পর্যায়ে যৌনকর্মীদের জন্য নেতৃত্ব দিয়েছি। এছাড়া নিজে দুইটা সংগঠন তৈরি করেছি।

জয়া সিকদার আইসিডিডিআর,বি-এর প্রজেক্টে যৌনকর্মীদের সাথে যোগাযোগ এবং নমুনা সংগ্রহে কাজ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রকাশিত জার্নাল পেপারে জয়া সিকদারকে বানানো হয়েছে সিনিয়র অথার (লাস্ট অথার), যদিও তার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই! আইসিডিডিআর,বি-এর মতো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত প্রতিষ্ঠান সমকামী অধিকার এক্টিভিস্ট বানাতে জয়া সিকদারের মতো ব্যক্তিকে অথারশীপ দেয়ার মাধ্যমে সায়েন্টিফিক এথিক্স ভঙ্গ করেছে। আরো অবাক করা বিষয় হচ্ছে—জয়া সিকদার যে প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ড. তাসনীম আজিম-এর প্রজেক্টে কাজ করেছেন, এই পেপারগুলোতে তিনি নিজের নাম দেননি। গবেষণা ফিল্ডে এমন সচারাচর দেখা যায় না। এ থেকে কি অনুমান করা যায় না যে, ড. তাসনীম আজিম ভবিষ্যতে যদি এটি ফাঁস হয়ে যায়, সেই দায়মুক্তি থেকে এড়ানোর প্রচেষ্টাই এটি? রিসার্চ পেপারে সিনিয়র অথার হিসেবে নাম দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জয়া সিকদারের একটা আন্তর্জাতিক মানের প্রোফাইল তৈরী করা। আইসিডিডিআর'বি-কে এই বিষয়ে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা দরকার।

Living on the Extreme Margin: Social Exclusion of the Transgender Population (Hijra) in Bangladesh

Article | Full-text available | August 2009 · 2,552 Reads · 197 Citations

Journal of Health Population and Nutrition

Sharful Islam Khan · Mohammed Iftekher Hussain · Shaila Parveen · [...] · Joya Sikder

Not to Stigmatize But to Humanize Sexual Lives of the Transgender (Hijra) in Bangladesh: Condom Chat in the AIDS Era

Article | Full-text available | November 2008 · 964 Reads · 37 Citations

Journal of LGBT Health Research

Sharful Islam Khan · Mohammed Iftekher Hussain · Gorkey Gourab · [...] · Joya Sikder

Khan, S. I., Hussain, M. I., Gourab, G., Parveen, S., Bhuiyan, M. I., & Sikder, J. (2008). Not to stigmatize but to humanize sexual lives of the transgender (hijra): condom chat in the AIDS era. Journal of LGBT Health Research (Specia issue: issues on male sexual behaviors and HIV risk in South Asia).

Article | Full-text available | January 2008 · 388 Reads

Journal of LGBT Health Research

Sharful Islam Khan · Mohammed Iftekher Hussain · Gorkey Gourab · [...] · Joya Sikder

জয়া সিকদার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রফেসর সাবিনা ফয়েজ রশিদের সাথেও জড়িত, যিনি দেশের LGBTQ+ এক্টিভিস্টদের এক প্লাটফর্মে এনেছেন এবং মেন্টরিং করছেন সেই ২০০৭ সাল থেকে। আইসিডিডিআর,বি হিজড়া এবং ট্রান্সজন্ডারকে সমার্থক শব্দ হিসেবে জার্নাল পেপারে দেখিয়ে আসছে (উপরের পেপারগুলোর স্ক্রিনশট দেখুন)। ২০১৭ সালের পর থেকে LGBTQ+ নেটওয়ার্ক এই দুটি শব্দকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। জয়া সিকদারসহ ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্টদের মাধ্যমে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার আলাদা, হিজড়া হচ্ছে সংস্কৃতি, জেন্ডার আইডেন্টিটি নয়—এসব তথ্য বারবার মিডিয়াতে দেয়ার কৌশল গ্রহণ করেছে ব্র্যাক এবং বন্ধু সোস্যাল। Share-net LGBTQ+ গোষ্ঠীদের প্লাটফর্ম যা ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ স্কুলের ডিনের প্রফেসর সাবিনা ফয়েজ রশীদ গড়ে তুলেছেন।





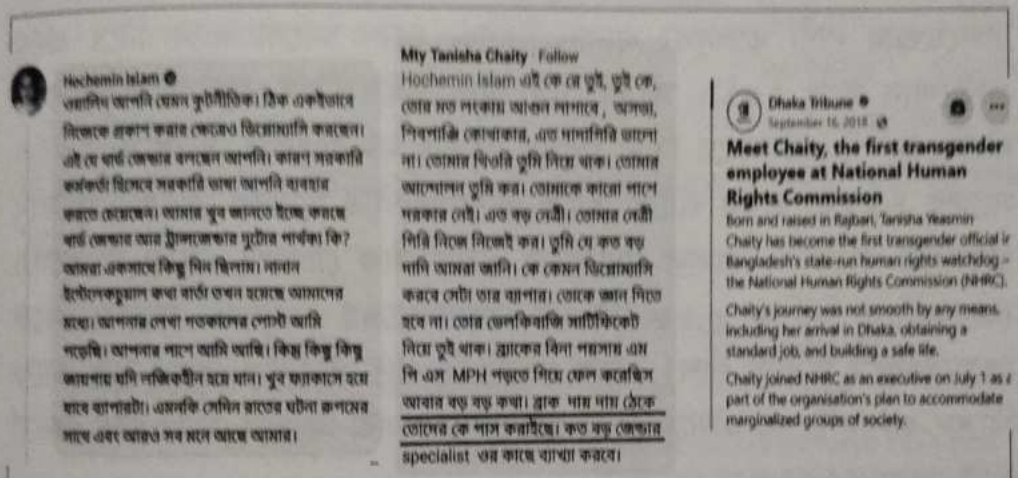
তাসনুভা আনান শিশির এবং হোচিমিন তৈরীর নেপথ্যে

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে প্রথম আলো প্রকাশ্যে এবং ব্র্যাক নেপথ্যে থেকে এক্টিভিস্ট তৈরি করেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের একদিকে বৈষম্যের শিকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে প্রশংসিত করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে তাসনুভা আনান শিশির ও হোচিমিনকে এমনভাবে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বিশেষভাবে হাইলাইট করা হয়েছে, যেন মনে হয় তারা করোনার মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এই প্রচারের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে বিশেষ ফেলোশিপের মাধ্যমে এমপিএইচ কোর্সে ভর্তি করায়, যদিও তাদের ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর মতো আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির

যোগ্যতা ছিল না। LGBTQ+ গ্লোবাল এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্র্যাকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম নৈতিকতাও বিসর্জন দিয়েছে।

প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে বেশকিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে, অথচ তারা দেশের বা সমাজের জন্য তেমন কোনো অবদান রাখেনি, যার জন্য মিডিয়াতে এত গুরুত্ব পাওয়ার কথা। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের মতো গণমাধ্যমগুলো দেশের সমাজের মূল্যবোধের বিরোধী মতাদর্শ বাস্তবায়নে কতটা সক্রিয় এবং উৎসাহী।



ছবি- ভাইরাল হওয়া তৃতীয় লিঙ্গের বাংলাদেশী ফরেন এম্বেসীর কর্মকর্তার (ওয়ালিদ) পোষ্টে হোচিমিন এবং তানিশা চৈতীর বিতর্কের স্ক্রিনশট। চৈতিও একজন মিডিয়া সেলিব্রেটি ট্রান্সজেন্ডার। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় দায় পড়ে এমপিএইচ ডিগ্রী দিয়েছে সেই আলোচনা।

SL	Date	প্রথম আলোর শিরোনাম-(তাসনুভা এবং হোচিমিন) ট্রান্সজেন্ডার
1	15/6/2019	সমাজের 'ভয়ে' ঈদেও বাড়ি ফেরা হয় না তাসনুভার
2	17/5/2020	করোনায় মানুষের পাশে ট্রান্সজেন্ডার অভিনেত্রী তাসনুভা
3	10/2/2021	আন্তর্জাতিক কোর্সটিতে তাঁরাই প্রথম 'ট্রান্সজেন্ডার'
4	6/3/2021	রূপান্তরিত নারী হলেন উপস্থাপক
5	31/3/2021	প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রান্সজেন্ডাররা
6	24/3/2021	তাঁরা বদলাচ্ছেন নিজেদের, বদলাচ্ছে সমাজও
7	27/6/2021	অনলাইন হয়রানির বিরুদ্ধে তাসনুভা শিশিরের #myresponse
8	13/10/2021	মূলধারায় একজন শিল্পী তাসনুভা
9	6/11/2021	প্রথম আলোর ২৩তম বর্ষপূর্তি নিয়ে বিশেষ আয়োজন 'আলোর আড্ডা
10	13/2/2022	নিউইয়র্ক সিটি ফ্যাশন উইকে তাসনুভা আনান 'ট্রান্স মডেল হিসেবে অংশ নেওয়া বড় প্রাপ্তি'

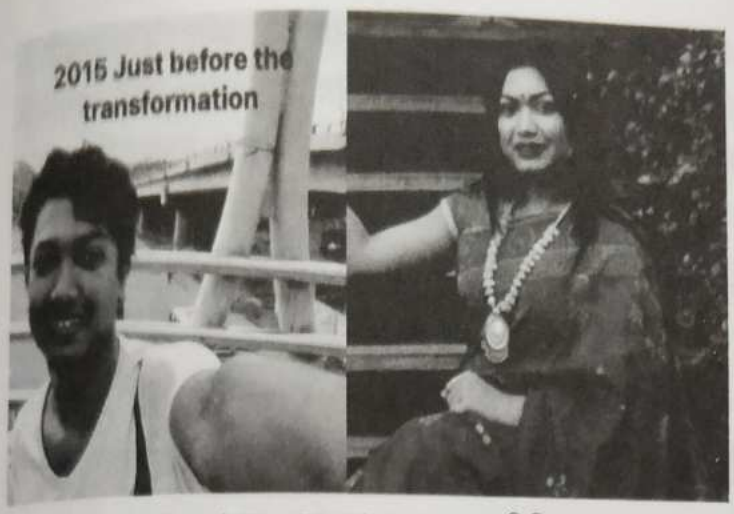
SL	Date	প্রথম আলোর শিরোনাম (তাসনুভা এবং বেতিদিন) ট্রান্সজেন্ডার
11	16/3/2022	ট্রান্স নারীরা সমান নারী
12	12/6/2022	অন্য মায়েরাও বলুক, ও আমারই সন্তান'
13	31/3/2023	প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রান্সজেন্ডাররা
14	8/10/2023	অপ্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, সোপন করার কিছু নেই: জো চি মিন ইসলাম
15	25/11/2023	শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা দিতে পারেননি জো চি মিন ইসলাম
16	26/11/2023	জো চি মিনের ঘটনায় অবস্থান তুলে ধরল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
17	28/11/2023	জো চি মিনের ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে ইউজিসি

তাসনুভা আনান শিশির

বাগেরহাটের প্রত্যন্ত গ্রামে বেড়ে উঠা কামাল হোসেন ঢাকা এসে হয়ে গেলেন ট্রান্সজেন্ডার নারী তাসনুভা আনান শিশির! প্রথম আলো তাকে নিয়ে প্রথম প্রতিবেদন করে ২০১৯ সালের ১৫ জুন। তখন তিনি বন্ধু সোশ্যালে কাজ করছিলেন[৯]। এর আগে তিনি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে। ২০২০ সালের ১৬ মে, প্রথম আলো তাকে করোনাকালীন মানবিক ত্রাণকর্মী হিসেবে হাইলাইট করে[১০]। কামাল হোসেনের একাডেমিক রেজাল্ট ভালো না হলেও (এসএসিতে জিপিএ ৩.৮৮ [১০]এবং নারায়নগঞ্জের তোলারাম কলেজ থেকে কোনোরকমে মাস্টার্স পাশ) ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল তাকে বিশেষ স্কলারশীপের মাধ্যমে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে এমপিএইচ কোর্সে ভর্তি করে (২০২১)।

পাকিস্তানের এক ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠিকার পদাংক অনুসরণ করে বিশ্ব নারী দিবসে (৮ মার্চ ২০২১-এ) বৈশাখী টিভি তাসনুভাকে দিয়ে ৩ মিনিটের জন্য লোকাল নিউজ পড়ায়। এই খবর বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠিকা হিসেবে। এরপর বিবিসি তাসনুভাকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করে[১১]। এরপর তাসনুভা নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে অংশগ্রহণ করে, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকা তাকে নিয়ে ফিচার লেখে। এমনকি তার সংবাদপাঠের একটি ছবি টাইম ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা ছবির তালিকায় স্থান পায়।

২০২২ সালে তাসনুভা নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে অংশগ্রহণ করা প্রথম বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার নারী। তাসনুভা সমকামী নেটওয়ার্ক ILGA ওয়ার্ল্ডের বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হন এবং ইনক্লুসিভ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ILGA হলো সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ছড়ানোর একটি বৈশ্বিক

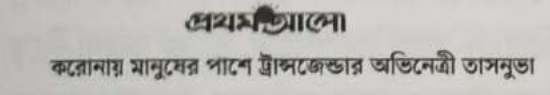


কামাল হোসেন থেকে তাসনুভা আনান শিশির

(ছবি শিশিরের ফেসবুক এবং প্রথম আলো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

প্রতিষ্ঠান, যা দেশের আইন ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মিডিয়া ও ব্র্যাক মিলে সমাজের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদ প্রচারকারী শিশিরের মতো ট্রান্সজেন্ডারদের তৈরি করছে এবং বারবার তাকে মানবিক কর্মী হিসেবে তুলে ধরছে।


প্রথম আলো

করোনায় মানুষের পাশে ট্রান্সজেন্ডার অভিনেত্রী তাসনুভা

দেশে দিনে দিনে বাড়ছে করোনার প্রকোপ। করোনা মোকাবিলায় যখন সবাই সাধারণ দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, কাজের বুয়াসহ খেটে খাওয়া মানুষের কথা ভাবছেন। ঠিক তখন মনে হয় বাদ

১৯ মে ২০২০


The Daily Star

Sports Business Entertainment Life & Living Youth Tech & Startup

Time magazine features Tashnuva Anan Shishir in 100 best photos of 2021


The New York Times

Transgender Activist Who Made History in Bangladesh Is Onstage in New York

Tashnuva Anan Shishir, who became her country's first transgender news anchor in 2021, is performing in "Public Obscenities" at Soho Rep.


The Daily Star

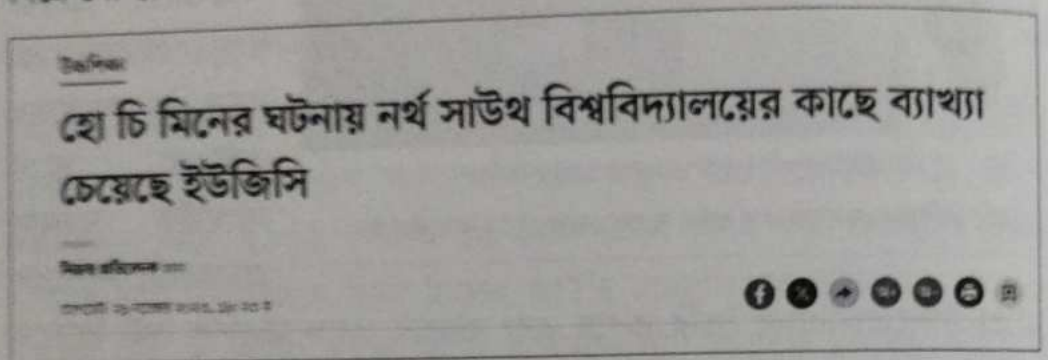
Sports Business Entertainment Life & Living Youth Tech & Startup

Celebrating Tashnuva Anan Shishir: A journey of resilience and triumph

হোচিমিন ইসলাম

২৫ নভেম্বর, ২০২৩। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত উইমেন্স কার্নিভাল অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রান্সজেন্ডার হোচিমিন ইস্যু টক অব দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়। পুরো গণমাধ্যম ইন্ড্রাস্ট্রি উন্মত্ত এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্তর্জাতিক মিডিয়াও এসে হাজির হয়। বিবিসি বাংলা থেকে আমাকেও ফোন করা হয়, কেননা হোচিমিন নিজের ফেসবুকে স্টাটাসে আমার নাম উল্লেখ করে

অভিযোগ করেছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনায় ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন) নর্থ সাউথকে শোকজ করে। দেশের সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারছিল না, কী হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে সম্ভবত দেশের ৯৯.৯৯% মানুষের কোনো ধারনাই ছিল না। হিজড়া সহানুভূতির ওপর ভর করে গড়ে তোলা যৌন বিকৃতির ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্ট হঠাৎ হোঁচট খায়। হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনা শুরু হয়।


হো চি মিনের ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে ইউজিসি

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী শুক্রবারের সালাত আদায় করে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ করে এই যুক্তিতে ট্রান্সজেন্ডার হোচিমিন হচ্ছে পুরুষ, কিন্তু নিজেকে নারী দাবী করে। এই প্রতিবাদে তারা ক্যাম্পাসে তাকে বক্তব্য দিতে বাধা দেয়। এর আগে শিক্ষার্থীরা ভিসিকে ইমেল করে প্রতিবাদ জানায়, কেননা এটা সমকামিতা অর্থাৎ দেশের আইন বিরোধী (পেনাল কোড ৩৭৭)। অবশেষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ওই অনুষ্ঠানে হোচিমিনের সেশনটি বাতিল হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর ট্রান্সজেন্ডার হোচিমিন সম্পর্কে অনেক তথ্য বের হয়ে যায়। নর্থ সাউথের ঘটনার আগেই দেশের ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিজম নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঘাটাঘাটি করেছিলাম। তখন কয়েকজন সেলিব্রেটি ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে হোচিমিন সম্পর্কে গণমাধ্যমে অনেক প্রতিবেদন দেখতে পাই। ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্টের গতি-প্রকৃতি বুঝার জন্য তাৎক্ষণিক কন্টেন্ট এনালাইসিস করে হোচিমিন সম্পর্কে কমপক্ষে ৩৭টির মতো প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছিলাম (নীচের লিস্ট নর্থ সাউথ ঘটনার আগে সংগ্রহ করা। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারের খবরের জন্য উপরে দেয়া লিস্ট দেখুন)।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা পর হোচিমিনকে নিয়ে অগণিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, চ্যানেল টিভিতে টকশো হয়েছে। নারীবাদী, বামপন্থীরা অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। তখন জনমনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয়। বাংলাদেশে

ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন প্রায় পাশ হতে যাচ্ছিল। এই আইন হলে কোনো পুরুষ নিজেকে মনে মনে নারী দাবী করতে পারবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের তাকে নারী হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে! এটা শুনতে পাগলামী মনে হলেও ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্টের উদ্দেশ্য এটাই।

নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী দাবী করার আগে হোচিমিন ইসলাম পরিচিত ছিল রোকন নামে। বগুড়া জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রাম বারোপুরে রোকন বেড়ে উঠে। পিতা কাজ করতেন এক এনজিওর নিরপত্তা প্রহরী হিসেবে এবং যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট রাজনীতিতে। হোচিমিন বগুড়ার এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, টিএমএসএস নার্সিং কলেজে পড়াশুনা করেছে।

বর্তমানে পেশায় নার্স। কিন্তু, সেটার চেয়ে তার বড় পরিচয় হলো, সে একজন ট্রান্সজেন্ডার অধিকারকর্মী। ভারত থেকে পরিচালিত সমকামী সংগঠন South Asian Young Queer Activist Network (SAYAN) এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে জড়িত রয়েছে হোচিমিন। সংগঠনটি দক্ষিণ এশিয়ায় LGBTQ+ কমিউনিটির বিকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। এছাড়াও সে কাজ করছে No Passport Voice নামক প্রতিষ্ঠানের ট্রান্সজেন্ডার রাইটস অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। ফেসবুক ইভেন্ট থেকে আমরা তার সাথে সমকামী সংগঠন বয়েজ অব বাংলাদেশ (BOB) এর যোগসূত্রও পেয়েছি। হোচিমিনকে নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও ডকুমেন্টারী রয়েছে যেখানে সব ডকুমেন্ট লিপিবদ্ধ রয়েছে[১২]।

হোচিমিন ২০১৬ সাল পর্যন্ত জীবনযাপন করতো পুরোদস্তুর একজন পুরুষ হিসেবে, ফ্লার্টিং করতো মেয়েদের সাথে। প্রেমিকার সাথে তার একাধিক ছবিও নেটে ভাইরাল হয়েছে। জন্মগত এই পুরুষ, লিঙ্গ পরিবর্তন করে পরবর্তীতে নিজেকে দাবী করে বসে নারী হিসেবে। প্রথম আলোর এক সাক্ষাৎকারে সে বলে, 'অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই'[১৩]।

হোচিমিন নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন

SL	হোচিমিন নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন	পত্রিকা
1	Ho Chi Minh Islam to make small screen debut	New Age
2	'Socially marginalised are excluded from most relief effort'	New Age
3	Ho Chi Minh Islam: গান্ধীর মন্ত্রে যুদ্ধে বগুড়ার ট্রান্সকন্যা	Ananda Bazar Po
4	My Story: "My Gender Identity Is A Part Of Me, But Not Me Entirely	The Logical Indian
5	Hochemin Islam: The story of a transgender nurse	The Business Sta
6	'Sheikh Hasina is a guardian with whom we can share our plights'	The Business Sta
7	Transgender actor Hochemin to make debut in Eid drama	The Business Sta
8	Activists call for ensuring rights of women, trans people	The Business Sta
9	Responsibility lies in all of us to ensure gender equity: ARTICLE 19	The Business Sta
10	Transwoman says uncle trying to grab property, isolating family	The Business Sta
11	Tashnuva Anan Shishir and Ho Chi Minh Islam's journey to breaking	The Business Sta
12	Breaking down barriers, leaping across prejudice	Dhaka Tribune
13	Covid-19 frontline warrior: Nurse embraces trans identity	Dhaka Tribune
14	22 changemakers selected for Acumen Fellowship Program in Bangl	Dhaka Tribune
15	Speakers at ARTICLE 19 training: Enact law to protect, promote righ	Dhaka Tribune
16	JCI Dhaka Independent hosts webinar on inclusivity	Dhaka Tribune
17	ট্রান্সজেন্ডার-তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষায় আলাদা আইন দরক	সমকাল
18	সহিংসতার শিকার নারীর প্রতি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আচরণ সহানুভূতিশীল	কালের কণ্ঠ
19	নারীর প্রতি আরো সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ	কালের কণ্ঠ
20	অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মি	প্রথম আলো
21	তাসনুভা-হোচিমিন শোনালেন রূপান্তরিত নারীর প্রেমের গল্প	News Bangla 24
22	এমনটাই হওয়ার কথা	Bangla Tribune
23	২ মাস ধরে একঘরে ট্রান্সজেন্ডার হোচিমিনের পরিবার	Bangla Tribune
24	আরেক ধাপ এগিয়ে ট্রান্স নারীরা, লক্ষ্য এবার বিসিএস	Bangla Tribune
25	ঈদের নাটকে ট্রান্সজেন্ডার হোচিমিন	Bangla Tribune
26	উপবৃত্তি বরাদ্দ থাকলেও স্কুলে খোঁজ মেলে না কেন?	Bangla Tribune
27	রূপান্তরিত নারীদের পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস নয়	Bangla Tribune
28	শুধু শারীরিক গঠন দিয়ে লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না: হো চি মিন	রাইজিংবিডি.কম
29	ট্রান্সজেন্ডার হো চি মিন ও তার পরিবারকে হয়রানির অভিযোগ	DBC News
30	প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার হো চি মিনের সাক্ষাৎ	Somoy News
31	হো চি মিন: দুই বাংলার প্রান্তিক লিঙ্গের স্থল হকিকত	Video
32	পুরুষের শরীরে নারী | হোচিমিন ইসলাম | Transgender Bangladesh | Thin	Video
33	ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের মধ্যে পার্থক্য কি? | Hochemin Islam | Transge	Video
34	কবিতার সাথে হো চি মিন ইসলাম একজন বাংলাদেশী রূপান্তরিত নারী	Video
35	পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস বিকৃতি, ট্রান্সজেন্ডার সংযুক্তিকরণ নিয়ে যা বলছেন ট্রান্স	Video
36	প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? | Ho Chi Minh Islam |	Video
37	Speaking out for trans rights in Bangladesh - DEUTSCHE WELLE (D	Video



হোচিমিন সম্পর্কে
ভিডিও ডকুমেন্টারী

স্ক্যান করুন

আজকের হোচিমিন হয়ে উঠার নেপথ্যে ছিল ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ডিপার্টমেন্টে তার ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা থাকার কথা নয়। ব্র্যাকের সমকামিতা প্রকল্পের অংশ হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্ট তৈরীর স্পেশাল কোটায় তাদের স্কলারশীপ দিয়ে যেনতেন ডিগ্রী দেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রান্সজেন্ডাররা

এই কমিউনিটির মানুষেরা বলছেন, জন্মের সময়ের লৈঙ্গিক পরিচয়ের সঙ্গে হরমোনের গঠনের মিল ছিল না তাঁদের। তাঁদের অভিযোগ, ভুল শরীরে ভুল মানুষের জন্ম হয়েছে। মানসিকভাবে ছেলে

৩১ মার্চ ২০২০



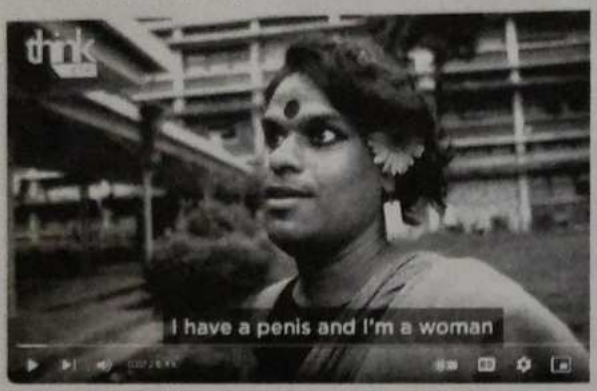
হোচিমিন শারীরিকভাবে নারী বা পুরুষের বিশ্বাসী নন। তার মতে[১৪]—

> 'শুধু স্তন ও যৌনাঙ্গের ওপর নির্ভর করে আপনি একজনকে নারী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন না। আরও অনেক ব্যাপার আছে, সেটাকে চিন্তা করতে হবে। আমি নারী, *পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার বা অন্য যেকোনো কিছু হই না কেন, সেটা আমি নিজেই বলতে পারি। সমাজ রাষ্ট্র বা অন্য কেউ আমাকে সেটা বলে দিতে পারে না আমি কী।*'

উপরের হাইলাইট করা কথাটি জর্জ সরোসের Self-ID মুভমেন্টের শ্লোগান। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ সরোসের অনুদান রয়েছে। মাতৃত্বের প্রচলিত ধারণা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তার মতে নারীত্ব ও মাতৃত্ব হচ্ছে[১৪]—

> মাতৃত্ব হলো প্রকৃতি। যে-কেউ মা হতে পারেন। মাতৃত্ব যে কেউ ধারণ

করতে পারে। শুধু আমার পেট বা জরায়ু থেকে সন্তান প্রসব করাই যদি মাতৃত্ব হয়, তবে মাতৃত্বের সংজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে হবে। একজন মানুষ তার জেন্ডার সত্তাকে যেভাবে অনুভব করেন বা ভাবতে পছন্দ করেন সেভাবেই তিনি বাঁচতে চান। যদি সেখানে কোনো বাধা দেওয়া হয় তাহলে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। সে বাধা কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র যেই দিক না। শুধু শারীরিক গঠন গতানুগতিক না হলে অথবা আলাদা হলেই মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না।



পুরুষের শরীরে নারী | হোচিমিন ইসলাম | Transgender Bangladesh | Think Bangla

আমার পুরুষাঙ্গ আছে এবং আমি একজন নারী!

প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রফেসর, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এবং বামপন্থীদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আপনারা কি এই বাংলাদেশ কায়েম করতে চাচ্ছেন সমাজের মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে? মাতৃত্ব, নারীত্বের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার মাধ্যমে জন্মগত নারীর অধিকারকেই কি অস্বীকার করা হয় না? এতে নারীরা কি সমাজ থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে না? নারী স্পেসকে পুরুষদের কাছে ছেড়ে দেয়াই কি মানবাধিকার?

পুরুষকে নারীদের হোস্টেল সিট বরাদ্দ: প্রথম আলো এবং ব্র্যাকের এক্টিভিজমের সাফল্য

তারা কতটুকু মরিয়া যে, পুরুষদের ট্রান্সজেন্ডারের নামে মহিলা হোস্টেলে সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে[১৫]। যে সিট পেয়েছে সে ব্র্যাকে কর্মরত, ওর সাথে লবিং করেছে হোচিমিন যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রডাক্ট এবং সেই সাংবাদিক মানসুরা হোসাইন যিনি হিজড়াদের সহানুভূতির মোড়কে ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন, ফলো-আপ করছেন। অবশেষে এক পুরুষকে নারীদের হোস্টেলে সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম আলো

'প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, ঘুম থেকে জেগেই যেন নিজেকে মেয়ে হিসেবে দেখতে পাই'

জারা রহমান ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরিত নারী। তিনিই প্রথম, তিনি সরকারি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে সিট পেলেন। ১ ডিসেম্বর থেকে তিনি হোস্টেলটির বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছেন।

১৪ নভেম্বর ২০১৯



জারা রহমান বলেন, 'সরাসরি বাড়ি খুঁজতে গেলে এক বয়স্ক বাড়িওয়ালি ভাড়া ঠিকঠাক করে জানালেন, আমাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। এরপর তাঁকে যখন ট্রান্স উইমেন বলে আমার পরিচয় দিলাম, তিনি বিষয়টি ঠিক বুঝতে পারলেন না। তখনো বললেন, সমস্যা নেই। কিন্তু তাঁকে যখন জানালাম আমি ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছি, তখন সৌড় দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর স্বামীকে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন, তাঁরা কোনো হিজড়াকে বাসা ভাড়া দেবেন না।' রাজধানীর মহাখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া নিতে গিয়ে জারা রহমানের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

তবে জারার ভোগান্তির অবসান হয়েছে। তিনি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে সিট পেয়েছেন। দেশে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর পরিচালিত ৯টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল রয়েছে। জারা রহমানই প্রথমবারের মতো ট্রান্স উইমেন বা রূপান্তরিত নারী পরিচয়ে সরকারি হোস্টেলে সিট পেতে যাচ্ছেন।

গত শনিবার প্রথম আলো কার্যালয়ে বসে জারা রহমান বলেন, 'বাসা নিয়ে সমস্যায় আছি, এটা জানার পর ট্রান্সজেন্ডার অধিকারকর্মী হো চি মিন ইসলাম আমাকে নিয়ে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরে যান। আমরা দুজনই ভেবেছিলাম, সেখানে গিয়ে আসলে কোনো লাভ হবে না। তবে অবাক হলাম, অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিকভাবে নিলেন। সিট পেতে হলে কী কী করতে হবে, সব বলে দিলেন। সে হোস্টেলে সিট পেতে যাচ্ছি, সেখানকার হোস্টেল সুপারকে নির্দেশনা দিলেন। ট্রান্সজেন্ডার হয়ে এত সহজে সরকারি হোস্টেলে সিট পাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

এমবিএ করা জারা রহমান দুই বছর ধরে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মানবসম্পদ বিভাগের অধীনে পে–রোল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রূপান্তরিত নারী পরিচয়েই ব্র্যাকের চাকরি পেয়েছেন। চাকরির পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জারা রহমান জানালেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্র্যাকের চাকরিটি পান। এর আগে ঢাকার বাইরে ছিলেন। ব্র্যাক থেকে এক মাস সময় দেওয়া হয় বাসা ভাড়া নেওয়াসহ অন্যান্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তখনই বাড়ি খুঁজতে গিয়ে নানা ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন। বাসা ভাড়া পাওয়া না গেলে চাকরিতে যোগ দেওয়াই সম্ভব হতো না। পরে মহাখালী এলাকায় তার সমগোত্রীয় একজনের সঙ্গে থাকেন; তবে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল।

বর্তমানে উত্তরায় আছেন আরেকজন রূপান্তরিত নারীর সঙ্গে। অবশেষে সরকারি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে সিট পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন জারা রহমান। এখন আপাতত নিশ্চিন্ত। সব ঠিক থাকলে ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে মিরপুরের নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের বাসিন্দা হতে যাচ্ছেন।

ব্র্যাকে চাকরি পাওয়ার পর থেকে জারা রহমান নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে শুরু করেছেন। তার নতুন পরিচয় ঢাকার বাইরে থাকা পরিবারের অনেকেই জানেন না।

জারা ব্র্যাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বললেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ট্রান্সজেন্ডারদের সেভাবে মূল্যায়ন করে না। তবে ব্র্যাক এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। নিয়োগপ্রক্রিয়া থেকে শুরু করে অফিসের নিরাপত্তাকর্মীরাও ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব বা সংবেদনশীল আচরণ করেন।

জারা বলেন, 'ব্র্যাকে চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি একজন পুরুষের মতোই পোশাক পরতাম। আমি জানতাম, আমার পরিচয় প্রকাশ করলে পরিবার, সমাজ কেউ মেনে নেবে না। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। আর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পড়াশোনা করা হবে না। পরিবার থেকে টাকা নিয়েই আমি পড়াশোনা করেছি। ব্র্যাকে যোগ দেওয়ার পর চাকরির পাশাপাশি এমবিএ সম্পন্ন করেছি।'

ক্ষোভ প্রকাশ করে জারা বলেন, মাদকসেবী, চোর—এমন সন্তানকেও পরিবার মেনে নেয়। শুধু তাদের মতো ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের পরিবার মেনে নিতে পারে না। অথচ তারা তো নিজে থেকে এমন হননি। হরমোনসহ নানা বিষয় এর সঙ্গে জড়িত। তবে এসব কেউ শুনতে চায় না, মানতে চায় না।

রাজধানীর নীলক্ষেতে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের (আগে নাম ছিল নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল) সুপার ছামিনা হাফিজ। তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মিরপুরের নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটিরও সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছামিনা হাফিজ প্রথম আলোকে বলেন, 'এর আগে কোনো ট্রান্সজেন্ডার সরকারি হোস্টেলে সিটের জন্য আবেদন করেননি। জারা রহমান প্রথমবারের মতো আবেদন করেছেন। হোস্টেলে সিট পেতে হলে যেসব ক্রাইটেরিয়া (শর্ত) থাকা প্রয়োজন, তা ওনার আছে। ওনাকে একটি একক সিট দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে, যাতে তিনি হোস্টেলে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারেন।'

হোস্টেল সুপার আরও বলেন, সরকার ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। জারা রহমানকে সিট দিতে পেরে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও খুশি হয়েছেন। তিনি হোস্টেলে থাকার পর কোনো কোনো নারী এ নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন। তবে যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, তা সার্বিকভাবে নজরদারি করা হবে। এ ছাড়া বর্তমানে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে।

References

1. ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার রক্ষায় আইন হচ্ছে. The Daily Ittefaq https://shorturl.at/QveE2
2. প্রতিবেদকনিজস্ব, অবগুণ্ঠন সরে গেল. Prothomalo https://www.prothomalo.com/onnoalo/অবগুণ্ঠন-সরে-গেল (2010).
3. Decriminalising same-sex relations. https://www.dhakatribune.com/opinion/editorial/34815/decriminalising-same-sex-relations.
4. 4. Rashid, S. F., Standing, H., Mohiuddin, M. & Ahmed, F. M. Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh. Health Research Policy and Systems 9, S12 (2011).
5. Media Resources Development Initiative | MRDI. https://mrdibd.org/.
6. Joya Sikder – Somporker Noya Setu – Global Genders and Sexualities. Orfalea Center for Global & International Studies https://orfaleacenter.ucsb.edu/joya-sikder-somporker-noya-setu-global-genders-and-sexualities/ (2022).
7. Hossain, A. The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh. Culture, Health & Sexuality 19, 1418–1431 (2017).

8. (20+) জন্ম সিকদার একজন ট্রান্সজেন্ডার... - মেয়ে নেটওয়ার্ক - Meye Network | Facebook. https://shorturl.at/kB8Jt

9. প্রতিবেদকনিজস্ব, সমাজের 'ভয়ে' ঈদেও বাড়ি ফেরা হয় না তাসনুভার. Prothomalo https://www.prothomalo.com/bangladesh/সমাজের-'ভয়ে'-ঈদেও-বাড়ি-ফেরা-হয়-না-তাসনুভার (2019).

10. করোনায় মানুষের পাশে ট্রান্সজেন্ডার অভিনেত্রী তাসনুভা | প্রথম আলো. https://shorturl.at/L4X4X

11. ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠক তাসনুভার বদলে যাওয়ার গল্প. (2021).

12. কে এই হোচিমিন? কী তার পরিচয়? কী নিয়ে তার আক্টিভিটিজম? Who Is Hochemin? || Offbeat Talks. (2024).

13. অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মিন ইসলাম | প্রথম আলো. https://www.prothomalo.com/bangladesh/jretv8gk5i.

14. https://www.risingbd.com. শুধু শারীরিক গঠন দিয়ে লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না: হো চি মিন | জাতীয়. Risingbd Online Bangla News Portal https://www.risingbd.com/national/news/397669.

15. হোসাইনমানসুরা, 'প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম, ঘুম থেকে জেগেই যেন নিজেকে মেয়ে হিসেবে দেখতে পাই'. Prothomalo https://www.prothomalo.com/bangladesh/61dxb96kvh (2023).

ব্র্যাকের সমকামিতা বান্ধব যৌনশিক্ষা মিশন

যৌনশিক্ষা কার্যক্রমের নৈতিক পটভূমি

পশ্চিমা দাতাদের সহযোগিতায় পরিচালিত এনজিওগুলোর প্রচেষ্টা সাধারণত ইতিবাচক বলে মনে হয়। তারা সমাজের মানুষের অবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে, তাদের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষ সচেতন হচ্ছে—এমন ধারণা জন্ম নেয়। কিন্তু এসবের আড়ালে যে আদর্শগত এজেন্ডা লুকিয়ে থাকে, তা কেবল গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব। অনেক সময় এটা মেনে নিতে কষ্ট হতে পারে যে, কীভাবে এমনটা সম্ভব। তবে বিশ্ব রাজনীতিতে আবেগের কোনো স্থান নেই। তারা এমন শব্দ ব্যবহার করে, যা সাধারণ মানুষের কাছে সচরাচর বোধগম্য হয় না।

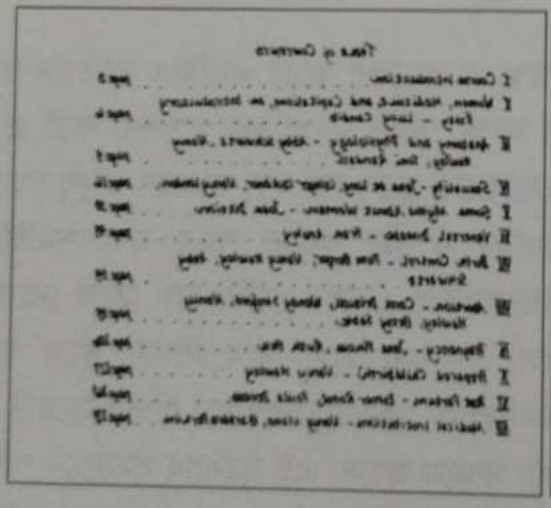
বিশ্বের বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ব্র্যাকের মতো এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের এজেন্ডা নিয়ে কাজ শুরুর আগে পর্যাপ্ত নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা করে প্রকৃত সমস্যা শনাক্ত করে। যখন এই সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়, সাধারণ মানুষ সহজেই তাদের অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করতে পারে এবং সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের বেশিরভাগ স্কুলে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেটের অভাব ছিল। একসময় ছেলে-মেয়ে আলাদা স্কুলে পড়ত। নারীবাদের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এনজিওরা কো-এডুকেশনের ধারণা প্রমোট করা শুরু করে। এরপর টয়লেটের সমস্যা সামনে আসে। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিমা বিশ্ব এগিয়ে আসে, ব্র্যাকের মাধ্যমে (WASH প্রকল্প) দেশের হাজার হাজার স্কুলে টয়লেট তৈরি করা হয়। হাত ধোয়া ও জীবাণুমুক্ত থাকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয় এবং সেই আলোচনায় মাসিক (Menstruation) বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

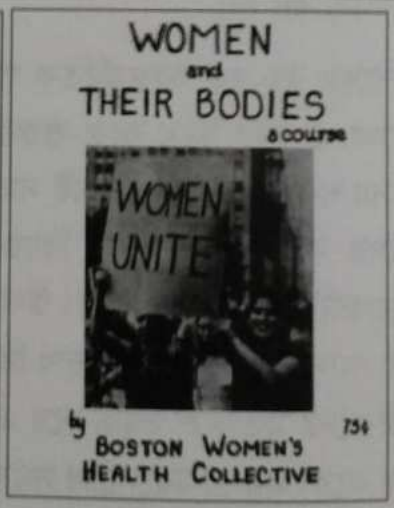
মেয়েদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধিকে কেন্দ্র করে স্কুলের শিক্ষার্থীদের যৌনশিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বয়ান তৈরি করা হলো। কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন

(সিএসই), অর্থাৎ যৌনশিক্ষায় LGBTQ+/সমকামিতার অধিকারকে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

মাসিক যেহেতু যৌনতার অংশ, তাই পৃথিবীর সব সমাজেই এটি একটি সামাজিকভাবে গোপনীয় বিষয়। নারীবাদীরা যুক্তি দেখিয়েছে, এই লজ্জার ধারণার মাধ্যমে নারীদের দমিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। ফলে, যৌনতা তথা মাসিক সম্পর্কিত লজ্জার বিষয়কে পশ্চিমা লিবারেল দর্শনের আলোকে ট্যাবু হিসেবে ট্যাগ করা হলো, অর্থাৎ এটিকে কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। তাই, মাসিকের এই ট্যাবু ভাঙতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে সবার যৌন সুখ নিশ্চিত করাও একটি অধিকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাজার বছরের বেশি সময় ধরে সমকামিতার বিষয়টি সামাজিকভাবে চরমপন্থী অশ্লীলতা হিসেবে গণ্য করা হতো। এই ধারণা ভাঙতে পারলে সমাজের ধর্মীয় নৈতিকতার বিষয়গুলোকে সহজেই প্রভাবিত করা যাবে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক থিংকট্যাংক LGBTQ+ ইস্যুকে লিবারেল নৈতিকতার আউটলাইয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এটিকে কাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করেছে।





১৯৭০ সালে নারীবাদী অ্যাক্টিভিস্টরা যৌন অধিকার নিয়ে এই বইটি প্রথম প্রকাশ করে (হাতে লিখে)। এই বইতে মেয়েদের মাসিক, সমকামিতা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নারীবাদের আলোকে বর্তমানের আলোচিত স্কুলের শিশুদের যৌনশিক্ষার বিষয়টি এসেছে। বাংলাদেশের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে 'যৌন অধিকার' ফ্রেমে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে ব্র্যাক পশ্চিমাদের হয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে।

নতুন চিন্তাধারার প্রজন্ম তৈরি করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল দেশে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাক সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে। ১৯৯৫ সাল থেকে নারীবাদের আলোকে ব্র্যাক যৌনশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে[১]। পরবর্তীতে, চলমান যৌনশিক্ষার প্রকল্পে ২০০৫ সাল থেকে LGBTQ+ অধিকারকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের কারণে ব্র্যাক সারাবিশ্বে সমাদৃত। ব্র্যাকের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা হলো, তারা কোনো আইডিয়াকে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরো দেশে স্কেল-আপ বা ছড়িয়ে দিতে পারে।

ব্র্যাকের একটি বিশাল শিক্ষাক্রম রয়েছে। তাদের স্কুল প্রোগ্রামে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে। ১৮ লক্ষ কিশোর এবং মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী (৬৯% মেয়ে) ব্র্যাক ক্লাব এবং কমিউনিটি লার্নিং সেন্টরের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেছে[২]। ইংল্যান্ডের ডিএফআইডি'র অর্থায়নে ২০০৫ সাল থেকে ব্র্যাক বাংলাদেশে LGBTQ+ অধিকারের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে[৩]।

বিশ্বজুড়ে যৌনশিক্ষা চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ষাটের দশকে শুরু হওয়া যৌন বিপ্লবের ফলে পশ্চিমা সমাজে ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবক্ষয় ঘটে। অবাধ যৌনতাকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সমাজের পিতামাতারাও সাম্প্রতিককালে স্কুলের পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষার (কম্প্রিহেনসিভে সেক্সুয়াল এডুকেশন বা সিএসই) বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। কানাডা[৪] এবং আমেরিকার[৫] হাজার হাজার পিতামাতা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। বর্তমান সময়ে LGBTQ+/সমকামিতা যৌনশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ (LGBT-inclusive education)। শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবার বিধ্বংসী LGBTQ+ মতবাদকে মাত্রারিক্ত প্রমোট করছে। এতে পিতামাতারা শংকিত হয়ে সন্তানকে স্কুল থেকে সরিয়ে হোম স্কুলিং করছেন (An increasing number of parents in Birmingham are pulling their children out of mainstream schools to stop them receiving LGBT-inclusive relationships education)[৬]।

২০২৩ সালের জরীপ অনুসারে আমেরিকার ৫০% স্কুলের শিক্ষকরা জেন্ডার/LGBT আইডেন্টিটি শ্রেণীকক্ষে পড়াতে অপছন্দ করেন। শিক্ষকদের ৪১% মনে

করেন LGBTQ+ নিয়ে বিতর্ক তাদের দায়িত্ব পালনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে[৭]। যৌনশিক্ষার বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় প্যারেন্টসরা প্রতিবাদ করছেন। যেমন- নাইজেরিয়া এবং সেনেগাল পাঠ্যক্রম থেকে যৌনশিক্ষা বাদ দিয়েছে। সেনেগালের প্রেসিডেন্ট বলেন, পশ্চিমা যৌনশিক্ষা তাদের সমাজের মূল্যবোধ-বিরোধী[৮]। হন্ডুরাসও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে রাইটস বেইজড যৌনশিক্ষা বাদ দিয়েছে[৯]। পোলান্ডও একই পথে হাঁটছে। এ বছর (২০২৪) রাশিয়া LGBTQ+ মতবাদকে চরমপন্থী বলে আখ্যায়িত করে আইন তৈরী করেছে। এই মতবাদ যারা প্রচার করবে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বিধান চালু করেছে। তাই স্কুলে LGBTQ+-নির্ভর যৌনশিক্ষা রাখার প্রশ্নই উঠে না।

এলজিবিটি-বান্ধব যৌনশিক্ষা ২০২৪ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অন্যতম একটি ইস্যু ছিল। ২০২৩ সালে আমেরিকার ৮টি অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে LGBTQ+ কেন্দ্রিক যৌনশিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে[১০]। উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থাকলেও দাতা সংস্থাগুলো LGBTQ+/যৌনশিক্ষার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে, যা অস্বাভাবিক।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সারাবিশ্বে যখন যৌনশিক্ষা নিয়ে তোলপাড়, বাংলাদেশের মতো ধর্মীয় রক্ষণশীল দেশে কোনো আলোচনা ছাড়াই পশ্চিমা দেশগুলো ব্র্যাকের মত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে পাঠ্যক্রমে LGBTQ+ উপাদান যুক্ত করেছে।

Masturbation should be taught in sex ed

Ending sexual shame for women and genderqueer people

By Sophie Knight Contributing writer Mar 3, 2020 0

ছবি- LGBTQ+ অধিকারের লক্ষ্যে যৌনশিক্ষা নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি শিরোনাম!

যৌনশিক্ষা আসলে কি?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যৌনশিক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত[১১], যেমন কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন তথা (সিএসই), 'life skills', 'holistic sexuality education', 'family life', 'healthy lifestyle', 'sex ed', or 'HIV' education, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) ইত্যাদি[১]। উল্লেখ্য

যে, বাংলাদেশে যৌনশিক্ষাকে এসআরএইচআর (SRHR) বা সিএসই (CSE) হিসেবে মিডিয়াতে উপস্থাপন করা হয়। এসআরএইচআর একটি বিস্তৃত বিষয় যা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিয়ে আলোকপাত করে। এটা বয়স নির্বিশেষে সবাইকে লক্ষ্য করে করা হলেও নারী এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীকে (সমকামী গোষ্ঠী) বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন (সিএসই) স্কুল ভিত্তিক যৌনশিক্ষা সিস্টেম। ইউনেস্কো এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে যৌনশিক্ষার পরিধি অনেক বিস্তৃত, যার মধ্যে মোটাদাগে রয়েছে[১২], [১৩]_

* প্রজনন অঙ্গ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান
* বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন (মাসিক, স্বপ্নদোষ)
* যৌনতার বিস্তৃতি অন্বেষণ করে নিরাপদ যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানো- হস্তমৈথুন, ওরাল সেক্স, পায়ুসংগম, পর্ণ
* জেন্ডার নর্মকে পরিবর্তন করার প্রয়াস—নারী-পুরুষের সামাজিক রোল বা প্রত্যাশাকে চ্যালেঞ্জ করা
* জেন্ডার আইডেন্টিটি এবং সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (LGBTQ+)
* যৌন সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ (এইডস মোকাবেলায় কনডম)
* যৌন সহিংসতা নিয়ে বোঝাপড়া, যৌন সম্মতি (মেরিটাল রেইপ)
* সামাজিক ট্যাবু বা ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দেয়া
* অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এবং গর্ভপাতের অধিকার ইত্যাদি

ইউনেস্কোর সংজ্ঞায়নে সিএসই হচ্ছে[১৩]—'a curriculum-based process of teaching and learning about the cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality.' এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষ যৌনসর্বস্ব প্রাণী ছাড়া আর কিছুই না। মানুষকে শারীরিক, সামাজিক এবং আবেগীয়ভাবে যৌনায়িত করে তোলাই সেক্সুয়াল এডুকেশনের মূল উদ্দেশ্য। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এজেন্সি সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে যৌনশিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য, সবার জন্য বাধ্যতামূলক করার জন্য। তারা জাতিসংঘের সাহায্য এবং সমর্থন চেয়েছে। কিন্তু পরিবার ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার জন্য হুমকি বিবেচনায় জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পায়নি (Disagreeing over References to Comprehensive Sexual Education, Delegates Fail to Adopt Draft Resolution, as Commission on Population and Development Concludes Session)

[১৪]। তবে UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), IPPF (International Planned Parenthood Federation) এবং SIECUS (Sexuality Information and Education Council of United States) বিতর্কিত যৌনশিক্ষাকে জোরালোভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। IPPF এবং SIECUS উভয় প্রতিষ্ঠানই জাতিসংঘের উপদেষ্টা মর্যাদায় আছে। তারা তাদের এই অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে যৌন বিপ্লবের জনক হিসেবে খ্যাত আলফ্রেড কিনসির বিকৃত যৌনশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে লবিং করে সফল হয়েছে।

আধুনিক যৌনশিক্ষার স্থপতি এবং ইতিহাস

১৯৫০-এর দশকের আলফ্রেড কিনসি'র প্রতারণামূলক গবেষণার তথ্য-উপাত্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যৌনশিক্ষা। কিনসি'র প্রতারণা এবং ভুলভাল তথ্য এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব নিয়ে ডক্টর জুডিথ রেইসম্যান (Judith Reisman) দীর্ঘ ৩০ বছরের বেশী সময় গবেষণা করেছেন। এই বিষয়ে তিনি কয়েকটি বই প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে Kinsey, Sex and Fraud (১৯৯০), Kinsey: Crimes & Consequences (১৯৯৮) এবং Sexual Sabotage (২০১০)। ড. রেইসম্যান আমেরিকার Departments of Justice, Education, and Health and Human Services-এর প্রাক্তন উপদেষ্টা। অন্যদিকে ৪৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোর্ড সার্টিফায়েড শিশু-কিশোর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর মিরিয়াম গ্রসম্যান[১৫] (Miriam Grossman) যৌনশিক্ষার ইতিহাস ও এর প্রভাব (You're Teaching My Child WHAT?) নিয়ে বই লিখেছেন এবং সচেতন করে আসছেন অনেক বছর ধরে। তিনি ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ নিয়ে (Lost in Trans Nation, 2022) আরেকটি বই প্রকাশ করেছেন। এই দু'জন এক্সপার্টের তথ্য-উপাত্ত এবং বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে যৌনশিক্ষার ইতিহাস এবং এই সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি।

ড. রেইসম্যান এবং ড. গ্রসম্যান সিএসই বা যৌনশিক্ষা নিয়ে অনেক আগে থেকে কাজ করছেন। যখন সিএসই খুব একটা আলোচনায় আসেনি, তখন থেকেই ড. গ্রসম্যান পিতামাতা এবং পলিসিমেকারদের সচেতন করার চেষ্টা করছেন (ড. রেইসম্যান মারা যান ২০২১ সালে)। এই দুইজন বিশেষজ্ঞের মতে, কম্প্রিহেনসিভ

সেক্সুয়াল এডুকেশন থেকে জন্ম নেয়া আজকের যৌন আন্দোলনের নেপথ্যে রয়েছেন আলফ্রেড কিনসির প্রতারণামূলক গবেষণা। ডক্টর মিরিয়াম গ্রসম্যান জাতিসংঘে তাঁর একটি ভাষণে বলেন[১৯]—

> 'Who came up with the notion that it's necessary to teach the world's children about high-risk sex acts their parents never heard of? Planned Parenthood and the Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). These groups portray themselves as guardians of our children's health and claim to provide students with all the information and skills they need to make smart choices. Their curricula, they declare, are comprehensive, age-appropriate, ideologically neutral, and medically accurate.'

অর্থাৎ, কে এই আজগুবি ধারণা নিয়ে এসেছে যে, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকাজ সম্পর্কে পড়াতে হবে, শেখাতে হবে—যা তাদের বাবা-মাও শুনেনি কোনোদিন? এই বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিয়ে এসেছে Planned Parenthood আর Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS)। এই সংস্থাগুলো নিজেদেরকে আমাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করে এবং দাবি করে যে, তারা শিক্ষার্থীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও দক্ষতা প্রদান করে। তারা ঘোষণা করে যে, তাদের পাঠ্যক্রমগুলো সার্বিক, বয়স-উপযোগী, মতাদর্শ-নিরপেক্ষ এবং চিকিৎসাগতভাবে সঠিক।

গ্রসম্যান আরো বলেন—

> I've discovered that the vision of groups such as Planned Parenthood and SIECUS—the groups at the helm of sexuality education in the U.S.—is not sexual health. It is sexual freedom. These large and powerful organizations believe in sexuality that extends from cradle to grave. They tacitly endorse early sexual activity and multiple

> partners as well as sexual experimentation, which are the very behaviors that fuel the epidemics of sexually transmitted diseases, HIV/AIDS, abortion and emotional distress....
>
> I've studied the history of sex education and one of the things you need to understand is that sex education is a social movement. Its goal is to change society. That was true 50 years ago when it began, and it's still true. The objective is to change my society, and now, yours.'
>
> One of the learning objectives [of sexuality education] is to 'change social norms.'[Those who advocate for comprehensive sexuality education] envision a world without sexual taboos and restrictions—a world free of Judeo/Christian morality where each individual, regardless of age, should be free to make his or her own sexual choices . . . and no judgment [is] allowed . . . It's an 'anything goes as long as you use a condom' philosophy of sex education.

অর্থাৎ, আমি আবিষ্কার করেছি যে, Planned Parenthood এবং SIECUS-যারা যুক্তরাষ্ট্রে যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান করে—এদের লক্ষ্য যৌন স্বাস্থ্য নয়, বরং যৌন স্বাধীনতা। এই বিশাল ও ক্ষমতাবান সংস্থাগুলো এমন যৌনতার ধারণায় বিশ্বাস করে, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা সূক্ষ্মভাবে কম বয়সে যৌনসম্পর্ক, একাধিক যৌনসঙ্গী এবং যৌন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সমর্থন করে। এসব আচরণই যৌন-সংক্রমিত রোগ, এইচআইভি/এইডস, গর্ভপাত এবং মানসিক চাপের মহামারীকে বাড়িয়ে দেয়।

যৌনশিক্ষার ইতিহাস নিয়ে আমি পড়াশুনা করেছি এবং এ বিষয়ে আপনাকে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, যৌনশিক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন। এর লক্ষ্য হলো সমাজ পরিবর্তন করা। ৫০ বছর আগে যখন এটি শুরু হয়েছিল তখনও সত্য ছিল, এবং এখনো সত্য। উদ্দেশ্য হলো আমার সমাজকে পরিবর্তন করা, এবং এখন, আপনার সমাজকে।

যৌনশিক্ষার শিখন লক্ষ্য হলো 'সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করা'। [যারা বিস্তৃত যৌনশিক্ষার পক্ষে সমর্থন করেন, তারা] এমন একটি বিশ্ব কল্পনা করেন, যেখানে যৌন নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক নিয়ম (ট্যাবু) থাকবে না—এমন একটি বিশ্ব, যা ধর্মীয় নীতি থেকে মুক্ত, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি, বয়স নির্বিশেষে, প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী যৌন আচরণ করবে। এবং কোনো রকম সমালোচনা [নিষিদ্ধ] থাকবে না। এটি মূলত 'যৌনশিক্ষার এমন দর্শন যেখানে যতক্ষণ কনডম ব্যবহার করা হয় সবকিছুই ঠিক আছে'।

পঞ্চাশের দশকেও আমেরিকার সমাজ এত রক্ষণশীল ছিল যে সামাজিকভাবে 'সেক্স' শব্দ উচ্চারণ করাও ছিলো লজ্জার, এটি ছিল গোপনীয় এবং স্পর্শকাতর বিষয়। যৌনতার বিষয়কে জনপরিসরে এনে খুঁটিনাটি আলোচনা করে ওই ধারনাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিনসি। কয়েক হাজার নারীর সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে কিনসি হস্তমৈথুন, বিয়েপূর্ব যৌন কার্যকলাপ, বিয়ের পর পরকীয়াসহ আরো নানান রকমের যৌনকর্মের ওপর তথ্য সম্বলিত করেছেন। কিনসি'র গবেষণা পদ্ধতিগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং এমনকি ন্যূনতম এথিক্সও না মেনে ডেটার আলোকে তিনি বলেন, সমস্ত নারীদের অর্ধেক সংখ্যক নারী বিয়ের আগে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। শিশুরা জন্মের পর থেকেই যৌন-সক্রিয়; সেটা প্রমাণ করতে পাঁচ মাসের শিশুদের ওপরও সেক্সুয়াল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন, তাদের অর্গাজম হয় কিনা দেখেছেন।

কিনসি'র গবেষণাকর্মে লজিস্টিক্যাল সহায়তা করেছিলো ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, ফান্ডিং করেছে জায়নবাদী সংস্থা রকফেলার ফাউন্ডেশন। তার গবেষণায় পদ্ধতিগত এবং নৈতিক মান নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা, বিতর্ক সত্ত্বেও লিবারেল পলিসিমেকার এবং তাদের সহযোগীরা এগুলো রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে প্রচলিত আইন পরিবর্তনসহ বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করেছে। এতে বিকৃত যৌনতার দরজা খুলে গেছে। বর্তমানের LGBTQ+ মুভমেন্টকে কিনসি তাত্ত্বিক ভীত দিয়েছে। কিনসি'র প্রবর্তিত যৌন স্কেল স্বাভাবিক নারী-পুরুষের বাইনারী যৌনতার বাইরে যৌনতার অনেকগুলো ধারণার জন্ম দিয়েছে, এখনো যৌন গবেষণার ভিত্তি হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিনসি মারা যায় ১৯৫৬ সালে। আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে এমন নৈতিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, সচেতন এবং নৈতিক বোধসম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় কিনসি'র কাজগুলোর তাৎক্ষণিক ফলাফলকে থামানো গেলেও ২০২৪

সালে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি, তার সমাজ এবং পরিবারবিধ্বংসী প্রচেষ্টা আসলে ব্যর্থ হয়নি। তার বপন করা বীজ আজ বিশাল এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আজকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌনশিক্ষা কিনসির সেই প্রচেষ্টারই ফল। শিক্ষা আর অধিকারের নামে ছেলেমেয়েদের মাথায় একদম শিশুকাল থেকে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে—তারা একটা যৌনসর্বস্ব প্রাণী।

ব্যক্তিগতভাবে কিনসি নিজেও ছিলেন একজন যৌন বিকারগ্রস্ত মানুষ। ছিলেন শিশুকামী, তারও ছিলেন যৌনতার ফেটিশ। কিনসির জীবনীকার James H. Jones লিখেন[১৬]_

> Kinsey was a deeply disturbed individual with bizarre sexual fetishes and that Kinsey, an admitted bisexual, engaged in masochistic sexual behavior.

কিনসি নিজেই ছিলেন উদ্ভট যৌনাচারে অভ্যস্ত মানুষ। তিনি একজন স্বঘোষিত উভকামী, যিনি মানুষের যন্ত্রণা থেকেও যৌন উত্তেজনা এবং আনন্দ লাভ করতেন।

কিনসির কাজের সবচেয়ে জঘন্য দিক হচ্ছে নীচের টেবিলটি। শিশুরাও যে যৌনসক্রিয়, এবং যৌন অনুভূতি জন্মের পর থেকে পেতে পারে সেটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বয়ঃসন্ধিপূর্ব শিশুদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন[১৭]। এগুলোর মাধ্যমে তিনি তাদেরও অর্গাজম হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। আর এসব পরীক্ষা তিনি করেছেন তার টিমের পেডোফাইলদের (শিশুকামী) মাধ্যমে, যা কুখ্যাত টেবিল-৩৪ নামে পরিচিত।

AGE	NO. OF ORGASMS	TIME INVOLVED	AGE	NO. OF ORGASMS	TIME INVOLVED
5 mon.	3	?	11 yr.	11	1 hr.
11 mon.	10	1 hr.	11 yr.	19	1 hr.
11 mon.	14	38 min.	12 yr.	7	3 hr.
2 yr.	7	9 min.	12 yr.	3	3 min.
	11	65 min.		9	2 hr.
2½yr.	4	2 min.	12 yr.	12	2 hr.
4 yr.	6	5 min.	12 yr.	15	1 hr.
4 yr.	17	10 hr.	13 yr.	7	24 min.
4 yr.	26	24 hr.	13 yr.	8	2½ hr.
7 yr.	7	3 hr.	13 yr.	9	8 hr.
8 yr.	8	2 hr.		3	70 sec.
9 yr.	7	68 min.	13 yr.	11	8 hr.
10 yr.	9	52 min.		26	24 hr.
10 yr.	14	24 hr.	14 yr.	11	4 hr.

Table 34. Examples of multiple orgasm in pre-adolescent males
Some instances of higher frequencies.

এই টেবিলে চৌদ্দ বছরের কিশোর থেকে একদম পাঁচ মাসের সদ্যজাত শিশুও রয়েছে। কিনসি বিভিন্ন পেডোফাইলদের মাধ্যমে তাদের ওপর পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, শিশুরাও যৌন আনন্দ লাভ করে, তারাও যৌন উত্তেজনা বোধ করে। এটার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার একটা সময় বেঁধে দেয়া হয়, এবং এই সময়ের মধ্যে তাদের কত বার অর্গাজম হয়, সেটা রেকর্ড করা হয়। কিনসি রিপোর্টে এগারো মাসের একটা শিশুর এক ঘণ্টায় দশ বার অর্গাজম হয়েছে। কিন্তু কিনসি বলছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয়, শিশুরা যন্ত্রণা এবং ব্যথা পেলেও, চিৎকার এবং কান্না করলেও তারা এই যৌনকাজে আনন্দ পায়, সাড়া দেয়।

Dr. Mary Calderone, কিনসির কাজ, মতাদর্শ, চিন্তাধারার অন্যতম একজন সমর্থক এবং প্রচারক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে Planned Parenthood এর মেডিকেল ডিরেক্টর থাকাকালীন 'প্লেবয়' ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা Hugh Hefner এর কাছ থেকে ফান্ড নিয়ে SIECUS প্রতিষ্ঠা করেন। কিনসির মতো তিনিও মনে করতেন যৌনতার প্রচলিত (ট্র্যাডিশনাল) দৃষ্টিভঙ্গি ভাংতে হবে। উনার মতে, শিশুদেরকে শেখানো জরুরি যে, তারা যৌনসত্তা (Sexual being), যৌনতা খারাপ নয়। যৌনতা যেকোনো বয়সে স্বাভাবিক এবং আনন্দায়ক বিষয়। কিনসির গবেষণাকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন যে, সদ্যজাত শিশুরও যৌন অনুভূতি আছে। সে-ও যৌনসক্রিয়। পিতামাতাদের উদ্দেশ্য করে লিখিত বইতে তিনি বলেন 'শিশুরাও যৌনসক্রিয়। তারা যৌনতা নিয়ে ভাবে।'

SIECUS এর আরেকজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা Wardell Pomeroy, কিনসির শিষ্য (পিএইচডি স্টুডেন্ট) এবং সহলেখক। তিনি কিনসি ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টরও ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলো একটা বাঁধা। সমাজের পুরো বিশ্বাসের পরিমণ্ডলটাই পুনর্গঠন করতে হবে; ধর্ম মানুষের চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। তিনি এটা খুব জোরালোভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শরীরের আনন্দ অনুভূতিকে নৈতিকতার মতোই গুরুত্ব দেয়া উচিত।

১৯৮০ সালের টাইম ম্যাগাজিন-এ Attacking the Last Taboo শিরোনামে একটা আর্টিকেলে অজাচারের (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন, যেমন মা-ছেলে, ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে ইত্যাদি) পক্ষে লিখতে গিয়ে Wardell কে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে[১৮]—

'It is time to admit that incest need not be a perversion or

a symptom of mental illness...Incest between ... children and adults ... can sometimes be beneficial.'

অর্থাৎ- 'এখন স্বীকার করতে হবে যে, অজাচার কোনো বিকৃত আচরণ অথবা মানসিক অসুস্থতা নয়। শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে অজাচার কখনো কখনো উপকারীও হতে পারে।'

এই লোকগুলোই SIECUS এবং IPPF প্রতিষ্ঠা করেছে, যে সংস্থাগুলো সারা বিশ্বের শিশুদের ওপর যৌনশিক্ষা চাপিয়ে দিতে কাজ করছে।

আধুনিক যৌনশিক্ষা যেসব নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে[১২]

* শিশুরা জন্মের পর থেকেই যৌনসক্রিয়। তাই তাদের যৌন অনুভূতি প্রকাশে বাধা দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের যৌন অধিকারকে লংঘন বা বাধাগ্রস্ত করা।
* সুস্থ জীবন যাপনের জন্য শিশু এবং বয়স্কদের প্রতিনিয়ত যৌন অভিজ্ঞতা নেয়া উচিত। এটা একা একা (হস্তমৈথুন) অথবা বিপরীত/সমলিঙ্গের কারো সাথেও হতে পারে।
* যৌন আনন্দের অধিকার অন্য যে কোনো অধিকারের ওপর প্রাধান্য পাবে, এমনকি সেটা শিশু বয়সেও।
* শিশুদের যৌনতার ব্যাপারে গোপনীয়তার অধিকার তাদের মা-বাবার তদারকি করার অধিকারের ওপর প্রাধান্য পাবে।
* পিতামাতাকে জানানো ছাড়া এবং তাদের সম্মতি ব্যাতিরেকে শিশু-কিশোরদের যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া এবং গর্ভপাত ঘটানোর অধিকার আছে।
* সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ যৌন এবং লিঙ্গ রীতিনীতি (বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত) জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা অস্বাস্থ্যকর। এসব পরিবর্তন করা উচিত।

যৌনশিক্ষার সেকাল

শুরুর দিকে যৌনশিক্ষা এমন ছিল না। ইউরোপে যৌনশিক্ষা নিছক সচেতনতা বাড়ানোকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে শিশুদের যৌনশিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতাদের সাহায্য করতে যৌনশিক্ষামূলক বেশ কিছু

কন্টেন্ট প্রকাশ করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যৌনশিক্ষা নিয়ে স্কুলে খুব সামান্যই পড়ানো হতো। তখন যৎসামান্য ছিল, তা মূলত 'স্বাস্থবিধি' সম্পর্কিত। ১৯২০-এর দশকে বয়সে কিছুটা বড় ছাত্রীদেরকে আত্মসম্মানবোধ এবং লজ্জা, বিনয় এবং নম্রতা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হতো এবং কর্মক্ষেত্রে ছেলেরা কীভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তা স্কুল জীবন শেষ করার আগে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেয়া হতো[১১]।

১৯৫০ এবং ১৯৬০

এই সময়টাতে ইংল্যান্ডের অনেক স্কুলে খরগোশের প্রজনন ব্যবস্থা এবং ফুলের পরাগায়নের ওপর পাঠ দেয়া হতো। এই পাঠগুলোর অ্যানেকডোটাল (ব্যক্তি পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ) বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে তখন যৌনশিক্ষা গাছপালা এবং সাধারণ প্রাণীর প্রজনন ব্যবস্থার বর্ণনার মাধ্যমে দেয়া হতো, মানুষের জৈবিক কাজের সরাসরি কোনো পাঠ তখনও ছিল না। আবার প্রাণী এবং গাছপালার প্রজননব্যবস্থার শিক্ষাও হতো সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে, সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নয়। তখন সম্ভবত পাবলিক স্কুলের ছাত্রদেরকে হস্তমৈথুনের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করা হতো। এই সময়ে যৌনশিক্ষা মূলত প্রজনন সম্পর্কে শিক্ষাদান হিসাবে দেখা হতো, যা জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের জন্য জীববিজ্ঞান বেশি উপযুক্ত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতো। তাই ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি যৌনশিক্ষা পেত।

১৯৭০ এবং ১৯৮০

সত্তর দশকের শুরুতে যৌনশিক্ষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এর নেপথ্যে ছিল ১৯৬০ এবং-৭০ এর দশকের বড় সামাজিক পরিবর্তন (যৌন বিপ্লব শুরুর দিকে)। স্কুলের বায়োলজি পাঠ্যপুস্তকগুলো মানুষের প্রজনন বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করে, এবং গর্ভনিরোধের পদ্ধতিগুলোও আরও ব্যাপকভাবে শেখানো হতে থাকে। যৌনতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, যৌন আচরণে অপরাধবোধ, এবং বিব্রতবোধ ও উদ্বেগ কমানো ছিল যৌনশিক্ষার মূল লক্ষ্য।

আশির দশকে যৌনশিক্ষার পরিধি বড় হতে থাকে। এই সময়ে নারীবাদী চিন্তাধারণা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে। যৌনশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে জেন্ডার রোল (লিঙ্গ ভূমিকা) সংক্রান্ত চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজে

লিঙ্গবৈষম্যের অস্তিত্ব বোঝানো হতো যৌনশিক্ষার মাধ্যমে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এ সময় নারীবাদীরা যৌনশিক্ষার বিরোধিতা করতো। তাদের ভাষ্য ছিল এই প্রোগ্রামগুলো সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা মানুষকে তখন আরো বুঝাতে থাকে যে, এই প্রোগ্রামগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাকে নারীদের ওপর চাপানো। অর্থাৎ যদিও পুরুষরা চাইলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু তা না করে পুরুষরা নারীদের আচরণের দোষ দেয়। তাই নারীদের এমনভাবে আচরণ করতে হবে, চলাফেরা করতে হবে, যেন পুরুষরা উত্তেজিত না হয়ে পড়ে। নারীবাদীদের হস্তক্ষেপের পরে যৌনশিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে।

এইচআইভি মহামারি এবং যৌনশিক্ষা পলিটিক্স

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, অ্যান্টিবায়োটিকের আবির্ভাবের ফলে যৌন বাহিত সংক্রমণ (STIs) সম্পর্কে ভয় কমে যায়, যার জন্য যৌনশিক্ষাও প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতি ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, যখন এইচআইভি মহামারি দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এইচআইভির কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং এইডস-এর চিকিৎসা না থাকায় এই ভয় আরও বেড়ে যায়। যৌনশিক্ষা নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের মধ্যে এইচআইভি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে উঠে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের গর্ভনিরোধক ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের অধিকার নিয়ে ১৯৮৫ সালের গিলিক কেসের মতো বিতর্ক এবং সমকামী আন্দোলনের উত্থান জনমতকে বিভক্ত করে। সংক্ষেপে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যৌনশিক্ষার ল্যান্ডস্কেপ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিকের উদ্ভাবন, এইচআইভি/এইডসের আবির্ভাব এবং যৌনতার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন বিতর্ক এবং নীতিমালার উত্থান ঘটেছে। স্কুলের পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষা আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ২০১০ সালের পর থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে মূলত পশ্চিমা মূল্যবোধের যৌনশিক্ষা বৈশ্বিক এজেন্ডায় পরিণত হয়। নাইরু'র মত ক্ষুদ্র দেশেও স্কুলের পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না করা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো আর্থিক সহয়তা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়।

ব্র্যাক যৌনশিক্ষা প্রকল্প শুরু করে ৯০'র দশকে!

১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রথমবারের মতো প্রজনন অধিকার আলোচনায় আসে। জাতিসংঘ এতদিন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রিক এজেন্ডা থেকে সরে এসে টেকসই উন্নয়ণের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ণে প্রজনন অধিকারকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করার জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্র্যাক অন্যতম এনজিও হিসেবে পরিগণিত হয়। জাতিসংঘের এজেন্ডা ভবিষ্যতে কোনদিকে বিস্তৃত হবে তা ব্র্যাকের থিংক-ট্যাংক অবহিত ছিল। সেই লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে নারীর ক্ষমতায়নে যৌনশিক্ষাকে জোর দিয়ে কাজ শুরু করে। ব্র্যাক কিশোর-কিশোরী জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা (Adolescent Reproductive Health Education, ARHE) কার্যক্রম চালু করে। ২০০০ সালে যৌনশিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে এই শিরোনামে -'Providing sex education to adolescents in rural Bangladesh: Experiences from BRAC'- একটি প্রতিবেদন Gender and Development জার্নালে প্রকাশিত হয়[১]।

এসআরএইচআর কার্যক্রমে ১২ বছরের বেশি বয়সী এমন কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা কখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। ব্র্যাকের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি (BEOC) বা কিশোর-কিশোরী স্কুলের সিলেবাসের অংশ হিসেবে এই যৌনশিক্ষার ক্লাসগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা তিন বছর মেয়াদী ছিল। এই ক্লাসগুলো স্কুল জীবনের শেষ বর্ষে প্রদান করা হতো। ১৯৯৮ সালে যখন এই মূল্যায়ন গবেষণাটি পরিচালিত হয়, তখন ৮০৩টি স্কুলের ২৭,১৭৫ জন শিক্ষার্থী যৌনশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছিল। কারিকুলামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন:

* কৈশোরে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন (যেমন- ঋতুস্রাব, স্বপ্নদোষ)
* নারী ও পুরুষের শারীরবিদ্যা, প্রজনন প্রক্রিয়া (গর্ভধারণ, গর্ভাবস্থা এবং সন্তান জন্মদান)
* পরিবার পরিকল্পনা, যৌন-সংক্রমণ রোগ, বিবাহ এবং সন্তান জন্মের জন্য উপযুক্ত বয়স

এই কার্যক্রমে বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। ব্র্যাকের গবেষক, প্রফেসর সাবিনা ফাইজ রশিদ, যিনি

বর্তমানে ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ অনুষদের দায়িত্বে আছেন এবং ব্র্যাকের মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকার আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এই আলোচনার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন—

> 'Moral disapproval of sexual activities outside marriage means that overall discussion and knowledge of such issues tend to be limited.'

অর্থাৎ, বিবাহবহির্ভূত যৌন কার্যকলাপকে অনৈতিক স্বীকার করা মানে যৌনতার সার্বিক আলোচনা এবং জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া।

১৯৯৮-২০০০ সালে পরিচালিত এই নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফল ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ বিভিন্ন প্রকল্পের, যেমন- ব্রেকিং দ্যা শেইম প্রজেক্ট, মাসিক ব্যবস্থাপনা, যৌনশিক্ষার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে স্কুলভিত্তিক কিশোর ক্লাব বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই গবেষণার অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৫-২০১৮ সালে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল লজ্জা ভাঙা (Breaking the shame) এবং ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উপায় নিয়ে স্কুল পর্যায়ে এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছে। যৌনশিক্ষা নিয়ে প্রকাশিত গবেষণার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো—

* মেয়েদের ঋতুস্রাব নিয়ে যৌনশিক্ষার ক্লাসে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশে এটি যৌনতা, গর্ভধারণ ও অপবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা সামাজিকভাবে লজ্জার এবং গোপনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

* যৌনশিক্ষার ক্লাসগুলোর মাধ্যমে কিশোরী এবং তরুণীদের মাঝে যৌনতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরী করে। কিশোরী মেয়ে এবং কিছু শিক্ষকের মধ্যে যৌন তাড়না, যৌন তৃপ্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজন নিয়ে গবেষকদের সাথে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিল। এই ধরনের খোলামেলা আলোচনা রক্ষণশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে (যেখানে যৌনতা নিয়ে নারীর লাজুক [নিষ্ক্রিয়] স্বভাবকে ভাল ও পবিত্র ভাবা হয়, এবং খোলামেলাভাবে যৌনতা প্রদর্শন করাকে লজ্জাহীন হিসেবে গণ্য করা হয়) এই গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ। এক মেয়ে যৌন তৃপ্তি নিয়ে খোলামেলা অনুভূতি প্রকাশ করে এভাবে—My friend is very nice and he prays five times a day. He kissed me. I think that is normal ... Both

men and women have equal rights in the sexual relationship.

* গবেষণায় উঠে আসে শিক্ষক এবং কিশোরীরা এমন ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত যা থেকে ধারণা করা যায় যে, মৌলিক চাহিদার (primal needs) কারণেই মানুষ যৌন-তাড়িত হয়, নিজের আচরণের নিয়ে তাদের দায়বদ্ধতা নেই। কৈশোরপ্রাপ্ত ছেলে এবং এমনকি মেয়েরাও মনে করে যৌবনকালে যৌন তাড়না নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, যার কারণে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক তৈরী হয়। কেউ কেউ মনে করেন খুব বেশী যৌন তাড়না/প্রয়োজন এবং অনিয়ন্ত্রিত তাড়না হরমোনের কারণে হয়ে থাকে, যার কারণে ছেলে ও মেয়েরা যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় (Some referred to too much desire/needs, and uncontrollable urges brought on by hormones: Boys and girls get involved in sexual relations to meet their sexual needs.)। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েদের যৌন আচরণের জন্য দায়ী হচ্ছে 'যৌন তাড়না'।

* এই গবেষণায় দেখা গেছে, হস্তমৈথুন নিয়ে যৌবনপ্রাপ্ত তরুণরা বিচলিত নয় (We get together and watch all these naked people mixing with one another. We feel good, and we sit and masturbate to satisfy our desires)। অন্য গবেষণা অনুযায়ী হস্তমৈথুনকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে দেখা যাবে, ব্র্যাক এই সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে কাজ করবে, হস্তমৈথুন যৌন-তাড়না মেটানোর জন্য যে একটি ভাল উপায়, তা নিয়ে স্কুল পর্যায়ে ভিডিও এবং পুস্তিকার মাধ্যমে এক্সপেরিমেন্ট করবে, যাতে এগুলো স্কুলের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা যায়।

* ছেলেরা মনে করে মেয়েদের তুলনায় তারা বেশী যৌন স্বাধীনতা ভোগ করে ('While some boys felt that their behaviour was justified by the fact that they had `more desires compared with adolescent girls')। অনেক মেয়ে মনে করে তাদেরও একই রকম যৌন তাড়না এবং অনুভূতি থাকলেও সামাজিক চাপে তারা প্রকাশ করতে পারে না ('many commented that girls, although they may share similar urges and feelings, are unable to express themselves because of social pressures')

* যৌনশিক্ষার ক্লাসগুলো ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা করে দেয়া হয়েছে কেননা এই ধরনের আলোচনা ছেলে-মেয়েদের একসাথে নিয়ে করা সামাজিকভাবে ঠিক নয় মনে করেন শিক্ষিকারা। ছেলেদের নিয়ে ক্লাস করাতে শিক্ষিকারা লজ্জা পান, কেননা উঠতি বয়সের ছেলেরা হাসাহাসি করে।

সামনে আমরা দেখতে পাবো যৌনশিক্ষা নিয়ে শিক্ষকদের লজ্জার বিষয়টি সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা লবিং করে 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব' ধারণা কারিকুলামের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায়!

* অনিরাপদ যৌন কার্যকলাপের সাথে এইডস এবং অন্যান্য রোগ জড়িত এবং কনডম ব্যবহারে যৌন সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়- এই বিষয়ে সচেতনতা সত্ত্বেও প্রায় সবাই মনে করে পতিতালয়ের গমন করলে এইডস হতে পারে (If someone goes to a bad person (prostitute) they will get AIDS , or [having] too many partners causes STDs)
* সমবয়সী কিশোর-কিশোরী নেটওয়ার্ক (peer network) ব্যক্তি পরিচয় এবং গ্রুপ পরিচয় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যৌনশিক্ষার ক্লাস করার কারণে সহপাঠীদের মাঝে সহজ সম্পর্ক তৈরী হয়। এই 'কমান্ডারশীপে'র নিজেদের মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে পরস্পরের ভালো বোঝাপড়া তৈরী হয় এবং এর ফলে পূর্বের তুলনায় মেয়েরা কম টিজিং-এর শিকার হয়েছে।
* যৌনশিক্ষার ফলে কমিউনিটিতে 'সংবেদনশীল' বিষয় নিয়ে নীরবতা এবং লজ্জা/গোপনীয়তার পরিবেশ ভাঙতে সহজ হয়েছে এবং এর ফলে কিশোর-কিশোরী এবং পিতামাতাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে বলে এই পেপারে দাবী করা হয়।

ব্র্যাক-ওয়াশ প্রকল্প (USD ১০০+ million): স্কুল ভিত্তিক মাসিক ব্যবস্থাপনা

মেয়েদের মাসিক নিয়ে খোলামেলা আলোচনার কালচার পৃথিবীতে ২০০০ সালের আগেও তেমন ছিল না[২০]। ধর্মীয় এবং সংস্কৃতি হিসেবে সব সমাজেই মাসিককে গোপনীয় বা লজ্জার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পশ্চিমা থিংক-ট্যাংক এ

কারণে মাসিককে ট্যাবু (কুসংস্কার) আখ্যায়িত করে। মাসিক নিয়ে সামাজিক লজ্জা ভাঙ্গার এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে ১৯৯৯ সালে ব্র্যাক স্যানিটারি নাপকিন তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্র্যাকের নারী স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন কম দামে বিক্রি শুরু করে। এই বিক্রির একটা অংশ (কমিশন) স্বেচ্ছাসেবীরা পায়, যা তাদের জন্য মোটিভেশান হিসেবে কাজ করে।

ব্র্যাকের নারী কর্মীরা বাড়ীর উঠানে কিশোরী এবং বিবাহিতদের নিয়ে গুচ্ছ মিটিং-এর মাধ্যমে ঋতুস্রাব/মাসিক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য শেয়ার করে সচেতনতার কাজ শুরু করে। যেমন- মাসিকের সময় আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, মাসিকের জন্য ব্যবহার্য কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকানো। ব্র্যাক দাবী করে, এই প্রকল্পের কয়েক বছর আগেও মাসিক নিয়ে এমন খোলামেলা আলোচনা সামাজিকভাবে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। এই ন্যাপকিন ফেরি করা প্রজেক্টের মাধ্যমে মাসিকের ব্যাপারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লজ্জা/ট্যাবু ভাঙতে শুরু করে।

২০০৫ সালের আগে উন্নয়নশীল বিশ্বে মাসিক পলিসি লেভেলে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না, এমনকি তেমন সায়েন্টিফিক লিটারেচারও পাওয়া যেত না[২১]। বিশ্বব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা এজেন্ডার টার্গেট পপুলেশন ছিল ১৫ বছর এবং তার বেশী বয়সী নারীরা। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো ছিল মূল লক্ষ্য। সেই সময়ের অন্যতম বড় একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে পানিবাহিত রোগ (ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড) প্রতিরোধে উন্নয়নশীল দেশে পশ্চিমা দাতা সংস্থাগুলো অর্থায়ন করে ওয়াশ প্রকল্পে (WASH- water, sanitation, and hygiene)। শুরুতে ওয়াশ প্রকল্পে মাসিক হাইজিন ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দাতা সংস্থা এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মাসিক ব্যবস্থাপনাকে ব্যক্তিগত ইস্যু এবং পরিবারের দায়িত্ব মনে করতেন। তাই এটা প্রাইওরিটি লিস্টে ছিল না।

নারী ও পুরুষের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য বা গ্যাপ নিয়ে ২০০৪-২০০৫ সালে শক্তিশালী মুভমেন্ট গড়ে উঠে। এই সময়টাতে কিছু এনজিও মাসিকের কারণে নারী শিক্ষার্থীদের স্কুলে অনুপস্থিতি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে ডেটা সংগ্রহ শুরু করে। মাসিক হাইজিন ব্যবস্থাপনা আন্দোলনে সেই বিখ্যাত জায়নবাদী প্রতিষ্ঠান রকফেলার ফাউন্ডেশন (যৌন বিপ্লবের গবেষণা ও এক্টিভিজমেও তারা ফান্ডিং করেছে) ভিত্তি গড়ে তুলতে সোস্যাল সায়েন্স এবং এই বিষয়ের প্রযুক্তিগত গবেষণায় অর্থায়ন করে[২১]। বিশ্বের সুশীল সমাজকে এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে, যেন মাসিক ব্যবস্থপনা পলিসি এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করে। এই সময়ে ইউনিসেফসহ আরো এনজিও বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে স্কুলের মেয়েদের মাসিক হাইজিন ব্যবস্থাপনা ওপর ছোট ছোট ফান্ডিং শুরু করে।

ইউনিসেফের উদ্যোগে ২০০৫ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে রাউন্ডটেবিল মিটিং-এ মাসিকের কারণে স্কুলের মেয়েরা কোন কোন ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এরপর থেকে মাসিক বিষয়টি চলমান ওয়াশ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশের ব্র্যাক মাসিক নিয়ে অনেক আগেই কাজ শুরু করে, ডেটা তৈরির কাজ করে। এর ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক ওয়াশ প্রকল্পের জন্য ২০০৬-২০১৫ ব্যাপী ১০০+ মিলিয়ন ডলারের পশ্চিমা ফান্ডিং লাভ করে। স্কুলে মেয়েদের টয়লেট বানিয়ে দেয়ার মোড়কে যৌনশিক্ষা (মাসিক হাইজিন ব্যবস্থা) কার্যক্রম আটঘাট বেঁধে শুরু হয়[২২]।

এখানে পাঠকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—ঠিক এই সময়টাতেই (২০০৫) ব্র্যাকের পাবলিক হেলথ স্কুল রিয়েলাইজিং রাইটস (Realising Rights, funded by UK) প্রজেক্টের নামে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করে এবং কেয়ারটেকার সরকারের আমলে মোক্ষম সুযোগে ২০০৭ সালের জুলাই মাসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশে LGBTQ+ তথা পায়ুসংগম করার অধিকার জনপরিসরে দাবী করে।

GRANT INFORMATION

Project Name	Water, sanitation and hygene programme		
Organization Name	BRAC		
Grant ID# EKN	13880/DHA0075307 (WASH I) 23167 (WASH II)	Contact person EKN	Carel de Groot Michiel Sistema
Grant ID# BMGF	2011/081	Contact person BMGF	Jan Willem Rosenboom
Date Grant Awarded EKN	01-06-2006 (WASH I) 01-10-2011 (WASH II)	Project End Date EKN	30-09-2011(WASH I) 30-04-2016 (WASH II)
Date Grant Awarded BMGF	01-11-2011	Project End Date BMGF	30-11-2014
Grant Amount EKN	EUR 62.96 million (WASH I) EUR 27.3 million (WASH II)	Project Duration EKN	5 years 5 months (WASH I) 3 years 7 months (WASH II)
Grant Amount BMGF	USD 11 milion	Project Duration BMGF	3 years
Report Period from	2006 to 2016		

মাসিক হাইজিন ব্যবস্থাপনা গ্লোবাল এজেন্ডা হওয়ার পর ছোটো-খাটো অনেক লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল এনজিও কাজ শুরু করে। বাংলাদেশের এনজিও কার্যক্রম তেমন মনিটর করা হয় না, তারাও জনপরিসরে রিপোর্ট প্রকাশ করে না। তাই কাজের বিস্তৃতি সম্পর্কে অনুধাবন করা কঠিন। উন্নয়ন সেক্টরে বিশ্বের বড় বড়

দাতাসংস্থা এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান (যেমন- ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ইউএনডিপি, ইউএসএইড) বাংলাদেশে বড় প্রজেক্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্র্যাক সচরাচর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ্যভাবে জড়িত থাকে।

দীর্ঘদিন মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাক কাজ করছে এবং তাদের সাথে মিডিয়া, সরকারের পলিসিমেকার, সুশীল সমাজের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। মাঠ পর্যায়ের বড় নেটওয়ার্ক এবং ব্যবস্থাপনার সাপোর্ট ব্র্যাক দিয়ে থাকে। তাই উন্নয়ন সেক্টরে যেকোনো গ্লোবাল এজেন্ডার বৃহৎ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্র্যাক অবধারিতভাবে এসে যায়। ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় সক্ষমতা হচ্ছে, তারা কোনো আইডিয়া সারাদেশে স্কেলআপ (Scale up) করার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম এনজিও প্রতিষ্ঠান।

ব্র্যাকের সহোদর ভাইয়ের মতো কলাবোরেটিভ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আইসিডিডিআর,বি যার সক্ষমতা হচ্ছে পাবলিক হেলথ রিসার্চ এবং ল্যাব ভিত্তিক ডেটা কালেকশন এবং এনালাইসিস করা। মাসিক হাইজিন ব্যবস্থাপনা এবং LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজের বেইজলাইন ডেটা তৈরী করতে আইসিডিডিআরবি আড়ালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দিনশেষে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষা করা।

পাঠ্যপুস্তকে মেয়েদের মাসিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তি

ব্র্যাক-ওয়াশ প্রজেক্ট কীভাবে কাজ করেছে, তা এই প্রোগ্রামের একজন ম্যানেজার, মিস শারমিন ফারহত থেকে জানা যাক[২৩]-

> 'শুরু থেকেই (২০০৭), ব্র্যাক-ওয়াশ কার্যক্রমে জেন্ডার স্ট্রাটেজি, জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভনেস), জেন্ডার সমতা, নারী স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া হয়। ২০০৮ সালে আমরা মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাট্রিন (টয়লেট) নির্মাণ শুরু করি। টয়লেট নির্মাণের পর, স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একদিনের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে পুরুষ এবং মহিলা শিক্ষক উভয়েই যৌথ ওরিয়েন্টেশন সেশনে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে মাসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ মিটিংগুলো মাসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা আরও স্বাভাবিক করে তোলে।'

মাসিক হাইজিন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সমন্বয়ে একটি ১৪ সদস্যের স্কুল ওয়াশ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ২৪ সদস্যের একটি শিক্ষার্থী ব্রিগেড টিম গঠন করে। এই টিম মেম্বারদের প্রতি বছর স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে তিন দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, তাদের স্কুলের চত্বর এবং স্যানিটেশন সুবিধা পরিষ্কার রাখা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা সম্পর্কে ট্রেইনিং দিয়ে শেখানো হয়।

ওয়াশ প্রজেক্টের উদ্যোগে সারাদেশে ৬,৩২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৪ লক্ষের বেশী কিশোরীদের জন্য আলাদা টয়লেট করা হয়; সেখানে মাসিক হাইজিন ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্র্যাকের ওয়াশ ইন স্কুল প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক ইনোভেটিভ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঋতুস্রাব সম্পর্কে নীরবতা ভাঙ্গা হতো। শিক্ষার্থীদের কাছে ঋতুস্রাবকে একটি স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া হিসাবে চিত্রিত করা হয়। প্রতি বছর স্কুলগুলোতে একবার ন্যাপকিন কালেকশন কর্মসূচি আয়োজন করা হয় যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি করে স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাকেট জমা দিত, যা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে। সিনিয়র এডভাইজর ব্র্যাক-ওয়াশ প্রজেক্টের মিলন কান্তি বড়ুয়া বলেন—

'২০১০ সালে কিশোর-কিশোরীদের সাথে বাড়ীর উঠানে ক্লাস্টার মিটিং উদ্যোগ আরও এগিয়ে নেওয়া হয়। অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং কমিটির সদস্যদের নিয়ে বারবার আলোচনা করা হয়।' ... 'শুরুতে এই গণ্ডীবদ্ধ সভাগুলোতে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিষয় উঠলে লজ্জায় অংশগ্রহণকারীরা উঠে যেত। আমার মনে আছে, যখন শুধু কিশোরীদের জন্য সভা হতো, তখন সভা এলাকা পাটের ছালা দিয়ে আড়াল করে রাখা হতো, চারপাশে কৌতূহলী, সতর্ক বাবা-মাও উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু যখন তারা অনুধাবন করতে পারলেন, এটি তাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, তখন তারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।'

এই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে স্কুল ওয়াশ ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড অনুমোদিত হয়২৪। জনপরিসরে সচেতনতার উদ্দেশ্যে মাসিক হাইজিন দিবস ২০১৪ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো উদ্‌যাপিত হয়। ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসায় মাসিকের ইস্যুকে স্কুলের সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

২০১৬ সালে জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রাইভেট কোম্পানীগুলো লবিং করে যাতে জাতীয় পাঠ্যক্রমে মাসিক হাইজিন ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬-১৭ সালে প্রাইমারি এবং ম্যাসকমিউকেশন মন্ত্রণালয় পিইডিপি প্রোগ্রামে মাসিক হাইজিনের ইস্যু যুক্ত করে। ২০১৭ সালে ইউনিসেফ, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও স্কুলে মাসিক দিবস আহবান জানায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যৌনশিক্ষা (মাসিক ইস্যু) ২০১৩ সালে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের স্কুলের পাঠ্যক্রমে মাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের টাইমলাইন[২৪]—

বছর	বাংলাদেশে স্কুলে মাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাইলস্টোন
১৯৯৫	ব্র্যাক যৌনশিক্ষা প্রকল্প শুরু করে।
১৯৯৯	ব্র্যাক বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মাসিকের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদন করে এবং সেগুলো কম মূল্যে বাড়ি বাড়ি বিক্রির উদ্যোগ নেয়।
২০০৩	ইউনিসেফের (UNICEF) উদ্যোগে ইংল্যান্ডের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সহায়তায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাসিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়।
২০০৫	ওয়াটারএইড (WaterAid) ও তাদের সহযোগী সংস্থা (ব্র্যাক অন্যতম) শহর ও গ্রামের প্রেক্ষাপটে মাসিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্যাকেজ তৈরি করে।
২০০৬	ইউনিসেফ ঢাকার একটি বস্তিতে 'সানিমার্ট' প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে কিশোরী মেয়েরা স্যানিটারি পণ্য তৈরি ও বিক্রি করত।
২০১২	স্কুলে ওয়াশ (WASH- Water, Sanitation, Hygiene)-এর জাতীয় মানদণ্ড অনুমোদিত হয়, যা স্কুলে মাসিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে।
২০১৪	বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মেন্সট্রুয়াল হাইজিন ডে (মাসিক দিবস) উদ্‌যাপিত হয়।
২০১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoE) সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক ব্যবস্থাপনা সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা জারি করে।
২০১৬-২০১৭	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং এনজিও প্রতিষ্ঠান জাতীয় পাঠ্যক্রমে মাসিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে লবিং ও সমন্বয় করে।

বছর	বাংলাদেশে স্কুলে মাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাইলস্টোন
২০১৭	মেন্সট্রুয়াল হাইজিন ডে উপলক্ষে ইউএনিসেফ, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ স্কুলে মাসিক প্রচারণার প্রকল্প শুরু করে।
	বাংলাদেশে এসডিজি (Sustainable Developmental Goal, SDG) ভিত্তিক উইনস (WASH in Schools) এর জন্য সেক্টর পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়।
২০১৮	ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও আইসিডিডিআর,বি কিশোরীদের মাসিক দক্ষতা পরিমাপের একটি নতুন টুল তৈরি করে।



যৌনশিক্ষায় মাসিক (Menstruation) কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?

প্রাণীজগতে মাসিক খুবই বিরল ব্যাপার। বলা যায়, এটা নারীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ৯৮%-এর ক্ষেত্রে মাসিক হয় না[২০]। পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম (মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ, সিনটো ইত্যাদি) এবং সংস্কৃতিতে মাসিক সর্বতোভাবে লজ্জার বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়[২৫]। উনিশশো সত্তর দশকে শুরু হওয়া যৌন বিপ্লবের ফলে পশ্চিমা সমাজে পোশাক-আশাকে এবং সেক্সুয়াল বিষয়াদিতে তুলনামূলকভাবে খোলামেলা মানসিকতা লালন করলেও মেয়েদের মাসিক নিয়ে লজ্জাবোধ রয়েই গেছে। যেমন- আমেরিকার শতকরা ৫৮ ভাগ (২০১৮) এবং ফ্রান্সের শতকরা ৪৪ ভাগ (২০১৭) মানুষ মাসিকের ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে[২৬]। ১৯৮০-এর দশকে আমেরিকার সিংহভাগ মেয়ে মনে করত, মাসিক নিয়ে ছেলেদের সাথে আলোচনা করা উচিত নয়।

মাসিকের বিষয়টি নিয়ে নারীবাদীরা কেন এত মরিয়া, তা নিয়ে ধারনা পেতে 'The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma' শিরোনামে জার্নালে প্রকাশিত রিভিউ পেপারটি পড়তে পারেন[২৭]। সেই পেপারের নির্যাস

পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের মাসিক শুরু হলে (পোস্ট-মেনার্কেল) যৌনতার বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করা করা হয়, বলা হয়, তোমরা এখন 'বড়' হয়ে গেছো, এবং তাই 'লেডি'র মতো আচরণ করতে জোর দেয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা আগে যে স্বাধীনতা উপভোগ করত, সেগুলো খর্বিত হয়। এভাবে মাসিক ঋতুস্রাব নারীদেরকে পুরুষদের (ঐতিহ্যগতভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত) থেকে আলাদা করে। তাছাড়া নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে মাসিকের সময় নারীদেরকে দুর্বল, অসুস্থ, অক্ষম, নিয়ন্ত্রণহীন, এমনকি তাদেরকে উন্মাদ/ক্রেইজি হিসাবেও মনে করা হয়[২৭]।

নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন গবেষকরা মাসিকের রীতিনীতি, স্বাস্থ্যবিধি ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মাসিকের রক্তকে যে ঘৃণ্য মনে করে, এগুলোকে তার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মাসিকের রক্ত শরীরের অন্যান্য ফ্লুয়িড (তরল) যেমন মাতৃদুগ্ধ এবং পুরুষের বীর্যের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্রী মনে করা হয়। প্রায় সব ধর্মীয় সংস্কৃতিতে মাসিক চলাকালীন সময়ে নারীদের অপবিত্র হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে যৌন মিলনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যকরণীয় বিশেষ গোছল করতে হয়, যাতে (যেমন- ইহুদিদের মিকভা, মুসলিমদের ফরজ গোছল) তারা পুরুষের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারে। নারীবাদীদের মতে মাসিকের রক্তের প্রতি ঘৃণার মাধ্যমে মেয়েদের চরিত্র কলংকিত করা হয়[২৭]!

ল্যাটিনোদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে মাসিকের সময় তারা যোনি স্পর্শ, ওরাল সেক্স এবং যৌনসঙ্গম এড়িয়ে চলে। পুরুষরাও জানিয়েছে যে, তারা ঋতুস্রাবী যৌনসঙ্গীর সাথে এ জাতীয় কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা প্রশ্ন তুলেছেন, মাসিকের রক্তকে প্রথাগতভাবে অপবিত্র গণ্য করে এক ধরনের প্রথাগত ভীতি সঞ্চার করে নারীদেরদের আবদ্ধ রাখা কি উচিত?

তাদের মতে সেক্স করার জন্য উপযুক্ত সময়ই হচ্ছে মাসিককালীন সময়ে কেননা এসময় নারীরা গর্ভবতী হয় না এবং সেক্সুয়াল অর্গাজমের ফলে ঋতুস্রাবী নারীর পেটের প্রচণ্ড ব্যথা লাঘব হতে পারে[২৭]!

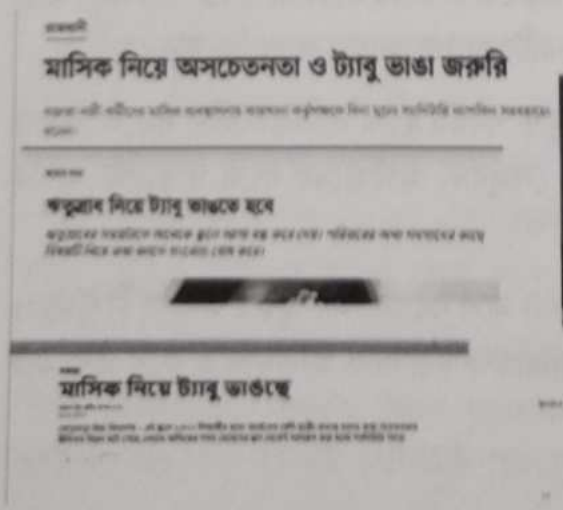
মোদ্দাকথা হচ্ছে, নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন, মাসিকের কলংক (স্টিগমা) ও নিষেধাজ্ঞা (ট্যাবু) নারীদের নীচু সামাজিক মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে এবং এই অবস্থায় পতিত হতে ভূমিকা রাখে।

জনপরিসরে মাসিক নিয়ে উন্মাদনা

শুরুতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাসিক মুসলিমদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এর সাথে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় পবিত্রতা এবং আচার-আচরণ। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা বয়ঃসন্ধিকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ছেলে এবং মেয়েদের মাঝে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়। এই পাঠদানের উদ্দেশ্য লজ্জাশীলতা ভাঙা নয়, বরং এর মাধ্যমে আরো লজ্জাশীল হতে সহয়তা করে। লজ্জাশীলতা মুসলিমদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে মাসিকের ট্যাবু ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের একসাথে কোরাস গাওয়ানো হচ্ছে—মাসিকের লজ্জা নেই। ছেলেদের হাতে মাসিকের প্যাড ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনকি প্রথম মাসিক উৎযাপন করছে কিছু এনজিও, মূলধারার মিডিয়াতে সেলিব্রেটিরা মাসিক উৎযাপনের কেক কাটা নিয়ে দাবী যানাচ্ছে, ইন্ডিয়ায় মাসিকের গান রচনা করা হচ্ছে। মিডিয়াতে গোল টেবিল হচ্ছে ('আসুন মাসিকের কথা বলি')।

ব্র্যাক-এর সিনিয়র সাপোর্ট স্পেশালিস্ট বিথী রায় বলেন, মাসিক নিয়ে যে ট্যাবু আছে, সেটা ভাঙতে হবে২৮। মাসিক বিষয়টি শুধু নারী বুঝলেই হবে না। পরিবারের সদস্য এবং সমাজকেও এটা বুঝতে হবে। এটাকে একটি স্বাভাবিক শারীরিক বিষয় হিসেবে জানতে হবে, মানতে হবে। তাহলে আর ভয় বা লজ্জা থাকবে না।

ওয়াটার এইডের পরিচালক (প্রোগ্রাম) হাসিন জাহান বলেন, বর্তমানে মেয়েদের নয় থেকে ১১ বছরের মধ্যেই মাসিক শুরু হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে কোনো কার্যক্রম নেই। এ স্তরের পাঠ্যপুস্তক কারিকুলামেও কিছু বলা হয়নি। তারা বিষয়টি নিয়ে যাতে কোনো ধরনের ট্রমার মধ্যে না পড়ে তার জন্য এই বয়সকে টার্গেট করে বিভিন্ন কার্যক্রম নিতে হবে।


মাসিক নিয়ে অসচেতনতা ও ট্যাবু ভাঙা জরুরি

মাসিক নিয়ে ট্যাবু ভাঙতে হবে


লজ্জা নয়, সচেতন হতে হবে

The Daily Star

'Break the taboo' campaign launched

'মাসিক নিয়ে লজ্জা আর নয়' স্লোগান!- উই ফর এডোলেসেন্ট[২৯]

প্রতিটি স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়েই কাজ করা হয়। বেশ কয়েকটি সেশনে কার্যক্রম চলে। প্রথম সেশনে মেয়েদের সংকোচ ভাঙিয়ে দেওয়ার কাজ করা হয়, যাতে তারা নিঃসংকোচে নিজেদের কথা বলতে পারে। প্রতিটি স্কুলেই এই সেশনে দুই আড়াই ঘন্টা সময় লেগে যায়। এরপরের সেশনে মেয়েদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের নিজেদের প্রথম পিরিয়ডের অভিজ্ঞতা। কেমন ছিল সময়টা, কেমন অভিজ্ঞতার দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেসবই জানায় ছাত্রীরা।

পরের সেশনে একজন ডাক্তার পিরিয়ড এবং সংক্রান্ত সবকিছু নিয়ে কথা বলেন। পিরিয়ডের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তিনি। এরপর মেয়েদের জন্য থাকে একটি কুইজ পরীক্ষা। এর মাঝেই ছাত্রীরা হাতে হাতে পেয়ে যায় স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের দিকনির্দেশনা এবং কৈশোরের যাবতীয় পরিবর্তন নিয়ে সচিত্র বুকলেট। কুইজ শেষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার এন্ড উইমেন্স স্টাডিজের শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীরা ছাত্রীদের সামনে আসেন আরেকটি সেশনে।

তারপর ছাত্রীরা গান, কবিতা, গল্প শোনায়। মেয়েরা চকলেটও পায়। একইসাথে প্রতিটি মেয়েকে তিন মাসের জন্য ন্যাপকিন উপহার দেওয়া হয়। এরপর কেউ কেউ সাদা কাগজে প্রকাশ্যে বলতে না পারা শারীরিক সমস্যাগুলো লিখে ডাক্তারের কাছে দেয়। এছাড়াও পিরিয়ড নিয়ে বানানো অ্যানিমেটেড ডকুমেন্টারি দেখানো হয়। ডকুমেন্টারির পর আবার ডাক্তার আরেকটি সেশন নেন চিরকুটে পাওয়া সমস্যার সমাধান নিয়ে। কুইজে বিজয়ীরা আলাদা বইও উপহার পায়। আরও নানান কিছুর পর সমস্বরে 'মাসিক নিয়ে লজ্জা আর নয়' স্লোগানে শেষ হয় চমৎকার এবং প্রাণবন্ত ইভেন্টটি।

প্রথম মাসিক স্কুলে উৎযাপন[৩০]*!*

নারীদের জন্য পিরিয়ড একটি অনিবার্য সত্য। অথচ বিষয়টিকে রীতিমতো নিষিদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সমাজে। শারমিন কবির ভাবলেন, পিরিয়ড সচেতনতা শুধু মেয়েদের জন্য নয়, সচেতন করতে হবে পুরুষদেরও। ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাইকে সচেতন করতে শুরু থেকেই ভিন্নধর্মী কর্মসূচি পালন করছে ঋতু দল। সারা দেশে ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবক এসব কর্মসূচির কান্ডারি। কোনো কিশোরীর প্রথম পিরিয়ড হলে, স্কুলে তা উদ্‌যাপনের রেওয়াজও তারা চালু করেছে।



Students of Hazera Mukaeo High School in Mymensingh, northern Bangladesh, participating in a napkin drive and discussion on menstruation. Photo credit: BRAC © 2022

ছবি- ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাসিক নিয়ে পাঠদান। এটি ব্রাকের মাসিক প্রকল্পের ছবি। বিশেষ করে লক্ষ্য করুণ ছেলে শিশুদের হাতে মাসিকের প্যাড!

মাসিক নিয়ে ট্যাবু ভাঙছে (২০১৭)[৩১]

ব্র্যাক-এর সিনিয়র সাপোর্ট স্পেশালিস্ট বিথী রায় ডয়চে ভেলেকে বলেন,

> মাসিক নিয়ে যে ট্যাবু আছে, সেটা ভাঙতে হবে। ভাইকে বুঝতে হবে বোনের প্রয়োজন। স্বামীকে বুঝতে হবে স্ত্রীর প্রয়োজন। মাসিক বিষয়টি শুধু নারী বুঝলেই হবে না। পরিবারের সদস্য এবং সমাজকেও এটা বুঝতে হবে। এটাকে একটি স্বাভাবিক শারীরিক বিষয় হিসেকে জানতে হবে, মানতে হবে। তাহলে আর ভয় বা লজ্জা থাকবে না।

বিষয়টিকে সামনে রেখেই ব্র্যাক তাদের কর্মীদের কর্মস্থল ও কর্ম এলকায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। পুরুষ সহকর্মীও যাতে নারী সহকর্মীকে বুঝতে পারেন, ঘরের মানুষ যেন ঘরের নারী সদস্যের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে, সেই টার্গেটকে সামনে রেখেই ব্র্যাক-এর এই ক্যাম্পেইন। তারা এ জন্য একটি ফেসবুক গ্রুপও পরিচালনা করছে।

বিথী রায় একজন সাইক্লিস্টও। তাই তাঁর পরিকল্পনা আছে, সামনে এক হাজার নারী সাইক্লিস্ট নিয়ে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে ক্যাম্পেইন করার। তবে এটা শুধু মেয়েদের জন্য নয়, ছেলে-মেয়ে উভয়ের সচেতনতায় কাজ করতে চান তাঁরা। তাঁর কথায়,"বাবা যেন মেয়ের জন্য স্যানিটা রি প্যাড কিনে আনেন। ভাই যেন বোনের জন্য



কেনেনা সবাই যেন বুঝতে পারেন যে ময়লা কাপড় বা পুরনো ন্যাকড়া ব্যবহার কতটা ক্ষতিকর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি প্যাড যে অপরিহার্য, সেটা যে বুঝাতে হবে।'

পাঠ্যপুস্তকে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্তির নেপথ্যে ব্র্যাক

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষকরা তাদের একটি কমপ্রিহেনসিভ রিভিউ পেপার ('Review report on comprehensive sexuality education in Bangladesh')-এ যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তি তুলে ধরেছেন, যা ২০১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এখানে একটি দুঃখজনক তথ্য জানিয়ে রাখা প্রাসঙ্গিক, যা ব্র্যাকের মতো একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কাছে কাম্য নয়। দেশে LGBTQ+ বিষয়ে সচেতনতার কারণে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এই রিপোর্টটি অনলাইন সিস্টেম থেকে সরিয়ে ফেলে। তবে, এটির পিডিএফ কপি সংরক্ষিত রয়েছে। যৌনশিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি সম্পর্কিত বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি:

ইন্টারনেট প্রযুক্তি এবং স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার ফলে প্রচলিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারণা পালটে যাচ্ছে (Subrahmanyam and Greenfield, 2008)। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এখানে কেবল নারী-পুরুষের সম্পর্ক নয়, বরং সমলিঙ্গের সম্পর্কও বৈশ্বিক এজেন্ডার আলোকে স্বাভাবিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিশোর-কিশোরীরা ১৮ বছরের আগেই বিবাহবহির্ভূত রোমান্টিক এবং শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকায় ৪০০ কিশোর-কিশোরীর ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, তারা রোমান্টিক সম্পর্কের মানসিক টানাপোড়ন এবং হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে (Chow, ২০১৫)। ইন্ডিয়াতেও একই অবস্থা দেখা গেছে, যেখানে কলেজ পড়ুয়া ২০-২৪% শিক্ষার্থী প্রেমঘটিত কারণে হতাশা ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে (Kumar and Akoijam, ২০১৭)। বাংলাদেশেও ৩০০ জন শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা রোমান্টিক সম্পর্কের কারণে বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতায় ভুগছে (Ahmed, 2017)।

২০১৬ সালের এক গবেষণার তথ্যানুসারে, ৬ লক্ষের বেশি মানুষ (৬১০,০০০) এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ (২,৬০,০০০) কিশোর-কিশোরী (১৫-১৯ বছর বয়সের) অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও

সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া ইত্যাদি যৌন সংক্রমিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার উল্লেখযোগ্য (UNICEF, 2018)।

কিশোর-কিশোরীদের অবাধ মেলামেশা নিয়ে তারা চিন্তিত নন; তাদের উদ্বেগের কারণ হলো, এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নিজস্ব নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অনৈতিক মনে করে। এজন্য তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধে বিয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর নির্ধারণে আইন করতে বাধ্য করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রগতিশীল নৈতিকতায় অবৈধ মেলামেশা বা অবাধ যৌনাচারকে নেতিবাচক বিবেচনা করা হয় না। বরং সব বয়সে বৈচিত্র্যময় যৌনতাকে উপভোগ করার পথ দেখাতে কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন (সিএসই বা যৌনশিক্ষা) এর গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে নিরাপদ হস্তমৈথুন, ওরাল সেক্স, এনাল সেক্সকে সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলোকে পশ্চিমা লিবারেল নীতি-নির্ধারকরা কুসংস্কার বা ট্যাবু হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

একটি বিষয় জোর দিয়ে বলা দরকার—যৌনশিক্ষা যে নামেই আসুক না কেন, সেখানে সমকামিতাকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সমকামী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করার কথা ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌনশিক্ষা গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত আছে।

> *সংক্ষেপে, পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে যেকোনো শারীরিক মেলামেশা স্বাস্থ্যকর ধরা হয়, যদি কিশোর-কিশোরীরা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ (যেমন- কনডম ব্যবহারের উপায়, হস্তমৈথুন) এবং যৌন সংক্রমণজনিত রোগ প্রতিরোধে সতর্ক থাকে। এ কারণেই অনেক দেশে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে কনডম ব্যবহারের উপকারিতা এবং কীভাবে তা পরিধান করতে হয় তা ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের একসাথে ক্লাসে শেখানো হয়।*

ব্র্যাকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্লাটফর্ম- Share-net-এ ২০২৩ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়ালিটি এডুকেশন (CSE) একটি অপরিহার্য অংশ

হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তবে সেটা আন্তর্জাতিক মানের (LGBTQ+ অত্যাবশ্যক) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা উচিত[৩২]। যদিও সাম্প্রতিককালে দেশের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা প্রতিষ্ঠান, এনসিটিবি (NCTB) পাঠ্যক্রমে CSE ধারণার মূল বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করেছে, তবে এটি এখনও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি (remains unexplored)। শিক্ষকরা এই বিষয়টি সঠিকভাবে পড়ানোর জন্য প্রস্তুত নন এবং অভিভাবকরাও এ বিষয়ে আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

বাংলাদেশে যৌনশিক্ষার সাথে জড়িত এনজিও

ব্র্যাকের প্রকাশিত পেপারের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৩২টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও কোনো না কোনোভাবে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করেছে, এবং তখন পর্যন্ত ১৩টি এনজিও যৌনশিক্ষা/SRHR কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল (যেমন- ব্র্যাকের এডিপি প্রোগ্রাম এবং ইউবিআর প্রোগ্রাম কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদান এবং এসআরএইচআর শিক্ষাসহ কাজ করছে)। ব্র্যাকের তালিকা অনুযায়ী দেখা যায়, যৌনশিক্ষা/সিএসই/SRHR কার্যক্রমে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন সংস্থাগুলোও যুক্ত, কেননা যৌনশিক্ষায় LGBTQ+ অধিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই এনজিওগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (যারা ১৯৯৭ সাল থেকে সমকামীদের নিয়ে কাজ করছে), *বয়েজ অব বাংলাদেশ* (প্রথম অনলাইন ভিত্তিক গে প্ল্যাটফর্ম), এবং রূপবান (বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র সমকামী কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ছোট ছোট প্ল্যাটফর্ম/এনজিওগুলো ব্র্যাকের মতো বড় এনজিওর ছত্রছায়ায় কাজ করছে।

> *উদাহরণস্বরূপ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, বয়েজ অব বাংলাদেশ ব্র্যাক পাবলিক হেলথ স্কুলের অধীনে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। দেশে অনেক এনজিও যৌনশিক্ষা কার্যক্রম সরাসরি বা পরোক্ষভাবে (অন্য প্রজেক্টের অংশ হিসেবে) পরিচালনা করলেও তাদের তথ্য-উপাত্ত প্রকাশিত হয় না, ফলে কার্যক্রম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।*

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা বিশ্ব LGBTQ+ এজেন্ডা বাস্তবায়নে অধিক আগ্রহী, এবং দাতা সংস্থাগুলো বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে LGBTQ+ উপাদান অন্তর্ভুক্ত

করছে। আমেরিকা থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে হলে প্রতিটি প্রজেক্টে কোনো না কোনোভাবে LGBTQ+ উপাদান থাকতে হবে—এটি বাইডেন প্রশাসনের একটি বিশেষ নিয়ম। ইউরোপিয়ান দেশগুলোও একই নীতিতে চলছে।

ব্র্যাকের তথ্য মতে, এনজিও প্রজেক্টের মাধ্যমে পরিচালিত যৌনশিক্ষার কার্যক্রম জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত যৌনশিক্ষার চেয়ে বিস্তৃত।

> সামাজিক বাধা এবং স্টিগমা এড়াতে বেশিরভাগ এনজিও সরাসরি যৌনশিক্ষা নামে প্রজেক্ট পরিচালনা না করে কৌশলে সংবেদনশীল বিষয়গুলোকে বিভিন্ন প্রজেক্টে (যেমন: বাল্যবিবাহ, এমআর, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ প্রসব, কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি) অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

এই প্রোগ্রামগুলো সচারাচর বস্তি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ডিজাইন করা হয়। এসব প্রকল্পে এনজিওরা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ভাউচার স্কিম, হেল্পলাইন এবং সামনা-সামনি কাউন্সিলিং, ক্লিনিকাল সার্ভিস, সামাজিক জমায়েত (social gathering), সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন জোট (সুশীল সমাজ, বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন- জেনারেশন ব্রেকথ্রু (Generation Breakthrough), বালিকা (Balika) ইত্যাদি) বিদ্যমান সরকারি এবং চলমান এনজিও কার্যক্রমে (নিরাপদ আশ্রয় তৈরি, জীবিকা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) যৌনশিক্ষাকে যুক্ত করা হয় (বন্ধু, ২০১৬)।

ইউনিসেফের নেতৃত্বে যৌনশিক্ষার এক্সপেরিমেন্ট: 'নিজেকে জানো' (২০১৩)

'নিজেকে জানো' প্রকল্পের যৌনশিক্ষা নিয়ে মূলধারার মিডিয়ায় ২০১৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর এটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। ইউএসআইড-এর অর্থায়নে এআরএইচ ওয়ার্কিং গ্রুপের (ব্র্যাকসহ ২০টির বেশী বিখ্যাত এনজিও জড়িত) সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে এবং সহায়তায় বাংলাদেশে সেন্টার প্রোগ্রামস বইটি প্রকাশ করেছে। এই বিষয়ে *শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌনতায় ভরা বই বিতরণ* শিরোনামের আর্টিকেল হুবুহু সংযুক্ত করলাম[৩৩]—

'যৌনতায় ভরা একটি বই বিতরণ করা হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে। স্কুলের

শিক্ষকেরা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক এ বই বিতরণ করেছেন। বইটির নাম 'নিজেকে জানো'। কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত এ বইয়ের নারী-পুরুষের স্পর্শকাতর অঙ্গের নাম উল্লেখ করে এমন খোলামেলাভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা হুবহু প্রকাশযোগ্য নয়। বইটিতে 'শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন' অধ্যায়ে লেখা হয়েছে, যখন একটি মেয়ে ১০-১২ বছর বয়সে পৌঁছে তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়।

যেমন, উচ্চতা বাড়ে, মাসিক শুরু হয়, স্তন বড় হয়, বগলে ও ... চুল বা লোম গজায়। এ বয়সে ছেলেদের শরীরের শুক্রাণুযুক্ত রস মাঝে মাঝে মূত্রনালী দিয়ে বের হয়ে আসে, যাকে ... বলা হয়।

বইটির 'বন্ধুত্ব ও ভালবাসা' শীর্ষক অধ্যায়ে একটি শিরোনাম হলো 'প্রেম করলে কেন ছেলেমেয়েরা ধরাধরি করে?' এখানে লেখা হয়েছে প্রেম এমন একটি সম্পর্ক যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা দু'জনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করে, এ অনুভব হতেই তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি পেতে চায় এবং এ কারণেই অনেক সময় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে।

আসলে কোনো সমাজেই এটা ভালো চোখে দেখে না। কৈশোর হলো জীবন গড়ার সময়। এ বয়সে এসব করে তাই সময় নষ্ট না করাই ভালো। এ অধ্যায়ে আরেকটি শিরোনাম হলো, 'পরিস্থিতির চাপে যদি দৈহিক মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে আমি সে অবস্থায় কী করবো?' এখানে লেখা হয়েছে, বিয়ের আগে ছেলে-মেয়েদের দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা পরিস্থিতির চাপে এরকম অবস্থায় পড়তে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, আবেগকে 'না' বলতে জানাটাও বড় হওয়ার একটা লক্ষণ। পরিচয়ের এক পর্যায়ে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। যদি কারো মনে হয় যে, তার প্রেমিক এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী, তবে মেয়েটাকে এ প্রস্তাবে সায় না দিয়ে বড় কারো সাথে বিষয়টি আলোচনা করা ভালো।

যদি তা না করা যায় আর দৈহিক সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে গর্ভধারণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কোনো অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করা জরুরি। এরপরও যদি কোনো সমস্যা হয়, তবে উপদেশের জন্য তুমি কাছের কোনো ক্লিনিকে যেতে পারো। (বইটির শেষে বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বেশ কয়েকটি ক্লিনিক/সেবা সংস্থার তালিকা দেয়া রয়েছে এ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের জন্য)। বইটির এ অধ্যায়ে আরো লেখা হয়েছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো কারণে দৈহিক মিলনের ফলে

একটি মেয়ের পেটে বাচ্চা আসতে পারে। তাই বিয়ের আগে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি পেটে বাচ্চা এসে যায়, তবে দেরি না করে উপদেশের জন্য মা-বাবা অথবা কাছের কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। মা-বাবাকে যদি ব্যাপারটা বোঝানো না যায় আর মেয়েটিকে তারা গ্রহণ না করে, তাহলে কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার বা আত্মীয়ের পরামর্শ নেয়া ভালো।

নিজেকে জানো বইটির আরেকটি অধ্যায়ের নাম 'দৈহিক সম্পর্ক'। এ অধ্যায়ের শুরুতে লেখা হয়েছে—নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন খুবই স্বাভাবিক। তবে এতে সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক। অবৈধ যৌনমিলন তা যেকোনো বয়সেই হোক না কেন, সেটা অনৈতিক ও সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কই বৈধ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

এ অধ্যায়ে একটি শিরোনাম হলো—'সতী পর্দা কি জানতে চাই?' এ বিষয়ে যে বিবরণ বইটিতে দেয়া হয়েছে তা প্রকাশযোগ্য নয়। এ অধ্যায়ে আরেকটি শিরোনাম হলো 'প্রথম মিলনে কি সব মহিলার রক্ত পড়বে? এই অংশের বর্ণনাও রীতিমতো রগরগে।

দৈহিক সম্পর্ক অধ্যায়ে আরেকটি শিরোনাম হলো 'মায়ের পেট থেকে কীভাবে বাচ্চা বের হয়ে আসে?' এখানে সন্তান প্রসবের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তাও প্রকাশযোগ্য নয়। 'বাচ্চা কীভাবে হয়?' শিরোনামে লেখা হয়েছে কীভাবে মায়ের গর্ভে সন্তান আসে তার বর্ণনা।

'বিয়ের আগে কেউ কেউ কনডম বা খাবার বড়ি ব্যবহার করে। সেটা কি ঠিক?' শীর্ষক শিরোনামে লেখা হয়েছে, এ দুটি জন্ম নিরোধক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

দৈহিক মিলন অধ্যায়ের আরেকটি শিরোনাম হলো 'অনেকের সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তা ক্ষতিকর। এরকম হলে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়?' এখানেও লেখা হয়েছে অনেকের সাথে দৈহিক সম্পর্ক থাকলে কনডম ব্যবহার খুবই জরুরি।

বইটিতে যৌনমিলন অধ্যায় আলোচনার আগে কীভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, সে আকর্ষণ এবং ভালোলাগা প্রকাশের উপায় কী, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া যৌন অনুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন উপায় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির পেছনে লেখা রয়েছে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন অব চিলড্রেন অ্যান্ড উইমেন প্রকল্পের জন্য। ইউনিসেফের সহায়তায় মুদ্রিত। বইটি প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি)। বইটি প্রণয়নে সহায়তা নেয়া হয়েছে এমন ১১টি সংস্থার নাম বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটি কী পরিমাণ স্কুলে বিতরণ করা হয়েছে জানার জন্য বিসিসিপি অফিসে ফোন করা হলে এক কর্মকর্তা জানান, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে অফিসে আসতে হবে। তবে অনেক দিন ধরেই বইটি বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন এনজিও সংস্থা তাদের কাছ থেকে এ বই নিয়ে বিভিন্নভাবে বিতরণ করেছে। বেসরকারি একটি সংস্থা সারা দেশে যাদের অনেক স্কুল রয়েছে, তারাও এ বই তাদের স্কুলে বিতরণ করেছে বলে জানানো হয় বিসিসিপি অফিস থেকে।

কয়েক দিন আগে রাজধানীর একটি স্কুলে এ বই বিতরণ করার পর অষ্টম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী তার বাবার কাছে দেয় বইটি। বইটি পড়ে উদ্বিগ্ন বাবা এ বই আর তিনি তার সন্তানকে পড়তে দেননি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বই নিয়ে রীতিমতো বিব্রত এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন অনেক অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ। প্রশ্ন উঠেছে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এ ধরনের বই বিতরণের উদ্দেশ্য নিয়ে। সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কী বিবেচনায় তা অনুমোদন করল তা নিয়েও প্রশ্ন অভিভাবকদের।'

জেনারেশন ব্রেকথ্রু এক্সপেরিমেন্ট

এটা পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১৩-২০১৯) প্রজেক্ট, ন্যাদারল্যান্ডস এম্বেসীর অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে ইউএনএফপিএ এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৩৫০টি স্কুল (৫০টি মাদ্রাসাও অন্তর্ভুক্ত ছিল) বাছাই করে যৌনশিক্ষার জেমস কারিকুলাম (Gender Equity Movement in Schools, GEMS) দেড় লক্ষ হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের ওপর যৌনশিক্ষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়[৩৪]। তাছাড়া এই প্রজেক্টের আওতায় 'দোষ উনিশের' নামের ১০০ সিরিজের রেডিও প্রোগ্রাম, হেল্পলাইন সার্ভিস, স্কুল এবং ক্লাবে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, রাস্তায় নাটক, কমিউনিটি লেভেলে প্যারেন্ট, রাজনৈতিক লিডার, ইমাম সাহেবদের টার্গেট করে কার্যক্রম চালু ছিল।

২৬ মার্চ ২০১৯ সালে বিবিসি এই প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ ভিডিও প্রকাশ করে এই শিরোনামে—*সেক্স এডুকেশন: সাড়ে তিনশ স্কুলের শিক্ষার্থীরা 'জেনারেশন ব্রেক থ্রু'র ক্লাসরুমে পাঁচ বছরে যা শিখল*[৩৫]'

বাংলাদেশের সাড়ে তিনশ বিদ্যালয়ে গত ৫ বছর ধরে পড়ানো হচ্ছে একটি কোর্স, যেটি অনেকটা পশ্চিমা দেশগুলোর বিদ্যালয়ের সেক্স এডুকেশন বা যৌনশিক্ষা কোর্সের আদলে সাজানো। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় মাসিক, স্বপ্নদোষ, কনডম ইত্যাদি শব্দকে নিষিদ্ধ জ্ঞান করা হয়। কিন্তু ঢাকার বিমানবন্দরের কাছে আশকোনা এলাকার একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমেই এসব শব্দ নিয়ে অবলীলায় আলোচনা করছে।

তারা বয়ঃসন্ধিকালীন এসব অবশ্যম্ভাবী ইস্যুগুলো সম্পর্কে জানছে। তারা শিখছে প্রজননস্বাস্থ্যের নানা দিক। যৌনবাহিত এবং যৌনাঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে। শিখছে এসব রোগ থেকে দূরে থাকার উপায়। এই প্রশিক্ষণের জন্য তারা সাহায্য নিচ্ছে নানা রকম কম্পিউটার গেম এবং লুডো ও মনোপলির মতো দুটি বোর্ড গেমের। সেই সঙ্গে ক্লাস লেকচার তো রয়েছেই।

আশকোনার এই বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরী কর্নারে আমি যেদিন যাই, সেদিন তাদের পড়ানো হচ্ছিল বাল্যবিবাহ নিয়ে। বাল্যবিবাহ নিরোধ নিয়ে শিশুরা একটি নাটিকার মহড়া করছে শিক্ষার্থীরা; আমাকে সেটিও তারা দেখাল।

বাংলাদেশ সরকারের 'জেনারেশন ব্রেকথ্রু' নামের একটি প্রকল্পের আওতায় এই শ্রেণীকক্ষটি তৈরি হয়েছে। কক্ষটির নাম দেয়া হয়েছে 'কিশোর কিশোরী কর্নার'। আর এখানে তারা পড়ছে 'জেমস' নামে একটি কোর্স যেটির পূর্ণরূপ দাঁড়ায় 'জেন্ডার ইকুয়িটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস'।

কোর্সটি অনেকটা পশ্চিমা দেশগুলোর বিদ্যালয়ে পড়ানো সেক্স এডুকেশন বা যৌনশিক্ষার আদলে সাজানো।

যদিও সংশ্লিষ্টরা এই কোর্সকে যৌনশিক্ষা বলতে নারাজ। এই কোর্সটি সাজানো হয়েছে 'আমার জেমস ডায়েরি' নামের একটি বই, সাতটি কম্পিউটার গেমস, দুটি বোর্ড গেম, একটি এনিমেশন ভিডিও আর একশোটি পর্বের রেডিও ধারাবাহিক দিয়ে। ক্লাসে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ। দুই বছরের এই কোর্সে যোগ দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী যেসব বিষয় সম্পর্কে জানছে:

* জেন্ডার সমতা (এর মধ্য LGBTQ+ও জড়িত), বাল্যবিবাহ, মাসিক রজঃস্রাব
* স্বপ্নদোষ, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, শারীরিক ও যৌন সহিংসতা
* যৌনবাহিত রোগ, জননাঙ্গবাহিত রোগ

জেনারেশন ব্রেকথ্রু: কী আসলে?

কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশে বিদ্যালয়গুলোতে যৌনশিক্ষা দেবার চেষ্টা বহু বছর থেকেই করা হচ্ছে, কিন্তু যৌন বিষয় নিয়ে সামাজিক ট্যাবুর কারণে এটা সফল করা যায়নি কখনো (স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- ব্র্যাক সেই ১৯৯৫ সাল থেকেই যৌনশিক্ষা শুরু করেছে)। এমনকি পাঠ্যপুস্তকে যৌনশিক্ষা বিষয়ক অধ্যায় জুড়ে দেবার পরও দেখা গেছে, শ্রেণীকক্ষে সেসব অধ্যায় শিক্ষকেরা পড়াচ্ছেন না। শিক্ষার্থীদেরকে বাড়িতে গিয়ে এসব অধ্যায় পড়বার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। আর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অভিভাবকেরা বইয়ের সেসব অধ্যায় স্টাপলিং করে আটকে দিচ্ছে, যাতে অধ্যায়গুলো শিক্ষার্থীদের নজরে না পড়ে।

ফলে বিদেশী দাতাদের অর্থায়নে ২০১৪ সালে যখন ৫ বছর মেয়াদী জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পটি শুরু হয়, বাংলাদেশের চারটি জেলার তিনশো ৫০টি বিদ্যালয়ে, তখন তারা এই ট্যাবুর বিষয়টি মাথায় রেখেছিলেন। এই প্রকল্পের পরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলছেন, প্রকল্পটি শুরু করতে গিয়ে স্কুলগুলো থেকে বাধা আসবে বলে আশঙ্কা করেছিলেন তারা। কিন্তু বাধা যতটুকু এসেছে তা ঢাকার বিদ্যালয়গুলো থেকে। মফস্বলের বিদ্যালয়গুলো থেকে কোন বাধা আসেনি।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছে। এমনকি প্রকল্পে যে ৫০টি মাদ্রাসাকে যুক্ত করা হয়েছিল, সেখান থেকে এসেছিল অভূতপূর্ব ইতিবাচক সাড়া। ড. হোসেন বলছেন, 'বাস্তবে দেখা গেল মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর'।

সাফল্য এলো কি?

প্রকল্পের মেয়াদের পাঁচ বছর শেষে এসে দেখা যে বিদ্যালয়গুলোতে এই বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে সেখানকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যেসব

বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি পড়ানো হয় না, সেখানকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্র আমাকে বলছিল, "আমার অন্যান্য স্কুলের যেসব বন্ধু আছে তারা এইসব শব্দ শুনলে অনেক লজ্জা পায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আর এসব হয় না।"

অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রী বলছিল, "প্রথম প্রথম আমি নিজেও এইসব ব্যাপারে অনেক সংকীর্ণ ছিলাম। যেসব বিষয় আমি আমার মা কিংবা বন্ধুদেরকে বলতে পারতাম না, পরামর্শ চাইতে পারতাম না, এখন অবলীলায় তা পারি।" 'জেমস ক্লাস করবার পর আমরা অনেক বেশী ফ্রি হয়ে গেছি', বলছিল সপ্তম শ্রেণীর আরেক ছাত্রী।

যেসব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই জেনারেশন ব্রেকথ্রুর ক্লাসরুমে পাঠানো হয়েছিল, তারাও শুরুর দিকে জড়সড় হয়ে থাকতেন।

'আমাদের নিজেদের ভেতরেই একটা জড়তা ছিল। সেই জড়তা কাটিয়ে উঠতে আমাদের কিন্তু সময় লেগেছে। সেক্স বিষয়ক কোনো শব্দ আলোচনায় এলে বাচ্চার লজ্জা পেত' বলছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মঞ্জুয়ারা খাতুন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরো উলটে গেছে, অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমাকে বললেন তিনি।

ভিডিও: যৌনশিক্ষার নামে বাংলাদেশে যা শেখানো হচ্ছে ||
বিবিসি বাংলা (জেমস কারিকুলাম)

QR code স্ক্যান করে ইউটিউবে ভিডিও দেখা যাবে-

যৌনশিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের অনীহা: ব্র্যাকের বিকল্প পদ্ধতি

২১ অক্টোবর ২০১৯ সালে 'পাঠ্যবইয়ে যৌনশিক্ষা আছে, পড়ানো হয় না' শিরোনামে 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা: কৈশোর ও তারুণ্যের অধিকার' শীর্ষক এই বৈঠক আয়োজন করে ব্র্যাক। প্রথম আলো মিডিয়ার পার্টনার হিসেবে ভূমিকা রাখে[৩৬]। দেশে সমকামী অধিকার নিয়ে যেসব এনজিও কাজ করছে তাদের অনেকে উপস্থিত ছিল। উল্লেখ্য যে, মিডিয়া পার্টনার হিসেবে প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার LGBTQ+ তথা যৌনশিক্ষা বাস্তবায়নে অনেক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছে।

বৈঠকে নারীপক্ষ-এর সদস্য ইউ এম হাবিবুন নেসা বলেন,

> 'এখনকার বাচ্চারা অনেক খোলামেলাভাবে জানতে চায়, বলতে পারে, যা আমাদের সময় ছিল না। চিন্তা–চেতনার দিক থেকে এক প্রজন্ম পরে অনেক বড় পরিবর্তন আসবে। নিজের যৌনাঙ্গ চেনা, এটাকে সুস্থ রাখা—এটা একটা অধিকার। এসব নিয়ে লজ্জার ব্যাপারগুলো ভেঙে ফেলতেই হবে।'

পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার-এর নির্বাহী পরিচালক নূর মোহাম্মদ বলেন,

> সবাই ভাবে, শিশু-কিশোর-তরুণেরা বড় হতে হতে বুঝে যাবেন। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের মনে হাজারো প্রশ্ন। তবে উত্তর কম। বইয়ে উত্তর আছে, সেটা সামান্য। শিক্ষকদের কাছে গেলে বলেন, ইঁচড়ে পাকা। আর অভিভাবকদের কাছে গেলে শুনতে হয়, 'চুপ করো। সময়ে জানতে পারবে।' এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে জন্ম নেয়া প্রতিষ্ঠান, বন্ধু স্যোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-এর নির্বাহী পরিচালক সালেহ আহমেদ বলেন,

> তৃতীয় লিঙ্গের (এটা তারা LGBTQ+ গোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহার করে) মানুষদের নিয়ে কথা কম বলা হয়। কিছুদিন আগে এক জরিপে দেখা গেছে, তরুণদের একটা বড় অংশ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে।

বাংলাদেশে সমকামী অধিকার বাস্তবায়নে মূল স্ট্রেটেজিস্ট ব্র্যাকের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডিন প্রফেসর সাবিনা ফয়েজ রশিদ বলেন,

> যৌন ও প্রজননশিক্ষার (যৌনশিক্ষা) পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে হবে। তাদের কাছে পৌঁছাতে স্যোশাল মিডিয়া, ইউটিউব ভিডিও, কার্টুন—বিকল্প চ্যানেলগুলোর ব্যবহার বাড়াতে হবে।

স্কুলে যৌনশিক্ষা শিক্ষা দেয়ার বিকল্প পদ্ধতির সন্ধানে

২০১৩ সাল থেকে পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষার প্রাথমিক কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু শিক্ষকরা লজ্জার কারণে সেগুলো নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা এড়িয়ে যেতেন। শিক্ষার্থীরাও অস্বস্তি অনুভব করে। শিক্ষার্থীদের পশ্চিমা ধাঁচে যৌনশিক্ষা দেয়ার বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ গবেষণা শুরু করে ২০১৫ সাল থেকে। প্রায় এক মিলিয়ন ডলার ফান্ডিং-এ দুটি প্রকল্প শুরু করে, যার একটি হচ্ছে *ব্রেকিং দ্যা শেইম* এবং অন্যটি হচ্ছে *ডিজিটাল সিস্টার (মায়া আপা)*।

নেদারল্যান্ডসের অর্থায়নে (NWO-WOTRO Netherlands) ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলের নেতৃত্বে নেদারল্যান্ডসের Radboud University, Nijmegen এবং United for Body Rights (UBR) Alliance-এর সাথে যৌথভাবে তিন বছর মেয়াদী (২০১৫-২০১৮) '*Breaking the Shame: Towards improving SRHR education for adolescents and youth in Bangladesh*'প্রকল্পের প্রধান তিনটি লক্ষ্য ছিল [৩৭]_

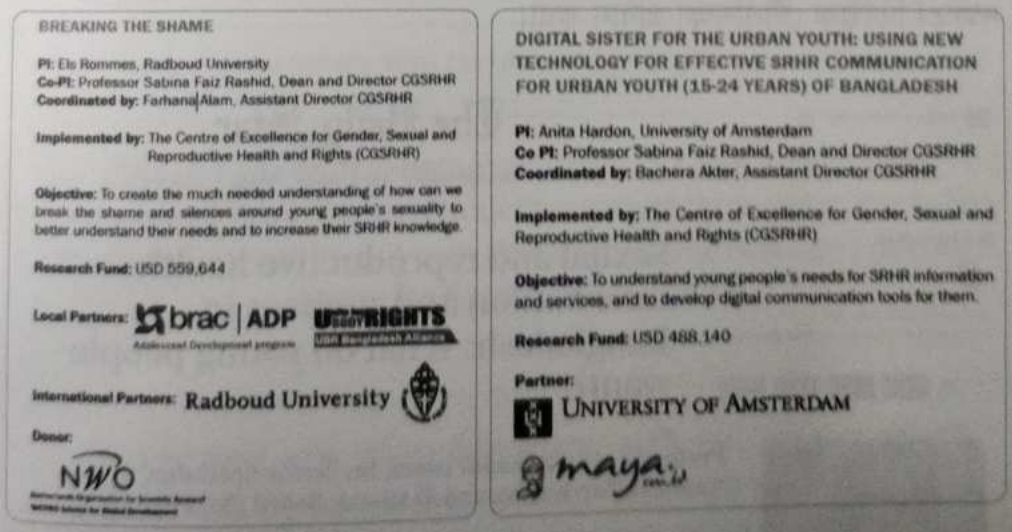
* বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌনশিক্ষায় কারিকুলামের (এসআরএইচআর) কোন কোন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, অর্থাৎ যৌনশিক্ষা কারিকুলামে কোন বিষয়গুলো এখনও অপূর্ণ রয়েছে।
* শ্রেণিকক্ষে যৌনশিক্ষা নিয়ে শিক্ষকরা কেন আলোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন তার কারণ নির্ণয় করা।

* শিক্ষার্থীদের যৌনশিক্ষার নতুন সৃজনশীল শিক্ষাদান পদ্ধতি তৈরি ও পরীক্ষা করা।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে যৌনতার বিষয়ে সমাজের প্রচলিত 'ভুল ধারণা' (যেমন- হস্তমৈথুন, সমকামিতা, সম্মতি/হ্যারাসমেন্ট, হিজড়া, যৌনতার বিস্তৃতি) রয়েছে তা শনাক্ত করা হয়। এছাড়া বৈরী অবস্থায় শিক্ষার্থীরা কীভাবে তীব্র আবেগ নিয়ন্ত্রণ করবে (যেমন- প্রেমে ব্রেক আপ হলে) তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দক্ষতাভিত্তিক (skill-based SRHR) তথা যৌনতার যে বিষয়গুলো হাতে-কলমে শেখাতে হবে, সেগুলোর তালিকা তৈরি করা। এর মধ্যে ছিল:

* কনডম ব্যবহারের পদ্ধতি (Condom use)
* বাচ্চা কীভাবে জন্মগ্রহণ করে (How babies are born)
* কীভাবে চুমু দিতে হয় (How to kiss)

গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষকের উপস্থিতিতে সামাজিক ট্যাবু সম্পর্কিত যৌন বিষয়গুলোর আলোচনা শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে। লজ্জার কারণে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায় না, এবং শিক্ষকরাও যৌন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করেন।



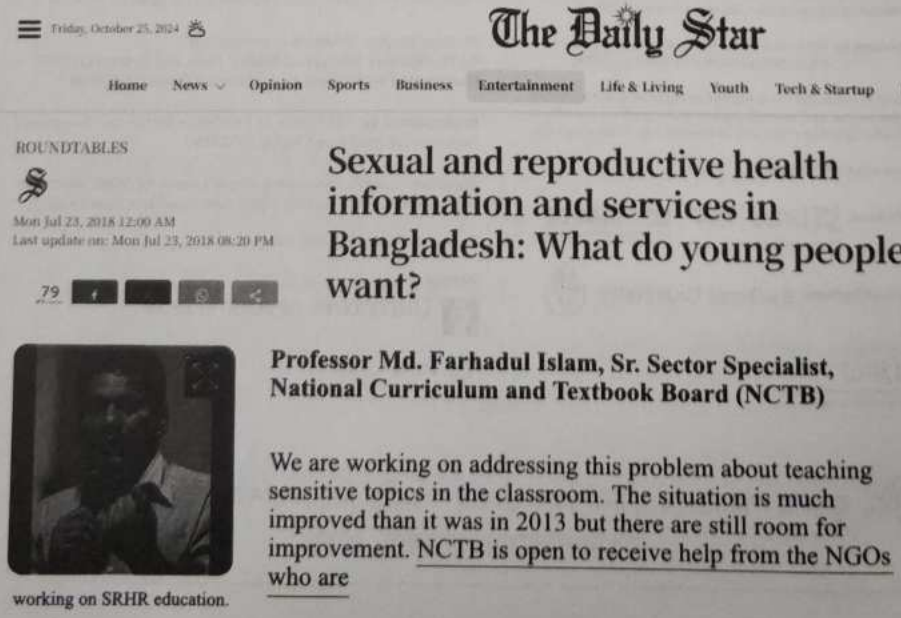
ছবি- স্কুলের পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি নিয়ে পশ্চিমা অর্থায়নে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্প

এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নতুন একটি সৃজনশীল শিক্ষাদান পদ্ধতি ৪০০ শিক্ষার্থীর ওপর পরীক্ষা করা হয়। যৌনশিক্ষায় যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলোকে আলোকপাত করতে 'চলো ভুল ধারনা ভেঙ্গে ফেলি' নামে বুকলেট এবং ভিডিও তৈরি করা হয় যেগুলো শ্রেনীকক্ষে পরীক্ষা করা হয়। ২১ জুলাই ২০১৮ ডেইলি স্টার-এ গোলটেবিল বৈঠক পলিসি সুপারিশ করে। এগুলো জাতীয় কারিকুলাম এবং টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিবিটি) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বাস্তবায়নে কাজ করেন। সেই পলিসি সুপারিশগুলো হচ্ছে—

* শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের লজ্জা এড়াতে অনলাইনের মাধ্যমে যৌনশিক্ষা প্রদান করা এবং নিশ্চিত করা, যাতে কিশোর-কিশোরীরা গোপনীয়তা (নামহীন বা এনোনিমাস) বজায় রেখে এই যৌনতার বিষয়ে তথ্যগুলো জানতে পারে। যৌনশিক্ষার এই অনলাইন প্লাটফর্ম বিদেশে হোস্ট করা উচিত।

* সংবেদনশীল বিষয়গুলো কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিরাপদ (safe) এবং নির্ভরযোগ্য পরিবেশ প্রয়োজন। এজন্য প্রতিটি স্কুলে কিশোর-কিশোরী ক্লাব বা কর্নার খোলার পরামর্শ দেয়া।

যৌনশিক্ষার বিভিন্ন শিক্ষামূলক পদ্ধতি (যেমন: সংক্ষিপ্ত নাটক, ছবিসহ টেক্সট, অ্যানিমেশন) এবং বিকল্প উপকরণ (যেমন ভিডিও) ব্যবহার করা। স্কিলড বেইজড বা দক্ষতা ভিত্তিক যৌনশিক্ষা প্রদান করা।



Friday, October 25, 2024

The Daily Star

Home | News | Opinion | Sports | Business | Entertainment | Life & Living | Youth | Tech & Startup | Multi

ROUNDTABLES

Mon Jul 23, 2018 12:00 AM
Last update on: Mon Jul 23, 2018 08:20 PM

79

Sexual and reproductive health information and services in Bangladesh: What do young people want?

Professor Md. Farhadul Islam, Sr. Sector Specialist, National Curriculum and Textbook Board (NCTB)

We are working on addressing this problem about teaching sensitive topics in the classroom. The situation is much improved than it was in 2013 but there are still room for improvement. NCTB is open to receive help from the NGOs who are working on SRHR education.

বিকল্প যৌনশিক্ষার মাধ্যম নিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং University of Amsterdam যৌথ উদ্যোগে আরেকটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, শহুরে তরুণ-তরুণীদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (SRH) সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম কতটুকু কার্যকরি তা বোঝা।

এই প্রজেক্টে মায়া আপা (Maya Apa) অনলাইন মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণেরা মূলত SRHR সম্পর্কিত তথ্যের জন্য Google এবং YouTube ব্যবহার করে। তবে, এই প্ল্যাটফর্মগুলোর পাশাপাশি Facebook গ্রুপেও SRHR সম্পর্কিত বিপুল তথ্য থাকায় কিশোর-যুবকরা কোন তথ্য অনুসরণ করবে তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এছাড়া, তরুণেরা এসব বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চায়, যা Facebook-এর মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্ভব হয় না এবং সেগুলো তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

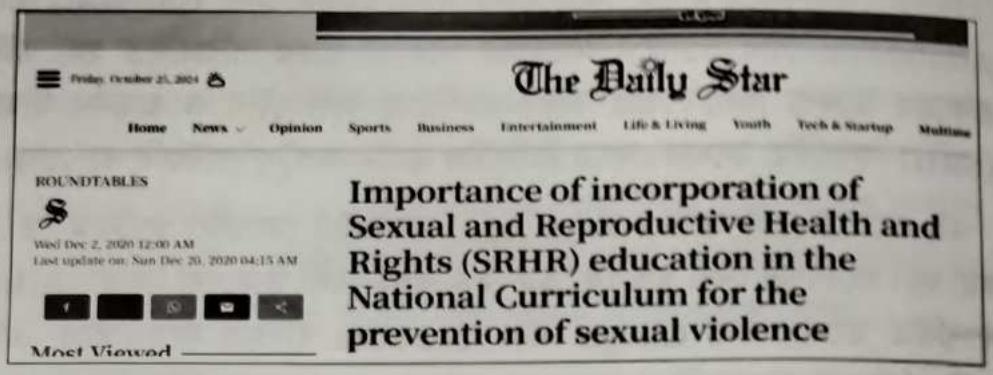
এই গবেষণার ভিত্তিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ দিয়েছিল যে এসআরএইচ (যৌনশিক্ষা) বিষয়ে সামাজিক স্টিগমা ও লজ্জা কাটাতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা কার্যকরি মাধ্যম হতে পারে।

Examples of SRHR questions taken from Maya Apa for content analysis

"I am having irregular periods. What can I do to make my perioe regular?" **[Famle, age24]**

"We did sex stuff together and slept in same bed. We are homosexual boys. We were together almost three years. I'm felling depressed. I want to quit being homsexual. So, how can I get rid of these fee-lings?" **[Male, age 25]**

ছবি- মায়া আপা এপে যৌনতা নিয়ে জানতে একটি প্রশ্ন। এক যুবক সমকামী আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে কীভাবে এই আচরণ থেকে ফিরে আসতে পারে? পরবর্তীতে ব্র্যাক বলে, সমকামিতা দোষের কোনো বিষয় নয়, এটা স্বাভাবিক (Breaking the shame project)। পরিশেষে QR কোড স্ক্যান করে ভিডিও দেখুন।



The Daily Star

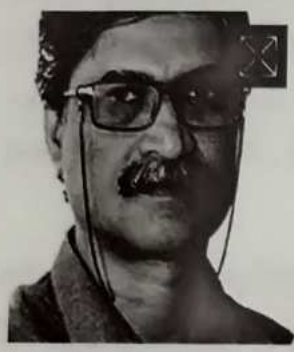
Home News Opinion Sports Business Entertainment Life & Living Youth Tech & Startup

ROUNDTABLES

Wed Dec 2, 2020 12:00 AM
Last update on: Sun Dec 20, 2020 04:15 AM

Most Viewed

Importance of incorporation of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) education in the National Curriculum for the prevention of sexual violence



Professor Md Moshiuzzaman, *Mem*
(Curriculum), National Curriculum
Text Book Board NCTB

SRHR education is included to an e
the curriculum but our teachers an
failing to disseminate that informa
Most schools staple the chapters re
reproduction and reproductive hea

CTB is prepared to fully incorporate SRHR education in the curr
ıt we need the support of other relevant organisations for
ıplementation. We have plans on introducing interactive learnir
aking SRHR education interdisciplinary in the future curriculu
ıve conducted gender sensitivity training for our curriculum spe
tackle the issues of gender bias that have been so ingrained in t
so have plans on providing such training to all our curriculum

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশকে সমকামিতা-বান্ধব বানানো। পাঠ্যক্রম যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পর পশ্চিমা সংস্থারা নিশ্চিত হতে চেয়েছে, এর মাধ্যমে যেন শিক্ষকদের মনোযোগ পরিবর্তন হয়। এজন্য শিখন পদ্ধতি নিয়ে তারা ২০১০ সাল থেকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে।

ব্র্যাকের সেই ডিজিটাল সিস্টার প্রকল্পের থেকে যৌনশিক্ষা সহয়তায় মোবাইল অ্যাপ চালু[৩৮]

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ – আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য সম্মেলনে উদ্বোধন হওয়া দুটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বাংলাদেশের লাখ লাখ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা পেতে সক্ষম হবে।

Project	Funder	Start	Partners
Nijeke Jano	UNICEF and other international donors	2010	BRAC (Adolescent Development Program - ADP), local schools, community leaders
Generation Breakthrough (GEMS)	UNFPA, Embassy of the Kingdom of the Netherlands	2014	BRAC (ADP), Ministry of Education, schools in urban and rural Bangladesh
Digital Sister (Maya Apa)	Grand Challenges Canada, BRAC CGSRHR	2015	University of Amsterdam, Maya Apa, BRAC James P Grant School of Public Health
Breaking the Shame	NWO-WOTRO Science for Global Development, Netherlands	2015	BRAC James P Grant School of Public Health, Radboud University (Netherlands), United for Body Rights (UBR) Alliance

ইউনিসেফ ও সুইডিশ দূতাবাসের সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চালু করা কৈশোর স্বাস্থ্য ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের লক্ষ্য হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবার সহজপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।... বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি মিঃ শেলডন ইয়েট বলেন, 'বয়োসন্ধিকাল হলো একটি রূপান্তরের সময় যখন কিশোর-কিশোরীরা বিস্তৃত পরিসরে পৃথিবীর মুখোমুখি হয়, মুখোমুখি হয় নতুন চ্যালেঞ্জের।

> এই অ্যাপটি তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করবে, যেসব তথ্য তারা বাবা-মা, বন্ধু এমনকি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে সাধারণত লজ্জা পেয়ে থাকে।

কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মগুলোতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, পুষ্টি, সহিংসতা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষামূলক ও জেন্ডার-ভিত্তিক নির্দেশিকা ও কোর্সের পাশাপাশি কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কীভাবে ও কোথায় পাওয়া যায় সে বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্ল্যাটফর্মটির কথা প্রচার করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব, পিয়ার-গ্রুপ (বন্ধু-দল) এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

ঢাকায় নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে বলেন, 'এই কৈশোর স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের লাখ লাখ মেয়ে ও ছেলের জীবন উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এই উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আনন্দিত।'

কিশোর-কিশোরী কর্নার- প্রতিটি স্কুলে কিশোর-কিশোরী কর্নার চাই ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯[৩৯]

লজ্জা ভাঙার ব্রেকিং দ্য শেইম প্রকল্পের একটি ফাইন্ডিং ছিল শিক্ষার্থীদের যৌনশিক্ষার জন্য নিরাপদ পরিবেশ দরকার। সেই গবেষণার পার্টনার ইউনাইট ফর বডি রাইটস্ (ইউবিআর) বাংলাদেশ অ্যালায়েন্স গোলটেবিল বৈঠক করে প্রস্তাব করা হয়-

> *'দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) যেমন সততা কর্নার তৈরি করেছে, তেমনি প্রতিটি স্কুলে কিশোর-কিশোরী কর্নার করার প্রস্তাব করেন। যেখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যেকোনো তথ্য ও সহযোগিতা নিতে পারে'।*

'সভায় বক্তারা বলেন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সঙ্গে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নসহ অনেক বিষয় জড়িত। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এ বিষয়ে সঠিক তথ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণসূচিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি যুক্ত করতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'কৈশোর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার শিক্ষার গুরুত্ব, সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক সভায় সভাপতিত্ব করেন পপুলেশন সাইন্স অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ। সভায় বক্তৃতা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব

মোমিনুর রশিদ আমিন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে সদস্য (কারিকুলাম) অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান, নেদারল্যান্ডসের বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের প্রতিনিধি মাশফিকা জামান সাটিয়ার, টিসার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ কানিজ সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সালমা আক্তার, ইউবিআর বাংলাদেশ অ্যালায়েন্সের প্রধান কাজী সুরাইয়া সুলতানা, কেয়ার বাংলাদেশের লাভলী ইয়াসমিন জেবা, মেরী স্টোপস-এর মঞ্জুন নাহার, শিক্ষক প্রতিনিধি তৃপ্তি রানী রায় ও হাফিজ উদ্দিন প্রমূখ।'


Creating a Space for Shame-Free Sex Ed

August 21, 2017 / Breaking the Shame, CGSRHR, Research

ছবি- ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ অনুষদ থেকে প্রকাশিত ২০১৭ সালের প্রতিবেদন। তারা যে যৌনশিক্ষার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরীর পরীক্ষা করছে তা নিয়ে বর্ণনা করেছে এই প্রতিবেদনে[৪০]

প্রতিটি স্কুলে কিশোর-কিশোরী কর্নার চাই

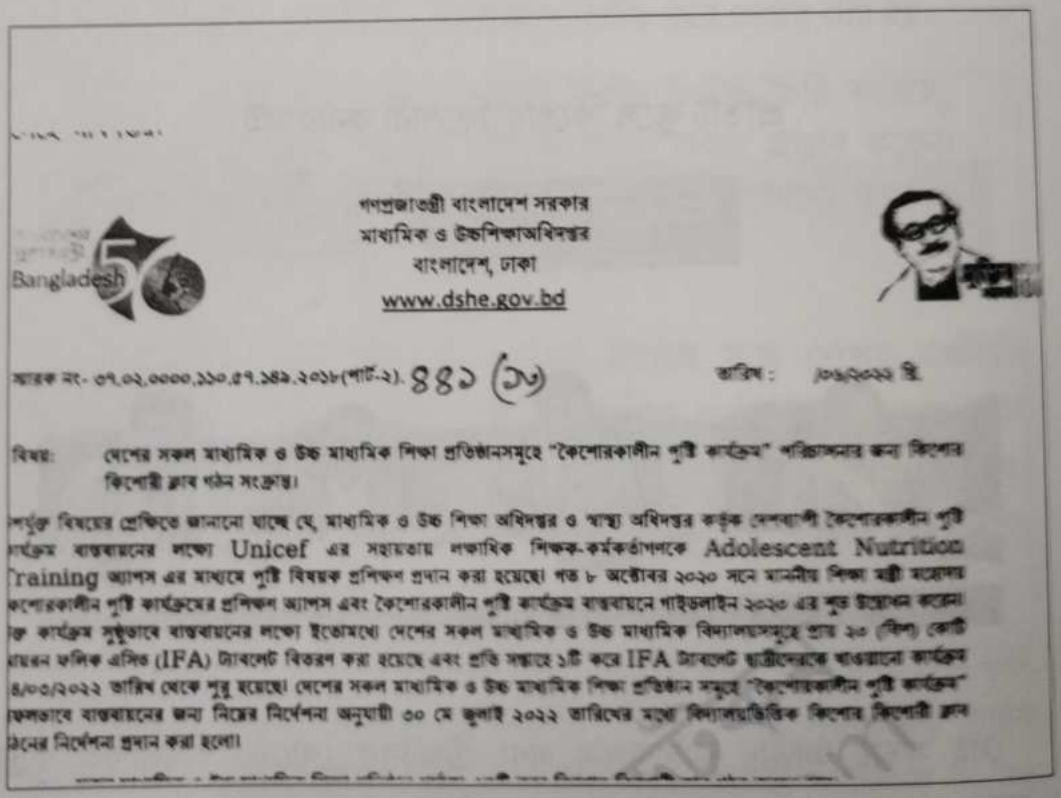


সেই সভায় জাতীয় কারিকুলাম এবং টেক্সটবুক বোর্ডের আলোচিত কট্টর এনজিও ঘরানার সদস্য অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান বলেন, '২০১২ সালে

শিক্ষা কারিকুলামে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার বিষয়গুলো যুক্ত করা হলেও সে বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। নতুন প্রজন্মকে দক্ষ ও সচেতন করে গড়ে তুলতে শিক্ষা কারিকুলাম যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি আরো গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন'।

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠনের নির্দেশ ১৮ জুন ২০২২ [৪১]

'এ ক্লাব গঠনের বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে অধিদপ্তর। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে একটি করে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণি থেকে ৬জন করে মোট ৩০ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজের ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচ জন করে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করতে হবে। বিদ্যালয়টি কো-এডুকেশন হলে ৩০ জন সদস্যদের অর্ধেক মেয়ে এবং অর্ধেক ছেলে (৫০:৫০) শিক্ষার্থী হতে হবে। এ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে সব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সব ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য সেবা দেয়া হবে।'



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাঅধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫৭.১৪৯.২০১৮(পার্ট-২).৪৪১ (১৬)

তারিখ : /০৬/২০২২ খ্রি.

বিষয়: দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম" পরিচালনার জন্য কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন সংক্রান্ত।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Unicef এর সহায়তায় লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তাগণকে Adolescent Nutrition Training অ্যাপস এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর ২০২০ সনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ অ্যাপস এবং কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গাইডলাইন ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রায় ২০ (বিশ) কোটি মায়রন ফলিক এসিড (IFA) ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রতি সপ্তাহে ১টি করে IFA ট্যাবলেট ছাত্রীদেরকে খাওয়ানো কার্যক্রম ৪/০৩/২০২২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে "কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম" ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ মে জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীনে 'কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প[৪২]

"কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

৭. কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন

বাস্তবায়নকাল : ০১/০৪/১৮ - ৩১/১২/২০২১
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা: ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৫৫৩ টি ইউনিয়ন এবং ৩৩০টি পৌরসভা (মোট ৪৮৮৩টি ক্লাব গঠন)।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা এবং Sexual & Reproductive Health And Rights (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা।
কার্যক্রম: কিশোর কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।
প্রকল্প পরিচালক: জনাব জয়ন্ত কুমার সিকদার (যুগ্মসচিব), মোবাইল নং: 01730335025

যৌনশিক্ষার সংস্কৃতি গড়তে ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রম

স্কুলের পাঠ্যক্রমের বাইরে, ব্র্যাক কমিউনিটি পর্যায়ে সমকামী-সহায়ক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। যৌনশিক্ষায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর, ইয়ুথ গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন স্কুলে মাসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যু প্রচারের কাজে নিয়োজিত করা হয়। এসব প্রকল্পের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হলো LGBTQ+ সামাজিকীকরণ। ব্র্যাকের সব প্রকল্প (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ডিজাইন করা হয়। বর্তমানে তিনটি LGBTQ+ সামাজিকীকরণ প্রকল্প চলছে, যা হলো রাইট হিয়ার রাইট নাও, সমতন্ত্র, এবং আমরা নতুন নেটওয়ার্ক।

রাইট হিয়ার, রাইট নাও (RHRN)

RHRN প্ল্যাটফর্ম হলো নেদারল্যান্ডসের রুটগার্স ফাউন্ডেশনের (Rutgers Foundation) একটি উদ্যোগ, যা বিশ্বব্যাপী এসআরএইচআর (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার) এবং সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৭ সাল থেকে রুটগার্সের সাথে অংশীদারিত্বে বাংলাদেশে সমকামী অধিকার নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। সরাসরি সমকামিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, তাই তারা শব্দের সূক্ষ্ম ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। ব্র্যাকের এক শীর্ষ কর্মকর্তা সম্প্রতি শরীফা ইস্যুতে এক বক্তব্যে সমকামী-বান্ধব বাংলাদেশ গড়ার সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরেছেন। ব্র্যাক পাবলিক হেলথ স্কুল এই প্রকল্পের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছে:

> 'To ensure that no one is afraid to openly express who they are and who they love.'

অর্থাৎ, যে কেউ যেন নিজের যৌন পরিচয় প্রকাশ করতে পারে এবং যার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে তা প্রকাশ করতে পারে। এখানে পরোক্ষভাবে সমকামিতার

উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পায়ুসঙ্গম বা লেসবিয়ান পরিচয় প্রকাশের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর মূল ভিত্তি হলো "Love is love" মতবাদ, যেখানে প্রেমের সাথে জৈবিক লিঙ্গের সম্পর্ক নেই।

রুটগার্স সম্পর্কে জানা জরুরী। জোহানেস রুটগার্স (১৮৫০–১৯২৪) এই রুটগার্স সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন নারীবাদী ডাচ চিকিৎসক, যিনি ১৮৯২ সালে বিনামূল্যে গর্ভনিরোধকের প্রচলন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে গর্ভপাত বৈধ করার পক্ষে ছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে কাজের মাধ্যমে দারিদ্র্যের কষ্ট লাঘবে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৯০০-এর দশকের শুরুর দিকে, রুটগার্স নিউ-মালথুসিয়ান বন্ড (এনএমবি) নামক একটি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হন, যা গর্ভনিরোধক প্রচারে কাজ করত এবং যা পরবর্তীতে রুটগার্স ফাউন্ডেশনে পরিণত হয়। সময়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পাল্টে যায় এবং বর্তমান রুটগার্স সংগঠন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) নিশ্চিতে অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্যহীনতার ওপর গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজ করে৪৩।

রুটগার্স ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে জোহানেস রুটগার্স কুখ্যাত ইউজেনিক্স (ডারউইনের বিবর্তনবাদের আলোকে তথাকথিত কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্মরোধ করে বুদ্ধিদীপ্ত আলোকিত সভ্যতা গড়া ছিল ইউজেনিক্স মুভমেন্টের মূল লক্ষ্য) সমর্থন করতেন, কিন্তু আজকের রুটগার্স সংস্থা এ ধরনের মতাদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। বর্তমান রুটগার্স অধিকারভিত্তিক যৌনশিক্ষা (SRHR) নিয়ে কাজ করে, যার লক্ষ্য মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (Inclusive society) প্রতিষ্ঠা[৪৩]।

এই প্রজেক্টে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কমপক্ষে ১৪টি স্থানীয় এনজিওদের পার্টনারশীপে মাঠ পর্যায়ে যৌনশিক্ষার প্রশিক্ষক গড়ে তুলছে। ব্র্যাকে এই প্রকল্পের জন্য আলাদা ওয়েবসাইট তৈরী করেছে (Right Here Right Now)৪৪। বাংলাদেশে স্থানীয় এনজিওগুলো অনেক বছর ধরে ব্র্যাকের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে সমকামিতা সামাজিকীকরণে। অনেক সময় তারা আলাদাভাবেও কাজ করে। কিন্তু সেটা ব্র্যাক পাবলিক হেলথ অনুষদের তদারকিতে হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রম বা পলিসি পর্যায়ে এরা যেন প্রভাবিত করতে পারে সেজন্য এসব স্থানীয় এনজিও কর্মকর্তাদের ব্র্যাক ট্রেইনিং দিয়ে গড়ে তুলেছে।

রাইট হিয়ার, রাইট নাও (RHRN) প্রজেক্টে জড়িত লোকাল এনজিওগুলো	
১. BRAC	৯. Oboyob (*বয়েজ অব বাংলাদেশ* এই নতুন নামে কাজ করছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে)
২. Bandhu Social (সমকামী অধিকার নিয়ে ১৯৯৭ সালে জন্ম নেয়া প্রতিষ্ঠান)	১০. United for Body Rights (UBR) Alliance
৩. Youth Policy Forum	১১. Bangladesh Mahila Parishad
৪. RHSTEP	১২. Dance8Life
৫. Naripokkho	১৩. Arrow
৬. SERAC-Bangladesh	১৪. HiVOS
৭. Family Planning Association of Bangladesh (FPAB),	
৮. BLAST	

ব্র্যাকের RHRN ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে তারা এ পর্যন্ত আঞ্চলিক পর্যায়ে ১০০ ইয়ুথ গ্রুপকে জড়িত করে যৌনশিক্ষা প্রসারে ২৫০০ ইয়ুথকে বিভিন্ন ট্রেইনিং এর মাধ্যমে লিডার হিসেবে তৈরী করেছে। তারা অসচেনতার সুযোগ এবং ব্র্যাকের দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা ইমেজ ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে লবিং করে ২০০০ স্কুল এবং মাদ্রাসায় যৌনশিক্ষা নিয়ে কাজ করছে। যারা এসব প্রজেক্টে কাজ করছে তারাও সচেতন নন। ব্র্যাকের মত প্রতিষ্ঠান সন্মাননা দিলে উঠতি বয়সী যুবক- যুবতীর লুফে নেয়ার কথা। দেখা যায় বাহ্যিক ইসলাম পালনকারীরা (হিজাব, নিকাব, দাড়ী টুপি) তাদের অজান্তে সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সমকামিতা প্রসারে অন্যতম এগ্রেসিভ দেশ হচ্ছে নেদারল্যান্ডস (প্রথম সমলিঙ্গের বিয়ে লিগাল করা হয়)। নেদারল্যান্ডস এর এম্বেসীর কর্মকর্তা তাদের এই উদ্যোগে অনেক আশাবাদী।

RIGHT HERE RIGHT NOW (RHRN)

PI: Professor Sabina Faiz Rashid, Dean and Director
CGSRHR, BRAC JPGSPH.

Coordinator: Kuhel Islam, Senior Coordinator, BRAC JPGSPH; *Tasfiyah Jalil*, Senior Coordinator, BRAC JPGSPH; *Rituja Shome*, Research Assistant, BRAC JPGSPH.

Timeline: July 2017 - October 2020

Implemented by: Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR).

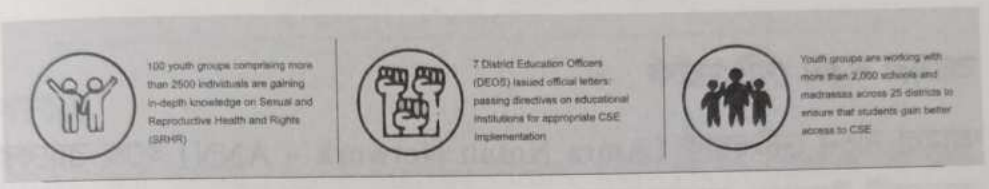
Objective: To create a world where everyone is able to access quality and youth-friendly health services. To ensure that no one is afraid to openly express who they are and who they love.

Methodology: Evidence-based Advocacy and Capacity Strengthening.

Donor: Rutgers

Partners: BRAC Education Programme, BRAC; RHSTEP; Bandhu Social Welfare Society (Bandhu); Naripokkho; SERAC-Bangladesh; Family Planning Association of Bangladesh (FPAB); Oboyob; BLAST; United for Body Rights (UBR) Alliance; Bangladesh Mahila Parishad Dance4Life; ARROW; HIVOS.

Grant Amount: BDT 35,57,400 (2019)



Youth-led initiatives showcased at the RHRN Youth Festival are very inspiring. Youth and adolescents can utilise social media as a powerful tool of bringing social change and ensuring gender justice.

• • •

Mr. Jan Swillens

First Secretary - Human Rights, Humanitarian Affairs and Gender: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangladesh

After the official letter was issued, the teachers were more encouraged to teach Comprehensive Sexuality Education (CSE) in school.

• • •

Md Enayet Hossain

District Education Officer (DEO), Rangpur



এই প্রকল্পের প্রধান গবেষক হলেন প্রফেসর সাবিনা ফাইজ রশিদ, যিনি ব্র্যাকের LGBTQ+ সেন্টার পরিচালনা করেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে মাঠ পর্যায়ে যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে মেয়েদের মাসিক ব্যবস্থাপনার আড়ালে



ছবি- আমরা নতুন নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের যুবকদের সম্মেলনে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক। শিক্ষার্থীরা মাসিকের লজ্জা ভাংগার অংশ হিসেবে প্যাড তৈরী করেছে। এই বয়সী শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেলে ধরতে ইতিবাচক কাজ হিসেবে এসবে জড়িত হয়েছে। ব্র্যাক বাংলাদেশের মানুষের অজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইমেজ কাজ লাগিয়ে পশ্চিমা সমাজের বিকৃত মতবাদ বাংলাদেশে আমদানী করছে।

সমতন্ত্র

BRAC-এর সমতন্ত্র (Somotontro) উদ্যোগ একটি বিশেষ প্রোগ্রাম, যা লিঙ্গ ন্যায়বিচার (Gender Justice) এবং বৈচিত্র্য (Diversity) তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে কাজ করে। ব্র্যাকের লিঙ্গ ন্যায়বিচার ও বৈচিত্র্য প্রোগ্রামের আওতায় চালু হওয়া এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো সচেতনতা তৈরি করা, সামাজিক ট্যাবুগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা এবং যুবক সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে লিঙ্গ-সচেতন তথা সমকামী-সহায়ক একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

ব্র্যাকের দীর্ঘদিনের ইমেজ এবং LGBTQ+ মতাদর্শ নিয়ে অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে ২০২৩ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সমতন্ত্র মুভমেন্টের ব্যানারে সরাসরি সমকামিতার প্রতীক ব্যবহার করায় ক্যাম্পাসে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তারা ৭৩টি লিঙ্গ/জেন্ডার প্রমোট করার বিষয়টি স্বীকার করে।

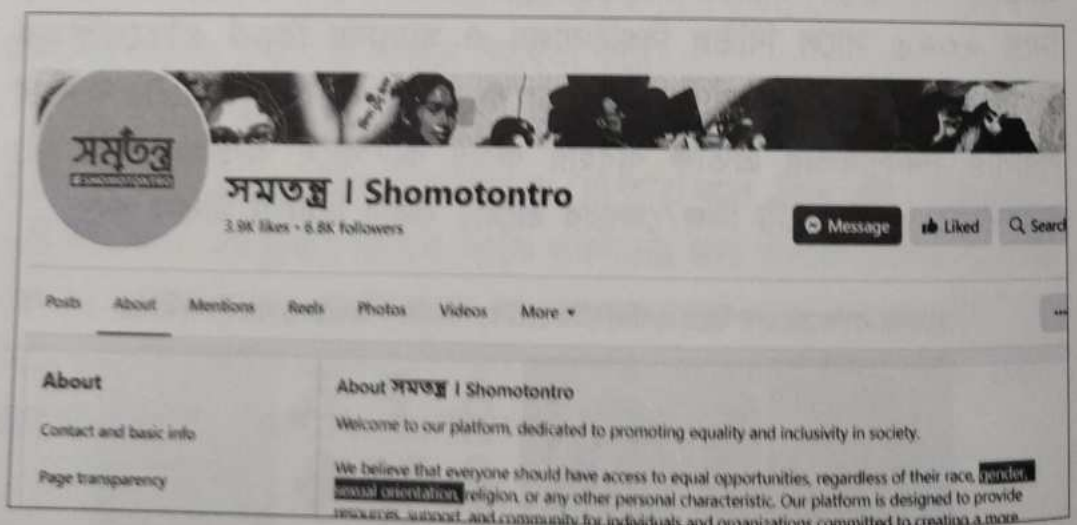
ব্র্যাকের সমতন্ত্রের পোস্টারে এলজিবিটির প্রতীক, সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের



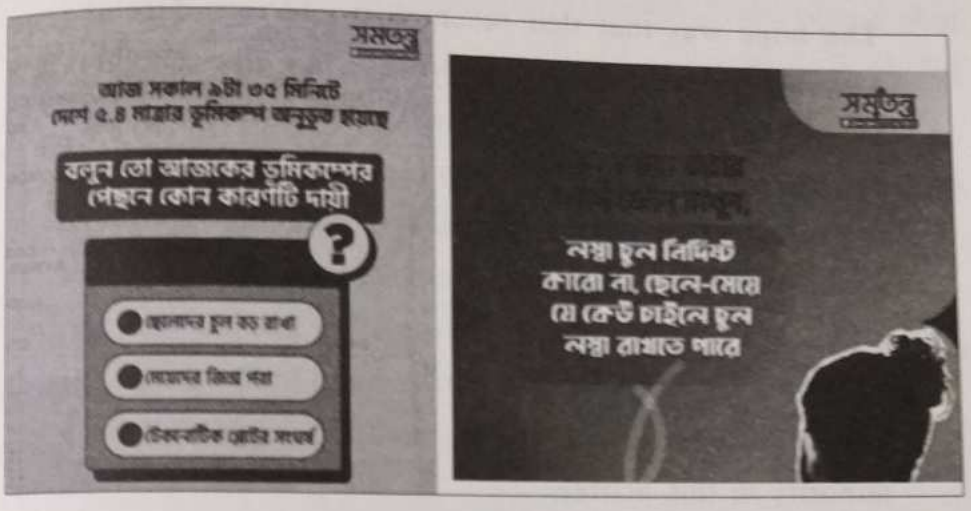
এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতা তৈরি হওয়ায় তারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শহীদ আবু সাঈদের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রথম শারীরিকভাবে প্রতিবাদ জানায় এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসিও এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর জানা যায়, বিখ্যাত তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সমতন্ত্র বিতর্কে অংশ নিয়েছিল। যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদেরকে LGBTQ+ এজেন্ডা প্রসারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

আইইউবিতেও সমতন্ত্র প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে আমন্ত্রণপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সরাসরি সমকামিতার উল্লেখ রয়েছে; ইংরেজিতে "Sexual Orientation" লেখা থাকলেও, বাংলায় এর সরাসরি অনুবাদ না থাকায় বিষয়টি সাধারণত স্পষ্ট বোঝা যায় না।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা কৌশলে ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং সংস্থাকে যুক্ত করে যাতে রক্ষণশীল সমাজের সাধারণ যুবক-যুবতীরা সহজেই বুঝতে না পারে। ছবিতে দেখা যায়, এক পরিচিত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব নারী ও পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছেন যা সমতন্ত্র প্ল্যাটফর্মের ভিডিও গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে, ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হতে পারে। মুসলিমদেরকে ভেবেচিন্তে, জেনে-বুঝে পদক্ষেপ নিতে হবে; নতুবা মুসলিম হয়েও কওমে লুতের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে।



ব্র্যাকের সমতন্ত্র পশ্চিমা বিশ্বের জেন্ডার নিরপেক্ষ বিশ্ব গড়ার এজেন্ডায় জনপরিসরে কাজ করছে। সামাজিক মূল্যবোধকে কটাক্ষ করা তাদের কৌশলের অংশ। দেখুন তারা সমাজে সংঘাত তৈরী করার উসকানি দিয়ে থাকে।



ব্র্যাকের স্বীকারোক্তি - মাসিক প্রকল্পের আড়ালে সমকামিতা এজেন্ডা

সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে 'শরীফার গল্প' অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD)-এর জেন্ডার ও সামাজিক রূপান্তর বিভাগের সিনিয়র ফেলো মাহীন সুলতান বাংলাদেশে কম্প্রিহেনসিভ যৌনশিক্ষার (CSE) প্রসার নিয়ে দ্য ডেইলি স্টার-এর তামান্না খানের সাথে মত বিনিময় করেছেন ৫ জুলাই ২০২৪ সালে৪৬। উল্লেখিত দুজনে একসাথে নারীবাদী সংস্থা নারীপক্ষের হয়ে কাজ করেছে। তারা ২০১৪ সালে বাংলাদেশের যৌনশিক্ষা বিষয়ে রিভিউ পেপার লিখেছেন যেখানে এটাকে ধর্মী মৌলবাদীদের সাথে ট্যাগিং করেছেন[৪৭]। কেন পাঠ্যপুস্তকে যৌনতা অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, কেন সমকামিতাকে নেতিবাচক চোখে দেখা হয়- এসব নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলেন।

ডেইলি স্টারের সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয় - শরীফার গল্প'জাতীয় পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়া নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? ইংরেজি জবাব উপস্থাপন করছি কেননা বাংলায় LGBTQ+ নিয়ে শব্দের প্যাঁচ ধরা অনেক সময় মুশকিল।

> I think, was a very positive step to try and introduce the concepts surrounding gender diversity. It was a well-researched piece of text. The idea was that students

should be aware of the various gender identities and be more open to others who find themselves unable to fit into the binary identities of 'boy'or 'girl'.

The hope was that that teachers would introduce the topic sympathetically and sensitively. The government in its policies is very open to sexual and reproductive health and rights (SRHR) and is committed to including CSE in the curriculum. However, it is sometimes scared of the reaction of people that it considers extremists. And often, it is only the most conservative people who get heard on social media. They have been loud enough for the authorities to hear them, but they might still be a minority in this matter. ...

People who have been opposing the text have said that it promotes homosexuality. This is a clear misrepresentation of the message of the story. Unfortunately, the government was influenced by this kind of reaction..

অর্থাৎ আমি মনে করি, শরীফার গল্প পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল, যা লিঙ্গ বৈচিত্র্যের (LGBTQ+) ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এটি ভালোভাবে গবেষণাকৃত লেখা, যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের বিষয়ে সচেতন হয় এবং এমন মানুষদের প্রতি আরও গ্রহণযোগ্য হয়, যারা 'ছেলে'বা 'মেয়ে'এই দ্বৈত পরিচয়ের বাইরে নিজেদের খুঁজে পান (অর্থাৎ, তিনি জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল লিঙ্গে বিশ্বাসী নন, ইনভার্টেড কমার মাধ্যমে তা বুঝানো হয়েছে)। আশা করা হয়েছিল যে শিক্ষকরা বিষয়টি সহানুভূতির সাথে এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

সরকার তার নীতিমালায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) বিষয়ে যথেষ্ট খোলামেলা এবং পাঠ্যক্রমে CSE অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে, কখনও কখনও সরকার এমন কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়,

যাদেরকে তারা উগ্রপন্থী বলে মনে করে। প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে রক্ষণশীল মানুষেরাই তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পান। তারা এমনভাবে আওয়াজ তুলেছে যে কর্তৃপক্ষ তা শুনতে বাধ্য হয়েছে, যদিও এই ক্ষেত্রে তারা হয়তো একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। অধিকাংশ মানুষ হয়তো এই পাঠ্যাংশ নিয়ে কোনো সমস্যা অনুভব করেন না। তাই প্রশ্ন রয়ে যায়, সরকার কি একটি ছোট উগ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত কিনা।

যারা এই পাঠ্যাংশের বিরোধিতা করেছেন তারা বলেছেন এটি সমকামিতাকে উৎসাহিত করে। এটি গল্পের মূল বার্তার একটি স্পষ্ট বিকৃত উপস্থাপন। দুর্ভাগ্যবশত, সরকার এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

যেসব সংস্থা সিএসই (কম্প্রিহেনসিভ সেক্স এডুকেশন) প্রচারের জন্য কাজ করছে, তারা কি সহিংসতার হুমকি পায়?

> BRAC, Naripokkho, and Nagorik Uddyog are all part of the Right Here Right Now coalition that promotes CSE in schools and increased access to adolescent health services. The coalition also contributes to changing social and gender norms by developing influencers and mobilising the youth to interact with the local government authorities, teachers and schools to promote CSE.
>
> It has been very careful in not exposing the youth volunteers to any kind of risks. In their outreach programmes, they talk about reproductive health education and topics like menstrual health regulation, and access to services.
>
> They don't go around talking about sexual orientation and gender identity. Those topics are avoided because they know that they might face very strong reactions from the community, the authorities and the schools.
>
> However, organisations that are more explicitly dealing with sexual orientation and gender identity have to

be very careful. A lot of misinformation was spread on social media following the Sharif-Sharifa debacle. Both individuals and organisations were labelled and threatened for their work on sexual orientation and gender identity.

Unfortunately, there's not much legal recourse available for such hate crimes and cyber harassment, which have detrimental effects on activists' physical and mental well-being. Citizens don't usually file cases under the Cyber Security Act for fear of not protecting their privacy and personal data.

অর্থাৎ ব্র্যাক, নারীপক্ষ এবং নাগরিক উদ্যোগ, এরা সকলেই রাইট হিয়ার রাইট নাও (RHRN) কোয়ালিশনের অংশ, যারা স্কুলে সিএসই প্রচার এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকারের উন্নয়নে কাজ করে। এই কোয়ালিশন সামাজিক এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত মানসিকতা পরিবর্তনে অবদান রাখে (অর্থাৎ সমকামিতা বান্ধব সমাজে লিঙ্গ মানসিকতা পরিবর্তন করা অবিচ্ছেদ্য অংশ), বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি (ইনফ্লুয়েন্সার) তৈরি করে এবং যুবসমাজকে স্থানীয় সরকার, শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে।

তারা যুব স্বেচ্ছাসেবকদের কোনো ঝুঁকির মুখোমুখি না করানোর বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। তাদের প্রচারণামূলক কার্যক্রমে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং মাসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা ও সেবাগ্রহণের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারা *যৌন অভিমুখ এবং লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে না (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টশন)*। এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে, কারণ তারা জানে যে এই ধরনের আলোচনায় কমিউনিটি, কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলগুলো থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসতে পারে।

তবে, যেসব সংগঠন যৌন অভিমুখ (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টশন) এবং লিঙ্গ পরিচয় (জেন্ডার আইডেন্টিটি) নিয়ে সরাসরি কাজ করে, তাদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয়। শরীফ-শরীফা বিতর্কের পর সামাজিক মাধ্যমে প্রচুর ভুল তথ্য ছড়ানো হয়। ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিকভাবে এসব কর্মীদের যৌন অভিমুখ এবং লিঙ্গ পরিচয়ের ওপর কাজের জন্য আক্রমণাত্মক ট্যাগ দেয়া হয় এবং হুমকি দেওয়া হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ধরনের ঘৃণাপূর্ণ অপরাধ এবং সাইবার হয়রানির বিরুদ্ধে তেমন কোনও আইনগত প্রতিকার নেই, যা কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। নাগরিকরা সাধারণত সাইবার সিকিউরিটি আইনে মামলা করেন না, কারণ তারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

মাহীন সুলতানার ওপরোক্ত সাক্ষাতকারে স্পষ্ট হয়েছে যে সামাজিক চাপের কারণে সমকামিতা নিয়ে প্রকাশ্যে বলে না, সমাজ এখনো তৈরী হয়নি (They don't go around talking about sexual orientation and gender identity) । এখানে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে যৌনশিক্ষার মাধ্যমে ব্র্যাক পশ্চিমা যৌন বিকৃতির মতবাদ আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হাতেগোনা কয়েকজন নারীবাদী কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নূন্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই।

মোদ্দা কথা- পশ্চিমা অর্থায়নে এনজিওগুলো কিছু ইতিবাচক কাজ করলেও তাদের মূল এজেন্ডা লিবারেল নৈতিকতার পরিবেশ কায়েম করা যা আমাদের সমাজের মূল্যবোধ বিরোধী। বিষয়টি বোধগম্য করার প্রচেষ্টা হিসেবে গ্লাসের পানিকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

References

1. Rashid, S. F. Providing sex education to adolescents in rural Bangladesh: Experiences from BRAC. Gender & Development 8, 28–37 (2000).
2. Education Education program. BRAC https://www.brac.net/program/education/.
3. Health (JPGSPH), J. P. G. S. of P. Annual Report (JPGSPH) : February 2005 - January 2006. Incorporating graduation of the first batch of MPH (2006).
4. 1Million March 4 Children at Lethbridge city hall met with counter protest - Lethbridge | Globalnews.ca. Global News https://globalnews.ca/news/9976182/1-million-march-4-children-lethbridge-city-hall-counter-protesters/.
5. 'No taxes for evil woke politics': Protesters, parents clash over sex ed controversy at Princeton Middle School - The Princetonian. https://www.dailyprincetonian.com/article/2024/01/princeton-news-broadfocus-public-school-board-sex-education-curriculum-protest-lgbtq.

6. Maurice, E. P. A spike in children being homeschooled may be due to LGBT-inclusive education. PinkNews | Latest lesbian, gay, bi and trans news | LGBTQ+ news https://www.thepinknews.com/2019/09/23/birmingham-homeschooling-lgbt-education-parkfield-anderton-park/ (2019).

7. Braga, L. L., Juliana Menasce Horowitz, Kiley Hurst and Dana. Race and LGBTQ Issues in K-12 Schools. Pew Research Center https://www.pewresearch.org/social-trends/2024/02/22/race-and-lgbtq-issues-in-k-12-schools/ (2024).

8. Idoko, C. FG orders NERDC to remove sex education from basic education curriculum. Tribune Online https://tribuneonlineng.com/fg-orders-nerdc-to-remove-sex-education-from-basic-education-curriculum/ (2022).

9. 'No' to sex education encourages early pregnancies in Central America. Q COSTA RICA https://qcostarica.com/no-to-sex-education-encourages-early-pregnancies-in-central-america/ (2023).

10. Wong, A. 8 states restricted sex ed last year. More could join amid growing parents' rights activism. USA TODAY https://www.usatoday.com/story/news/nation/2024/02/16/states-banning-lgbtq-sex-ed/72595403007/.

11. Ericksen, I. H. & Weed, S. E. Re-Examining the Evidence for School-Based Comprehensive Sex Education: A Global Research Review. Issues Law Med 34, 161–182 (2019).

12. The History & Agenda Behind CSE. StopCSE.org https://www.comprehensivesexualityeducation.org/history-of-cse/ (2015).

13. UNESCO-International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach - UNESCO Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770.

14. Disagreeing over References to Comprehensive Sexual Education, Delegates Fail to Adopt Draft Resolution, as Commission on Population and Development Concludes Session | Meetings Coverage and Press Releases. https://press.un.org/en/2023/pop1109.doc.htm.

15. Dr. Miriam Grossman, MD - Child & Adolescent Psychiatrist in New Hampton, NY | Healthgrades. https://www.healthgrades.com/physician/dr-miriam-grossman-gg3gh.

16. Jones, J. H. (James H. Alfred C. Kinsey : A Public/Private Life. (New York : W.W. Norton, 1997).

17. Bancroft, J. Alfred C. Kinsey and the politics of sex research. Annu Rev Sex Res 15, 1–39 (2004).

18. Sexes: Attacking the Last Taboo | TIME. https://time.com/archive/6857842/sexes-attacking-the-last-taboo/.

19. A brief history of sex education | OpenLearn - Open University. https://www.open.edu/openlearn/health-sports-psychology/health/a-brief-history-sex-education.

20. Menstruation: science and society - ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937820306190.

21. Sommer, M., Hirsch, J. S., Nathanson, C. & Parker, R. G. Comfortably, Safely, and Without Shame: Defining Menstrual Hygiene Management as a Public Health Issue. Am J Public Health 105, 1302–1311 (2015).

22. BRAC. BRAC water, sanitation and hygiene : nine years of scale and innovation in Bangladesh : programme report 2006-2015. 55 p. : 2 diagr., 24 fig, 1 tab. (2016).

23. Going beyond the hygiene taboos: It's really simple! :: IRC. https://www.ircwash.org/blog/going-beyond-hygiene-taboos-it%e2%80%99s-really-simple.

24. Menstrual Hygiene Management in schools: South Asia | WASH Matters. https://washmatters.wateraid.org/publications/menstrual-hygiene-management-in-schools-south-asia.

25. The Period Taboo: A Universal Problem | CARE International. https://www.care-international.org/stories/period-taboo-universal-problem (2021).

26. Nearly half of American women have been 'period shamed' | Daily Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5233629/Nearly-half-American-women-period-SHAMED.html.

27. The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma | SpringerLink. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0614-7_17.

28. SAMAKAL. স্বাস্থ্যঝুঁকিতে মেয়েরা, লজ্জা-ভয়ে স্কুল ছাড়ছে. স্বাস্থ্যঝুঁকিতে মেয়েরা, লজ্জা-ভয়ে স্কুল ছাড়ছে. https://tinyurl.com/5avm55dx

29. দেশের ২০০টি স্কুলে মেয়েদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করবে 'উই ফর দেম'. https://tinyurl.com/vww26ksp .

30. মিয়াসজীব. পিরিয়ডের ট্যাবু ভাঙতে সোচ্চার 'ঋতু'. Prothomalo https://www.prothomalo.com/lifestyle/পিরিয়ডের-ট্যাবু-ভাঙতে-সোচ্চার-ঋতু (2022).

31. মাসিক নিয়ে ট্যাবু ভাঙছে – DW – 02.01.2017. dw.com. https://tinyurl.com/5axf4ze6

32. Comprehensive Sexuality Education (CSE). Share-Net Bangladesh https://www.share-netbangladesh.org/comprehensive-sexuality-

education-cse/ (2024).

33. সম্পাদক. শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌনতায় ভরা বই বিতরণ. ইসলামিক অনলাইন মিডিয়া https://i-onlinemedia.net/5318 (2014).

34. UNFPA Bangladesh | Generation Breakthrough. https://bangladesh.unfpa.org/en/news/generation-breakthrough.

35. সেক্স এডুকেশন: সাড়ে তিনশ স্কুলের শিক্ষার্থীরা 'জেনারেশন ব্রেক থ্রু'র ক্লাসরুমে পাঁচ বছরে যা শিখলো. BBC News বাংলা https://www.bbc.com/bengali/news-47694959 (2019).

36. প্রতিবেদকনিজস্ব. পাঠ্যবইয়ে যৌনশিক্ষা আছে, পড়ানো হয় না. Prothomalo https://www.prothomalo.com/bangladesh/পাঠ্যবইয়ে-যৌনশিক্ষা-আছে-পড়ানো-হয়-না (2019).

37. Breaking the shame. Towards improving SRHR education for adolescents and youth in Bangladesh | NWO. https://www.nwo.nl/en/projects/w-08560003 (2015).

38. রিপোর্টস্টার অনলাইন. কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবায় মোবাইল অ্যাপ চালু. The Daily Star Bangla https://bangla.thedailystar.net/health/news-441146 (2023).

39. প্রতিটি স্কুলে কিশোর-কিশোরী কর্নার চাই. https://tinyurl.com/esjhswzf

40. Blog, V. S. Creating a Space for Shame-Free Sex Ed. #VitalSigns https://jpgsphblog.wordpress.com/2017/08/21/creating-a-space-for-shame-free-sex-ed/ (2017).

41. Dainikshiksha. সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠনের নির্দেশ - দৈনিকশিক্ষা. Dainik shiksha https://tinyurl.com/5279muvw

42. 'কিশোর-কিশোরী-ক্লাব-স্থাপন'-শীর্ষক-প্রকল্প. https://tinyurl.com/5dbahwx4

43. Origins of Rutgers. Rutgers International https://rutgers.international/about-rutgers/origins-of-rutgers/.

44. Right Here Right Now. BRAC https://www.brac.net/program/social-empowerment-and-legal-protection/right-here-right-now/.

45. The RHRN Youth Festival. (2024).

46. Khan, T. 'Government should not be swayed by the opinions of a small extremist minority'. The Daily Star https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/government-should-not-be-swayed-the-opinions-small-extremist-minority-3648986 (2024).

47. Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and Higher Secondary Education in Bangladesh. https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-0141-2016033

ব্র্যাকের প্রস্তাবিত যৌনশিক্ষা: চলো ভুল ধারণাগুলো ভেঙে ফেলি

ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR) দেশে পায়ুসঙ্গম অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে, স্কুল পর্যায়ে যৌনশিক্ষা কারিকুলাম কেমন হবে, তা নিয়ে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। মূলধারার গণমাধ্যমে (ডেইলি স্টার এবং প্রথম আলো) যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বেশ কয়েকটি গোলটেবিল বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই কাজের অংশ হিসেবে, নেদারল্যান্ডসের আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে যৌন-শিক্ষার নানা বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক রিভিউ (Systematic review) পরিচালনা করেন। ২০০৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা প্রবন্ধ এবং এনজিও রিপোর্ট ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে একটি সারমর্ম তৈরি করা হয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (ইউনিসেফ, ইউএন) বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে যৌন-শিক্ষার কনটেন্টের ঘাটতিগুলো তুলে ধরে এর সমাধানের প্রস্তাবও করা হয়।

পরে, এই রিভিউ পেপারটি 'A Review Report on Comprehensive Sexuality Education in Bangladesh' নামে জুলাই ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে পাঠ্যপুস্তকে যৌনশিক্ষার কনটেন্ট বর্তমানে (২০১৮ পর্যন্ত) কোন অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতে এর কী ধরনের বিস্তৃতি হতে পারে, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ব্র্যাকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং এনজিওগুলোর প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করেছে, যার ফলে শরীফ-শরীফা ইস্যুটি দেশে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট, অনলাইনে LGBTQ+ ইস্যু নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ওয়েবসাইট থেকে কিছু সংবেদনশীল কনটেন্ট

মুছে ফেলেছে। তাই এখন আর্টিকেলটির লিংক অনলাইনে নেই। পিডিএফ কপির গুগল ড্রাইভের লিংকও সংযোজন করা হয়েছে, যেখান থেকে আপনারা এটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

ব্র্যাক স্টাডি: যৌনশিক্ষায় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

ব্র্যাকের এই স্টাডির 'A Review Report on Comprehensive Sexuality Education in Bangladesh' এর নির্যাস উপস্থাপন করছি।

২০১৩ সাল থেকে দেশের কারিকুলামে সীমিত আকারে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এটি কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের বিস্তৃত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বইয়ে বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন, বাল্যবিবাহ, গর্ভধারণ, নির্যাতন, HIV/AIDS, মানসিক স্বাস্থ্য এবং বয়ঃসন্ধিকালীন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে (NCTB, ২০১৮)। তবে International Technical Guidance and Sexuality Education (ITGSE) গাইডলাইন অনুসারে যৌনশিক্ষার আরো অনেক বিষয় অনালোচিত (unexplored) রয়ে গেছে। এর মধ্যে বিশেষ কিছু বিষয় হলো:

* প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ: বাংলাদেশে কিশোরীদের মাসিক বা ঋতুস্রাব শুরু হয় ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে। এর মধ্যে প্রায় ৩০% কিশোরীর ঋতুস্রাব শুরু হয় ১১ থেকে ১৩ বছর বয়সে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়। এটা তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যাদের মাসিক আগে শুরু হয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই যৌনশিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ওয়াটার এইডের ডিরেক্টরও একই দাবি জানান।

* যৌনশিক্ষায় হস্তমৈথুন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে স্বপ্নদোষ দু-একবার উল্লেখ করা হলেও, হস্তমৈথুনের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। তাছাড়া, স্বপ্নদোষের কোনো বিস্তৃত আলোচনা নেই (NCTB, ২০১৮)।

* কারিকুলামে লিঙ্গ-পক্ষপাতমূলক আলোচনা পরিহার: লিঙ্গ প্রথা (জেন্ডার নর্ম) পরিবর্তন, লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন এবং লিঙ্গসমতা বিষয়ে আরও তথ্য

সহজলভ্য করা প্রয়োজন। কিন্তু কারিকুলামে লিঙ্গ-পক্ষপাতমূলক আচরণ দেখা যায় বেশি। যেমন, সপ্তম শ্রেণির একটি বইয়ে মেয়েদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে বলা হয়েছে, 'মেয়েরা তাদের নিরাপত্তার খাতিরে যেখানে সেখানে একা যাবে না।' অষ্টম শ্রেণির বইয়ে বলা হয়েছে, 'তাড়াতাড়ি গর্ভধারণের কারণে একজন মেয়ে ঘরের কাজ ভালোভাবে করতে পারে না। সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং এটা পরিবারে সমস্যা সৃষ্টি করে' (NCTB, ২০১৮)।

* যৌন বৈচিত্র্য (LGBTQ+) এবং বিয়েপূর্ব যৌন চাহিদা নিয়ে আলোচনা: ITGSE চায় যৌনশিক্ষা অধিকারভিত্তিক (rights-based) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) হোক। যদিও কারিকুলামে যৌন নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যৌন বৈচিত্র্য এবং *বিয়েপূর্ব যৌন চাহিদা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই*। এগুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ITGSE-এর মতে, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং যৌনতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কারিকুলামে এখনো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য নিয়ে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, স্কুলের জীববিদ্যা বইগুলোতে প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব সামান্যই আলোচনা আছে। এটি বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যের প্রতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো প্রতিফলিত করে না: '...লিঙ্গ, বয়স, জাতপাত, জাতীয়তা, ধর্ম, অক্ষমতা, নাগরিক অবস্থান, যৌন অভিমুখিতা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন/LGBTQ+), আঞ্চলিকতা এবং HIV রোগী নির্বিশেষে সবারই সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যমান অর্জনের অধিকার রয়েছে।'

ব্রেকিং দ্য শেইম প্রকল্প: চলো ভুল ধারণাগুলো ভেঙে ফেলি

যে ভুলগুলো যৌনশিক্ষার মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে, তা ব্র্যাক বুকলেট এবং ভিডিও তৈরী করে ক্লাসে পরীক্ষা করেছে[১]। এই বইয়ের কন্টেন্ট রাইটাদের অন্যতম সাদ আদনান খান (নীচের স্ক্রিনশটে) যিনি নারী সমকামী কমিক ম্যাগাজিন 'ধী' রচনায় জড়িত ছিলেন, যা আগের পরিচ্ছদে আলোচনা করা হয়েছে।

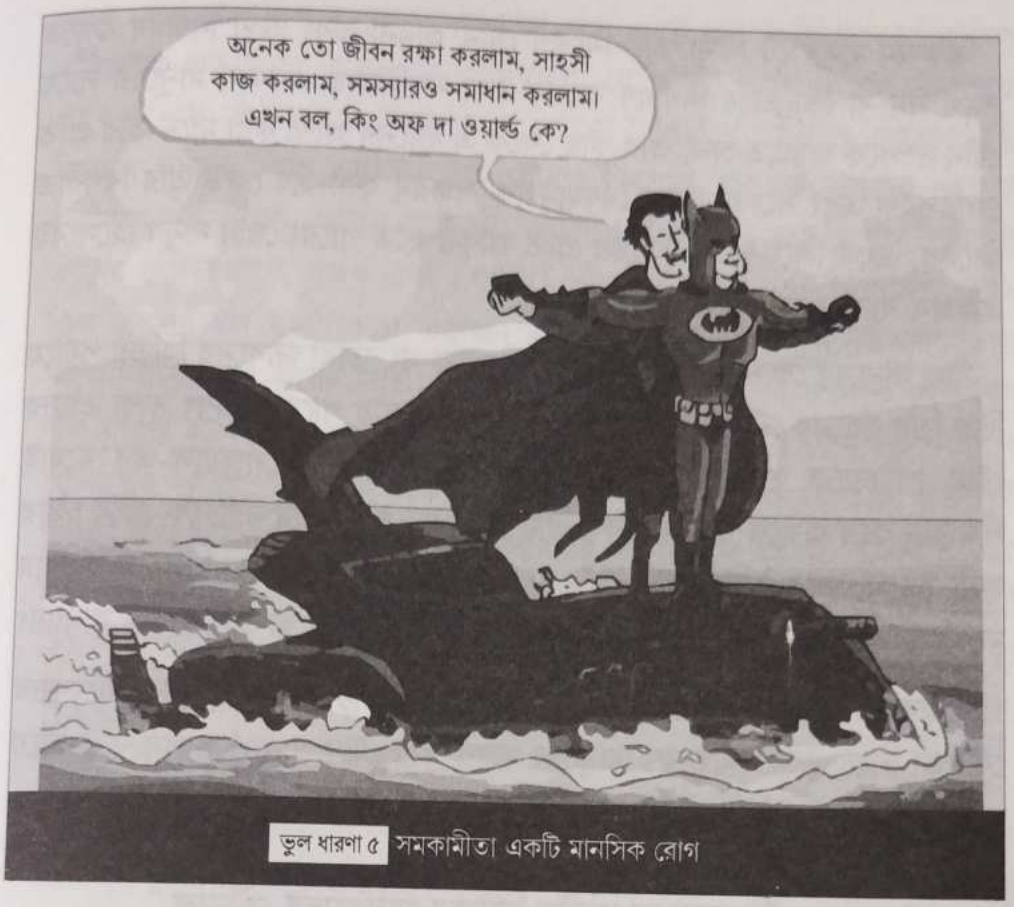
ভুল ধারণা-১: 'সমকামিতা একটি মানসিক রোগ'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ–সমকামিতা স্বাভাবিক, এটি মানসিক কোনো রোগ নয়। যে কেউ তার বিপরীত লিঙ্গের, একই লিঙ্গের বা উভয় লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এটি একজন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার, অর্থাৎ যৌন বৈচিত্র্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। একে মানসিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করে অসমকামী বানানোর চেষ্টা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যায়। এখানে মুক্তমনা অভিজিৎ রায়ের প্রকাশিত 'সমকামিতা' বইটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম আলো পত্রিকায়ও এই বইটি ২০১০ সালে প্রমোট করা হয়েছিল, যা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কার্টুন (সুপারম্যান) ছবির মাধ্যমে সমকামিতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে

'সমকামিতা বলতে একই জেন্ডারের মানুষের মধ্যে যৌনতাকে বোঝায় যিনি একজন সমকামী মানুষ যিনি ব্যক্তিগত, মানসিক এবং শারীরিকভাবে তার নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হন। সমকামী পুরুষরা ইংরেজিতে 'গে' এবং সমকামী নারীরা ইংরেজিতে 'লেসবিয়ান' হিসেবে বিশ্বজুড়েই সাধারণভাবে পরিচিত।

এই তথ্য অস্বাভাবিক, বা অদ্ভুত মনে করার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশে সমকামিতা নিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলা হয় না। গণমাধ্যমগুলোতেও সমকামী ব্যাক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করা হয় না বা তাদের এই যৌনতা নিয়ে কথা বলা হয় না। সমকামী মানুষদের এখনও পর্যন্ত সামাজিকভাবে ইতিবাচক চোখে দেখা হয় না। শত শত বছর ধরে বৈষম্য, কুসংস্কার এবং অবিচারের শিকার হয়ে আসছেন সমকামী মানুষেরা (স্ট্রং, ডেভল্ট ও সাইদ ১৯৯৯)। সমকামী পরিচয়টি নিয়ে এই গোপনীয়তা সৃষ্টির কারণে ব্যাপারটির সাথে লজ্জা এবং কলঙ্ক জড়িয়ে গেছে- যেমন, অধিকাংশ 'স্বাভাবিক' মানুষ মনে করে থাকেন সমকামীরা নোংরা এবং বিকৃত মানসিকতার অধিকারী বা তাদের মানসিক সমস্যা আছে। এই কারণেই দোষী সাব্যস্ত হওয়া, বা সমাজ থেকে বর্জন এমনকি হত্যার শিকার হওয়ার ভয়ে সমকামী মানুষেরা জনসম্মুখে তাদের পরিচয় প্রকাশ করেন না।



ভুল ধারণা ৫ সমকামীতা একটি মানসিক রোগ

আমাদের প্রকৃতিতে কিন্তু সমকামিতা ব্যাপকভাবে উপস্থিত। লেখিকা জোয়ান রফগারডেন তাঁর বই 'বিবর্তনের রেইনবো' (২০০৪) এবং অভিজিৎ রায় তাঁর 'সমকামিতা' (হোমোসেক্সুয়ালসিটি) (২০১০) বইটিতে পেঙ্গুইন, ডলফিন, বানর, সরীসৃপ, এবং আরো অনেকগুলো প্রাণীর কথা লিখেছেন যাদের মধ্যে সমকামিতা এবং সমকামী আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৭২ সালে, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন তার মানসিক রোগের তালিকা থেকে সমকামিতা বাদ দেয় (স্ট্রং, ডেভল্ট ও সাইদ ১৯৯৯)। এমনকি, জাতিসংঘও যৌনতাকে সম্প্রতি মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিভিন্ন যৌনতার মানুষকে সহিংসতা থেকে রক্ষা করা নিয়ে কথা বলছে (জাতিসংঘ প্রস্তাব ২০১৬)।

সমকামিতা একজন মানুষের সম্পূর্ণ জৈবিক এবং মানসিক গঠনের ফলাফল, এবং সমকামিতার জন্য কোনো পূর্বনির্ধারিত কারণ থাকে না। কেউ কেউ মনে করেন, সমকামী পরিচয় পরিবর্তন করে বা সংশোধন করে হেটেরোসেক্সুয়াল পরিচয় ধারণ করা সম্ভব বা করা উচিত।

একজন মানুষ যে কিনা তার নিজের যৌন কামনা এবং চিন্তা নির্ধারণ করতে সমর্থ নন বা ভিন্নভাবে নির্ধারণ করেন এবং সমলিঙ্গের একজন মানুষের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়াতে চান, তার কাছ থেকে এ ধরনের আশা করা মানে তার প্রতি জোরপূর্বক এবং সচেতনভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা। যে কেউ তার বিপরীত লিঙ্গের, একই লিঙ্গের, বা উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সেটা মানুষ হিসেবেই একজন ব্যক্তির অধিকার।

কিছু মানুষের কোন নির্দিষ্ট যৌন পরিচয় থাকে না, তারা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যৌনতার প্রতি আকর্ষণবোধ করতে পারেন, এবং তারা তাদের যৌন পরিচয়কে শুধুমাত্র হোমোসেক্সুয়াল অথবা হেটেরোসেক্সুয়াল-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চান না। কিন্তু এটি ঠিক সমাজের নিয়ম নীতিকে মেনে চলার জন্য সমকামিতার পরিচয় পরিবর্তন বা সংশোধন করে হেটেরোসেক্সুয়াল হওয়ার মতো ব্যাপার নয়, বরং সেই ব্যক্তির মানবাধিকারের বিরুদ্ধে এটি একটি অন্যায়।

গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে যৌন বৈচিত্র্য মহাসৃষ্টির একটি অংশ। আমাদের নিজেদের যৌনতা নিয়ে এবং সমলিঙ্গের মানুষের সাথে সুখী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা নিয়ে লজ্জিত বোধ করার কোন প্রয়োজন নেই।'

ভুল ধারাণা-২: 'হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের যৌনাঙ্গ অসম্পূর্ণ বা নেই'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ- আমাদের সমাজে হিজড়াদের লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সরকারও হিজড়াদের লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধন করেছে। কিন্তু ব্র্যাক এটাকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, হিজড়া একটি সংস্কৃতি। আমাদের সমাজে হিজড়াদের প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি রয়েছে, যা ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও তাদের নিজস্ব সংজ্ঞার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা মতবাদকে সামাজিকীকরণে ব্যবহার করতে যাচ্ছে। এই বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে–

'যৌনাঙ্গের ভিত্তিতেই একটি শিশুর জেন্ডার নির্ধারিত হয়, এটাই সাধারণ ধারণা। ক্ষেত্রবিশেষে এই ধারণার ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। সমাজ শিশুদের শুধু নারী বা পুরুষ হিসেবেই বিবেচনা করে এবং এই সামাজিক পরিচয়টাই বেশির ভাগ শিশু

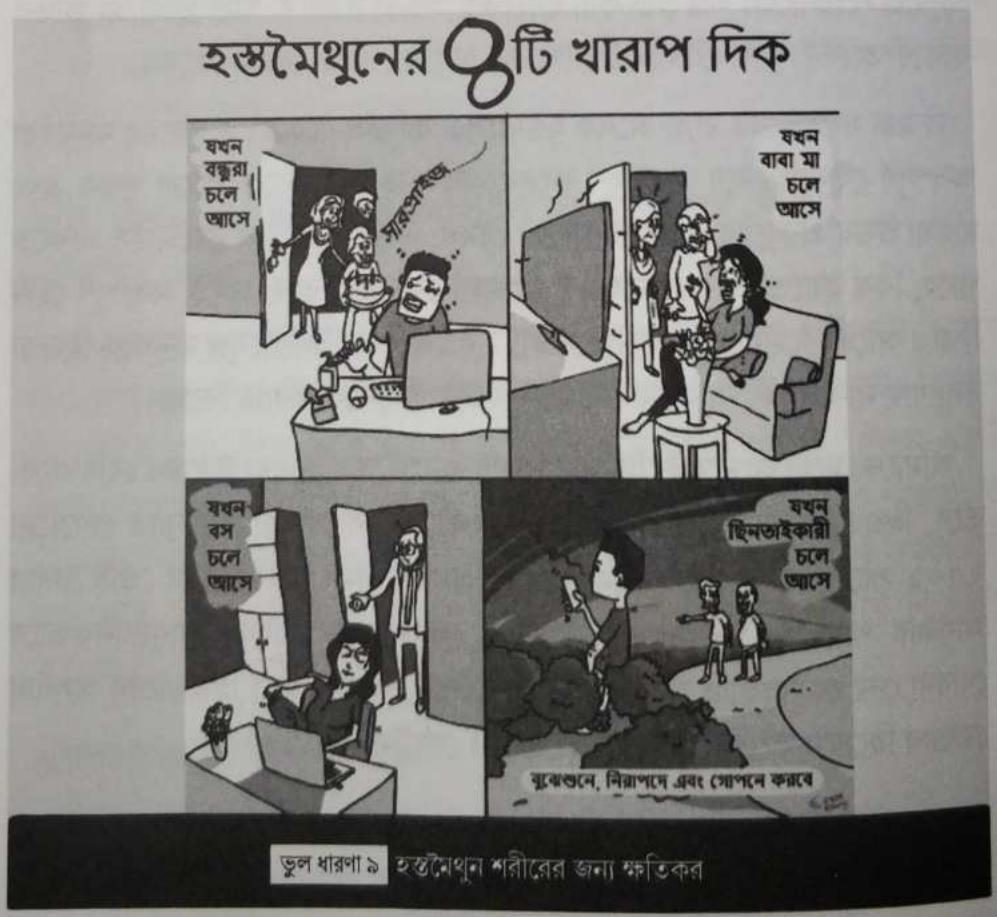
মেনে নেয়। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন যারা বয়স একটু বাড়লে নিজেদের নির্ধারিত পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করেন। উদাহরণস্বরূপ, যে শিশুটি পুরুষ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে সে বড় হয়ে নিজেকে যে কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একজন নারী হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন। তাই যৌনাঙ্গ সবসময় একজন মানুষের জেন্ডার নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে না। বাংলাদেশে যারা হিজড়া হিসাবে পরিচিত তাদের বেশিরভাগই পুরুষ এবং (পূর্ণাঙ্গ) পুরুষ যৌনাঙ্গ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাদের মন মানসিকতা একজন নারীর মতোই এবং মানসিকভাবে তারা নিজেদেরকে মনে করেন নারী। আমাদের সমাজে হিজড়াদের সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ ভাবে যে হিজড়াদের যৌনাঙ্গই নেই; বা যৌনাঙ্গের পরিবর্তে তাদের একটি ছোট গর্ত আছে; বা তাদের অঙ্গ অসম্পূর্ণ। হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের পরিবার ও সমাজে প্রায়ই নির্যাতিত এবং হয়রানির শিকার হন এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। প্রতিটি হিজড়া সম্প্রদায়ের একজন 'গুরু' থাকে যাঁর অধীনে নির্দিষ্ট রীতি পালন করে সে অনুযায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিছু হিজড়া লজ্জা বা অস্বস্তিকর অনুভূতির কারণে তাদের পুরুষ যৌনাঙ্গটি রাখতেন চান না, তাই কেটে ফেলেন।

হিজরা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ইন্টারসেক্স ব্যক্তিও রয়েছে। এ ধরনের মানুষেরা অসম্পূর্ণ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন অথবা তাদের কারো কারো পুরুষ এবং মহিলা উভয় প্রকারের যৌনাঙ্গই থাকে। যেমন, একজন ব্যক্তির ক্লিটোরিস থাকতে পারে; কিন্তু হয়তো তার যৌনাঙ্গর মুখ খোলা নেই এবং তার একটি অসম্পূর্ণ ছোট লিঙ্গও আছে ('হোয়াট ইজ ইন্টারসেক্স', ২০১৩)। সব ইন্টারসেক্স মানুষকে হিজড়া বলা যায় না যতক্ষণ না ব্যক্তি নিজেকে হিজড়া হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই 'হিজড়া' শব্দটি শুনলে অস্বস্তি এবং ইতস্তত বোধ করে। তবে, হিজড়াদের মানবাধিকার বিষয়টি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০০৯ সালে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী হিজড়ারা ভোট দেবার অধিকার পায়। ২০১৩ সালের নভেম্বরে, বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয় যে সরকারি ডকুমেন্টসে (পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র) হিজড়াদের আলাদা জেন্ডার হিসেবে উল্লেখ করা হবে (জৈন ও রোটেন, ২০১৩)।'

ভুল ধারণা-৩: 'হস্তমৈথুন শরীরের জন্য ক্ষতিকর'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ–এখানে হস্তমৈথুনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হস্তমৈথুন শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং এটি নিরাপদ ও আনন্দদায়ক। নিজেকে যৌন আনন্দ দেওয়ার এটি একটি ভালো উপায়, এবং সারা জীবন ধরে এটি করা সম্ভব। এটি যৌন আনন্দ লাভের সবচেয়ে নিরাপদ উপায়, কারণ এতে গর্ভধারণ বা যৌনবাহিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মেয়েদের হস্তমৈথুনের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ মেয়েরাও এটি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের হস্তমৈথুনের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ভাষায় কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে - কেউ কেউ ধর্মীয় কারণে এটি না-ও করতে পারে, এবং সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানানো জরুরি বলে বলা হয়েছে। কার্টুনের মাধ্যমে গোপনে হস্তমৈথুন করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।



ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে

হস্তমৈথুন হলো নিজের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে আনন্দ লাভ। বেশির ভাগ সময় পুরুষেরা তাদের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে বা হাত দিয়ে ওপরে নিচে মালিশ করার মাধ্যমে হস্তমৈথুন করে। মেয়েরা হাত দিয়ে বা আঙ্গুল দিয়ে তাদের ভগাঙ্কুর (ক্লিটোরিস) বা যোনির (ভ্যাজাইনা) ওপর বা আশেপাশে স্পর্শ করে বা নাড়িয়ে হস্তমৈথুন করে। অনেকে ভাবেন যে হস্তমৈথুন শুধু মাত্র ছেলেরাই করে থাকে, কিন্তু মেয়েরাও যে এটি করে সে বিষয়ে তারা জানেন না। কিন্তু মেয়েরাও এ কাজ করে থাকে। সব বয়সের নারী পুরুষই হস্তমৈথুন করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হস্তমৈথুন হয় তাদের প্রথম যৌন সুখ লাভের অভিজ্ঞতা। কিশোর-কিশোরীরা তাদের শরীরের পরিবর্তনগুলো যখন বুঝতে পারে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের হস্তমৈথুনের সাথে পরিচয় ঘটে। এমনকি বিবাহিত মানুষও অনেক সময় হস্তমৈথুন করে।

হস্তমৈথুন শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং তা অনেক নিরাপদ এবং আনন্দদায়ক। নিজেকে যৌন আনন্দ দেবার এটি একটি ভাল উপায় এবং এটি সারা জীবন ধরে করা যায়। এটি যৌন আনন্দ লাভের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় কারণ এতে গর্ভধারন বা এসটিডি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কে কতবার হস্তমৈথুন করে সে ব্যাপারে মানুষভেদে ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ প্রতিদিন করে, কেউবা সপ্তাহে একদিন করে, আবার কেউ মাসে একদিনও করতে পারে। সারা জীবনেও একবারও করেনি এমন খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর নয়। এগুলোর কোনটিই কোনো সমস্যা নয়। হস্তমৈথুন নিয়ে প্রচলিত একটি ভুল ধারণা হচ্ছে যে এটি অস্বাস্থ্যকর এবং শরীরের জন্য খারাপ। কোন গবেষণায় হস্তমৈথুনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী কোন রোগ হবার কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় নি (কলুমার হেলথ ডাইজেস্ট ২০১৭)। তাছাড়া, অনেকে এমনটাও মানেন যে এক ফোঁটা বীর্য সত্তর ফোঁটা রক্তের সমান; তাই হস্তমৈথুন করলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, এ কারণে এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর (খান এবং এরন এর গবেষণা ২০১৪)। এটি পুরোপুরি ভুল ধারণা। হস্তমৈথুনের সাথে শরীরের রক্ত কমে যাবার বা শরীর দুর্বল হবার কোন সম্পর্ক নেই।

অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন, হস্তমৈথুন করলে যৌন ক্ষমতা কমে যায় এবং এর ফলে ভবিষ্যতে স্ত্রীকে তৃপ্ত করা যায় না। এটিও একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যৌন ক্ষমতা কমে যাবার অনেকগুলো জৈবিক এবং সামাজিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু হস্তমৈথুনের কারণে যৌন ক্ষমতা কমে যায় এমন কোন তথ্য কোনো গবেষণাতেই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মদ্যপান, ধূমপান, অলস জীবন যাপন করা যৌন ক্ষমতা

কমে যাবার সাথে সম্পর্কিত (হার্টে এবং মেস্টন ২০১২, আরাকান এবং বেনেগাল ২০০৭)। খাদ্যাভ্যাসও অনেক সময় যৌন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যেমন, আত্মসম্মানবোধ কম থাকলে বা সঙ্গীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকলে তা যৌনতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

হস্তমৈথুন তখনই সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় যখন তা প্রকাশ্যে জনসম্মুখে করা হয় কাউকে যৌন নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। যদি এর কারণে কোন ব্যক্তির তার সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্কে প্রভাব পড়ে, অর্থাৎ কেউ যদি হস্তমৈথুনের কারণে সঙ্গীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, সেটাও সমস্যা। অনেকে অনুশোচনায় ভোগেন হস্তমৈথুন করার পর, কারণ অনেক সমাজে এবং ধর্মে এটি নিষিদ্ধ ও পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার হস্তমৈথুনের কারণে কারো যদি প্রাত্যাহিক ও সামাজিক জীবন ব্যাহত হয় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে কেউ যদি উদাসীন হয়ে পড়ে, তাহলে এটি ক্ষতিকর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ হস্তমইথুনে এতোই বেশী আসক্ত যে সে তার সামাজিকতা, লেখাপড়া বা কাজ ঠিক মত করতে পারছে না, সে ক্ষেত্রে এটি ক্ষতিকর হিসেবে অবশ্যই বিবেচিত হবে। মাত্রাতিরিক্ত যে কোন কিছুই খারাপ। তাছাড়া, যৌনাঙ্গ খুব জোরে ঘষলে জ্বালাপোড়া হতে পারে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে, থুথু বা পানি জাতীয় পিচ্ছিলকারক পদার্থ (ওয়াটার বেসড লুব্রিক্যান্ট) ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব সাবধানী হওয়া উচিত কোন কিছু তার যোনীতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে। অধিকাংশ নারী তার ভগাঙ্কুরে (ক্লিটোরিস) স্পর্শ করে হস্তমৈথুন করে থাকে, এটি খুব সংবেদনশীল তাই সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো।

পরিশেষে, হস্তমৈথুন করার ব্যাপারটি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একটি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ কেউ ধর্মীয় কারণে এটি নাই করতে পারে, এবং সে ব্যাপারে তার পূর্ণ অধিকার আছে। আবার অনেকে যৌন আনন্দ পাবার জন্য এটি করতেই পারে। কেউ যদি হস্তমৈথুন করে তাহলে তার খুব সাবধানতার সাথে করা উচিত। এ ব্যাপারে লজ্জা ও অনুশোচনায় ভোগা যুক্তিযুক্ত নয়।

ভুল ধারণা-৪: 'শারীরিক সম্পর্ক কিভাবে করতে হয় তা জানতে পর্ন একটি ভালো মাধ্যম'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ–শিরোনাম পড়ে মনে হতে পারে, তারা পর্নকে নেতিবাচক হিসেবে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পর্নকে উৎসাহিত করা হয়েছে, কেননা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে পর্ন থেকে যৌন আনন্দ লাভ করা যায়। তবে পর্ন আসক্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পর্ন ভিডিওতে যে দীর্ঘ সঙ্গম দেখানো হয়, তা বাস্তবসম্মত নয়—এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা উচিত।

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে

পর্নগ্রাফি বা 'পর্ন', বু-ফিল্ম, 'নেকেড', 'এক্সপ্লিসিট কনটেন্ট', 'এনএসএফডবিউ' ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে কমবেশি আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো একধরনের ভিডিও বা ছবি যেখানে বিভিন্ন যৌন বা যৌনতার বিভিন্ন বিষয় এবং কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। মানুষ এগুলো দেখে যৌন উত্তেজনা ও তৃপ্তি পাবার জন্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ছেলে এবং মেয়েদের কাছেও একা বা বন্ধুদের সাথে 'পর্ন' দেখা খুব সাধারন একটি বিষয়। অনেকেই এই ভিডিওগুলো দেখে কিভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতে হয় তা জানার জন্য বা যৌন আনন্দ পাবার জন্য বা হস্তমৈথুন করার জন্য। যদিও পর্ন যৌন উত্তেজনা দিতে পারে বা যৌন সংক্রান্ত অনেক তথ্য দিতে পারে, তার মানে এই না যে সেগুলো সবসময় বাস্তবসম্মত বিষয়বস্তু তুলে ধরে। তাছাড়া, পর্নের অনেক নেতিবাচক প্রভাবও আছে।

বলিউড বা হলিউডের অনেক সিনেমাতে যে রোমান্টিকতা, প্রেম, ভালোবাসা দেখানো হয়, তার সাথে যেমন বাস্তবতার মিল সব সময় পাওয়া যায় না, তেমনি পর্নে যা দেখানো হয় তাও সব সময় বাস্তবতার প্রতিফলন নয়। এখানে যারা অভিনয় করে তাদেরকে নির্বাচন করা হয় তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে। যেমন, ছেলেদের অনেকে পেশীবহুল হতে হবে এবং তাদের যৌনাঙ্গ অনেক বড় হতে হবে। আবার মেয়েদের মেদহীন, চিকন এবং বড় স্তনের অধিকারী হতে হবে।

পর্ন ভিডিওতে নারীপুরুষের দীর্ঘসঙ্গম দেখানো হয়, এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এখানে অনেক সময়েই থাকে এডিটের 'জাদু'। বাস্তবে সঙ্গমের সময়কাল মানুষভেদে ভিন্ন, এমনকি এই ভিন্নতারও বৈচিত্র থাকে। এখানে আদর্শ সময়কাল বা 'টাইমিং' বলে কিছু নেই। অনেক সময় পর্নে এমন কিছু পজিশন বা কার্যকলাপ দেখানো হয় যা অস্বাস্থ্যকর এবং অনেকের জন্য উপভোগ্য নাও

হতে পারে। সাধারনত পর্নে পুরুষদেরকে মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী আগ্রাসী বা তৎপর দেখানো হয়। এমনকি অনেক পর্নে নারী সহিংস দৃশ্যেও অংশ নিচ্ছে যা বিডিএসএম নামে বেশ পরিচিত, তাও দেখানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখানো হয় যে তারা তা উপভোগ করছে। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব আনন্দদায়ক হয় না বা অনেক সময় নারীদের জন্য অসুবিধাজনক ও পীড়াদায়কও হতে পারে। শারীরিক সম্পর্ক তখনই আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য হবে যখন তা নিজের এবং সঙ্গী উভয়ের জন্যই নিরাপদ। আর এ কারণেই সঙ্গীর সম্মতি নেয়া খুবই জরুরী।

পর্নের অনেক নেতিবাচক প্রভাব আছে। অনেক সময় অনেক কিশোর বয়সীরা নিজেদেরকে পর্নের নায়কের সাথে তুলনা করতে চায়। পর্নে দেখানো অনেক বড় যৌনাঙ্গ বা অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গমের বিষয়গুলো তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। অপরিপক্ক মনে তারা এটাকেই আদর্শ ধরে নেয়। অনেক ছেলের কাছেই পর্নের নায়করাই আসল বা আদর্শ পুরুষ। এর ফলে অনেক ছেলেই নিজেদের যৌনাঙ্গ নিয়ে এক ধরনের হতাশায় ভোগে, মন খারাপ করে, এমনকি কখনও কখনও লজ্জাও পায়। অনেকে নিজেদের যৌন ক্ষমতা বা সামর্থ্য নিয়ে দ্বিধায় থাকে এবং হীনমন্যতায় ভোগে (নাহার ও তার দলের গবেষণা ২০১৩, বুলন ও খানের গবেষণা ২০০৬)। অনেক সময় মেয়েরাও পর্ন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। পর্নে দেখানো অভিনেত্রীদের ফর্সা গায়ের রঙ বা চিকন ও মেদহীন গঠন বা যৌন আচরনের সাথে নিজেদের মিল খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় তারা নিজেদের শরীর নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করে। শারীরিক সম্পর্কের সময় কেমন আচরণ করতে হবে সেটা নিয়েও তাদের মধ্যে তৈরি হয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

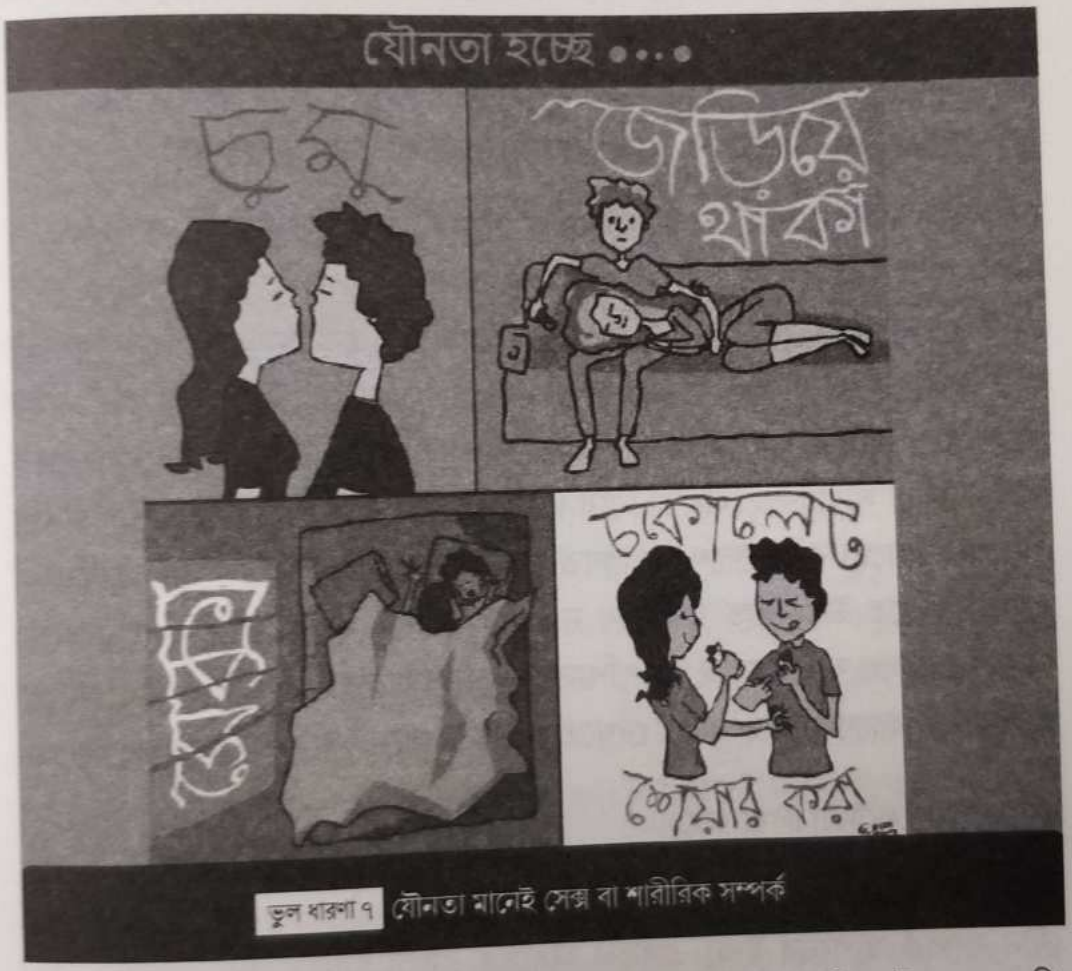
ভুল ধারণা-৫: 'যৌনতা মানেই সেক্স বা শারীরিক সম্পর্ক'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ–যৌনতার বিষয়টিকে লঘু করা হয়েছে, যাতে এটি খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তাদের মতে, সেক্স যৌনতার একটি অংশ মাত্র। অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ের সাথে যৌনতার সম্পর্ক স্থাপন শেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই যৌন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিক চিন্তাকে স্বাভাবিক মনে করে। উদাহরণ হিসেবে, চকলেট আদান-প্রদান বা পানি দেয়া, এসবও যৌনতা হতে পারে! সমকামিতার প্রসঙ্গও আনা হয়েছে—যে কেউই সমলিঙ্গের, বিপরীত লিঙ্গের, এমনকি উভয় লিঙ্গের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করতে

পারে। এই ধরনের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের যৌনশিক্ষার মাধ্যমে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে

যৌনতা একজন মানুষের পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যৌনতা আমাদের যৌন অনুভূতি, কার প্রতি আমরা যৌন আকর্ষণ অনুভব করি, এবং কী ধরনের কাজে আমরা যৌন অনুভূতি পাই তার সাথে সম্পর্কিত। যৌন কামনা, শারীরিক এবং মানসিক আকর্ষণ, রোমান্স, ভালবাসা, কল্পনা (ফ্যান্টাসি), সেক্স, প্রজনন ইত্যাদি সবগুলো বিষয়ই যৌনতার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।



কাউকে ভালো লাগা, কারো প্রেমে পড়া এবং কারো প্রতি যৌন অনুভূতি তৈরি হওয়া বয়ঃসন্ধি কালের খুব সাধারণ অংশ। এমন কি মানুষ জীবনে একাধিক মানুষের প্রেমে পড়তে পারে। যে কেউই সমলিঙ্গের, বিপরীত লিঙ্গের, এমন কি উভয় লিঙ্গের মানুষের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করতেই পারে।

অনেক ধরনের কাজই যৌনতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন, চুমু দেয়া, হাত ধরা, জড়িয়ে ধরা, হস্তমৈথুন, সঙ্গম ইত্যাদি। এছাড়াও এমন যেকোন কাজ যা আপনাকে যৌন উত্তেজনা দিবে এবং আনন্দ দিবে তাও যৌনতার অংশ। একেকজন একেক ধরনের কাজে যৌন আনন্দ পেতে পারে। যৌনতার ক্ষেত্রে কোন কাজ উপভোগ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যকর তা খুঁজে বের করা খুবই জরুরি।

সংক্ষেপে, যৌনতা হলো আবেগ, অনুভূতি, আচরণ এবং সম্পর্কের একটি মিশ্রন যা প্রত্যেক মানুষ নিজের মত করে বুঝে নেয়। মানুষভেদে এর ধারণাটি ভিন্ন। আলোচনার জন্য যৌনতা অনেক বড় একটি বিষয় এবং এর পরিধি অনেক বড়, সেখানে সেক্স তার একটি অংশ মাত্র। যৌনতা বলতে তাই শুধু 'সেক্স'কেই বোঝায় না।

ভুল ধারণা-৬: 'নারীদের যৌন কামনা প্রকাশ করা উচিত না'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ- এই কার্টুনের মাধ্যমে মূলত নারী সমকামী সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সকেটকে নারী এবং প্লাগকে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করে মেসেজ দেয়া হয়েছে। কার্টুনটি বোঝাতে চাচ্ছে যে একজন নারী শুধু পুরুষের সাথেই যৌন সম্পর্ক করবে তা নয়। যেমন লেখা আছে—যৌন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে, এবং এর সাথে পুরুষ বা নারী হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। নারীরা সাধারণত যৌনতা নিয়ে লজ্জা অনুভব করে, এই লজ্জাবোধ ভাঙার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশে সাধারণত নারীদের খোলাখুলিভাবে যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা হয় না। এর মাধ্যমে মূলত ধর্মীয় বিধিনিষেধের বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যা পশ্চিমা লিবারেল ধারণায় গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা সামনে এই ধরণের বিষয় আরো দেখতে পাবো যেখানে ধর্মকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে–

যৌন আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যৌনতা বা যৌন সঙ্গম নিয়ে চিন্তা, কল্পনা, প্রয়োজন এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা-এসকল বিষয়ের একটি মিলিত রূপ। অনেকে মনে করেন যে নারীর যৌনতা এবং যৌন চাহিদা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে জানতে চাওয়া এবং কথা বলা খুব লজ্জাজনক ও বিব্রতকর একটি ব্যাপার। প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের মতো এক্ষেত্রেও মনে করা হয় যে নারীদের যৌন ইচ্ছা যদি থেকেও থাকে, তারা এটা সরাসরি বলে না বা তাদের এটা বলা উচিত না।



ভুল ধারণা ৪ নারীদের যৌন কামনা প্রকাশ করা উচিত না

যৌন কামনা ব্যক্তি বা মানুষভেদে ভিন্ন হতে পারে। এই ইচ্ছার সাথে পুরুষ বা নারী হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। একজন নারীর একজন পুরুষের মতোই, বা তার চেয়েও কম বা বেশি যৌন কামনা থাকতে পারে। একই কথা একজন পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশে সাধারণত একজন নারীকে খোলাখুলিভাবে তার যৌন কামনা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা হয় না। ভুলবশতও যদি তার এই কামনা কোথাও প্রকাশ পায়, তবে তার চরিত্র ও নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় এবং তাকে প্রবল হেনস্তার সম্মুখীনও হতে হয়। এ কারণেই নারীদের তাদের নিজস্ব যৌনতা বা যৌন কামনা নিয়ে খুব একটা কথা বলতে দেখা যায় না এবং সমাজ তাদের এ ধরনের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিতেও রাজি না। এর মানে কিন্তু আবার এই নয় যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে যৌন কামনা কম বা অনুপস্থিত, যা পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিষয়টি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়, জেন্ডারভেদে নয়।

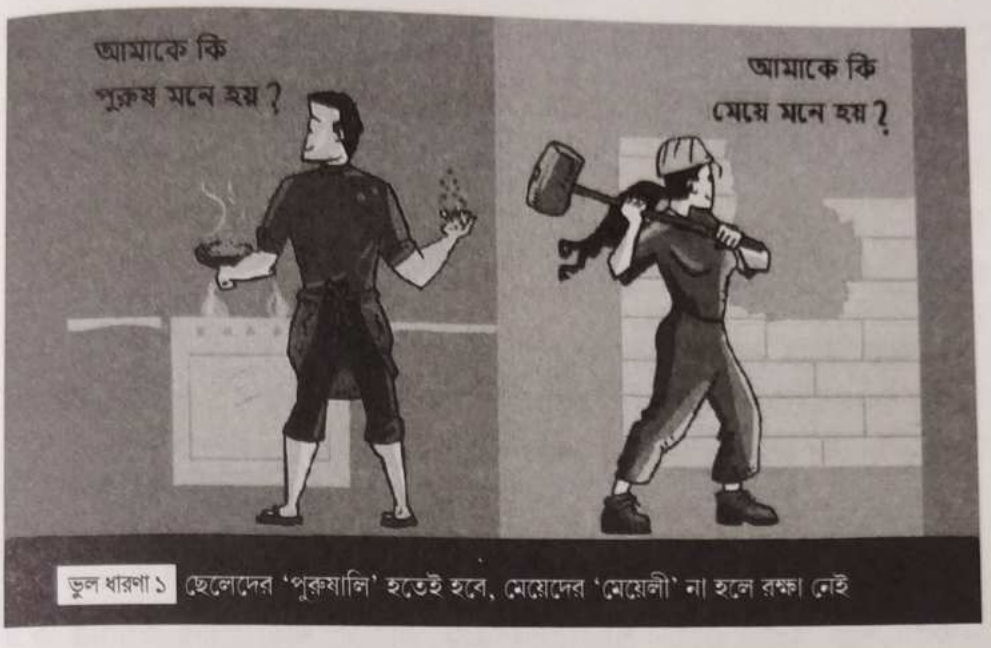
সামাজিক নানা অলিখিত বিধিনিষেধের কারণে নারীরা তাদের যৌনানুভূতি সম্পর্কেই যথাযথভাবে অবগত নয়, প্রকাশ তো দূরের কথা এবং তারা তাদের যৌনতাকে ইতিবাচক এবং ক্ষমতায়নের উৎস হিসেবে দেখেন না। সমাজের

পুরুষরাও এটা অনেক সময় জেনেশুনে বা না জেনেই উপেক্ষা করে; অনেক ক্ষেত্রে তারা আন্দাজেই ধরে নেয় যে মেয়েরা কি চায় তা তারা জানে। অতএব, 'বড় আকৃতির যৌনাঙ্গ মেয়েদের বেশি সন্তুষ্ট করে', এ ধরনের ভুল ধারণাগুলো পুরুষদের মধ্যে এখনও রয়েছে।

নারীর যৌনতাকে স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে নারীরা নিজে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরাও বিশ্বাস করে যে নারীরা যৌনতা বা যৌন সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে না এবং শুধুমাত্র পুরুষরাই যৌনতা উপভোগ করতে পারে। এছাড়াও, এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা এ যুগেও প্রচলিত যে পুরুষকে যৌন সন্তুষ্টি দেয়া একজন মহিলার কর্তব্য, তার নিজের অনুভূতি বিবেচনা না করেই! একটি যৌন সম্পর্ক আরো আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে যখন দুজনই তা উপভোগ করবে এবং যখন তারা দুজনেই তাদের যৌন অনুভূতি স্বাধীন এবং যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।'

ভুল ধারণা-৭: 'ছেলেদের পুরুষালি হতেই হবে, মেয়েদের মেয়েলি না হলে রক্ষা নেই

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ- হাজার হাজার বছরের প্রচলিত নারী-পুরুষের সামাজিক প্রত্যাশা (জেন্ডার রোল) চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল পার্থক্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। খুব ছোটো বয়স থেকেই পরিবার, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজ জেন্ডার রোল নির্ধারণ করে দেয়। শরীফার গল্পে এই ধারণাই তুলে ধরা হয়েছে যে কেউ নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্মায় না, বরং বড় হতে হতে নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠে। এটিই জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এডুকেশনের মূল ভাবনা। কিছু উদাহরণ (যেমন টমি মিয়া ভালো রান্না করেন, পর্বতারোহণ) উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের ভুল মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা কার্যত বুদ্ধিভিত্তিক দুর্নীতি। ব্র্যাকের আর্লি চাইল্ডহুড প্রোগ্রামও এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে কাজ করেছে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। জেন্ডারের বাঁধাধরা রীতি এবং সেকেলে নিয়মগুলো সমাজকে প্রত্যাখান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ, তথা সমকামী-বান্ধব বিশ্ব গড়ে তোলা।



ব্র্যাকের বুকলেটে যা লেখা আছে

'জেন্ডার ভাবনাটি মূলত পৌরুষ এবং নারীত্ব- এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুইটি রূপ অন্য যে কোন দেশের মতই আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এছাড়া এগুলো আমাদের পরিবারিক চিন্তা ভাবনা, পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা এবং জেন্ডার নির্ধারণকেও ব্যাখ্যা করে। অনেকটা অলিখিতভাবেই আমরা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি যে সমাজের চোখে ছেলেদের হতে হবে সাহসী, বহির্মুখী, স্পষ্টভাষী, পেশীবহুল অথবা অন্য কথায় মাসকিউলিন এবং মেয়েদের হতে হবে লাজুক, ঘরোয়া, নম্রভাষী, রাঁধুনি এবং সুন্দর অথবা অন্য কথায় ফেমিনিন।

মূলত তিনটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উৎপত্তি, জেন্ডারের বর্ণনা (আমরা নিজেদের সম্পর্কে কি ভাবি এবং অন্যরা কি ভাবছে), জেন্ডারের আদর্শ (নারী এবং পুরুষের কি ধরণের নিয়ম মানতে হবে, তাদের কাছে সমাজের তথাকথিত প্রত্যাশা, নারী এবং পুরুষের শারীরিক গঠন এবং আচার আচরণ) এবং জেন্ডারের ভূমিকা (সমাজের চোখে নারী এবং পুরুষের আচরণবিধি)।

প্রথাগত জেন্ডারের সম্পূর্ণ ধারণাটি সহজাত বা প্রাকৃতিকভাবে রপ্ত করা যায় না। খুব ছোটো বেলা থেকেই পরিবার, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব এবং গণমাধ্যম ছেলেদের মাসকিউলিন হিসেবে এবং মেয়েদের ফেমিনিন হতে উৎসাহিত করে। যদি ব্যাপারটি এভাবে আমরা ভেবে দেখি, ছেলেদের বাইরে গিয়ে খেলতে উৎসাহ দেয়া হয় কিন্তু মেয়েদের বাইরে যাওয়াটা এই একুশ শতকেও খুব একটা ভালো চোখে দেখা

হয় না; তার বদলে মেয়েদের ঘরে বসে পুতুল খেলতেই বেশি উৎসাহিত করা হয়। যদি একটি ছেলে অথবা মেয়ে সমাজের নির্ধারিত নিয়মে না চলে, তাদের নানাভাবে বিরক্ত করা হয়। যেমন, একজন ছেলের আচরণ যদি আপাতদৃষ্টিতে অন্যদের তুলনায় একটু 'নরম', 'কোমল' বা ফেমিনিন মনে হয় তবে তাকে 'হিজড়া', 'মেয়েলী' আরও নানা নামে ডাকা হয়। আবার একজন মেয়েকে যদি একইভাবে মাসকিউলিন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থাৎ মেয়েটি যদি স্পষ্টভাষী বা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন হয় বা তার যদি অনেক ছেলেবন্ধু থেকে থাকে তবে তাকে জনসম্মুখে যথেষ্ট হেনস্তা হতে হয় এবং তাকে নারীসুলভ হওয়ার, চুপচাপ থাকার বা সব ব্যাপারে কথা না বলার পরামর্শ দেয়া হয়।

'ফেমিনিন এবং 'মাসকিউলিন' এ ধারণাগুলোর প্রথাগত বা টিপিক্যাল সংজ্ঞায়ন ও চিত্রায়ন থেকে বের হয়ে আসলে নিজস্ব গঠন, আদর্শ, সামর্থ্যর উন্নয়ন এবং উচ্চাশা নিয়ে ভাবার সুযোগ থাকে। এছাড়াও, সাধারণ নারী-পুরুষ ধারণার চেয়ে বাস্তবতা, বা 'রিয়েলিটি' অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। যেমন, ধরে নেয়া হয় রান্না মেয়েদের কাজ কিন্তু অনেক বিশ্বখ্যাত শেফ যেমন টমি মিয়া, গর্ডন রামসে তাঁরা কিন্তু পুরুষ! রান্না করাটা যে তাদের পেশা এ বিষয়ে তাদের কোন আক্ষেপ আছে বলেও কেউ কখনও শুনেছেন বলে মনে হয় না।

একইভাবে, খেলাধুলা এবং বিভিন্ন 'অ্যাডভেঞ্চার' ধরনের কাজগুলো সাধারণত ছেলেদের জন্যই ভাবা হলেও মেয়েরাও এসব কাজে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী সফলতা অর্জন করছে। বিখ্যাত টেবল টেনিস খেলোয়াড় জোবেরা রহমান লিনু, এভারেস্ট বিজয়ী নারী নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজরীন বাংলাদেশি নারীদের সফলতার একটি চমৎকার উদাহরণ।

জেন্ডারের ধরাবাঁধা রীতি এবং সেকেলে নিয়মগুলো সমাজ প্রত্যাখান করলে পুরুষ এবং নারী সহজেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যাশা এবং সম্মান ধরে রাখতে পারবে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজও ভাগাভাগি করে নিতে পারবে যেমন ঘরের কাজ, টাকা পয়সার হিসাব রাখা ইত্যাদি যা কিনা নারী-পুরুষদের মধ্যে এবং নিজ নিজ জেন্ডারের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক এবং সম্পর্কের একটি ভারসাম্য বজায় রাখবে।

ভুল ধারণা-৮: 'যৌন নির্যাতনের শিকার হবার কারণ নারী নিজেই'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ– এর মাধ্যমে মুসলিম পর্দা এবং শালীনতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যার জন্য তথ্য বিকৃতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকলে, ব্র্যাক এত বড় দাবি করত না। প্রত্যেক নারীর অধিকার আছে তার ইচ্ছেমতো পোশাক পরিধান করার। সে স্বাধীনভাবে পোশাক বেছে নিতে পারে। এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুও আনা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, এখানে বিষয়টিকে এমন ভাষা ও উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কেউ যদি এটি ভাসাভাসাভাবে পড়ে, তবে দ্বিধায় পড়ে যেতে পারেন।



ভুল ধারণা ৬ যৌন নির্যাতনের শিকার হবার কারণ নারী নিজেই

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে–

শ্রেণী, পেশা, জেন্ডার নির্বিশেষে অনেকেই মনে করে থাকেন যে, যে কোন বয়সের একজন নারী যখন যৌন হয়রানির শিকার হোন তখন এর জন্য সে নিজেই দায়ী। তাদের পোশাক এবং হাঁটাচলার ধরন ছেলেদের উৎসাহিত করে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের মত অপরাধ করতে। তাদের মতে এসব অপরাধ ঠেকাতে মেয়েদের উচিত শালীনতা বজায় রাখা। তাদের পোশাক হবে ঢিলাঢালা, বুক ঢেকে রাখবে, টি শার্ট-জিন্স পরা যাবে না, সব সময় সালওয়ার কামিজ, ওড়না পড়তে হবে। আরও অনেক কিছুর মতই কিছু অলিখিত সামাজিক বিধি নিষেধ আছে মেয়েদের জন্য,

যেমন তারা জোরে কথা বলতে পারবে না, একা একা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব মেনে না চললে মনে করা হয় যে তার ওপর যৌন হয়রানি বা ধর্ষণ হওয়া তাই স্বাভাবিক (নোট- এটা মিথ্যা দাবি)।

যৌন নির্যাতন একটি গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যারা এ অপরাধ করে তারা অতি নিচু স্তরের মন মানসিকতার অধিকারী একেকজন অপরাধী। অন্য যে কোন অপরাধীর মত ধর্ষক এবং নির্যাতনকারীদের এ অপরাধের পুরো দায়ভার গ্রহন করতে হবে। এবং অন্যান্য অপরাধের মত, এ অপরাধকেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়া যাবে না কারণ এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অনেক ব্যাপক। যৌন নির্যাতনের শিকার মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে ভবিষ্যতে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে। এমন কি তারা আত্মহত্যাও করতে পারে এবং করে থাকে। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত এ ধরনের খবর দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া এর সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। যৌন নির্যাতন স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং বাল্য বিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবেও গণ্য। (জব্বা, সুলতানা এবং হোসেইন ২০১০, জাহান, জব্বার এবং হোসেইন ২০১০)।

এই ভুল ধারণাটি দুইটি বিষয়কে নির্দেশ করে। এক, ছেলেরা বা পুরুষরা তাদের যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আর এ কারনেই তারা যৌন নির্যাতনে লিপ্ত হয়। দুই, মেয়েদের স্বাধীনভাবে পোশাক পরিধান এবং চলাফেরার ধরণ ছেলেদেরকে উৎসাহিত করে তাদের যৌন নির্যাতন করার জন্য।

যদি প্রথম বিষয়টি সত্য হতো তাহলে সব ছেলেরাই যে কোন সময়ই স্থান, কাল, বয়স ভুলে কেবল যৌন নির্যাতনেই মেতে থাকত। কিন্তু আমরা জানি এটি সত্য নয়। ছেলেরা বা পুরুষরা কিভাবে তাদের যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা শিখে নিতে পারে। প্রত্যেকের উচিত নিজের কাজের বা আচরণের দায়িত্ব নেয়া। যৌন উত্তেজনা অনুভব খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়, তার মানে এই নয় সে অন্য যে কোনো একজন মেয়ের সাথে যা খুশি, যখন খুশি তা করার অধিকার রাখে। যে কোন ধরণের যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হবার আগে উচিত অপরজনের সম্মতি নেয়া।

দ্বিতীয় ভুল ধারণাটিও সত্য নয় কারণ যারা সমাজে শালীন পোশাক পরিধান করে এবং চলাফেরা করে তারাও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ১৯ বছরের একজন মেয়ে তনু ধর্ষিত এবং হত্যার শিকার হয়েছিল যদিও সে হিজাব পরিধান করত, যা বাংলাদেশে শালীনতার প্রতীক হিসেবেই গণ্য। অন্যদিকে, যারা তথাকথিত 'শালীন'

পোশাক পরিধান করে না তাদের সর্বদাই যৌন নির্যাতনের শিকার হবার কথা যদি এই ভুল ধারণাটি সত্য হয়। কিন্তু ব্যাপারটি সেরকম নয়। তাই নারীর পোশাককে কোনভাবেই এর জন্য দায়ী করা যাবে না। কারণ তাহলে যৌন নির্যাতনের বা ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ গুলো হালকা হয়ে যায়। যা প্রতিনিয়তই ঘটছে।

প্রত্যক নারীর অধিকার আছে তার ইচ্ছেমতন পোশাক পরিধান করা। সে স্বাধীনভাবে পোশাক বেছে নিতে পারে। যা তাকে মানাবে, যা তাকে সুন্দর দেখাবে বা যা তার জন্য আরামদায়ক এমন পোশাক সে পড়তেই পারে।

যৌন নির্যাতনের শাস্তির বিধান বাংলাদেশে যে নেই তা নয়, খুব ভালোভাবেই আছে। শাস্তির ধরন নির্ভর করে অপরাধের মাত্রার ওপর। কোন একজন নারীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি অশালীনভাবে স্পর্শ করে তার অনুমতি না নিয়ে বা যদি কেউ শীলতাহানির শিকার হয়, তাহলে অপরাধী ৩ থেকে ১০ বছরের জেল খাটতে পারে এবং সাথে আর্থিক জরিমানাও হতে পারে। যদি অপরাধ ধর্ষণের মতো হয়, তাহলে তাকে যাবজ্জীবন জেল খাটতে হতে পারে।

ভুল ধারণা-৯: 'স্বামী যখন ইচ্ছা তখনই তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবে'

সহজ ভাষায় সারসংক্ষেপ–এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈবাহিক ধর্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যেখানে যুক্তি হিসেবে তথ্য বিকৃতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে বলা হয়েছে যে স্ত্রীকে একটি ভোগ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়, যে স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণে সবসময় প্রস্তুত, এবং নারীর নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তা প্রায়শই অগ্রাহ্য করা হয়। বলা হয়েছে, যদি স্বামী বা স্ত্রী তার সঙ্গীকে সম্মতি ছাড়াই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে তবে তা সঙ্গীর অধিকার লঙ্ঘন এবং ধর্ষণ বা নির্যাতনের আওতাভুক্ত। যৌনশিক্ষায় বিয়ের ধারণার বদলে শুধুমাত্র দুজনের (এতে সমকামিতা ও উভয়কামিতা অন্তর্ভুক্ত) সম্মতিতে যৌন সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৈবাহিক ধর্ষণ নামক এই পশ্চিমা ধারণা আমাদের সমাজের মূল্যবোধের পরিপন্থী। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয়কে আইনের আওতায় এনে বিয়েকে কঠিন করে তোলা এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের কিছু এনজিও (ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন) বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে কাজ করছে এবং তারা সমকামী অধিকারের

প্রচারেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এনজিওগুলো পশ্চিমা অর্থায়নে দেশের মূল্যবোধ বিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত।

ব্র্যাকের বুকলেটে যা লিখা আছে–

ধর্ষণ হচ্ছে কোন ব্যক্তির সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার কোনো সম্মতি ছাড়াই বা শারীরিকভাবে তাকে ভয় দেখিয়ে ইত্যাদি যে কোনো উপায়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। অনেকের মধ্যেই এই ভুল ধারণা খুব শক্তভাবে বিদ্যমান যে বিয়ে পরবর্তী যৌন আচরণে থাকবে স্বামীর আধিপত্য। স্বামীর আনন্দলাভের জন্য এটা বাঞ্চনীয় এবং এটি স্বামীর অধিকার যেখানে স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে মেনে চলা। এক্ষেত্রে, স্বামী যখনই চায়, তখনই স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক করতে পারে এবং এতে স্ত্রীর ইচ্ছার বা সম্মতি বিবেচনা করার কোন প্রয়োজনই নেই।



ভুল ধারণা ৭ স্বামী যখন ইচ্ছা তখনই তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবে

স্ত্রীকে একটি ভোগ্যবস্তু বলে ধরে নেয়া হয়, যে স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণ করতে সদা প্রস্তুত এবং একজন নারীরও যে যৌন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তা প্রায়শই অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু যৌন সম্পর্কের আগে, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে

সম্মতি, বোঝাপড়া এবং স্বাচ্ছন্দ্য থাকা উচিত। যদি প্রয়োজন হয়, স্বামী এবং স্ত্রীর উচিত সম্পর্ক করার আগে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নেয়া। যৌন সম্পর্ক হচ্ছে দুজন ব্যক্তির একটি মিলিত কাজ এবং এই সম্পর্কের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা উল্লেখযোগ্যভাবে একজনের সঙ্গীর পছন্দের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং, সঙ্গীর সম্মতি এবং স্বস্তি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

কখনও কখনও স্ত্রী যৌন সম্পর্কে না গিয়ে শুধুমাত্র জড়িয়ে ধরা বা শারীরিক স্পর্শের মাধ্যমেই ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করতে চান। স্বামীরও একই অনুভূতি হতে পারে। আবার কখনও স্বামী স্ত্রী দুজনই কোনো কিছু করার মতো মানসিক অবস্থায় নাও থাকতে পারেন। যদি স্বামী বা স্ত্রী তার সঙ্গীকে তার সম্মতি ছাড়াই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করে তবে তা সঙ্গীর অধিকার লঙ্ঘন করে। সেটিও ধর্ষণ বা নির্যাতনের আওতাতেই পড়ে। যদি কেউ এটি করে, তবে তাকে বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে ধর্ষণ বলা হবে, স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে ব্যক্তির অবস্থা যাই হোক না কেন। যদিও অনেকেই বিয়ের সম্পর্কের মধ্যেও ধর্ষণের বিষয়টি যে থাকতে পারে সে সম্পর্কে অবগত নন, অথবা সমঝোতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না, তবুও দিনশেষে একটি ভয়াবহ ফলাফল হয়ত তাকে ভোগ করতে হতে পারে। সঙ্গী গুরুতর বিষন্নতায় ভুগতে পারে ফলে আত্মহত্যাও করতে পারেন।

অনেক দেশে, এ ধরণের ধর্ষণ একটি শাস্তিমূলক কাজ (বালি, ২০১৭)। বাংলাদেশে কয়েকটি সংগঠন রয়েছে যারা বৈবাহিক ধর্ষণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে যেমন ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন (BNWLA) ইত্যাদি.

ব্র্যাকের প্রস্তাবিত যৌনশিক্ষার ভিডিও (QR code **স্ক্যান করে ইউটিউবে ভিডিও দেখা যাবে**)

১। কার্টুনের মাধ্যমে সমকামিতা শেখাচ্ছে ব্র্যাক || Debunking SRHR

২। ব্র্যাক মামা সেক্স নামক কার্টুনে হস্তমৈথুন শেখাচ্ছে



৩। ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের কনডম ব্যবহার শেখাচ্ছে



References

1. BD S-NT. Breaking the Shame. In: Share-Net Bangladesh [Internet]. 21 Apr 2019 [cited 28 Oct 2024]. Available: https://www.share-netbangladesh.org/breaking-the-shame/

এলজিবিটির নতুন ফাঁদ- জেন্ডার ট্রান্সফোর্মেটিভ এডুকেশন

২০২১ সালের মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ব্র্যাকসহ আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো এতই দৃষ্টিকটুভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এটি নিয়ে মূলধারার গণমাধ্যম (যারা সচরাচর এনজিও বান্ধব) বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এনজিওদের বাড়াবাড়ির কারণে বিশেষজ্ঞরা পদত্যাগ করেছেন, মিটিং থেকে ওয়াক আউট করেছেন। এনসিবিটিতে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছিলেন এমন সিনিয়র কর্মকর্তা যারা প্রতিবাদ করেছেন তাদেরকে বদলি করা হয়েছে যেন এনজিও'র একচ্ছত্র প্রভাব অব্যাহত থাকে।

এই বিষয়ে ভোরের কাগজ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত(জানুয়ারি ৫, ২০২২)এই শিরোনামে *'নতুন কারিকুলাম নিয়ে তালগোল : কাজ চলছে এনজিওর প্রেসক্রিপশনে*[১]।

'কমিটি থেকে ৪ বিশেষজ্ঞের পদত্যাগ- বই ছাপা হয়নি তবু পাইলটিং

ইউনিসেফের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে নতুন কারিকুলাম (শিক্ষাক্রম) প্রণয়ন করছে সরকার। বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার আদলে তৈরি হওয়া নতুন কারিকুলাম এ দেশে কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য হবে তা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এসব হঠকারী সিদ্ধান্তে কারিকুলাম কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন চার বিশেষজ্ঞ। পাশাপাশি নতুন কারিকুলামে বই লেখার দায়িত্ব পেয়েছেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডেস্ক অফিসার ও ইংরেজি মিডিয়ামের শিক্ষকরা। ভোরের কাগজের অনুসন্ধানে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নির্দেশিকাতেই নতুন কারিকুলাম তৈরি করছে। এমন শিক্ষাক্রম নিয়ে খোদ এনসিটিবিতেই বিরোধ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও

গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক ড. মরিয়ম বেগম ও ইংরেজির অধ্যাপক ড. শায়লা সুলতানা, অধ্যাপক ড. গৌতম রায় কারিকুলামের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মকর্তা মিলে নতুন কারিকুলামের কাজ করছেন।

অভিযোগ রয়েছে, এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান নিজেই অতি উৎসাহী হয়ে এমন লোকদের দিয়ে কারিকুলামের কাজ করাচ্ছেন। এজন্য প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের টাকায় তিনি সুইডেন ও পরে ডেনমার্ক ঘুরে আসেন। বর্তমানে ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও টিকট্যালিক নামে তিনটি এনজিওর তত্ত্বাবধানে নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই লেখার কাজ চলছে। পাঠ্যবই লেখার কাজ শেষ না হলেও এনসিটিবি বলছে আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে দেশের ৬০টি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর পাইলটিং শুরু হবে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ এই পদ্ধতির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে। অথচ এই মশিউজ্জামান এখন এনসিটিবির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য জোর তদবির করছেন।

নথি ঘেঁটে দেখা গেছে, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন কার্যক্রম, জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটির (সিডিআরসি) সঙ্গে সমন্বয় রক্ষায় গঠন করা 'ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর আহ্বায়ক এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান। অভিযোগ রয়েছে, ১৫ সদস্যের ওই গ্রুপের ছয়জন সদস্যকে একপাশে সরিয়ে ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্য সদস্যদের নিয়ে কারিকুলাম তৈরির কাজ হচ্ছে। এনজিও প্রতিনিধিরা যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটাই করছেন অধ্যাপক মশিউজ্জামান। তবে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এনজিওদের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে এসব ঘটনাকে আংশিক সত্য বলে জানিয়েছেন।

তিনি এও বলেন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের টাকায় বিদেশ যাননি। সরকারি একটি অনুষ্ঠানে তিনি সুইডেন গিয়েছেন। এরপর ছুটি নিয়ে তিনি ডেনমার্ক ঘুরে আসেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ভালো রাজনীতিক, ভালো বিতার্কিক, চিকিৎসক- সর্বোপরি দেশের বাইরে থেকে পড়াশোনা করে ডিগ্রি নিয়েছেন। তিনি কীভাবে এই দেশে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন কারিকুলামের অনুমোদন দেন? তবে এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি

সাড়া দেননি।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশে ১৯৮০'র দশকে প্রথম কারিকুলাম তৈরি হয়। দ্বিতীয় কারিকুলাম প্রণীত হয় ১৯৯৫-৯৬ সালে। এর ১৭ বছর পরে ২০১২ সালে দেশে তৃতীয়বার কারিকুলাম পরিবর্তন হয়। ওই সময়ে কারিকুলাম পরিবর্তনের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক ড. কবীর চৌধুরীর কন্যা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহীন কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হামিদুর রহমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, বুয়েটের অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইংয়ের (সিডিডব্লিউ) অধ্যাপক গৌতম রায়সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। সবমিলিয়ে ২০১২ সালের কারিকুলাম প্রণয়নে বিশেষজ্ঞদের সম্মিলন ছিল। কিন্তু ২০২১ সালে কারিকুলাম পরিবর্তনের কাজে এদের কাউকে রাখা হয়নি। পাঠ্যবই লেখার কাজে ড. জাফর ইকবালকে রাখা হয়েছে। ড. ছিদ্দিকুর রহমানকে রাখা হলেও তিনি ছেড়ে চলে যান। বাকিদের নামই নেই।

এনসিটিবিতে পদায়ন পেয়েই মশিউজ্জামানকে ধারণা দেন, কারিকুলামের কাজে সরকারের লোক নেয়ার দরকার নেই। এরা করিৎকর্মা হয় না। এনজিওর লোকদের নিয়ে কাজ করালে স্মার্ট কারিকুলাম হবে। এরপরই মুর্শিদের মাধ্যমে ইউনিসেফের সম্পর্ক গড়ে উঠে মশিউজ্জামানের। প্রসঙ্গত, ইউনিসেফ এর আগে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে ছোট ছোট কাজ করলেও এত বড় কাজ কখনোই করেনি। এবারই প্রথম তারা তাদের প্রেসক্রিপশনে কারিকুলাম প্রণয়ন করে দিয়েছে। ইউনিসেফের শিক্ষা বিভাগে কাজ করা ইকবাল হোসেনের সঙ্গে মশিউজ্জামানের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়ে উঠে। অথচ ইকবাল হোসেন পদার্থ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন। শিক্ষা নিয়ে তার কোনো ডিগ্রি নেই।

ইউনিসেফ যখন কারিকুলামের কাজ করছে তখন ইউনিসেফের ইকবাল হোসেন 'টিকট্যালিক' নামে আরেক পারিবারিক এনজিওকে এখানে ভেড়ান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বছর দুয়েক শিক্ষকতা করা নাসরিন সুলতানা মিতু এই 'টিকট্যালিক' এনজিওর মালিক। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের জামাতা রাকিব উদ্দিন। এরপর মিতু তাদের দলে টেনে আনেন তারই বন্ধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক ড. রুবায়াত জাহানকে। রুবায়াত জাহান দলে টেনে আনেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারিক আহসানকে। এদের সঙ্গে যোগ দেন কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক ও শেষবর্ষে অধ্যয়নরত কিছু শিক্ষার্থী। সংশ্লিষ্টরা বলেন, অধ্যাপক মশিউজ্জামান, মুর্শিদ আক্তার মিতু, ইউনিসেফে কর্মরত ইকবাল হোসেন, টিকট্যালিক এনজিওর মালিক নাসরিন সুলতানা মিতু, রুবায়াত কিংবা তারিক আহসান- এদের কারোরই কারিকুলাম লেখার অভিজ্ঞতা নেই। তবু তারা কারিকুলামের কাজ করেছেন; এখন তাদের মনোনিত ব্যক্তিরাই পাঠ্যবই লেখার কাজ করছেন।

জানতে চাইলে ইউনিসেফের শিক্ষা কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন ভোরের কাগজকে বলেন, সরকার আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। তাই আমরা সাহায্য করছি। এখানে এনজিওর প্রেসক্রিপশনে কিছু লেখা হচ্ছে না বলে জানান তিনি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এনজিও দলটি কারিকুলামের কাজ শুরুর সময়ই ঘোষণা দেয়, এনসিটিবির কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইংয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের রাখবে না। অথচ কারিকুলামের কাজে এই বিশেষজ্ঞরা দক্ষ ও উপযুক্ত। এই উইংকে দুর্বল করে তারা তাদের মতো করে কারিকুলাম প্রণয়ন করেছে। অন্যদিকে এনজিওর লোকেরা এনসিটিবিতে প্রচার করেছেন, কারিকুলাম প্রণয়নের কাজে তাদের চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই। এজন্য এনসিটিবির বিশেষজ্ঞদের এখানে রাখেনি তারা। এমন প্রচারণায় এনসিটিবির বেশির ভাগ কর্মকর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সদস্য (শিক্ষাক্রম) মো. মশিউজ্জামানের সঙ্গে শুরু হয় বিরোধ। এরপর এনসিটিবির ১০ জন করে বিশেষজ্ঞকে কারিকুলাম কমিটিতে নেয়া শুরু হয়। কিছুদিন ১০ জন কাজ করার পরে এদের বাদ দিয়ে নতুন করে আরো ১০ জন নেয়া হয়। এভাবে চলতে থাকে কাজ। কিন্তু কারিকুলাম নিয়ে কী কাজ হচ্ছে, তা এনসিটিবির কেউ বলতে পারেনি। শুরু হয় সমন্বয়হীনতা। ইংরেজি কারিকুলাম সমন্বয়ের দায়িত্ব পান প্রাণীবিজ্ঞান থেকে পড়াশোনা করে আসা একজন কর্মকর্তা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এসব কর্মকর্তাদের রাখা হয়নি। বাদ দেয়া হয়েছে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইংকেও। অন্যদিকে অখ্যাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও রাখা হয়েছে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে। মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রমে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করা শিক্ষকও রাখা হয়েছে। বাছাই করা হয়েছে পছন্দের লোক। এসব পরিস্থিতিতে

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রধান চালিকা শক্তি ও ২০১২ সালে কারিকুলামে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান নিজেই শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কমিটি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। ১০ বছর আগে প্রণীত কারিকুলামের প্রধান যিনি ছিলেন তিনিই নতুন কারিকুলামের কাজ থেকে অব্যাহতি নেয়ায় বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে।

'নতুন কারিকুলাম নিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব' শিরোনামে ঢাকা পোষ্ট ৯ এপ্রিল, ২০২১ সালের প্রতিবেদন ছাপে [২]_

'ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা, আমাদের দেশে বাস্তবায়ন অযোগ্য-বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য।

কিন্তু নতুন কারিকুলাম তৈরি করতে গিয়ে বিদেশি সংস্থা ও এনজিওকে বেশি প্রাধান্য, অতিমাত্রায় লার্নিং এডুকেশন (অভিজ্ঞতাভিত্তিক) করায় কারিকুলাম কমিটির ওপর চরম ক্ষিপ্ত হয়েছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ব্যক্তিরা। এ নিয়ে এনসিটিবির ভেতরে চলছে চরম দ্বন্দ্ব।

অভিযোগ উঠেছে, এনসিটিবি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশীয় কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে নতুন কারিকুলাম তৈরি করা হচ্ছে। গত তিন বছর ধরে দেশের বাস্তবতা যাচাই ও চাহিদা বিবেচনা করে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞদের তৈরি করা যোগ্যতা ভিত্তিক শিখনফল (লার্নিং আউট কাম) বাদ দিয়ে অতিমাত্রায় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যা বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে যায় না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, এনসিটিবির বিভিন্ন কর্মশালায় প্রস্তাবিত কারিকুলাম এখনই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে একাধিক বিশেষজ্ঞ মতামত দেন। তারা বলেন, পশ্চিমা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম (এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং) চালু হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের পক্ষে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে না। এ কারিকুলাম চালু হলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আরও বেশি কোচিং এবং সহায়ক বই নির্ভর হয়ে পড়বে।

প্রস্তাবিত প্রাক-প্রাথমিক স্তরের একটি বইয়ে চারটি ধর্মের বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। আর ইসলাম শিক্ষা বইয়ে যোগ্যতার গল্প বলা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর রূপরেখায় কারিগরি শিক্ষা যুক্তই করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এসব বিষয় কারিকুলামে যুক্ত না করার

জন্য এনসিটিবিতে বেশ কয়েকজন ওয়াকআউট করেছেন (মিটিং থেকে বের হয়ে যাওয়া)। এ নিয়ে প্রাথমিক একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনিসহ উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন।

সূত্র জানায়, ২০১৮ সালে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম তৈরির উদ্যোগ নেয় সরকার। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের হালনাগাদকৃত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর অনুমোদন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সূত্র জানায়, ২০১৮ সালে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম তৈরির উদ্যোগ নেয় সরকার। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের হালনাগাদকৃত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর অনুমোদন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নতুন কারিকুলাম প্রণয়নে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে কারিকুলাম তৈরিতে একটি কমিটি করে দেয় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটি কারিকুলাম বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রায় চূড়ান্ত করে।

কিন্তু হঠাৎ আগের রূপরেখায় যোগ্যতা ও শিখনফল বাদ দিয়ে জটিল একটি যোগ্যতার ছক (মেট্রিক্স) জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয় অনুমোদিত প্রাথমিক স্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত উপেক্ষা করে ইউনিসেফ, প্লান বাংলাদেশ ও ব্র্যাকের কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় সমন্বিত শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি তৈরি করা হয়েছে। আর এনসিটিবির প্রাথমিকের উইং প্রধানকে বাদ দিয়ে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানটির সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মশিউজ্জামানকে।'

ঢাকা ট্রিবিউন '*গোঁজামিলে তৈরি হচ্ছে নতুন কারিকুলাম*' শিরোনামে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ (২৫ ডিসেম্বর ২০২১) করে৩। এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করছি—

এনজিওর প্রেসক্রিপশন

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-

বিদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নির্দেশিকাতেই নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে। এমন শিক্ষাক্রম নিয়ে বিরোধও দেখা দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যক্রম ও জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটির (সিডিআরসি) সঙ্গে সমন্বয় রক্ষায় গঠন করা 'ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর আহ্বায়ক এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান। অভিযোগ রয়েছে, ১৫ সদস্যের ওই গ্রুপের ছয়জন সদস্যকে বাইপাস করে ইউনিসেফ, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কারিকুলাম তৈরির কাজ হচ্ছে। এনজিও প্রতিনিধিরা যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটাই করছেন অধ্যাপক মশিউজ্জামান।

তবে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এনজিওদের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেছেন তিনি। যদিও ১৫ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপে এনজিও সংশ্লিষ্টদের নাম রয়েছে।

প্রাথমিকের সঙ্গে বিরোধ

নতুন শিক্ষাক্রম তৈরিতে ২০১৮ সালে উদ্যোগ নেয় সরকার। ওই সময় চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক হালনাগাদ করা হয়। ওই হালনাগাদের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর অনুমোদন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।কিন্তু হঠাৎ শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় যোগ্যতা ও শিখনফল বাদ দিয়ে জটিল একটি 'অভিজ্ঞতা ভিত্তিক যোগ্যতার ছক জুড়ে দিয়ে শিক্ষাক্রম তৈরি হয়। এটি চাপিয়ে দেওয়া হয় প্রাথমিকের ঘাড়ে।

শিক্ষাক্রমে গোঁজামিল

অভিযোগ উঠছে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদের 'যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক' শিক্ষাক্রম প্রণয়নের অভিজ্ঞতা নেই। প্রেসক্রিপশন যারা দিচ্ছেন তারাও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ নন। নতুন রূপরেখা অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব সে বিষয়ে গবেষণা নেই সংশ্লিষ্টদের।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মশিউজ্জামান বলেন, 'আমরা প্রথম করছি। তাতে অসুবিধা কী? কারিকুলাম বাস্তবায়নে সমস্যা হয় কিনা সেটা দেখার জন্যই পাইলটিং করছি।'

বিশেষজ্ঞদের অভিমত

অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'এই কারিকুলামের ওপর বই লেখা দুরুহ। বাস্তবায়ন করতে হ-য-ব-র-ল অবস্থা হবে। কারিকুলামে যেসব টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে, আমার বিশ্বাস এগুলো সম্পর্কে তাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। এতে বই লেখা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ হবে সবচেয়ে কঠিন কাজ। তবে কারিকুলাম তৈরি ও বই লেখা ঠিকঠাক হলে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ সহজ হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'কারিকুলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— কী চাচ্ছি, কীভাবে বাস্তবায়ন হবে এবং কী অর্জন হবে। এই কারিকুলামে ভালো কিছু চিন্তা আছে। তবে কোন টুলস দিয়ে মূল্যায়ন করছি, সেটা নির্ভরযোগ্য কিনা, ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারবে কিনা— সেগুলো যথাযথভাবে দেখতে হবে।'

ড. হাফিজুর আরও বলেন, 'প্রস্তাবিত কারিকুলামে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রয়াস চালানো হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আগের কারিকুলামে এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। এবার ফোকাস করা হচ্ছে। কিন্তু এর বাস্তবায়নই বড় চ্যালেঞ্জ। এটা না বুঝলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে পরবর্তী প্রজন্মের।'

কে এই প্রফেসর মশিউজ্জামান: এনজিও যোগসূত্র

বিতর্কিত কারিকুলামের নেপথ্যের অন্যতম কারিগর এনসিটিবির কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান, যিনি বারবার মিডিয়ার শিরোনামে এসেছেন। তিনি বাংলা বিভাগ থেকে লেখাপড়া করে কলেজে শিক্ষকতা করলেও বিভিন্ন এনজিও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন[৪]। প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রজেক্টে কাজ করেছেন, যেমন- UNODC, MGIEP, UNESCO, ASRHR (adolescents sexual and reproductive health and rights), PVE, UNFPA। বয়ঃসন্ধি শিক্ষা ও জেন্ডার সমতা তথা যৌনশিক্ষা বিষয়ে ভারতের এনজিও আফলাতুনের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতিসংঘের পপুলেশন ফান্ডের অধীনে পরিচালিত একটি প্রজেক্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা দরকার—২০১৩ সালে জাতিসংঘের পপুলেশন ফান্ড বাংলাদেশ সরকারকে পায়ুসঙ্গমের অধিকার দিতে পলিসি গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করেছিল। ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় এটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় (১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩), যার শিরোনাম ছিল—'UNFPA for Gay Rights in Bangladesh'—অর্থাৎ UNFPA বাংলাদেশে সমকামিতার (পায়ুসঙ্গম) অধিকার চায়[৫]। সেই প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ-

> অর্থাৎ, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এবং কিছু এনজিও বাংলাদেশকে কিছু জটিল এবং সংবেদনশীল বিষয় মেনে নিতে 'চাপ দিচ্ছে', যার মধ্যে রয়েছে যৌনশিক্ষা চালু করা এবং সমকামী অধিকার নিশ্চিত করা। 'আমরা তাদের বলেছি যে আমরা এসব বিষয় গ্রহণ করতে পারি না, কারণ এগুলো আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী' বুধবার ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এ কে আবদুল মোমেন।
>
> তিনি বলেন, ইউএনএফপিএ LGBTQ+ (সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার) অধিকারের ধারণা চাপানোর চেষ্টা করেছে, ... তিনি বলেন, কমপ্রিহেনসিভ যৌনশিক্ষা বাংলাদেশে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
>
> 'যদি বাংলাদেশ এটি গ্রহণ করে, তাহলে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী স্কুলগামী শিশুদের অ্যানিমেশনের মাধ্যমে যৌনসঙ্গম কীভাবে করতে হয় তা শেখাতে হবে।'

এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা সমকামী অধিকার কায়েম করতে অনেক আগে থেকেই সচেষ্ট ছিল। LGBTQ+ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রফেসর মশিউজ্জামানদের লোকদের ব্যবহার করা হয়েছে।

এনজিওদের এত মরিয়া হওয়ার নেপথ্যে

LGBTQ-বান্ধব নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এডুকেশন এপ্রোচ জাতিসংঘের অধীনে ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের মত এনজিও সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর দূর্বল রাজনৈতিক কাঠামো এবং জনগণের অসচেতনতাকে পুঁজি করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে সমাজ ও ধর্ম-বিরোধী মতাদর্শ বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে[৬]। এই পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে নারীবাদ, যার মূল দাবী হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা ক্ষমতার জোরে প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি তৈরী করেছে, যার কারণে নারীরা অন্তর্নিহিতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়[৬]।

তাই নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা এবং প্রত্যাশা তথা জেন্ডার রোলকে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে যেখানে নিরংকুশ সমতা প্রতিষ্ঠা হয়। তাদের দাবী জেন্ডার যেহেতু সামাজিক নির্মাণ (social construct), উপযুক্ত লিঙ্গ নিরপেক্ষ পরিবেশে নারী ও পুরুষ নিজেদের মত জেন্ডার পরিচয় বেছে নিতে পারবে। এখানে নারী-পুরুষের বায়োলোজিক্যাল বা জৈবিক পার্থক্য (সেকুয়াল বা জন্মগত পরিচয়) মুখ্য নয়। জেন্ডার পরিচয়ই হচ্ছে মানুষের আসল পরিচয়।

বর্তমানে সময়ে অন্তর্ভুক্তির ব্যানারে সমকামিতা/LGBTQ+/জেন্ডার আইডেন্টিটি শব্দের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ, এমনকি পলিসি লেভেলের মানুষের কাছেও দূর্বোধ্য মনে হবে। ইউনিসেফ-এর জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এপ্রোচের প্রতিপাদ্য বিষয় ইংরেজি ভাষায় পড়লে অনুধাবন করা কিছুটা সহজ হতে পারে[৬]—

> Gender Transformative Education seeks to utilize all parts of an education system – from policies to pedagogies to community engagement – to transform stereotypes, attitudes, norms and practices by challenging power relations, rethinking gender norms and binaries, and

> raising critical consciousness about the root causes of inequality and systems of oppression.... Gender Transformative Education goes beyond just getting girls into school..... Children and young people who do not identify with the traditional gender binary (i.e LGBT) are not discriminated against. Children and young people are free to challenge norms without thinking twice.

জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এপ্রোচ অনুযায়ী শিশুদের জেন্ডার নিউট্রাল (লিঙ্গ নিরপেক্ষ) মনে করা হয়। বড় হতে হতে একটি শিশু নিজের নারী, পুরুষ বা এর বাইরের পরিচয় (LGBTQ+ বা নন-বাইনারি) তথা জেন্ডার পরিচয় বেছে নেবে। এজন্য তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে, যাতে তারা সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের প্রত্যাশা এবং ভূমিকাকে প্রশ্ন করতে পারে। সমাজের প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক প্রথা, রীতিনীতিকে জেন্ডার স্ট্যারিওটাইপ বলা হয়। এগুলো ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলতে শিশুদের টার্গেট করা হয়েছে। এজন্য শিশুদের স্কুল হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে তাদের সামাজিক যোগাযোগ, চিন্তাচেতনা গড়ে উঠতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।



ইউনিসেফের জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এডুকেশন সম্পর্কে ধারণা পেতে ছবিটিকে

ভালো করে খেয়াল করুন। হাজার হাজার বছর ধরে সমাজে প্রচলিত নারী ও পুরুষের ভূমিকা এবং তাদের প্রতি প্রত্যাশার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমতার ব্যানারে মূলত নারী-পুরুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাবা দুধ খাওয়াচ্ছেন (অর্থাৎ সন্তান লালনপালনে অংশ নিচ্ছেন), নারীরা শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে পুরুষদের মতোই, যার উদাহরণ হিসেবে ফুটবল খেলার ছবি দেখানো হয়েছে। পুরুষরা ঘরের কাজ করছে, নার্সিং করছে ইত্যাদি।

শিশুদের বড় করতে বাবার সহযোগিতা প্রয়োজন, তবে তার মানে এই নয় যে, একজন বাবা একজন মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারে। কেয়ারিং স্বভাবের কারণে নার্সিং পেশায় সাধারণত নারীরা বেশি পারদর্শী, তবে তার মানে এই নয় যে পুরুষরা এটি করতে পারে না। একই যুক্তিতে প্রচলিত বিবাহ প্রথায় নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়ে হয়, যা বায়োলজির সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ মতবাদের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ কোনো ইস্যু নয়। ছেলেরা ছেলেকে (গে), মেয়েরা মেয়েকে (লেসবিয়ান), ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাথে (বাইসেক্সুয়াল) বিয়ে করতে পারে। এছাড়া, নারী-পুরুষের পোশাকেও পার্থক্য থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ পুরুষরা নারী সাজতে পারে (ট্রান্সজেন্ডার)। এই ধারণাগুলো শিশুদের বিকাশমান মস্তিষ্কে প্রোথিত করাই জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এডুকেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের আর্লি চাইল্ড প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ছেলে ও মেয়ে শিশুদের পুতুল খেলতে উৎসাহিত করার ধারণা প্রচার করছেন, যার মাধ্যমে শিশুরা বড় হয়ে নারী বা পুরুষ হবে, যেখানে জন্মগত লিঙ্গ মুখ্য নয় (নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। এটি সেই প্রফেসর জন মানির কুখ্যাত মতবাদ, যা সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে শরীফ-শরীফার গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ পুরুষ শরীফ বড় হয়ে নিজেকে 'শরীফা' নামের নারী হিসেবে পরিচয় দেয়।

জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এপ্রোচ একটি নতুন ধারণা। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এই ধারণা নিয়ে একাডেমিক পর্যায়ে কাজ শুরু হয়। উন্নয়ন সেক্টরে এটি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা মূলত ২০১২ সালের পর থেকে দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, ২০১০ সালের পর থেকে, যখন LGBTQ+ মতবাদ গ্লোবাল এজেন্ডায় পরিণত হয়, তখন থেকে এটি শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে, যার অন্যতম লক্ষ্য হলো সমকামিতাবান্ধব বিশ্ব তৈরি করা। জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এপ্রোচের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে এই রিভিউ আর্টিকেল পড়তে পারেন[৭]। এই আর্টিকেলের সারমর্ম—

'Gender-transformative approaches aim to reshape gender dynamics by redistributing resources, expectations and responsibilities between women, men, and non-binary gender identities, often focusing on norms, power, and collective action. In this paper, we trace the history of gender-transformative approaches (1990 to March 2022)'

২০২১ সালের বিতর্কিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় এনজিওদের অতিরিক্ত খবরদারির মূল কারণ ছিল জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এপ্রোচকে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা। তারা এতে সফলও হয়। পুরো কারিকুলামটি জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনা করা হয়। সপ্তম শ্রেণী শিক্ষক সহায়িকা বইয়ের দুটি পৃষ্ঠার স্ক্রিনশট পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি। এখানে মনে রাখতে হবে, সমকামিতার মতো বিকৃত যৌনাচারের মতবাদ রাতারাতি প্রতিষ্ঠা করা হয় না। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এই অতি সংবেদনশীল বিষয়টি বিবেচনা করে কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে।

২.১৭.২ শিক্ষাক্রমে জেন্ডার রূপান্তরমূলক (Transformative) অ্যাপ্রোচ

যদিও শিক্ষাক্রমে জেন্ডার কোন নতুন আলোচনা নয়, তবে এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হলে প্রচলিত জেন্ডার অ্যাপ্রোচকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

ইতোমধ্যে অনেকবার আলোচনায় এসেছে যে, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়, বরং পাশাপাশি তার দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করাও জরুরি। আর যোগ্যতা অর্জনের এই

দায়িত্ব শিক্ষার্থীর নিজেরই, শিক্ষক বা তা পরিপার্শ্ব সেখানে একটি সহায়ক পরিবেশের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বার বার বলা হয়েছে, কীভাবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা এখানে পরিবর্তিত হবে, এবং সমাজের প্রচলিত রীতি ও মূল্যবোধের শুধু অনুসরণকারী না হয়ে বরং সে প্রশ্ন করবে, এবং সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে সক্রিয় হবে। প্রচলিত জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাপ্রোচ নিয়ে শিক্ষার্থীকে এই ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা কঠিন। তাই এই শিক্ষাক্রমে জেন্ডার রূপান্তরমূলক (Transformative) অ্যাপ্রোচ বেছে নেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে জেন্ডার পরিচয় নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থী শুধু যে সমানভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে তা-ই নয়, বরং সে নিজেই প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামোকে প্রশ্ন করতে শিখবে; এবং নিজের পরিবার, ও পরিপার্শ্ব থেকে বৈষম্য সৃষ্টিকারী উপাদান খুঁজে বের করে তা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেবে।

এই অ্যাপ্রোচ বাস্তবায়নে শুরুতেই যেটা প্রয়োজন তা হল, জেন্ডার বৈচিত্র নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া। নারী, পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গসহ সকল বৈচিত্রের মানুষ যাতে কোনরূপ বৈষম্য ছাড়াই শিখন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে, নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, এবং নিজ সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতা অর্জন করে তা-ই এই অ্যাপ্রোচ বেছে নেবার মূল উদ্দেশ্য।

যেহেতু এই শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, শিক্ষার্থীর শিখন এখন আর শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং বাইরে নিজের পরিবারে, কমিউনিটিতে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে শিখছে। কাজেই এই শিখন অভিজ্ঞতাগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে সে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তার পরিসরের বিভিন্ন অংশিজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পায়, এবং একইসাথে সমাজে প্রচলিত জেন্ডার বৈষম্যসমূহকে চ্যালেঞ্জ করার উপলক্ষ্য ও সুযোগ ঘটে।

এই অ্যাপ্রোচ বাস্তবায়নের জন্য যা যা প্রয়োজন-

- শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া জরুরি। শিক্ষক যাতে তার নিজের অবচেতনে থাকা বৈষম্যের উপাদান সনাক্ত করতে পারেন এবং সচেতনভাবে তা থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট হন সেজন্য তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা পরিকল্পনার সময় খেয়াল রাখা দরকার, জেন্ডার পরিচয়ের কারণে কেউ যাতে এই অভিজ্ঞতা অর্জনে কোন বাধার মুখে যা পড়ে। এছাড়া শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর ধরন এমন হওয়া

জেন্ডার ও ইনক্লুশন

খেয়াল রাখবেন ছেলে-মেয়ে বা লিঙ্গ বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। শ্রেণিতে যেন একটা পরস্পর সৌহার্দ্যমূলক শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক থাকে, সে বিষয়ে আগে থেকেই গ্রাউন্ডরুল তৈরি করে দিন। দলীয় উপস্থাপনায় যেন মেয়েরা বলার সুযোগ পায় তা লক্ষ রাখুন।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সংবেদনশীল ধারণা বজায় রাখবেন। নারী-পুরুষ বা লিঙ্গ বৈচিত্র্য বিষয়ে সনাতনী ভেদাভেদ- (যেমন- নারীকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করা, কিছু কাজ শুধু পুরুষের মনে করা, নারীকে/পুরুষ/ লিঙ্গ বৈচিত্র্যের জন্য শুধু জেন্ডার ধারণার ভিত্তিতে অনেক দায়িত্বের উপযুক্ত মনে না করা, নারীর মেধা, শ্রম ও ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা, লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্পন্ন মানুষকে মর্যাদা ও সম্মান না দেয়া ইত্যাদি) না করে শ্রেণিকক্ষে সবাইকে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন। এর থেকে বের হয়ে আসার জন্য বাস্তবিক উদাহরণ ও চ্যালেঞ্জ তৈরি করা; লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্মান ও মর্যাদা দেয়া এবং উৎপাদনক্ষম জনগোষ্ঠি হিসেবে প্রকৃত উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

- অর্পিত কাজ প্রদানের ক্ষেত্রে জেন্ডারবিষয়ক প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন: প্রজেক্ট বা ফিল্ড ট্রিপের মতো কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- কোনো প্রজেক্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো স্থান পরিদর্শনের প্রয়োজন হয় তাহলে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে এবং বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। (পরিদর্শনে নারী শিক্ষক ও পুরুষ শিক্ষক যৌথভাবে অংশগ্রহণ করা; অভিভাবককে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি)। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তার অজুহাতে এ ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা থেকে কোনো নির্দিষ্ট জেন্ডারের শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- শ্রেণিতে আপনার নির্দেশনায় যদি বিভিন্ন জেন্ডারের শিক্ষার্থীদের সাড়া প্রদানের ধরনে পার্থক্য থাকে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং উৎসাহ প্রদান করবেন যেন সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় লিঙ্গবৈচিত্র্য ও মানববৈচিত্র্যকে সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা না ভেবে তাকে 'সৌন্দর্য ও শক্তি' হিসেবে উপস্থাপন করবেন। যেমন: শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রযোজ্য স্থানে শুধুমাত্র মুখে বলতে না দিয়ে সবাইকে ইশারা বা বিকল্প উপায়ে প্রকাশ করতে বলা অথবা চোখ বন্ধ করে অন্য ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পরিবেশকে উপলব্ধি করতে বলা।

৮

ব্র্যাকের জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ প্রকল্প: সমাজকে LGBTQ+ লেন্সে বদলিয়ে দেয়া

ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রধান, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা সম্প্রতি 'জেন্ডার এবং শিশুর বিকাশ' শিরোনামে একটি

নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যেখানে ব্র্যাকের দীর্ঘমেয়াদী জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ পরিকল্পনার প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে। স্কুলের যৌনশিক্ষা নিয়ে ব্র্যাক কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছে, সেখানেও জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ বিষয়টি ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়। নিবন্ধটি অফিশিয়াল বিবৃতি না হলেও জেন্ডার সমতা, সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের অনেক বছরের কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি এটি।



ডয়েস অফ ভ্যাল-এর সাক্ষাতকারে মিথিলা বলেন, 'বাংলাদেশের ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালে কাজ করছি ১৫ বছর যাবৎ। সেখানে এখন আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছি। ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডের টেকনিক্যাল টার্মে বললে, আমাকে পুরো পোর্টফোলিওটা তদারকি করতে হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে। এই প্রোগ্রাম ডিজাইন করা থেকে বাস্তবায়ন করা, টিমকে লিড করা, পুরো প্রোগ্রাম দেখি[৮]।' মিথিলার নিবন্ধটি হুবহু তুলে ধরছি—

শৈশবে প্রাকৃতিক লিঙ্গ (সেক্স) ও সামাজিক লিঙ্গের (জেন্ডার) ভূমিকা

জেন্ডার বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে নিয়ম অনুযায়ী লিঙ্গ ও জেন্ডারের পার্থক্যের প্রসঙ্গ না নিয়ে এলে আলোচনা এগোবে না। কারণ এখনও আমরা অনেকেই লিঙ্গ আর জেন্ডারের সংজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তিতে থাকি। লিঙ্গ বা ইংরেজিতে 'সেক্স' হচ্ছে মানুষের জৈবিক বা শারীরিক পরিচয়, অর্থাৎ যে যৌনাঙ্গ নিয়ে শিশুটি জন্মাল, সেটিই তার সেক্স বা প্রাকৃতিক লিঙ্গ। সে নারীর যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে, সে পুরুষের যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে, বা তার যৌনাঙ্গে অনেক সময় নারী ও পুরুষের উভয়ের যৌনাঙ্গ শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যা মতে একসঙ্গে নানারকম ভাবে থাকতে পারে। যাই-ই থাকুক, সেটা তার প্রাকৃতিক লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করে। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিক লিঙ্গ। শিশুটি বড়ো হতে হতে নিজেকে কীভাবে দেখতে চায়। নারী না পুরুষ? সেটাই তার সামাজিক লিঙ্গ বা জেন্ডার। এটা তৈরি হয় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ থেকে, এই ধারণা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয় না।

জন্মের সময়, শিশুর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ছেলে বা মেয়ে বা অন্য কোনও লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় যা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় গঠনে শিশুকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন শিশুরা তাদের পরিবার, পরিবেশ এবং সমাজের লিঙ্গভিত্তিক নিয়ম, মনোভাব এবং প্রত্যাশাগুলো শেখে। এটাই তাদের পরবর্তীকালে (তারুণ্যে, যৌবনে বা পরিণত বয়সে) নিজেদের কীভাবে তারা পরিচয় দেবে সেই ভাবনাকে সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় (gender identity) এবং সামাজিক লিঙ্গ ভূমিকা (gender role) 'সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়' বা 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বলতে বোঝায় মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, যা তারা পুরুষ, নারী বা তাদের সংমিশ্রণ বা কোনওটিই নয় হতে পারে, এবং যা তাদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রভাব এবং পরিবেশগত অবস্থার মিথস্ক্রিয়া থেকে আসে।

সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের অনুভূতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। বেশিরভাগ শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের (gender identity) সঙ্গে এবং তাদের জন্মগত প্রাকৃতিক লিঙ্গের (assigned sex) মিল থাকতে পারে। মানে একই হতে পারে। ধরা যাক শিশুটি নারীর যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মেছে ও সে নিজেকে মেয়ে বলেই মনে করে। সবসময় আবার তা নাও হতে পারে। কিছু শিশুর জন্য, তাদের নির্ধারিত প্রাকৃতিক লিঙ্গ (assigned sex) এবং সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের (gender identity) মধ্যে মিল এতটা স্পষ্ট হয় না। হয়তো সে পুরুষের যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মেছে কিন্তু বড়ো হতে হতে সে নিজেকে মেয়ে বলে মনে করছে।

লিঙ্গ পরিচয় সাধারণত বয়সের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়।

* দুই বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে শিশুরা ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়।
* তিন বছর বয়সের কিছু আগেই বেশিরভাগ শিশু সহজেই ছেলে বা মেয়ে হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে।
* চার বছর বয়সের মধ্যে বেশিরভাগ শিশুর তাদের লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে একটি স্থিতিশীল ধারণা তৈরি হয়ে যায়। এভাবেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জৈবিক বিকাশের প্রক্রিয়া, পারিপার্শ্বিক উপাদান এবং সামাজিক অবস্থান ধীরে ধীরে শিশুকে তার জেন্ডার আইডেন্টিটি গঠনে প্রভাবিত করে।

এই একই সময়ে, শিশুরা লিঙ্গ ভূমিকা বা 'gender role' এর আচরণ শেখে।

অর্থাৎ, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নিয়মে, 'ছেলেরা যা করে' আর 'মেয়েরা যা করে'। যদিও, উল্লেখ্য যে 'ক্রস- জেন্ডার' এবং এই জাতীয় খেলা তাদের ভবিষ্যত লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে, লিঙ্গ ধারণা, বিকাশ এবং অন্বেষণের একটি স্বাভাবিক অংশ। একটি ছোটো শিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি যে কোনও খেলনা নিয়ে খেলা বা নির্দিষ্ট পোশাক পরা মানে 'আমি এটি পছন্দ করি'। শিশুরা বুঝতে পারে না যে তাদের পছন্দগুলো কীভাবে একটি লিঙ্গ বা অন্য লিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই কারণে জেন্ডার আইডেন্টিটি গঠনে বড়োদের ভূমিকা ও প্রভাব অনেকটা।

জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ (gender stereotype)

জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ হল একটি আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সাধারণ বা সামান্য বিষয় বলে মনে হলেও, আমরা যদি শিশুদের ওপর পুরুষত্ব এবং নারীত্বের কঠোর ধারণা চাপিয়ে দিই, তাহলে আমরা তাদের সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলি এবং পরবর্তী জীবনে প্রকৃত আত্মপরিচয় গঠনে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারি।

সমাজ নির্মিত ধারণা। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। কিছু বৈশিষ্ট্য যা নারী এবং পুরুষদের মধ্যে থাকা উচিত বা যে ভূমিকা পুরুষ এবং মহিলার পালন করা উচিত বলে সমাজ নির্মিত যে ছবি আছে, সেটাই জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ। জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপ শিশুদের বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সাধারণ বা সামান্য বিষয় বলে মনে হলেও, আমরা যদি শিশুদের ওপর পুরুষত্ব এবং নারীত্বের কঠোর ধারণা চাপিয়ে দিই, তাহলে আমরা তাদের সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলি এবং পরবর্তী জীবনে প্রকৃত আত্মপরিচয় গঠনে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারি। জেন্ডার স্টিরিয়োটাইপের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

এই স্টিরিয়োটাইপ ছেলেদের তাদের আবেগ প্রকাশ না করতে শেখায়, ছেলেদের ওপর শারীরিক ও পেশিশক্তির প্রত্যাশা চাপিয়ে দেয় এবং সামাজিকভাবে নির্ধারিত মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলির প্রতি মেয়েদের অনুগত হতে বলে, যেমন মেয়েরা কী জামা পরবে, কীভাবে কথা বলবে, কোথায় কোথায় চলাফেরা করবে, মেয়েদের সৌন্দর্যের যত্ন নিতে হবে-এইসব।

যখন একটি শিশুর আগ্রহ এবং ক্ষমতা সমাজ যা প্রত্যাশা করে তার থেকে অন্যরকম হয়, তখন তারা বৈষম্য ও বুলিং (bullying) এর শিকার হতে পারে। মা-বাবার তাদের সন্তানদের প্রতি লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রত্যাশা থাকে এবং তাঁরাও চান

না যে তাঁদের সন্তান সমালোচিত হোক এবং সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যাক। Social exclusion- এর শিকার হোক। বাচ্চাদের এই সামাজিক চাপগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলা এবং নিজেদের স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করার বদলে গুটিয়ে রাখার জন্য চাপ দেওয়ার পরিবর্তে, বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের সুন্দর বিকাশের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে নিজেদের জেন্ডার আইডেন্টিটি গঠন করতে এবং সাবলীল জীবন-যাপনে সক্ষম হয়। লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে, প্রতিটি শিশুর নিজস্ব প্রতিভা রয়েছে যা সবসময় সমাজের বা আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

> *নিজেদের প্রত্যাশা শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিলে তা শিশুদের বিকাশের জন্যে ক্ষতিকারক হবে এবং তাদের দক্ষতা, প্রতিভা এবং প্রকৃত আত্মপরিচয়কে দমন করা হবে।*

প্রত্যাশিত জেন্ডার রোল-এর বাইরেও হতে পারে, যেমন, পুতুল খেলা, গাড়ি চালানো, মহাকাশযান চালানো, রান্না করা, বাজার করা, সন্তান লালন, চাকরি করা-এইসবই ছেলে- মেয়ে নির্বিশেষে সকলের কাজ হতে পারে। শিক্ষাক্রম, পিতামাতাদের জন্য প্যারেন্টিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুদের এবং তাদের বাবা- মায়েদের জেন্ডার সচেতনতা এবং জেন্ডার সমতায়নের ধারণা তৈরির লক্ষ্যে এই জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ শিশু বিকাশের উদ্যোগ ভবিষ্যতের শিশুদের জন্য একটি সমতায়নের পৃথিবী তৈরি করতে পারে।

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরিতে বড়োদের ভূমিকা

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরিতে বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমস্ত শিশুর বিভিন্ন লিঙ্গের ভূমিকা এবং খেলার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করার সুযোগ প্রয়োজন। বাবা-মা এবং শিক্ষক নিশ্চিত করতে পারেন যে তাদের শিশুর পরিবেশ লিঙ্গ ভূমিকার বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। যেমন-

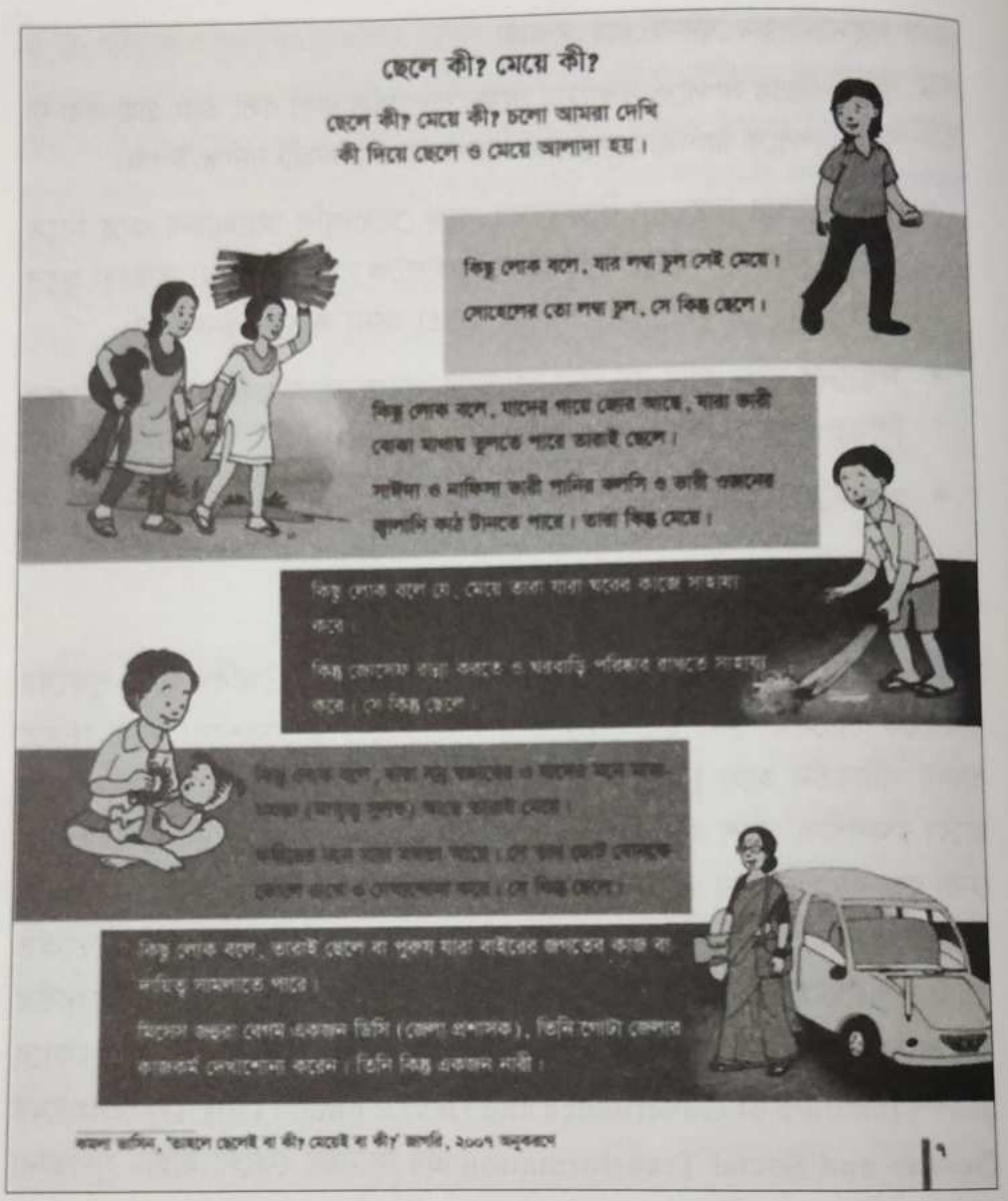
* শিশুদের এমন বই, উপকরণের সঙ্গে পরিচয় করানো দরকার যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের নন- স্টিরিয়োটাইপিক্যাল এবং বৈচিত্র্যময় জেন্ডার রোলে (gender role) দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাড়িতে থাকা বাবা, কর্মরত মা, পুরুষ নার্স এবং মহিলা পুলিশ অফিসার।
* *শিশুর জন্য লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে পুতুল, খেলনা গাড়ি, অ্যাকশন ফিগার, ব্লক*

সহ নানারকম খেলনা বেছে নেওয়া।

* লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে সন্তানের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা এবং প্রশ্ন করা যা লিঙ্গ সম্পর্কে আপনার সন্তানের ধারণা জানার একটি দুর্দান্ত উপায়।
* বাবা-মায়েরা সন্তানের শিক্ষকদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে নিতে পারেন কীভাবে তাঁরা লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশকে সমর্থন করেন। তাছাড়া স্কুলে লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে কী শেখানো হয়তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
* সন্তানের সঙ্গে এমন বই পড়া যা ছেলে, মেয়ে বা অন্য লিঙ্গ পরিচয় থাকার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে কথা বলে।
* সন্তানকে নিজেকে বদলানোর জন্য চাপ না দেওয়া।

জেন্ডার ট্রান্সফোর্মেটিভ এডুকেশনের কিছু নমুনা

লিঙ্গ নিরপেক্ষ তথা সমকামিতা বান্ধব বিশ্ব তৈরীর প্রক্রিয়ায় জৈবিক নারী-পুরুষের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় জেন্ডার ট্রান্সফোরেটিভ এডুকেশনে। নারী-পুরুষে ধারণা পরিবর্তন হলে LGBTQ+ এমনিতেই সমকামিতা সামাজিকীরকণ হয়ে যাবে। রক্ষণশীল দেশে এটা সরাসরি করা অসম্ভব। তাই বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়। বাংলাদেশের ৩৫০ স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে জেমস কারিকুলাম পড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিতর্কিত শরীফার গল্পটি মূলত জেন্ডার ট্রান্সফোর্মেটিভ ধারণা দেয়া হয়েছে। জনগনের দাবীর মুখে শরীফার গল্প বাদ দেয়ার প্রতিবাদ করেছেন ব্র্যাকের পক্ষ থেকে। সাক্ষাৎকারে ব্র্যাকের Institute of Governance and Development (BIGD) প্রোগ্রামের Gender and Social Transformation এর সিনিয়র ফেলো মাহীন সুলতানা বলেন, শরীফার গল্পটি অনেক গবেষণা করে তৈরী করা হয়েছিল। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন যারা প্রতিবাদ করছে তারা মৌলবাদী৯।



ছবিতে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত নারী পুরুষের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এটি জেমস কারিকুলাম থেকে নেয়া হয়েছে।

শরীফার গল্পে নারী এবং পুরুষের ধারণাকে বিভিন্ন ঘটনা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। শরীফার গল্পে কয়েকজনের ছবি যুক্ত করা হয়েছে, যেমন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার। যদিও বইতে হিজড়া হিসেবে দেখাতে চেয়েছে, আসলে তারা ট্রান্সজেন্ডার!

খুশি আপা তখন বললেন, কয়েকটা গ্রুপের মাধ্যমে আমরা চিন্তার খোরাক পেতে পারি। ওরা সবাই মিলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলো।

- আমরা নিজেদের ছেলে এবং মেয়ে বলে আলাদা করে চিনি কীভাবে?
- ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আমরা আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কী নিজেরাই পছন্দ করি?
- ছেলেদের খেলনা-মেয়েদের খেলনা, ছেলেদের কাজ-মেয়েদের কাজ কিসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করি?
- একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়?
- অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা আমাদের লিঙ্গগত পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?

গণেশ: তাহলে ছেলে এবং মেয়ে ছাড়াও ভিন্ন রকমের মানুষ হয়।

রনি: আমার মা বলেন, ছোটদের কোনো ছেলেমেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।

আয়েশা: আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আমাদের সময় ছেলে বা মেয়েদের পোশাক, আচরণ, কাজকর্ম যেমন দেখি, প্রাচীন মানুষেরও কি তেমন ছিল? সামনের সময়েও কি এমনটা থাকবে?

রফিক: পৃথিবীর সব দেশে, সকল সম্প্রদায়ে কি ছেলেমেয়ের ধারণা, তাদের চেহারা, আচরণ, সাজপোশাক একই রকম?

নীলা: আমার মা আমাকে বেগম রোকেয়ার লেখা একটা গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। গল্পটার নাম 'সুলতানার স্বপ্ন'। সেখানে এমন একটা জায়গা কল্পনা করা হয়েছে যেখানে ছেলে আর মেয়েদের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গিয়েছে।

চলো, আমরাও নারী-পুরুষের ধারণা, সমাজে তাদের ভূমিকা আর নিজেদের ভাবনা সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি।

লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হান্না বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শারীরিক গঠন দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শারীরিক গঠন একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। সাধারণত ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা বাইরে যেতে পছন্দ করে। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

শিহান: তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?



শরীফা গল্পের এই ছবিটির মাধ্যমে শিশুদের লিঙ্গ নিরপেক্ষ ধারণা দেয়া হয়েছে। ব্র্যাকের আর্লি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মিথিলার লেখার ধারণা এই ছবিতে রয়েছে। ছেলে-মেয়ে শিশুরা সবকিছু দিয়ে খেলতে পারে।

References

1. নতুন কারিকুলাম নিয়ে তালগোল : কাজ চলছে এনজিওর প্রেসক্রিপশনে > কমিটি থেকে ৪ বিশেষজ্ঞের পদত্যাগ > বই ছাপা হয়নি তবু পাইলটিং. Bhorer Kagoj. https://shorturl.at/gZVWm

2. মোহাম্মদনূর. নতুন কারিকুলাম নিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব. dhakapost.com https://www.dhakapost.com/education/22992 (2021).

3. গোঁজামিলে তৈরি হচ্ছে নতুন কারিকুলাম. Bangla Tribune . https://shorturl.at/

JvTLS

4. »Muhammad Moshiuzzaman. https://web.archive.org/web/20231205212012/https://nl.aflatoun.org/people/muhammad-moshiuzzaman/ (2023).

5. UNFPA for gay rights in Bangladesh. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/laws-rights/38481/unfpa-for-gay-rights-in-bangladesh.

6. Gender Transformative Education | UNICEF. https://www.unicef.org/reports/gender-transformative-education (2021).

7. MacArthur, J. et al. Gender-transformative approaches in international development: A brief history and five uniting principles. Women's Studies International Forum 95, 102635 (2022).

8. রাফিয়াত রশিদ মিথিলা: একের ভিতরে অনেক – DW – 11.07.2023. dw.com https://shorturl.at/U0n2o

9. Khan, T. 'Government should not be swayed by the opinions of a small extremist minority'. The Daily Star https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/government-should-not-be-swayed-the-opinions-small-extremist-minority-3648986 (2024).

ব্র্যাকে সমকামিতা বান্ধব জেন্ডার পলিসি ও বাস্তবায়ন

বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ভিত্তি তৈরী হয় তারা কোন আদর্শ, নীতি, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ওপর পরিচালিত হয় তার ওপরে। প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এবং নীতি ঠিক করে দেয় কর্ম-পরিকল্পনা। যেমন- কোনো ধর্মের আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ ঠিক করে দেয়, সেই ধর্মের অনুসারীদের জীবন-বিধান এবং সমাজ পরিচালনার বিধি-নিষেধ, আইনকানুন। ব্র্যাক এমন এক বিশ্ব গড়তে চায় যা শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, এবং প্রতিটি মানুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে। দারিদ্র বিমোচন, জেন্ডার ইকুয়ালিটি (লিঙ্গ সমতা), বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ব্র্যাকের মূলনীতি[১], [২]।

ব্র্যাকের আদর্শ/ভিশন
এমন একটি পৃথিবী যেখানে কোন প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

মূলনীতি
দারিদ্র্য বিমোচন, লিঙ্গ সমতা (Gender equality), নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার

অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ
সততা, উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি (Inclusiveness), কার্যকারিতা

পশ্চিমা অর্থায়নে ব্র্যাক উন্নয়ন সেক্টরে এনজিও কার্যক্রম শুরু করেছিল যার অন্যতম এজেন্ডা ছিল নারীর ক্ষমতায়নের মোড়কে আমাদের সমাজে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করা। নারী অধিকারসহ প্রতিটি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা সবার কাম্য। কিন্তু সেই পশ্চিমা অধিকার বা নারীবাদের ধারণা ভিন্ন, যেখানে 'আমার শরীরের মালিকানা আমার' (we own our own bodies), আমার যা ইচ্ছা, তাই করতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের ক্ষতি না হয়। উল্লেখ্য যে 'অন্যের

ক্ষতি' বিষয়টিও আপেক্ষিক, যেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। অন্যদিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের শরীরের মালিকানা হচ্ছে আল্লাহর, তিনি এটা আমাদের আমানত হিসেবে দিয়েছেন। এই মূলনীতির কারণে নিজের শরীরকে ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়া বা আত্মহত্যা করা চরম গর্হিত কাজ বলে গণ্য করা হয়। পশ্চিমা নারীর অধিকারের নামে পশ্চিমা বিশ্ব সমকামী নারীর অধিকার (লেসবিয়ান) অগ্রাধিকার দেয়া শুরু করে।

গত এক দশকে জেন্ডার, মানবাধিকার (Human rights), নারী (woman), পুরুষ (Man), সমতা (Equality) ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলোর - সংজ্ঞা LGBTQ+ অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রথমবারের মতো প্রজনন অধিকার (Reproductive Rights) আলোচনা হয় ৩ এবং পরের বছর (১৯৯৫) বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে সাউথ আফ্রিকার সমকামী অধিকার কর্মী তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য দেন—লেসবিয়ান অধিকার হলো নারী অধিকার এবং নারী অধিকার হলো সার্বজনীন এবং অবিচ্ছেদ্য এক মানবাধিকার[৪]।'

নারী প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারী ক্ষমতায়ন করা ব্র্যাকের চালিকাশক্তি। সেই লক্ষ্য অর্জনে ১৯৯৭ সালে ব্র্যাক জেন্ডার পলিসি গ্রহণ করে, যা সংস্থার অভ্যন্তরে এবং এর কার্যক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এই নীতি সংস্থার কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে। স্যার ফজলে হাসান আবেদ তার স্বপ্নের ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ প্রতিষ্ঠা করেই ২০০৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি'র অর্থায়নে 'রিয়েলাইজিং রাইটস' (অধিকার অনুধাবন) প্রকল্পের মাধ্যমে LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেন। আগের পরিচ্ছদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শুনতে বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বিশ্বের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে (অর্থাৎ সমকামী অধিকার) ২০০৭ সালে BRAC-এর জেন্ডার পলিসি পর্যালোচনা করা হয়, যাতে করে এটি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ইকুয়ালিটির প্রতি আরও সঠিক এবং কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে[৫]। ২০১৬ সাল থেকে BRAC তার পদ্ধতি পরিবর্তন করে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং (লিঙ্গ মূলধারায়ন) পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা BRAC-এর সকল প্রকল্পে জেন্ডার সমতার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্র্যাকের জেন্ডার, নারী (উইম্যান) শব্দের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে!

২০১০ সালের আগেও জেন্ডার বলতে দুটো বুঝাতো- নারী ও পুরুষ। এখন জেন্ডার পরিচয় ১০০টির বেশী হতে পারে। জেন্ডার নিয়ে বিস্তারিত একটা আলাদা পরিচ্ছেদ এই বইয়ের শুরুতে যুক্ত করা রয়েছে। ২০০৭ সালের আগেও ব্র্যাক লিঙ্গ বৈষম্য (Gender descrimination) বলতে নারী ও পুরুষের মাঝে বৈষম্য বোঝাতো। এখন জেন্ডার আইডেন্টিটির সাথে কার্যত বায়োলজির সম্পর্ক নেই। শব্দের মারপ্যাঁচ LGBTQ+ আন্দোলনের কৌশলের অংশ। আসুন দেখি, ব্র্যাকের জেন্ডার পলিসিতে জেন্ডারের সংজ্ঞায় কী লেখা আছে[৫]।

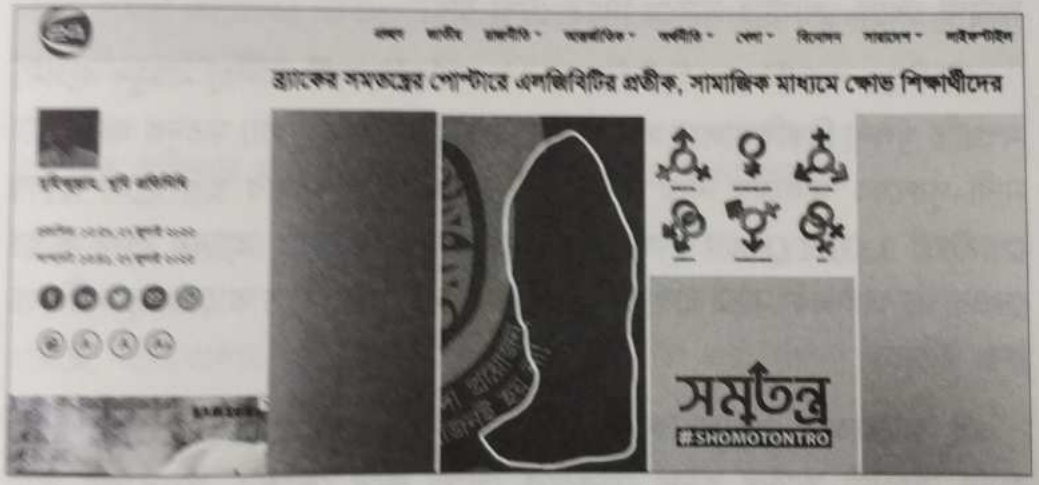
> Gender: Gender refers to socially constructed roles played by women, men and other gender identities that are assigned on the basis of sex. Gender is used as a means to distinguish similarities and differences between women, men and other sexual identity people without direct reference to human biology, but rather to the behavioural patterns expected of women and men and their cultural reinforcement. These roles are usually specific to a particular area and time.

অর্থাৎ, জেন্ডার-লিঙ্গ বলতে নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়সম্পন্ন (যেমন- নন-বাইনারি, ট্রান্সজেন্ডার) ব্যক্তিদের দ্বারা পালন করা সামাজিকভাবে নির্মিত ভূমিকা বোঝায়, যা মূলত শারীরিক লিঙ্গের (সেক্স) ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করা হয় নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য এবং সাদৃশ্য বোঝানোর জন্য, যা সরাসরি মানব জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং পুরুষ ও নারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ এবং তাদের সাংস্কৃতিক দৃঢ়করণের ওপর ভিত্তি করে। এই ভূমিকা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয়।

ভালো করে লক্ষ করুন, জেন্ডার বলতে ব্র্যাক এখন আর দুটি লিঙ্গ (নারী ও পুরুষ) বোঝাচ্ছে না, এখানে অন্যান্য লিঙ্গ তথা লিঙ্গবৈচিত্র্য বোঝানো হচ্ছে। লিঙ্গের সাথে শরীরের (বায়োলজির) সম্পর্ক নেই, একে বলা হচ্ছে সামাজিকভাবে নির্মিত ভূমিকা। অর্থাৎ লিঙ্গ এখন মানসিক ব্যাপার, যার সাথে শরীরের সম্পর্ক

না-ও থাকতে পারে। এই লিঙ্গ নির্ধারিত নয়, সমাজ এবং সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে। এজন্য সাংবাদিকতা, পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ব্যাপার যুক্ত হচ্ছে। একজন সুস্থ পুরুষ নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার দাবী করতে পারে। বলা হয়ে থাকে Transwomen are women এবং Transmen are men. মোদ্দা কথা আগে উইম্যান বলতে জন্মগত নারী বোঝানো হতো, এখন পরিবর্তিত সংজ্ঞা অনুযায়ী উইম্যান বলতে জন্মগত পুরুষও হতে পারে (ট্রান্সউইম্যান, যাদেরকে উইম্যানও বলা হচ্ছে)।

এসব আলোচনা হতবিহ্বল লাগতে পারে। ভাবতে পারেন এটা অসম্ভব। আসুন দেখি ব্র্যাক জেন্ডার বলতে আসলে কী বোঝায়! ব্র্যাকের Gender, Justice and Diversity (GJD)-০এর উদ্যোগে সমতন্ত্র আন্দোলনের ব্যানারে নব্য জেন্ডার ডাইভার্সিটি নিয়ে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের মাইন্ডসেট তৈরী করতে ৭৩টি জেন্ডার আইডেন্টিটির সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি মাদ্রাসায়) প্রচার করে৬।



২০২৩ সালের ২৭ জুলাই চ্যানেল-২৪ এই শিরোনামে- '*ব্র্যাকের সমতন্ত্রের পোস্টারে এলজিবিটির প্রতীক, সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের*'৬

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগিতায় ব্র্যাকের কার্যক্রম 'সমতন্ত্র'-এর আয়োজিত অনুষ্ঠানের পোস্টারে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডারের (এলজিবিটি) চিহ্ন প্রচারের অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামের পোস্টারে এলজিবিটি'র প্রতীকের

বিষয়টি সামনে এলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গত মঙ্গলবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী অডিটোরিয়ামে সমতন্ত্র কর্তৃক ডায়ালগ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের পোস্টারগুলোতে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডার (এলজিবিটি)'র চিহ্নগুলো একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসার পরপরই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঐ ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিতে দেখা যায়। তাদের দাবি পোস্টারে এভাবে সমকামিতা প্রচার করা বাংলাদেশে আইনানুসারে নিষিদ্ধ এবং এটি আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে স্পষ্ট আঘাত। নৈতিকতা ও শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে এই পোস্টার। স্বাধীনতার তকমা দিয়ে এসকল বিকৃত বিষয়াদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় প্রচার মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গা থেকে পোস্টার সরিয়ে নিতে দেখা যায়।

এটি নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী তালহা মাহমুদ বলেন, সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতন্ত্র এর একটা প্রোগ্রাম হলো। যতদূর জানি এটা নারী-পুরুষের অধিকার নিয়ে কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এদের পোস্টারে LGBTQ-এর সিম্বল কেন থাকবে? এটা নিয়ে তাদের স্পষ্ট ব্যখ্যা দেওয়া দরকার এবং তারা যদি ভুল করে এর প্রচার করে, তবে তাদের ভূল স্বীকার করা উচিত।

এই আয়োজনে সহায়তাকারী ডিসিপ্লিনের (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুর রউফ ফেসবুকে পোস্ট করে লেখেন, সমতন্ত্রের নামে সমকামিতা প্রোমোট বন্ধ করুন। আগে জানলে কখনই এই প্রোগ্রামে যেতাম না। আমাদের ডিসিপ্লিন নারী-পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করি বলে না জেনেই সবাই এই প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের বিস্তারিত না জানিয়েই তারা এসব করে গিয়েছে। আমাদের ডিসিপ্লিনকে, ডিসিপ্লিনের শিক্ষকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের বোকা বানিয়ে গেছে। আমি, আমরা বা আমাদের ডিসিপ্লিন কখনোই সমকামিতা সাপোর্ট বা প্রোমোট করিনি, করব না। তাদের পাতা ফাঁদ আমরা বুঝতে পারিনি।

এ ব্যাপারে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিসিপ্লিনের প্রধান নুজহাত ফাতেমা বলেন,

আমার চলতি মাসের ৩১ তারিখেই দায়িত্ব শেষ হবে। সেসব নিয়ে কিছু ব্যস্ততা থাকায় আমি এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে খুব একটা জানিনা। এটা সমন্বয় করেছেন ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক বায়েজিদ খান।

জানতে চাইলে বায়েজিদ খান বলেন, ব্রাক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। এর Gender Justice & Diversity-এর অধীনে 'সমতন্ত্র'-এর একটি ডায়ালগ সেশন আমাদের ক্যাম্পাসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে না জেনে খন্ডিত একটি ছবি দেওয়াতে মূলত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট কোনো জেন্ডার নয় বরং ৭৩টি জেন্ডার আইডেন্টিটিকে পোস্টারে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। আমদের এ প্রোগ্রাম এর ভিডিও বা সম্পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে, সেটি দেখলেও বুঝা যাবে আমরা সেখানে কি নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে আমরা দ্রুতই আমাদের উদ্দেশ্য ও অবস্থান ক্লিয়ার করে একটি বিবৃতি দেব। ভাবতেই অবাক লাগে ফজলে আবেদ সাহেব এত পরিশ্রম করলেন, কিন্তু রেখে গেলেন সমকামিতা বান্ধব পলিসি, যা সমাজ এবং দেশের আইন-বিরোধী। নারীর সমতা কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে নারীর বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন। Inclusion এর নামে exclusion!

ব্র্যাকের জেন্ডার পলিসি এবং এর বাস্তবায়নের রূপরেখা

ব্র্যাকের মূল জেন্ডার পলিসি ইংরেজিতে। বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে ঠিকমতো প্রকাশ করা যায় না। তাই মূল ইংরেজির পাশে বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদ করা হলো—

১. পটভূমি (ব্র্যাকগ্রাউন্ড)

জেন্ডার পলিসি/নীতিমালা ব্র্যাকের জন্য একটি নির্দেশিকা নথি (Guiding documents), যা সংস্থাটিকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেন্ডার রূপান্তরমূলক (High performing gender transformative) প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা। একটি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) এবং বৈচিত্র্যময় (Diverse) সংস্থা হওয়ার লক্ষ্যে, এই নীতিমালায় অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়গুলোকেও (Gender identities, অর্থাৎ LGBTQ+) অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে উদীয়মান (emerging) চাহিদা মোকাবিলা করা যায়।

এই নীতিমালায় মানবাধিকার ঘোষণা (Human Rights Declaration) এবং সকল প্রকার নারী বৈষম্যের বিলোপের জন্য কনভেনশন (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, CEDAW) বিবেচনা করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG) ৫, ১০, ১৬ এবং অন্যান্য (২০১৬-২০৩০) এই নীতির জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে, যা জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রচেষ্টা বাড়াতে সহায়ক হবে।

২. জেন্ডার নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্য : জেন্ডার নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো সংস্থার জন্য জেন্ডার সমতা (ইকুয়লাইটি) অর্জনের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভিশন তৈরি করা। ব্র্যাক এই পলিসির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চায় যে তাদের সকল পর্যায়ের প্রকল্প, প্রাতিষ্ঠানিক কালচার এবং প্রতিষ্ঠানকে রিপ্রেজেন্টেশন/প্রতিনিত্ব করার কেন্দ্রবিন্দু থাকবে জেন্ডার সমতা (Gender Equality) এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

৩. মূলনীতি

৩.১ জেন্ডার সমতা, ন্যায় এবং বৈষম্যহীনতা ব্র্যাকের সকল কার্যক্রম ও পরিচালনার কেন্দ্রে রয়েছে (Gender equality, equity and nondiscrimination are central to BRAC's activities and operation) ।

৩.৫ সকল কার্যক্রম বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত জেন্ডার সূচকের ভিত্তিতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় (All work is continuously monitored against gender indicators based on different country contexts)

৩.৭ ব্র্যাক স্বীকৃতি দেয় যে জেন্ডার সমতার পথে জেন্ডার বৈচিত্র্য এবং আন্তঃসম্পর্কের (intersectionality) বিষয়গুলোও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। অর্থাৎ, নারীদের (নোট- উইমেন এর সংজ্ঞায় ট্রান্সউইমেনও হতে পারে) মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো, যার শিকার তারা তাদের লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, জাতিগত উৎস, শ্রেণি, জাতীয়তা, গায়ের রঙ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, যৌন অভিমুখিতা (Sexual orientation, অর্থাৎ সমকামিতা) রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে হয়, সেগুলোকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। (BRAC recognizes that the path towards gender equality must also take into account

gender diversity and intersectionality, i.e. inequalities between women resulting from all other forms of embedded discrimination to which they may be subjected based on sex, gender, ethnic origin, class, nationality, skin color, age, disability, sexual orientation, gender identity or political beliefs)।

৪. সাংগঠনিক উন্নয়ন (Organisational Development)

৪.১ জেন্ডার সমতা বজায় রাখা এবং সাংগঠনিক নীতিমালা, পদ্ধতি, সিস্টেম এবং অভ্যাসের মাধ্যমে জেন্ডার এবং ডাইভারসিটি সমুন্নত করা; এটা নিশ্চিত করা যে সমস্ত সম্পর্কিত নীতিমালা, পরিকল্পনা, ব্যবস্থা এবং সিস্টেমগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল)। (Uphold gender equality, and integrate gender and diversity perspectives through organisational policies, procedures , systems and practices; ensuring all the relevant policies, plans and measures and systems related to organisational development is gender responsive)

৪.২ সংগঠনের সকল স্তরে নারীর অধিকার এবং বৈচিত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি শক্তিশালী করা, এবং জেন্ডার সমতার গুরুত্ব সম্পর্কিত আন্তঃসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি (intersectional approach, এই শব্দের মাধ্যমেও LGBTQ+ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) সহ সমস্ত কর্মচারী এবং স্টেকহোল্ডারদের নির্দেশনা প্রদান করা।

(Strengthen the commitment to women's rights and diversity at all levels of the organization, guiding all staff and stakeholders on the importance of gender equality with an intersectional approach)।

৪.৪ জেন্ডার সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং জেন্ডার এনালাইসিস সম্পর্কিত জ্ঞানকে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি মূল ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং সংগঠনের সর্বত্র সক্ষমতা তৈরি করা। (Recognize knowledge related to gender concerns and gender analysis as one of the core areas of building capacity for staff and build capabilities throughout the organization)

৪.৫ মূল মান ও জেন্ডার সচেতনতা, ন্যায় ও সমতা সম্পর্কিত মূল দক্ষতা

উন্নয়ন করা। (Develop core competencies that address core values and gender awareness and equity and equality)

৪.৬ প্রাথমিক পরিচিতি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্কিত সাধারণ বোঝাপড়া গড়ে তোলা। (Build a common understanding around gender through induction and training)

৪.৭ সংস্থার সকল প্রশিক্ষণ জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া নিশ্চিত করা; এবং এমপ্লিদের জেন্ডার সমতা, আন্তঃসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং জেন্ডার প্রতিক্রিয়া সরবরাহকারী আচরণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা। (Ensure that all training across the organisation is gender-sensitive; and staff are trained on gender equality, intersectional perspectives and gender responsive behavior)

৪.৮ সমস্ত হিউম্যান রিসোর্স (এইচআর) সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরী করা, এবং কর্মচারীদের পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (পিএমএস) জেন্ডার ইন্ডিকেটর সংযুক্ত করা যাতে জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল কাজের পরিবেশ তৈরী হয়।

(Make all Human resource (HR) systems and process gender-sensitive and responsive, and integrate gender indicators into staff objectives in performance management systems (PMS) towards a gender responsive work environment)

৪.৯ বাইরে থেকে আসা কনসাল্টেন্টদের সব রেফারেন্স ডকুমেন্ট, এমনকি টার্মস অফ রেফারেন্সও যেন জেন্ডার সংবেদনশীল সে বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(Prioritise gender sensitivity in all terms of reference documents, including Terms of references (TORs) for external consultants)

৫. প্রোগ্রামেটিক ব্যবস্থাপনা

৫.৮ নতুন প্রোগ্রাম ও প্রকল্প চক্রে (যেমন- প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, লক্ষ্য নির্ধারণ, সূচক এবং বাজেটিং) জেন্ডার সমতা এবং জেন্ডার জাস্টিস দৃষ্টিভঙ্গি/লেন্স অন্তর্ভুক্ত করুন। (Integrate gender equality and gender justice dimensions in all new programmes and

project cycles (e.g. context analysis, planning, implementation, management and monitoring and evaluation, setting objectives, indicators and budgeting)

৫.৯ প্রস্তাবনা উন্নয়নের প্রক্রিয়া জুড়ে নিশ্চিত করুন যে, প্রোগ্রাম ও প্রকল্পসমূহ লিঙ্গ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ সমতা এবং পিছিয়ে পড়া জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত নারীদের এবং মেয়েদের উন্নতির দিকে অবদান রাখছে। (Ensure that throughout the proposal development process, the programs and projects seek to contribute towards gender diversity, gender equality and empowerment of the disadvantaged people, especially women and girls)

৫.১১ BCC (বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন) উপকরণ তৈরি করার সময় প্রতিনিধি সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করুন, টেক্সট, ছবি/ইমেজ/চিত্র পর্যালোচনা করুন যাতে উপকরণ দ্বারা প্রচারিত লিঙ্গের নিয়ম চিহ্নিত করা যায়। বয়স, যৌন অভিমুখীতা, জাতিগততা এবং কার্যকরী সক্ষমতা সম্পর্কিত নিয়মগুলোর প্রতি মনোযোগ দিন। (Integrate representation issues when developing BCC materials, reviewing text, pictures/ images/illustration to identify the gender norms communicating by the materials and to also pay attention to norms regarding age, sexual orientation, ethnicity and functional ability)

বাস্তবায়ন এবং জবাবদিহিতা

BRAC এবং BRAC-এর প্রতিষ্ঠান, প্রোগ্রাম, প্রকল্প, বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট, এবং উদ্যোগগুলোর প্রত্যেকটি স্টাফ জেন্ডার পলিসির সফল বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহিতা রয়েছে। প্রতিটি সুপারভাইজারের অধীনে টিমগুলো লিঙ্গ মূলধারায়ন নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্বে থাকবে।

BRAC এবং BRAC-এর প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্টাফকে লিঙ্গ নীতি এবং এর বাস্তবায়নের সাথে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হতে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী, এই ডকুমেন্টে উল্লিখিত যেকোনো আইটেমে বৈচিত্র্যের অভাবের কারণের ডকুমেন্ট বা প্রকাশ করতে হবে, যেন বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার

জন্য তা পর্যালোচনা করা যায় এবং অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখা যায়।

ব্র্যাকের জেন্ডার পলিসির গুরুত্বপূর্ণ কিছু টার্মের ডেফিনেশন

Gender Equality: Gender equality entails the concept that all human beings, both men, women and other gender identities, are free to develop their personal abilities and make choices without the limitations set by stereotypes, rigid gender roles, or prejudices. Gender equality means that the different behaviours, aspirations and needs of women men and other gender identities are considered, valued and favoured equally. It does not mean that women men and other gender identity have to become the same, but that their rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male or female. Gender Equality is the ultimate goal in sustainable development

লিঙ্গ সমতা: লিঙ্গ সমতা এমন একটি ধারণা যা বোঝায় যে সমস্ত মানব (beings), পুরুষ, নারী এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ধারী, তাদের ব্যক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়ন ও নির্বাচন করার স্বাধীনতা রাখে কোনো স্টেরিওটাইপ, কঠোর লিঙ্গ ভূমিকা, বা পক্ষপাতিত্বের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই। লিঙ্গ সমতা মানে হচ্ছে নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ধারীদের বিভিন্ন আচরণ, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনগুলো সমানভাবে বিবেচনা, মূল্যায়ন এবং সমর্থন করা হয়। এর মানে নয় যে নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ধারীকে একই হতে হবে, বরং তাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং সুযোগগুলো জন্মসূত্রে পুরুষ বা নারী হওয়ার ওপর নির্ভর করবে না। লিঙ্গ সমতা হলো টেকসই উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

Gender diversity is an umbrella term that is used to describe gender identities that demonstrate a diversity of expression beyond the binary framework. For many gender diverse people, the concept of binary gender – having to choose to express yourself as male or female – is constraining.(Gender Rights Org.)

লিঙ্গ বৈচিত্র্য: লিঙ্গ বৈচিত্র্য একটি ছাতা শব্দ যা জেন্ডার পরিচয়গুলোর বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় যা বাইনারি কাঠামোর বাইরে প্রকাশের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।

অনেক লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষের জন্য, বাইনারি লিঙ্গের ধারণা—পুরুষ বা নারী হিসেবে প্রকাশ করতে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

Intersectionality: Awareness of all forms of discrimination combined and simultaneously experienced by women. This theory asserts that it is necessary to examine how the many forms of discrimination based on ethnicity, gender, religion, nationality, sexual orientation, social class or disability interact to fully understand the experiences of women. All women are therefore not equal.(Adapted from CECI/Uniterra, Key Concepts for Equality Between Women and Men) .

ইন্টারসেকশনালিটি: সমস্ত ধরনের বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা যা নারী দ্বারা একসাথে এবং সমসাময়িকভাবে অভিজ্ঞ হয়। এই তত্ত্বটি জোর দেয় যে—জাতি, লিঙ্গ (Gender), ধর্ম, জাতীয়তা, যৌন অভিমুখিতা (sexual orientation, যার মধ্যে সমকামিতা রয়েছে), সামাজিক শ্রেণী বা অক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য কিভাবে একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন, যাতে নারীদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায়। সব নারী সমান নয়।

ব্র্যাকের জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের কিছু দৃষ্টান্ত

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ ২০১২ ঘোষণা করেন যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি বাস্তবায়ন করা তার জীবনের একটি অসমাপ্ত এজেন্ডা (unfinished agendas of his life)। জেন্ডার পলিসির বাস্তবায়ন যেন নিশ্চিত হয় সেজন্য তিনি আরেকটি প্রতিষ্ঠান (Gender Justice and Diversity, GJD) তৈরী করেছেন। এই পলিসির মাধ্যমেই ব্র্যাকের সব প্রতিষ্ঠানে সেই জার্মানীর হাইরিখস উলরিখসের পায়ুসঙ্গম অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

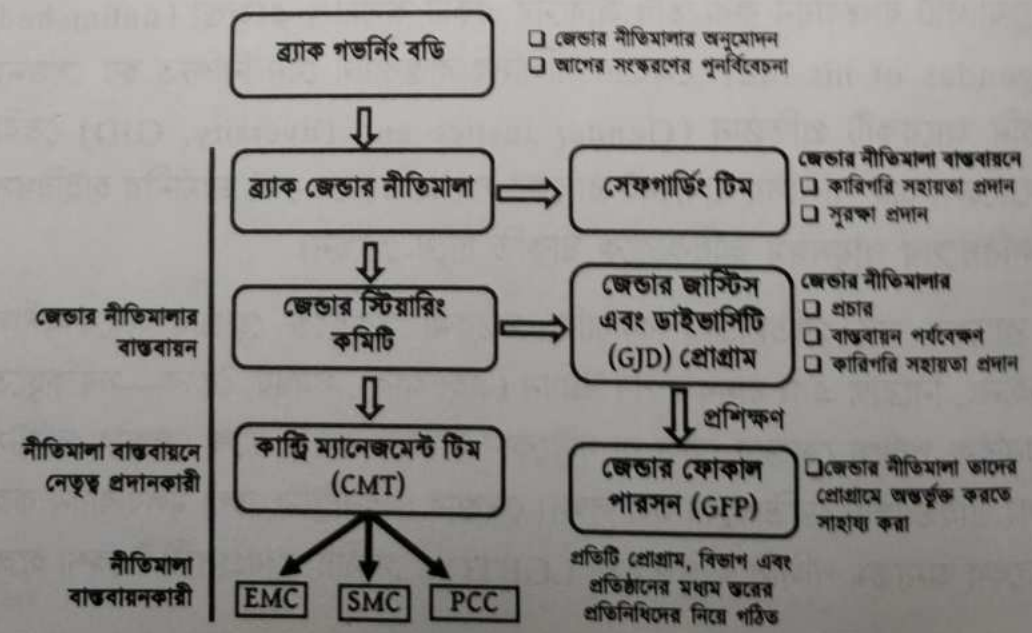
ব্র্যাকের সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি, মাঠকর্মী সবাইকে জেন্ডার সংবেদনশীল ট্রেইনিং, নিয়োগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন (এইচআর), সমন্বয়, বৈঠক—সবকিছুতে আনবিক পর্যায়ে জেন্ডার লেন্স বা দৃষ্টিকোণ নিশ্চিত করাই হচ্ছে জেন্ডার জাস্টিস এবং ডাইভার্সিটি ডিভিশনের মূল লক্ষ্য। জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং তথা মূলধারায়ন করা ব্র্যাকের অন্যতম পলিসি'র অন্তর্গত। LGBTQ+ গোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হচ্ছে

জেন্ডার নিরপেক্ষ বিশ্ব বানানো যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত নারী-পুরুষের সীমাকে উঠিয়ে দেয়া হবে। সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের জেন্ডার রোল গুড়িয়ে দিতে সবকিছুকে জেন্ডার ট্রান্সফর্মেটিভ এপ্রোচে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। জন্মগত নারী-পুরুষ মুখ্য নয়, সবকিছু আসলে সামাজিক/মনস্তাতিকভাবে নির্মাণ করা। এটা অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া, কিন্তু আল্টিমেইট লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করাই আছে। যৌনতার আলাপ এতদিন ছিল প্রাইভেট, এখন সেটা জনপরিসরে স্বাভাবিক করা হচ্ছে যার মাধ্যমে সমাজে ফাহেসার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করে সমকামিতা বান্ধব বিশ্ব গড়ে তোলা।

১. ব্র্যাকের এইচআর (HR) নীতিমালা LGBTQ+ বান্ধব

ইনক্লুসিভ (অন্তর্ভুক্তি) এবং বৈচিত্র্যতা(ডাইভার্সিটি) ধারণা LGBTQ+ অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সহজ কথায়, সবার সমান সুযোগ, যার মধ্য LGBTQ+রাও রয়েছে। আলাদা করে LGBTQ+ পরিভাষা ব্যবহার করা দরকার নেই। পশ্চিমা বিশ্বে DEI (Diversity, Equality and Inclusiveness) কনসেপ্ট চালু করা হয়েছে LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির জন্য। সমকামিতা এবং হোমোসেক্সুয়ালিটি শব্দগুলো হাজার হাজার ধরে সমাজে নেতিবাচক হিসেবে পরিচিত, তাই অন্যভাবে তা প্রকাশ করা হয়। ব্র্যাকের ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটের- *What does diversity mean at BRAC and how do we value it?* শিরোনামে লেখা রয়েছে[৭]—

অন্তর্ভুক্তি (ইনক্লুসিভ) ব্র্যাকের চারটি মূল সাংগঠনিক মূল্যবোধের একটি, যা প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গের মূলধারায়ন (Gender mainstreaming) এবং



বৈচিত্র্য রক্ষা (maintaining diversity) করাকে আমাদের (ব্র্যাকের) সাংগঠনিক অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মৌলিক নীতির ওপর যে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সম্ভাবনা আছে এবং কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হয়। কর্মক্ষেত্রে ব্র্যাক বিশেষভাবে নিশ্চিত করে যে কেউ জাতি, লিঙ্গ (জেন্ডার), ধর্ম, সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি, সক্ষমতা বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের সম্মুখীন না হয়।

বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি—

* বৈচিত্র্যময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাজের সংস্কৃতি গড়ে তোলার মানসিকতা ব্র্যাকের মূল নীতির সাথে গভীরভাবে জড়িত (Fostering a diverse and inclusive work culture is ingrained in BRAC's DNA)। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় পটভূমি থেকে আগত আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

* একটি ন্যায্য ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মক্ষেত্র বজায় রাখার লক্ষ্যে, অফিসের পরিবেশে কোনো ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় না এবং কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুভূতির জন্য প্রার্থনার স্থান বরাদ্দ করা হয় না। কর্মক্ষেত্রে সব কর্মী তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে নামাজ পড়তে পারেন।

* অফিসের ক্যাফেটেরিয়াগুলোতে এমন কোনো খাবার পরিবেশন করা হয় না যা কোনো কর্মীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে বা তাদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারে (নোট-গরুর মাংস নিষিদ্ধ)।

* কোনো ব্যক্তির যৌনতা বা যৌন পরিচয় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বা কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। ব্র্যাক চেষ্টা করে যাতে ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায় নিজেকে সংস্থার অংশ হিসেবে স্বাগত জানায়।

২. ব্র্যাক ব্যাংক: শতভাগ সমকামিতা-বান্ধব

ব্র্যাক ব্যাংকের ওয়েবসাইট অনুযায়ী (Towards Equitable society)[৮]

> 'ব্র্যাক ব্যাংক একটি বৈচিত্র্যময়, সমতাভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য চেষ্টা করে, যা দেখায় যে প্রতিষ্ঠানটি নতুন

ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি উন্মুক্ত। এটি কর্মীদের সন্তুষ্টি বাড়ায় এবং তাদের আনুগত্যকে শক্তিশালী করে। কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি (DEI- Diversity, Equality and Inclusion, অর্থাৎ সমকামিতা বান্ধব) চর্চার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে, ব্র্যাক ব্যাংক আমেরিকান আর্থিক প্রতিষ্ঠান জে.পি. মরগান চেজ অ্যান্ড কো.-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'ব্যাংকগুলোতে বৈচিত্র্য, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি'শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে। ব্র্যাক ব্যাংক বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক, যারা সক্রিয়ভাবে ট্রান্সজেন্ডার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছে।'

৩. ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপ

আলোচিত ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি হোচিমিন ইসলাম এবং তাসনুভা আনান শিশিরকে পাবলিক হেলথ অনুষদে এমপিএইচ কোর্সে স্কলারশীপ দেয়। ব্র্যাকের LGBTQ+ রিসার্চ সেন্টারের (The Center of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights, CGSRHR) অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর এই বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেন, যেখানে জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের কথা রয়েছে। সেই সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ অনুবাদ করে উপস্থাপন করলাম। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেটির অংশ বিশেষ তুলে ধরছি[৯]।

প্রশ্ন- অনুগ্রহ করে বলুন, কীভাবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।


The Daily Star
https://www.thedailystar.net › news · Translate this page
Brac Bank employs transgender people
Oct 4, 2021 — Brac **Bank** has widened its workplace diversity by introducing employment opportunities for the country's **transgender** and physically ...

Dhakatimes24
https://www.dhakatimes24.com › ক · Translate this page
কর্মীদের জেন্ডার সচেতনতায় ব্র্যাক ব্যাংকের আয়োজন
Apr 7, 2021 — অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী **ব্র্যাক ব্যাংক** কর্মীদের সঙ্গে তাসনুভা তার জীবনের উত্থান-পতন, বাংলাদেশের অন্যান্য **ট্রান্সজেন্ডার** ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের অবস্থা এবং কীভাবে তাদেরকে ...

জবাব- আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্য এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য অবদানকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করি, যা তারা শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসে। আমাদের শিক্ষকেরা শ্রেণিকক্ষে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল পাঠদানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর ফলে আমরা বহুসাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং অন্তর্ভুক্তি তৈরি করতে পারি, যা গ্রহণযোগ্যতাকে উৎসাহিত করে। আমাদের স্কুলে যে কোনো ধরনের বৈষম্য এবং হয়রানির বিরুদ্ধে কঠোর নীতি রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে আমাদের শিক্ষার্থী এবং সহকর্মীদের অধিকার রক্ষা করা হয়, বিশেষ করে তাদের জন্য যাদের লিঙ্গ পরিচয় এবং প্রকাশ প্রচলিত সামাজিক মানদণ্ডের সাথে মেলে না। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি যাতে আমাদের শ্রেণিকক্ষ সত্যিকার অর্থে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ হয়, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিরাপদ বোধ করে এবং নিজেকে সেই পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মনে করে।

প্রশ্ন- আপনি কেন ট্রান্সজেন্ডার নারীদের জন্য বৃত্তির সুযোগ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? আপনি কীভাবে মনে করেন এটি সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব ফেলবে?

জবাব- ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ (ব্র্যাক পাবলিক হেলথ স্কুল) বাংলাদেশে প্রান্তিক (নোট-LGBTQ+ অবধারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত) ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে একটি সফল রেকর্ড ধরে রেখেছে। আমাদের ডিন, অধ্যাপক সাবিনা ফাইজ রশিদ, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লিঙ্গ ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (এসআরএইচআর, অর্থাৎ যৌনশিক্ষা যেখানে সমকামী অধিকারের বিষয় অবিচ্ছেদ্য অংশ) সংক্রান্ত শিক্ষায় বা গবেষণা/আদালতে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের স্কুলে, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দ্য সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রেপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (সিজিএসআরএইচআর)' রয়েছে, যার লক্ষ্য হলো একটি ক্ষমতায়িত বাংলাদেশ তৈরি করা, যেখানে লিঙ্গ ও এসআরএইচআর সম্পর্কিত বৈষম্য দূর করা হয়েছে (অর্থাৎ সমকামিতা বান্ধব বাংলাদেশ)।

সেন্টার থেকে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে আসছি, বাংলাদেশে এসআরএইচআর (SRHR)-এর একটি বিস্তৃত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বোঝাপড়া প্রচারের জন্য, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী এবং যুবকদের ক্ষমতায়নে মনোনিবেশ করে।

মানসম্পন্ন শিক্ষা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করতে সাহায্য করে, যা

বৈষম্যমূলক মনোভাব পরিবর্তনে সহায়ক। আমরা বিশ্বাস করি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রসার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিক অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান ধারণার দিকে নিয়ে যায়।

এই বছর আমাদের এমপিএইচ শ্রেণীতে তাসনুভা আনান এবং হোচিমিন ইসলাম, দুজন ট্রান্স নারী আছেন। দুজনই আবেদন করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছেন এবং তাদের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করেছেন। হোচিমিন 'আমেনা আজফার ও হুরমাতুন্নেসা রব বৃত্তি' পেয়েছেন, যা মেধাবী এবং সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত নারী আবেদনকারীদের প্রদান করা হয়। তার নার্সিং পটভূমি রয়েছে এবং কোভিড সংকটের সময় একজন সম্মুখ সারির কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন, (আগের পরিচ্ছদে আলোকপাত করেছিলাম ব্র্যাকের ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি বানানোর প্রকল্প) যা তার জন্য বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল।

সম্প্রতি আমরা দিল্লিভিত্তিক সংগঠন সিআরইএ-(সমকামী অধিকার সংগঠন) এর সাথে যৌথভাবে "লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় কণ্ঠ ও সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" (এটা সমকামিতা সংক্রান্ত) শীর্ষক দুই বছরব্যাপী একটি অ্যাডভোকেসি প্রকল্পে কাজ করছি, যার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা কমানো।

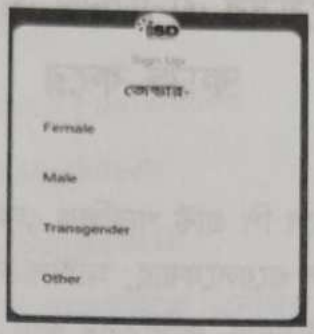
এই প্রকল্পের অধীনে, আমরা একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছি যেখানে ১৩ জন ফেলোকে বিভিন্ন প্রকল্পে বৃত্তি প্রদান করেছি, যেমন লিঙ্গের মিডিয়া উপস্থাপনা, ধর্ষণ সংস্কৃতি, মানসিক স্বাস্থ্য ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, LGBTQ+ ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা, ইন্টারসেক্স এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বাস্তবতা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং আইন, গার্হস্থ্য সহিংসতা ইত্যাদি।'

৪। ব্র্যাকের সব ফর্ম পরিবর্তন, সমকামিতার প্রতীক ব্যবহার

পলিসিগতভাবে ব্র্যাকের সব প্রতিষ্ঠান সমকামিতা বান্ধব। ২০২৪ সালের শুরুতে আড়ং শিশুদের পোষাকে সমকামিতা প্রতীক রেইনবো ব্যবহার করার খবর ভাইরাল হয়, ব্র্যাক ব্যাংকের এটিএম মেশিনের ছবিতে রেইনবো সিম্বল নিয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা হয়। সম্প্রতি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর অফিসের দরজায় সমকামীদের সিম্বল ব্যবহার করেন, যার মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সবার সমান সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের আইন এবং সমাজের মূল্যবোধ

বিরোধী জেনেও ব্র্যাক প্রকাশ্যে সমকামী অধিকার প্রতিষ্ঠায় গত ২০ বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না ব্র্যাক একটি নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যারা পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে?







References

1. ShineTheme. Vision, Mission and Values. https://www.brac.net/vision-mission-values.
2. About Us – BRAC International. https://bracinternational.org/aboutus/.
3. International Conference on Population and Development. https://www.unfpa.org/icpd.
4. LGBTI Milestones at the United Nations. UN LGBTI CORE GROUP https://unlgbticoregroup.org/home/lgbti-milestones-at-the-united-nations/.
5. Gender-policy-2020.pdf.
6. Channel24. ব্র্যাকের সমতন্ত্রের পোস্টারে এলজিবিটির প্রতীক, সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের. Channel 24 http://surl.li/rayed.
7. Islam, S. BRAC Careers. BRAC Careers https://careers.brac.net/.
8. BRAC Bank. https://www.bracbank.com/en/csr.
9. Today, I. C. E. Farhana Alam on providing scholarships to transgender (TG) women and the book Umbrella Stigma. ICE Today http://icetoday.net/2021/03/farhana-alam-on-providing-scholarships-to-transgender-tg-women-and-the-book-umbrella-stigma/ (2021).

বাংলাদেশে যেসব এনজিও এলজিবিটি নিয়ে কাজ করে

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলের নেতৃত্বে ব্র্যাকের বিভিন্ন সংস্থা, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, আইসিডিডিআরবি প্রায় ২০ বছর ধরে সমকামী অধিকার নিয়ে গবেষণা, এক্টিভিসম এবং লবিং করে আসছে। তাছাড়া আরো অনেক ছোট এনজিও এনজিও সমকামিতা মিশনের জড়িত। মোটাদাগে, পশ্চিমা অর্থায়নে প্রায় সব প্রজেক্টে (পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা) এলজিবিটি বিষয় থাকা স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে যে এনজিও সমকামী অধিকার আদায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ্যভাবে জড়িত সেগুলোর অন্যতম (এই নামগুলোর বেশিরভাগ আগের পরিচ্ছদগুলো আলোচনায় এসেছে)—

১. BLAST (Bangladesh Legal Assistant Trust)

২. Narripokkho

৩. Oboyob (*বয়েজ অব বাংলাদেশ* এই নতুন নামে কাজ করছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে)

৪. SERAC-Bangladesh

৫. Somporker Noya Shetu

৬. Youth Policy Forum

৭. RHSTEP

৮. Family Planning Association of Bangladesh (FPAB),

৯. United for Body Rights (UBR) Alliance

১০. Bangladesh Mahila Parishad

১১. Dance4Life

১২. Arrow

১৩. HiVOS

১৪. TransEnd

১৫. Jago Foundation

১৬. Manusher Jonno Foundation

১৭. Volunteers Bangladesh

১৮. Light House Bangladesh

এছাড়া এলজিবিটি'র আন্তর্জাতিক এনজিও নেটওয়ার্ক ইলগার সদস্য হয়েছে বাংলাদেশী কিছু এনজিও। ইলগার ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে[১]-

Bangladesh

- Asexual Pride Asia
- Badhan Hijra Sangha
- Bandhu Social Welfare Society
- Boys of Bangladesh
- Inclusive Bangladesh
- Noboprobhaat
- Prantoz Foundation
- Rainbow Nari O Shishu Kallyan Foundation
- Shacheton Hijra Odhikar Jubo Shangha
- Shawprova
- Somporker Noya Setu
- Vlountary Organization for the Needy
- Women's Window
- 2 anonymous organisations

ব্লাস্ট (বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এসিস্টেন্স ট্রাস্ট)

এই এনজিও গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইনি সহায়তা প্রদান এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয়। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং সমকামী বিরোধী আইন বাতিলের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ২০০৭ সাল থেকে ব্র্যাকের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা, সেমিনার ও মিটিংয়ে ব্লাস্টের নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি 'বয়েস অব বাংলাদেশের' নারী সমকামী কমিক ম্যাগাজিন ধী এবং প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন রূপবান-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমকামী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পূর্বের অধ্যায়ে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং রেফারেন্স সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সমকামী বিরোধী অপরাধ আইন (ধারা ৩৭৭) বাতিলের ক্ষেত্রে ব্লাস্ট ব্র্যাকের অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। ব্যারিস্টার সারা হোসেনের পারিবারিক প্রভাব, বিশেষ করে সংবিধান রচনায় তার পরিবারের ভূমিকা এবং তার আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি, এই প্রচেষ্টার সামাজিক ও নীতিগত অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। উন্নয়নশীল দেশে পারিবারিক ইমেজ লবিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST), খ্রিস্টান এইড বাংলাদেশ, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, নাগরিক উদ্যোগ এবং ওয়েব ফাউন্ডেশন যৌথভাবে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। এই গবেষণায় দলিত, সমতল ভূমির নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অধিকার ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ট্রান্সজেন্ডার ব্যতিরেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের বিষয়ে সাধারণত কোনো মতবিরোধ দেখা যায় না। তবে পশ্চিমা অর্থায়নের প্রকল্পগুলোতে সমকামী অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য পায় এবং একে প্রায়ই দলিত, সমতল ভূমির নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকার উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন ও নীতিমালার আলোকে বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করা, যেখানে কৌশলে এলজিবিটি অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন বাতিল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন ও নীতিমালা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা[২]

২০২৩ সালের ৩০ জুলাই, ঢাকা শহরের আগারগাঁওয়ের ট্যুরিজম কর্পোরেশনের কনফারেন্স রুমে '*ইক্যুয়ালিটি* ও ইনক্লুশন: বাংলাদেশের আইন ও নীতিমালার পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। খ্রিষ্টান এইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায়, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST) মার্জিনালাইজড জনগণের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক প্রবণতা প্রদর্শনকারী আইন ও নীতিমালার বিস্তৃত বিশ্লেষণ পরিচালনা করেছে। বক্তারা আইন ও নীতিমালার সমতা নিশ্চিত করার জন্য তাদের সামঞ্জস্য মূল্যায়ন করেন, যা লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি বা বর্ণ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে। বৈষম্যমূলক মনোভাব ও অসম সুরক্ষা ব্যবস্থার কারণে, দলিত, সমতল ভূমির নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, হিজরা ও ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের মতো মার্জিনালাইজড জনগণ অধিক বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। মার্জিনালাইজড সম্প্রদায়ের আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে, বাংলাদেশের বর্তমান আইন অমিল চিহ্নিত করতে হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ও আইনগত সহায়তা বিশেষভাবে সরকারী সেবায় তাদের প্রবেশাধিকার ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ অতিথি মাউরিজিও চিয়ান তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের সরকারের সময়োপযোগী আইন ও নীতিমালা সংস্কারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সকল বৈষম্যবিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

গবেষণাপত্রের সহ-সম্পাদক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, দলিত, হিজরা, ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে যাতে পাসপোর্ট ও মেডিক্যাল জরুরি সেবা ব্যাহত না হয়। এসব ক্ষেত্রে আইন পুনর্বিবেচনা করে অপ্রচলিত শর্তগুলোর পরিমাণ কমাতে এবং তাদের কল্যাণ উন্নত করতে হবে। একইসাথে, সকল নাগরিকের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত বৈষম্য মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে।

ইভেন্টের প্যানেলিস্ট এবং বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

(BANDHU) নির্বাহী পরিচালক সালেহ আহমেদ বলেন, প্রস্তাবিত ট্রান্সজেন্ডার বিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুরক্ষা প্রদান করে, যেমন সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, ভোট দেওয়ার অধিকার, ধর্ষণ আইন, সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি এবং কর্মস্থলে বৈষম্য। এছাড়া, আইসিটি মন্ত্রণালয় তাদের বিশেষজ্ঞ শ্রমে রূপান্তরের জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন আইন প্রণীত না হলে আজকের আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না।

আরেক প্যানেল আলোচক সাইমি ওয়াদুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক, বলেন যে আমরা যেসব গ্রুপকে বৈষম্যবিরোধী আইন বা নীতিমালার মাধ্যমে সুরক্ষিত করতে চাই, তারা এককরকম নয়—তাই তাদের আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। যৌন সহিংসতা বা যৌন হয়রানির বিষয়গুলো নিয়ে আইনগুলো শুধু নারীদের জন্য নয়, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্যও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্যানেলিস্ট রুবায়েত ফেরদৌস, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), সিনিয়র সহকারী বিচারক, ও জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা, বলেন, সরকার থেকে আইনগত সহায়তা পাওয়া প্রায় ৯ লাখ ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৪৪ জন ট্রান্সজেন্ডার।

গবেষণা পত্রের সহ-সম্পাদক ও ব্লাস্টের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র কাউন্সেল সারাহ হোসেন বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় ১৯৭২ সালে মৌলিক মানবাধিকারের উল্লেখ ছিল। অন্য কথায়, সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলোর সাথে সমতার অধিকার বোঝার প্রয়োজন। সমতা এবং বৈষম্য নির্মূল করতে, আমরা শুধুমাত্র সংবিধানের ব্যাখ্যা নয়, আন্তর্জাতিক আইনও ব্যবহার করতে পারি। মার্জিনালাইজড সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, এবং সরকারি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে নাগরিকের মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে হবে। মার্জিনালাইজড গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ঘৃণাবোধপূর্ণ বক্তব্য নিন্দনীয় এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অন্যদিকে, আমাদের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে মার্জিনালাইজড ও দরিদ্র মানুষ, যেমন কিশোর-কিশোরীরা, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন সহ্য করতে হয়।

নাগরিক উদযোগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির হোসেন সমাপনী বক্তব্যে বলেন, 'আজকের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিবেদনটি মাধ্যমে আমরা

আইনের শক্তি বৃদ্ধি করার আশা করি।' রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এই সংখ্যালঘুদের নিয়ে কথা বলেছেন। কিছু অগ্রগতি হলেও, এই মার্জিনালাইজড গোষ্ঠীগুলোর আরো বেশি অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

ড. সিনথিয়া ফরিদ এবং আহমেদ ইব্রাহিম গবেষণা প্রতিবেদনের মূল findings উপস্থাপন করেন যা দলিত, সমতল ভূমির নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানিক কাঠামো এবং আইন ও নীতিমালার সামঞ্জস্য বিশ্লেষণ করে। খ্রিষ্টান এইড বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন দেশের পরিচালক ড. খান্দকার গোলাম মওজ্জেমের তত্ত্বাবধানে, নুজহাত জেবিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

'ইক্যুয়ালিটি ও ইনক্লুশন: বাংলাদেশের আইন ও নীতিমালার পর্যালোচনা' সম্পাদক ছিলেন ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, সারাহ হোসেন এবং ড. ভীনা দে কোস্টা। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন আব্দুল্লাহ তিতির, আহমেদ ইব্রাহিম, সিনথিয়া ফরিদ, রেজাউল করিম সিদ্দিকী এবং তাজুল ইসলাম।'

লাইট হাউজ বাংলাদেশ

১৯৮৮ সালে জন্ম নেয়া এই এনজিও এমএসএম/সমকামী (Man sex with man) নিয়ে সারা বাংলাদেশে কাজ করছে। লাইট হাউজের ওয়েবসাইট অনুসারে, বর্তমানে ২৪ জেলা এবং ৭ টি বিভাগব্যাপী প্রতিষ্ঠানটির ৬৮টি মাঠ পর্যায়ে অফিস রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও এই এনজিওটি কাজ করে।

References

1. Member organisations. ILGA World https://ilga.org/member-organisations/.

2. Sayed. Press Release: Measures to Abolish Existing Discriminatory Laws Applied against Marginalized Communities and Adoption of Inclusive Laws & Policies is Essential. BLAST https://blast.org.bd/2023/07/30/5654/ (2023).

সমকামিতায় ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপরাধ প্রবনতা

এইডস: এখনো সমকামীদের রোগ

এইচআইভি/এইডস মহামারীর মাধ্যমে সমকামিতা জনপরিসরে জানায় দেয়। শুরুতে এইডসের (Acquired Immunodeficiency Syndrome) নাম ছিল গে ডিজিজ (Gay-Related Immune Deficiency)। এখনো এটিকে প্রধানত পায়ুসঙ্গমকারীদের রোগ হিসেবেই দেখা হয়, যদিও এটি কিছু অসমকামীদেরও হতে পারে, বিশেষ করে যারা মাদকাসক্ত একই সূচ ব্যবহার করে, অথবা সরাসরি রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এবং এইডস রোগীর সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে।

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে তাদের দেশে ৩৮,০০০ জন মানুষের শরীরে এইচআইভি জীবাণু শনাক্ত হয়। এর মধ্যে ২১,৪০০ জন এমএসএম (Man Sex with Man, যারা গে এবং বাইসেক্সুয়াল), অর্থাৎ ৬৭% পায়ুসঙ্গমকারী[১]। রিলেটিভ রিস্ক (Relative Risk) হিসেব করলে দেখা যায়, অসমকামীদের তুলনায় সমকামীদের এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি ৮৩-১০১ গুণ বেশি।

শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও এখন এটি স্পষ্ট যে এইডসের অতিরিক্ত ভয় সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী সমকামী অধিকারের প্রচার। এইডস প্রতিরোধের আড়ালে সারাবিশ্বে সমকামী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়, যা বিভিন্ন দেশের সরকারের সহায়তায় পরিচালিত হয়। এখানে জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক 'ক্লাব জড়িত (অজ্ঞতার কারণে আমাদের দেশের মানুষ এই সংস্থাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে)। এই জাতিসংঘের ইউনিসেফ একদিকে শিশুদের পড়াশোনা, পুষ্টি নিয়ে কাজ করে, আবার অন্যদিকে কমপ্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশনের ব্যানারে সমকামিতার সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিশুদের সমকামী হতে পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করে! সাপ হয়ে কামড়ায়, ওঝা হয়ে চিকিৎসা করে!

মাঙ্কিপক্স: সমকামীদের নতুন রোগ

২০২২ সালে মাঙ্কিপক্সের (যা এমপক্স নামে পরিচিত) মহামারি প্রথমবারের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, বিশ্বব্যাপী মাঙ্কিপক্সের ৯৪,৭০৭টি কেইস এবং ১৮১টি মৃত্যুর ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের CDC অনুযায়ী, মোট কেসের ৩৪% (৩২,০৬৩টি) এবং বৈশ্বিক মৃত্যুর ৩২% (৫৮টি) যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে। মাঙ্কিপক্স সাধারণত শ্বাসযন্ত্রের ড্রপলেট এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে, ২০২২ সালের প্রাদুর্ভাবের সময়, সমকামী পুরুষদের মধ্যে অধিক হারে মলদ্বার ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে সংক্রমণ দেখা গেছে, যা যৌন সংক্রমণকেই প্রধান রূপে নির্দেশ করে। এ কারণে, মাঙ্কিপক্সও এইচআইভি/এইডসের মতো সমকামীদের রোগ[২]।

কিছু গবেষণা নিবন্ধ এবং জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষণে রিপোর্ট করা হয়েছে যে, মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাবের সময় বেশিরভাগ কেস সমকামী পুরুষদের (MSM) নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় সংক্রমণের গতিবিদ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করা হয়েছে যে ৯৮% কেইস সমকামী পুরুষদের মধ্যে ছিল[৩]।

অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি

* একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সমকামীদের ৬৭.৫ শতাংশ পরজীবী ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়, যেখানে বিষমকামীদের মধ্যে এই হার ১৬ শতাংশ।[৪]
* সমকামী পুরুষদের পায়ু-ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেশি[৫]।
* সমকামী পুরুষদের মধ্যে ৩৯ শতাংশ EBV ভাইরাস আছে। আর বিষমকামীদের মধ্যে এই হার ৬ শতাংশ[৬]।

ডায়াবেটিসের বেশী ঝুঁকিতে LGBTQ+রা

লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, বা কুইয়ার (LGBTQ+) ব্যক্তিদের টাইপ-[২] ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রায় ১০% ডায়াবেটিস আছে, কিন্তু গে বা বাইসেক্সুয়াল পুরুষদের মধ্যে ২৫% এবং সমকামী বা বাইসেক্সুয়াল নারীদের মধ্যে প্রায় ১৪% এ রোগে আক্রান্ত[৭]।

আরেকটি স্টাডি অনুসারে, সমকামী নারীদের মধ্যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২৭% বেশী[৮]।

ক্যান্সার

LGBTQ+ মানুষদের প্রায় সব ধরনের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী[৯]।

অ্যানাল ক্যান্সার- পায়ুপথে ক্যান্সারের ঝুঁকির মূলে রয়েছে প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)। সমকামীদের পায়ুপথের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি ১৭ গুণ বেশী [১০]

ব্রেস্ট ক্যান্সার: সমকামী এবং বাইসেক্সুয়াল নারীদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের হার হেটেরোসেক্সুয়াল নারীদের তুলনায় বেশি।

ওরাল এবং অরোফেরেঞ্জিয়াল ক্যান্সার: HPV-সম্পর্কিত মৌখিক ক্যান্সার সমকামীদের ঝুঁকি অনেক বেশী

হার্টের রোগ

সমকামীদের লাইফস্টাইলের কারণে হার্টের রোগের ঝুঁকিও বেশী। এক সিস্টেম্যাটিক মেটা এনালাইসিস স্টাডিতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ (নারী-পুরুষ) তুলনায় ট্রান্সজেন্ডারদের হার্টের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৪০% বেশী[১১]। European Journal of Endocrinology নামক বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্যানুসারে হরমোন চিকিৎসা নেয়া ট্রান্সজেন্ডার নারীর ৯৫% এর হৃদরোগের ঝুঁকি রয়েছে। ৫ বছর মেয়াদী ২৬৭১ ট্রান্সজেন্ডার নারীদের নিয়ে ডেনমার্কে এই স্টাডিটি পরিচালিত হয়[১২]। পিউবার্টি ব্লকার এবং শরীরে বিভিন্ন ধরণের সার্জারীর কারণে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধাত্ববরণসহ বিকলাঙ্গ হয় তারা।

মাদক দ্রব্য ব্যবহার

সমকামীদের মাদকসেবী হওয়ার হার বেশী[১৩]

* ধূমপান- সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডাররা বিষমকামীদের চেয়ে ২০০% বেশি তামাক ব্যবহার করে।
* অ্যালকোহল- LGBTQ+ সম্প্রদায়ের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ লোক

মাঝারি থেকে তীব্র অ্যালকোহলের ওপরে নির্ভরশীল।

* মারিজুয়ানা- স্বাভাবিক যৌনতার পুরুষের চাইতে সমকামী পুরুষদের মারিজুয়ানা ব্যবহারের সম্ভাবনা সাড়ে তিনগুণ বেশি।
* Amphetamines- LGBTQ+ সম্প্রদায়ের লোকদের এ্যাম্ফেটামাইনস ব্যবহারের সম্ভাবনা ১২.২ গুণ বেশি।
* হিরোইন- LGBTQ+ মানুষদের হেরোইন ব্যবহার সম্ভাবনা বিষমকামী মানুষদের চেয়ে ৯.৫ গুণ বেশি।
* মেথাম্ফেটামাইন- LGBTQ+ সম্প্রদায়ের লোকদের মেথাম্ফেটামাইন ব্যবহারের সম্ভাবনা চার গুণ বেশি।

২০-৩০ শতাংশ LGBTQ+দের জীবনকালে ড্রাগ নেয়ার সম্ভাবনা বিষমকামীদের চেয়ে ৩ গুণের চাইতে বেশি[১৪]।

সেক্স ক্রাইম/পেডোফেলিয়া (বাল্যকামীতা)

আমেরিকায় ২০২২ সাল থেকে যৌন অপরাধীদের রেজিস্ট্রিতে LGBTQ+দের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সমকামীদের মধ্যে যৌন অপরাধ করার প্রবণতা বেশি। মোট ৯৬৪ জন অপরাধীর মধ্যে ২০ শতাংশ যৌন অপরাধী নিজেকে LGBTQ+ বলে পরিচয় দিয়েছে [১৫]। মনে রাখতে হবে, LGBTQ+দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এত কমসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে রেজিস্ট্রিকৃত অপরাধীদের ২০ শতাংশ LGBTQ+ হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা।

ব্রিটেনের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী- জেলখানায় ১৭৬ জন ট্রান্সজেন্ডার নারীর (জন্মগত পুরুষ) ৭৬ জন যৌন নির্যাতনমূলক অপরাধে জড়িত হয়। এদের ৩৬ জন ধর্ষণ (rape is defined as penetration with penis) এবং ১০ জন ধর্ষণের প্রচেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ ট্রান্স নারীদের ৫৮.৯% যৌন অপরাধে লিপ্ত। অন্যদিকে জন্মগত নারীদের ১৬.৮% যৌন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে ব্রিটেনের কয়েদখানায়[১৬]।

পেডোফেলিয়া

* উনিশটি গবেষণা কাজের মেটা এ্যানালাইসিস (নির্যাস) করে দেখা গেছে যে সমকামী এবং উভকামীদের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন করার সম্ভাবনা ১২-১৬ গুণ বেশি। আবার সমকামী এবং উভকামী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের যৌন নির্যাতন করার সম্ভাবনা ৯০-১০০ গুণ বেশি, এবং শিশু শিক্ষার্থীদেরকে যৌন নির্যাতনের ৮০ শতাংশই সমকামী এবং উভকামী শিক্ষকদের দ্বারা হয়[১৭]।

* সমকামীদের পেডোফাইল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং শিশু নির্যাতনকারীদের ৩৩% LGBTQ+[১৮]

* ৪০০০ পেডোফাইলের (শিশুকামী) ওপর এক বৃহৎ গবেষণা করে দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৩% পেডোফাইল সমকামী এবং আরো অনেকে উভকামী। এই গবেষণায় এটাও দেখে গেছে যে, সমকামী পেডোফাইলদের এই ধরণের অপরাধ পুনরায় করার সম্ভাবনাও বেশি, এবং তাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলাও কঠিন[১৯]।

* যৌন নির্যাতনকারীদের হাতে ভুক্তভোগীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছেলে। ব্রিটিশ জেলখানায় প্রায় ৩০০০ যৌন অপরাধী ছিলো, যাদের মধ্যে মাত্র ১২ জন হচ্ছে নারী। নারী পেডোফাইল খুবই কম। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পেডোফাইলদের ৩৩% হচ্ছে সমকামী[২০]।

* সমকামী এবং উভকামীরা পেডোফাইলদের ৪২%[২১]

* সংবাদপত্রে উঠে আসা শ্লীলতাহানীর প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই শ্লীলতাহানীর ঘটনাগুলোর ৪০-৬০% ঘটেছে সমকামীদের দ্বারা[২২]।

* সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে শিক্ষক পেডোফাইলদের ৫০ শতাংশই হচ্ছে সমকামী[২৩]।

* ৪৫.৮% পেডোফাইল LGBTQ+[২৪]

* সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যেসব পালক পিতামাতা সন্তানদেরকে যৌন নির্যাতন করে তাদের ৬০ শতাংশ সমকামী। আরেকটা গবেষণায় এই হারটা দেখা গেছে ৩৪ শতাংশ[২৫]।

বাছবিচারহীন যৌনতা (Promiscuity)

* গড়পড়তার একজন সমকামী পুরুষ প্রতি বছর ৪ জন সঙ্গী বদলায়। এবং ২৫ শতাংশ সমকামী পুরুষদের প্রতি বছর সঙ্গী প্রয়োজন পড়ে ১৩ জনের বেশি[২৬]।

* ইউরোপে গড়পড়তা একজন মানুষের জীবনকালে সঙ্গী থাকে ৬ জন, আর সমকামীদের সঙ্গী থাকে ৩১ জন। 27173 men and 9,134 women aged 16-59 years from all States and Territories. The overall response rate was 73.1% (69.4% among men and 77.6% among women।

LGBTQ+ বান্ধব পরিবেশেও সমকামীদের আত্মহত্যা প্রবনতা বেশী

যুগ যুগ ধরে সমকামীদের অন্যতম অভিযোগ হলো তাদের অধিকার নিশ্চিত না হওয়ার কারণে তারা বৈষম্যের শিকার হন। এ কারণেই তাদের মধ্যে বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেশি। দাবি করা হয়, তাদের সামাজিকীকরণ করলে এই সমস্যার সমাধান হবে। সমকামীদের আত্মহত্যা ঠেকানোকে লিবারেলরা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে, এবং এর জন্য পৃথিবীর সিস্টেমও পরিবর্তন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, সমকামীদের প্রতি মানবাধিকার নিশ্চিত করা। এখন প্রশ্ন হলো, সমকামিতা-বান্ধব সমাজে তাহলে আত্মহত্যার প্রবণতা কমে যাওয়ার কথা, তাই না? কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কিছু বলে। এই প্রসঙ্গে কিছু গবেষণা লব্ধ তথ্য উপস্থাপন করছি-

* সুইডেন, বিশ্বের অন্যতম LGBTQ+ বান্ধব দেশ। অথচ এখানে বিবাহিত সমকামী পুরুষদের আত্মহত্যার প্রবণতা একজন স্বাভাবিক মানুষের চাইতে ৩ গুণ বেশি। আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়া স্বত্ত্বেও এবং এইচআইভি না থাকলেও তাদের ভেতরে হতাশা কাজ করে বেশি[২৮]।

* বিশ্বের সবচেয়ে LGBTQ+ বান্ধব দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক। এই দেশের সমকামী পুরুষদের আত্মহত্যা প্রবণতা সাধারণ মানুষদের চেয়ে ৮ গুণ বেশি[২৯]।

সামাজিক বৈষম্য কি আত্মহত্যা প্রবণতার জন্য দায়ী

* বলা হয় যে, LGBTQ+ তরুণ-যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা বেশি সামাজিক বৈষম্যের কারণে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ১২০টি আত্মহত্যার ঘটনা বিশ্লেষণ করে এমন একটা ঘটনাও পাওয়া যায়নি যেটার কারণ ছিলো সামাজিক বৈষম্য। কিন্তু তাদের অন্যান্য মানসিক সমস্যা ছিলো[৩০]।

* সমকামীদের মানসিক ভারসাম্যহীনতার পেছনে কারণ হিসেবে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব আংশিকভাবে ভূমিকা রাখে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও তাদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার হার বেশি (Multiple mediation analyses showed that experiences of discrimination, victimization, and social isolation partially explained the sexual orientation disparity in these co-occurring problems)[৩১]।

* সমকামী এবং উভয়কামী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ড্রাগ নেয়ার প্রবণতা বেশি। এই গবেষণায় ১৫৬ জন পুরুষ সমকামী, নারী সমকামী এবং উভকামী (GLB) তরুণের মধ্যে সিগারেট, মদ্যপান এবং গাঁজা সেবনের তিনটি অনুমানকৃত ব্যাখ্যা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ (longitudinal) করা হয়েছে। গবেষণার দুটি অনুমানের বিপরীতে তাদের মাদক ব্যবহার এবং সময়ের সাথে সাথে এটা বেড়ে যাওয়ার সাথে শৈশবে যৌন নির্যাতনের ইতিহাস বা সম্প্রতি সমকামী-সম্পর্কিত চাপমূলক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার সম্পর্ক পাওয়া যায়নি[৩২]।

* ২০২২ সালের একটা মেটা এনালাইসিস থেকে জানা যায় যে, উভকামী এবং সমকামী লোকদের সব ধরণের মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার সম্ভাবনা বিষমকামীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আত্মহত্যাপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে এই ধরণের সমস্যাগুলো কমার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি[৩৩]।

* সমকামী পুরুষদের খাদ্য রোগ (Eating disorder) হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিক পুরুষদের চাইতে ৭-১২ গুণ বেশি এবং সমকামী নারীদের এই সম্ভাবনা স্বাভাবিক নারীদের চাইতে দ্বিগুণ[৩৪]।

ট্রান্সজেন্ডারদের ইতিবাচক চিকিৎসা কি আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে পারে?

লিঙ্গ সংশয় বা জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মানসিক কষ্টে ভোগা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে গত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রান্সজেন্ডার কিশোর-কিশোরীদের জন্য চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে জেন্ডার-নিশ্চিতকরণ (Gender affirming) চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত রিভিউ পেপার ('Current Concerns About Gender-Affirming Therapy in Adolescents') প্রকাশিত হয় Current Sexual Health Reports নামক জার্নালে[৩৫]।

জেন্ডার-নিশ্চিতকরণ চিকিৎসা পদ্ধতি ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে থেকে ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে প্রাপ্তবয়স্ক ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ফলাফল অসন্তোষজনক ছিল। প্রাথমিকভাবে আশা করা হয়েছিল যে জেন্ডার ট্রান্সজিশন কম বয়স থেকে শুরু করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিঙ্গ পরিবর্তন জীবন রক্ষাকারী বলে দাবি করা হলেও, এ সংক্রান্ত বহু গবেষণায় দীর্ঘস্থায়ী মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী এবং শক্তিশালী স্টাডি ডিজাইন করা গবেষণাগুলো প্রাপ্ত ফলাফল দেখা যায় যাচ্ছে যে প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের পরেও আত্মহত্যার উচ্চ ঝুঁকি (High risk) দেখা গেছে।

ট্রান্সজেন্ডার যুবক-যুবতীদের জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করে কিনা সে বিষয়ে গবেষণাগুলো সুস্পষ্ট সুবিধা (বেনিফিট) দেখায়নি। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সেলেন্স (NICE) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সংস্থার পর্যালোচনাগুলো দেখিয়েছে যে, পিউবার্টি ব্লকার এবং ক্রস-হরমোন চিকিৎসা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় সত্যিই সহায়তা করে কিনা তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই। সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং ফ্লোরিডার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষও তাদের নিজস্ব প্রমাণাদি পর্যালোচনার পরে দেখেছেন যে, বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরীর জন্য এই চিকিৎসাগুলোর ঝুঁকি (Risk) সুবিধার (Benefit) চেয়ে বেশি হতে পারে।

সুইডেনে ৩০ বছর ধরে চালিত ট্রান্সজেন্ডার প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে করা বড় একটি স্টাডি অনুসারে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করেনি এমন ব্যক্তিদের তুলনায় লিঙ্গ পরিবর্তন

করা ট্রান্সজেন্ডারদের মাঝে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি (সামগ্রিকভাবে ১৯ গুণ বেশি) এবং নারী-থেকে-পুরুষ হওয়া ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার হার ৪০ গুণ বেশি। LGBTQ+ বান্ধব দেশ সুইডেনে পরিচালিত এসব গবেষণা থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তন চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার হয়তো এতটা সহায়ক নয় যতটা মানুষ আশা করে।

References

1. HIV & AIDS Trends and U.S. Statistics Overview. HIV.gov https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and-trends/statistics.
2. Acharya, A., Kumar, N., Singh, K. & Byrareddy, S. N. Mpox in MSM: Tackling Stigma, Minimizing Risk Factors, Exploring Pathogenesis, and Treatment Approaches. Biomedical Journal 100746 (2024) doi:10.1016/j.bj.2024.100746.
3. Thornhill, J. P. et al. Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries — April–June 2022. New England Journal of Medicine 387, 679–691 (2022).
4. Keystone, J. S., Keystone, D. L. & Proctor, E. M. Intestinal parasitic infections in homosexual men: prevalence, symptoms and factors in transmission. Canadian Medical Association Journal 123, 512 (1980).
5. Six-Month Incidence, Persistence, and Factors Associated With Persistence of Anal Human Papillomavirus in Men: The HPV in Men Study | The Journal of Infectious Diseases | Oxford Academic. https://academic.oup.com/jid/article-abstract/204/11/1711/850478?redirectedFrom=fulltext.
6. van Baarle, D. et al. High prevalence of Epstein-Barr virus type 2 among homosexual men is caused by sexual transmission. J Infect Dis 181, 2045–2049 (2000).
7. CDC. Diabetes and the LGBTQ Community. Diabetes https://www.cdc.gov/diabetes/risk-factors/diabetes-risk-lgbtq.html (2024).
8. Risk of Type 2 Diabetes Among Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Women: Findings From the Nurses' Health Study II | Diabetes Care | American Diabetes Association. https://diabetesjournals.org/care/article/41/7/1448/36435/Risk-of-Type-2-Diabetes-Among-Lesbian-Bisexual-and.
9. Providence, T. N. L. C. N. 11 S. A. S. #377. Cancer Information - National LGBT Cancer Network. https://cancer-network.org/cancer-

information/ (2017).

10. Chidobem, I. et al. Trends in HPV and HPV Vaccine Awareness among Gay and Bisexual Males in the U.S. Vaccines 10, 604 (2022).
11. van Zijverden, L. M., Wiepjes, C. M., van Diemen, J. J. K., Thijs, A. & den Heijer, M. Cardiovascular disease in transgender people: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Endocrinology 190, S13–S24 (2024).
12. Searles, M. Trans women taking hormones 'up to 95 per cent more likely to suffer heart disease'. The Telegraph (2023).
13. LGBTQ+ And Addiction. Addiction Center https://www.addictioncenter.com/addiction/lgbtq/.
14. Mental Health and Addiction in the LGBTQ+ Community | Healthy Life. https://healthyliferecovery.com/mental-health-addiction-in-lgbtq/.
15. thisisloyal.com, L. |. LGBTQ People on Sex Offender Registries in the US. Williams Institute https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/lgbtq-sex-offender-registries/.
16. Evidence and data on transwomens' offending rates. Sex Matters https://sex-matters.org/posts/prisons/evidence-and-data-on-transwomens-offending-rates/ (2020).
17. Homosexual Molestation of Children/Sexual Interaction of Teacher and Pupil | Office of Justice Programs. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/homosexual-molestation-childrensexual-interaction-teacher-and-pupil.
18. Freund, K. & Watson, R. J. The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: An exploratory study. Journal of Sex & Marital Therapy 18, 34–43 (1992).
19. Maletzky, B. M. Factors associated with success and failure in the behavioral and cognitive treatment of sexual offenders. Annals of Sex Research 6, 241–258 (1993).
20. Sexual Offending Against Children: Assessment and Treatment of Male Abusers. (Routledge, London, 1994). doi:10.4324/9780203411773.
21. Elliott, M., Browne, K. & Kilcoyne, J. Child sexual abuse prevention: What offenders tell us. Child Abuse & Neglect 19, 579–594 (1995).
22. Cameron, P. & Cameron, K. What proportion of newspaper stories about child molestation involves homosexuality. Psychol Rep 82, 863–871 (1998).
23. Cameron, P. Do homosexual teachers account for about half of news

stories of molestations of pupils? A Boston Globe replication. Psychol Rep 90, 173–174 (2002).

24. Freund, K., Heasman, G., Racansky, I. G. & Glancy, G. Pedophilia and heterosexuality vs. homosexuality. Journal of Sex & Marital Therapy 10, 193–200 (1984).

25. Cameron, P. Molestations by homosexual foster parents: newspaper accounts vs official records. Psychol Rep 93, 793–802 (2003).

26. (PDF) Evidence for change: findings from the National Gay Men's Sex Survey 1998. https://www.researchgate.net/publication/242778654_Evidence_for_change_findings_from_the_National_Gay_Men's_Sex_Survey_1998.

27. Grulich, A. E., de Visser, R. O., Smith, A. M. A., Rissel, C. E. & Richters, J. Sex in Australia: homosexual experience and recent homosexual encounters. Aust N Z J Public Health 27, 155–163 (2003).

28. Björkenstam, C., Andersson, G., Dalman, C., Cochran, S. & Kosidou, K. Suicide in married couples in Sweden: Is the risk greater in same-sex couples? Eur J Epidemiol 31, 685–690 (2016).

29. Mathy, R. M., Cochran, S. D., Olsen, J. & Mays, V. M. The association between relationship markers of sexual orientation and suicide: Denmark, 1990-2001. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 46, 111–117 (2011).

30. Shaffer, D., Fisher, P., Hicks, R. H., Parides, M. & Gould, M. Sexual Orientation in Adolescents Who Commit Suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior 25, 64–71 (1995).

31. Bränström, R. & Pachankis, J. E. Sexual orientation disparities in the co-occurrence of substance use and psychological distress: a national population-based study (2008-2015). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 53, 403–412 (2018).

32. Rosario, M., Schrimshaw, E. W. & Hunter, J. Predictors of substance use over time among gay, lesbian, and bisexual youths: an examination of three hypotheses. Addict Behav 29, 1623–1631 (2004).

33. Wittgens, C. et al. Mental health in people with minority sexual orientations: A meta-analysis of population-based studies. Acta Psychiatr Scand 145, 357–372 (2022).

34. Eating Disorders In LGBTQIA+ Populations - NEDA. https://www.nationaleatingdisorders.org/eating-disorders-in-lgbtqia-populations/.

35. Levine, S. B. & Abbruzzese, E. Current Concerns About Gender-Affirming Therapy in Adolescents. Curr Sex Health Rep 15, 113–123 (2023).

শিশুদের মাঝে লিঙ্গ সংশয় হঠাৎ এত বাড়ছে কেন

হাইস্কুলে পড়ুয়া আপনার অতি আদরের মেয়ে হঠাৎ একদিন জানালো যে সে মনে মনে নিজেকে ছেলে ভাবে। যদি সে অপারেশনের মাধ্যমে 'ছেলে' হতে না পারে, তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। আপনি মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলেন, আর চিকিৎসক বললেন—'আপনি জীবিত ছেলে চান, নাকি মৃত মেয়ে?' (Do you want a live son or a dead daughter?) একজন পিতামাতা হিসেবে এই পরিস্থিতি কি সহ্য করতে পারবেন? এখন আর এটি অবিশ্বাস্য কিছু নয়। গত কয়েক বছরে আমাদের অগোচরে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যে, এমন ঘটনা এখন প্রায়শই ঘটছে।

ইংল্যান্ডের জেন্ডার ক্লিনিকে পাঁচ বছরে (২০০০-২০০৫) যেখানে জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ার (লিঙ্গ সংশয়) রেফারেল কেইস ছিল মাত্র ১৮ জন, ২০০৯-২০১০ সালে ৭৭ জন, সেখানে ১০ বছরে (২০২০-২০২১) লাফ দিয়ে বেড়ে হয়েছে ৩.৫৮৫ জন (অর্থাৎ ৪,৫৫৫%)। এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে কেননা ২০২১ সালে অপেক্ষমাণ রোগীর সংখ্যা ছিল ৫.৩০০ জন। ২০২৪ সালে অপেক্ষমাণ রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৬ হাজার (১৫,৯২৮)[১]। গত এক যুগে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রূপান্তরিত হওয়ার সংখ্যা বেড়েছে সুইডেনে ১৫০০%[২], ডেনমার্কে বেড়েছে ৮৭০০% [৩]। আমেরিকায় গড়ে ১১ বছর বয়সী মেয়ে শিশু এবং ১৩ বছর বয়সী ছেলে শিশুরা জেন্ডার ডিসফোরিয়ার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হচ্ছে[৪]।

জন্মগত লিঙ্গের সঙ্গে একজন ব্যক্তির জেন্ডার আইডেন্টিটি (সে নিজেকে যা মনে করে) অমিল হলে মানসিক চাপ বা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এই মানসিক অস্থিরতা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটায়, তখন এই অবস্থাকে জেন্ডার ডিসফোরিয়া বলা হয়। ২০১৩ সালের আগে জেন্ডার ডিসফোরিয়াকে "Gender Identity Disorder (GID)" নামে মানসিক রোগ

হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তবে ২০১৩ সালে এটি মানসিক রোগের তালিকা থেকে সরিয়ে আরও ইতিবাচক অর্থে 'Gender Dysphoria' নামে পরিবর্তিত করা হয়[৫]।

কোনো শিশুর জেন্ডার ডিসফোরিয়া দেখা দিলে তাকে যত দ্রুত সম্ভব জেন্ডার-ইতিবাচক চিকিৎসার (শিশুটি নিজেকে যে লিঙ্গের মনে করে সেই অনুযায়ী রূপান্তর করার) মাধ্যমে অস্থিরতা বা মানসিক চাপ কমানোর প্রচেষ্টা করা হয়, এবং এটি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে একটি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ার সম্ভাব্য কারণ

জেনেটিক স্টাডিগুলোও বায়োলজিক্যাল কারণ চিহ্নিত করতে পারেনি। মূলত পরিবেশগত ও সামাজিক ফ্যাক্টরগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে হঠাৎ করে জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া বা ট্রান্স আইডেন্টিফিকেশনের বৃদ্ধি বিশ শতকের শেষ দিকের দুটি মানসিক রোগের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে: মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (MPD, বর্তমানে যাকে ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার বলা হয়) এবং রিকভার্ড-মেমরি সিনড্রোম। এই বিষয়টি নিয়ে ড হেলেন জয়েস তার গ্রন্থ *Trans When Ideology Meets Reality* বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[৬]। এই দুটি রোগের তত্ত্ব ছিল এমন যে, শৈশবের ট্রমা বা নির্যাতনের কারণে একজন শিশু মানসিকভাবে 'বিভক্ত' হতে পারে, যেখানে তাদের মন খণ্ডিত হয়ে সেই স্মৃতিগুলোকে লুকিয়ে রাখে। থেরাপিস্টরা হিপনোসিস, ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন, এমনকি কখনো কখনো মানসিক প্রভাব ফেলা ওষুধ ব্যবহার করে সেই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বগুলো বা 'অল্টারস'কে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন এবং ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো পুনরুদ্ধার করে রোগীকে মুক্ত করার চেষ্টা করতেন।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত সাংবাদিক জোয়ান একোচেলা'র বই ক্রিয়েটিং হিস্টিরিয়া: উইমেন অ্যান্ড মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (Creating Hysteria: Women and Multiple Personality Disorder) এ দেখানো হয়েছে কীভাবে একসময় অত্যন্ত বিরল হওয়া সত্ত্বেও MPD আকস্মিকভাবে ব্যাপক আকার ধারণ করে[৭]। ১৯৪৪ সালের একটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আগের দুই শতাব্দীতে মাত্র

৭৬টি মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালে দুজন থেরাপিস্ট *দ্য থ্রি ফেসেস অব ইভ* বইটি প্রকাশ করেন, যেখানে এক গৃহবধূ, 'ইভ হোয়াইট'-এর গল্প বলা হয়েছে, যার বিকল্প ব্যক্তিত্ব 'ইভ ব্ল্যাক' সপ্তাহান্তে মদ্যপান, পার্টি ও অবাধ জীবনযাপন করতেন, এবং সোমবার সকালে ইভ হোয়াইট হয়ে ফিরে এসে কিছুই মনে করতে পারতেন না। থেরাপিস্টরা দাবি করেন, তারা এই দুই ব্যক্তিত্বকে একত্রিত করে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব 'জেন'-এ পরিণত করেছেন। এই বই এবং এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমা ব্যাপক সফলতা পায়। একইভাবে সিবিল নামের আরেকটি বই ও সিনেমা, যেখানে শৈশবে নির্যাতনের কারণে মানসিক সমস্যার উৎপত্তি দেখানো হয়েছিল, ব্যাপক সাড়া ফেলে।

এরপর আরও বই, সিনেমা, টিভি প্রোগ্রাম এবং সাক্ষাৎকার আসতে থাকে। থেরাপিস্টদের জন্য সেমিনার, কনফারেন্স ও একাডেমিক পেপারে এই রোগের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একোচেলা অনুমান করেন, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ আমেরিকানকে আনুষ্ঠানিকভাবে MPD রোগে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং আরও কয়েক মিলিয়ন লোক বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, তাদের শৈশবের নির্যাতনের স্মৃতিগুলো চাপা পড়ে আছে এবং তা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

এই ঘটনাপ্রবাহ, যেখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক প্রবণতাগুলো মিলে রোগগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তা বর্তমান সময়ে কিশোর-কিশোরীদের ট্রান্স আইডেন্টিফিকেশনের (জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া) আকস্মিক উত্থানের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে, যেখানে একই ধরনের চিকিৎসা, থেরাপি ও সামাজিক প্রভাব কাজ করছে বলে মনে করা যেতে পারে।

অটিস্টিক মানুষদের এলজিবিটি দাবি করার ঝুঁকি অনেক বেশি

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অটিস্টিক মানুষের মধ্যে সমকামী বা উভকামী হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ জনগণের তুলনায় ৩ থেকে ৬ গুণ বেশি। এই গবেষণায় ৫ লক্ষাধিক (৫১৪,০০০) মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে দেখা গেছে সিসজেন্ডার (জন্মগতভাবে নারী বা পুরুষ) ব্যক্তিদের মধ্যে ৫% অটিজম শনাক্ত হয়েছে, কিন্তু লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় (LGBTQ বা অন্যান্য) ব্যক্তিদের মধ্যে এটি ২৪%[৮]। গবেষকরা লিঙ্গ পরিচয় এবং ছয়টি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে সম্পর্কও খতিয়ে দেখেছেন,

যার মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া, বিষণ্ণতা, এবং ADHD অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় এই মানসিক সমস্যাগুলি অটিজমের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের মধ্যে সিসজেন্ডারদের (জন্মগত নারী ও পুরুষ) তুলনায় এই ছয়টি মানসিক সমস্যার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এর মধ্যে অটিজম এবং বিষণ্ণতার সাথে তাদের সম্পর্ক সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়[৮]।

শৈশবে যৌন নির্যাতনে সমকামী হওয়ার ঝুঁকি

ছোটবেলায় যৌন নির্যাতন অনেকগুলো মানসিক রোগের কারণ যেমন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার এবং এই ইফেক্টগুলো সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে অনেক জেন্ডার ডিসফোরিয়ায় আক্রান্তরা অতীতে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এক্ষেত্রে তাদের অনেক নিজের জন্মগত লিঙ্গকে ঘৃণা করে, বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয় কিংবা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরা আচরণগতভাবে সমকামী হয়েও ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার মাধ্যমে সমাজের চোখে তারা হেটারোসেক্সুয়াল হিসেবে পরিচিত হতে চায়। যেমন- ২০১৩ সালে একটি বড় এপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণায় দেখা গেছে, শৈশবে নির্যাতনের (শারীরিক, যৌন, অবহেলা) সাথে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে[৯]। ৩৪,৬৫৩ জনের উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় নির্যাতনের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। শৈশবকালের যৌন নির্যাতন সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (same sex attraction) ২.০%, সমলিঙ্গের সঙ্গী (same-sex partner) ১.৪%, এবং সমলিঙ্গের পরিচয় (same-sex identity) ০.৭% বৃদ্ধি করেছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব মহিলাদের তুলনায় বেশি ছিল।

সামাজিক প্রভাব: কন্টাজিওন থিওরি

বর্তমানে জেন্ডার ডিসফোরিয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে এটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। বিখ্যাত সুইস মনোবিজ্ঞানী, কার্ল গুস্তাভ জুং ১৯৫৭ সালে বলেছিলেন যে, মানুষ যেমন একে অপরের কাছ থেকে রোগ ছড়াতে পারে, ঠিক তেমনই আশেপাশের মানুষদের অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং আচরণের ধরনও তারা গ্রহণ করতে পারে। মানুষ যখন ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে, তারা তখন নিজেদের

ইউনিক বা অনন্য চিন্তা-চেতনা অনুসরণ করার চেয়ে বরং গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে।

২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগতভাবে মেয়েদের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তনের হার চার গুণ বেড়ে যায়, এবং যুক্তরাজ্যে টিনএজ মেয়েদের মাঝে জেন্ডার ডিসফোরিয়া এক দশকে ৪৪০০% বৃদ্ধি পায়। ২০১৬ সালে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য গবেষক লিসা লিটম্যান লক্ষ্য করেন, তার ছোট্ট শহর রোড আইল্যান্ডে একদল কিশোরী, যারা একই বন্ধু গ্রুপের সদস্য ছিল, তারা সবাই ট্রান্সজেন্ডার হয়ে গিয়েছে। এ ঘটনা তাকে অবাক করে দেয় এবং তিনি ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ২০১৮ সালে তার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি মেয়েদের মধ্যে বন্ধু সংক্রমণ বা 'পিয়ার কন্টাজিওন' এর কথা উল্লেখ করেন[১০]। এটা র‍্যাপিড অনসেট জেন্ডার ডিসফোরিয়া (ROGD) নামেও পরিচিত।

লিসা লিটম্যান (২০১৮) এবং সুজানা ডিয়াজ ও জে. মাইকেল বেইলি (২০২৩) র‍্যাপিড অনসেট জেন্ডার ডিসফোরিয়া (ROGD) নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে হঠাৎ করে লিঙ্গ পরিচয়ের দ্বিধাগ্রস্ততা নিয়ে। এই ধারণাটি মূলত এ কারণে আলোচিত হয় যে, অনেক কিশোর-কিশোরী যারা শৈশব বা কৈশোরের শুরুতে লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে কোনো সমস্যা প্রকাশ করেনি, তারা হঠাৎ করে বয়ঃসন্ধির পর লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রবণতা কেন হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা বোঝার জন্য দুটি গবেষণা সামাজিক প্রভাব এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্ভাব্য ভূমিকা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে।

লিসা লিটম্যানের গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ পিতামাতার মতে, তাদের সন্তানরা লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশের আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের বন্ধুদের মধ্যেও একাধিক ব্যক্তি একই সময় ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় প্রকাশ করেছে। ৮৬.৭% কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এই সামাজিক ও বন্ধুমহলের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয় যে, সামাজিক মাধ্যম ও বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব এই লিঙ্গ-পরিচয় পরিবর্তনের একটি বড় কারণ হতে পারে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, এই কিশোর-কিশোরীদের ৬২.৫% আগে থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিল। অনেকের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বা দুর্ঘটনার পর লিঙ্গ-দ্বিধার বিষয়টি প্রথম দেখা দেয়।

সুজানা ডিয়াজ এবং মাইকেল বেইলির গবেষণায়ও একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে। এখানে পিতামাতারা রিপোর্ট করেন যে, তাদের সন্তানদের ৫৯.৪% আগে থেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল, এবং তারা লিঙ্গ পরিবর্তনের পরে মানসিকভাবে আরও খারাপ অবস্থায় পড়েছে। পিতামাতাদের মতে, তাদের সন্তানদের মধ্যে যাদের মানসিক সমস্যা ছিল, তারা আরও বেশি দ্রুত সামাজিক বা চিকিৎসাগত ট্রানজিশনের দিকে ঝুঁকেছিল। এতে ৫৫.৪% ক্ষেত্রে পিয়ার গ্রুপের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয়[১১]।

দুটি গবেষণাতেই দেখা গেছে, কিশোর-কিশোরীদের ৩৬.৮% বন্ধুদের মধ্যেও লিঙ্গ-পরিচয় পরিবর্তনের প্রবণতা ছিল এবং পিতামাতারা অনুভব করেন যে তাদের সন্তানদের ট্রানজিশন করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে, পিতামাতারা মনে করেন যে তাদের সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য এবং তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ৪৭.২% ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

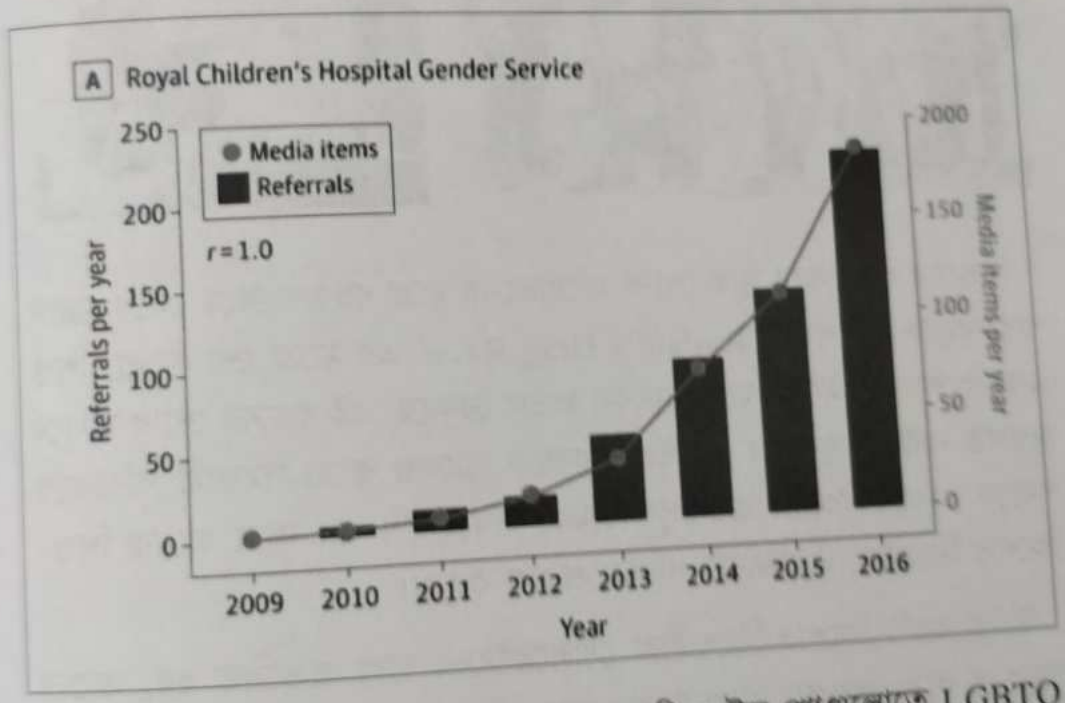
এই গবেষণাগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল লিঙ্গ-পরিচয় পরিবর্তনে সামাজিক প্রভাব এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার গুরুত্ব বোঝা। তবে, এই গবেষণাগুলো নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কারণ ডেটা পিতামাতার কাছ থেকে সংগৃহীত এবং তাদের অনেকেই লিঙ্গ-পরিচয় পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবুও, গবেষণাগুলো লিঙ্গ-পরিচয় সমস্যাগুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এবং আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে, যেখানে কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের মতামত এবং চিকিৎসকদের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

শংকার বিষয় হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় নেয়ার হার অস্বাভাবিক পর্যায়ে বেড়ে গেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এক দশক আগে যেখানে প্রতি ১০ জন ছেলের বিপরীতে ১ জন মেয়ে লিঙ্গ পরিচয় সেবা (Gender care service) গ্রহণ করত, এখন সেই অনুপাত অনেকটাই বদলে গেছে। বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কিশোরদের মধ্যে, প্রতি ১ জন ছেলের বিপরীতে প্রায় ৪ জন মেয়ে এই সেবা গ্রহণ করছে। যুক্তরাজ্যের Gender Identity Development Service (GIDS) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে বেশিরভাগ রেফারেল ছিল ছেলেদের জন্য। কিন্তু ২০২১ সালের দিকে এটি পুরোপুরি পাল্টে গেছে, যেখানে প্রায় ৭০% রেফারেল মেয়েদের জন্য করা হয়েছে[১২]। লিসা লিটম্যানের গবেষণাতে দেখা গেছে, যেসব যুবক-যুবতীদের লিঙ্গ ডিসফোরিয়ার জন্য ক্লিনিকে রেফার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৮২.৮% মেয়ে ছিল[১০]। এই সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

গবেষক এবং চিকিৎসকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে সামাজিক গতিশীলতা, সহপাঠীদের প্রভাব এবং মেয়েদের মধ্যে লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার ব্যাপারে। এ ধরনের প্রবণতা বোঝা এবং এদের জন্য যথাযথ সমর্থন ও যত্ন প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলজিবিটি পরিচয় বাড়ার নেপথ্যে মিডিয়ার প্রভাব

২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে ট্রান্সজেন্ডার এবং লিঙ্গবৈচিত্র্য নিয়ে মিডিয়া কভারেজে বাড়ার সাথে শিশুদের জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ার রেফারেল রেট বাড়ার যোগসূত্র রয়েছে[১৩]। অস্ট্রেলিয়ায় ৫০০০ রেফারেল কেইসের ডাটা এনালাইসিস করে এই রিলেশন পাওয়া গেছে। সহজভাবে বলা যেতে পারে, যত বেশি মিডিয়ার প্রচারণা ততবেশি লিঙ্গ সংশয়ের কেইস।



গত দশকে (২০১০-২০২০) শিশুদের অ্যানিমেটেড শোগুলোতে LGBTQ প্রতিনিধিত্ব অবিশ্বাস্য গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালের ইনসাইডারের একটি ডাটাবেসে ২৫৯টি LGBTQ চরিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়[১৪]। এগুলো নেটফ্লিক্স ও কার্টুন নেটওয়ার্কের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রমোট করা হচ্ছে। শিশু-কিশোরদের জন্য আকর্ষণীয় Steven Universe, She-Ra and the Princesses of Power, The Loud House, এবং Craig of the Creek উল্লেখযোগ্য। এই শোগুলো লেসবিয়ান, গে, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডারসহ অন্যান্য লিঙ্গবৈচিত্র্যকে

উপস্থাপন শিশুদের মধ্যে LGBTQ বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।






শিশুদের লক্ষ্য করে ড্রাগ শো'র আয়োজনের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেছে। ড্র্যাগ পারফরম্যান্স, বিশেষত 'RuPaul's Drag Race' এর মতো শো গুলো, শিশু এবং কিশোরদের মনোজগতে ভয়ংকর প্রভাব ফেলছে। এই ধরনের শো'র মাধ্যমে জন্মগত নারী ও পুরুষের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। সমকামী পরিচয়কে সমাজে স্বাভাবিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে[১৫]। এর ফলে অনেক শিশু-কিশোর নিজেদের এলজিবিটি পরিচয় প্রকাশ করছে।

উঠতি বয়সী কিশোর-কিশোরীরা সেলিব্রেটিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের অনুকরণ করে। শিশুদের মাঝে ট্রান্সজেন্ডার অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান এবং স্বাভাবিক করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন এই সেলিব্রেটিরা।

লিঙ্গ বিভ্রান্তি: মস্তিষ্ক বিকাশ এবং পরিবেশের যোগসূত্র

শিশু-কিশোররা কী করছে, কার সাথে উঠা-বসা করছে, আশে-পাশে কী দেখছে, অর্থাৎ পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে ব্যক্তিত্ব, পরিচয়, মননের গঠনে। এটা

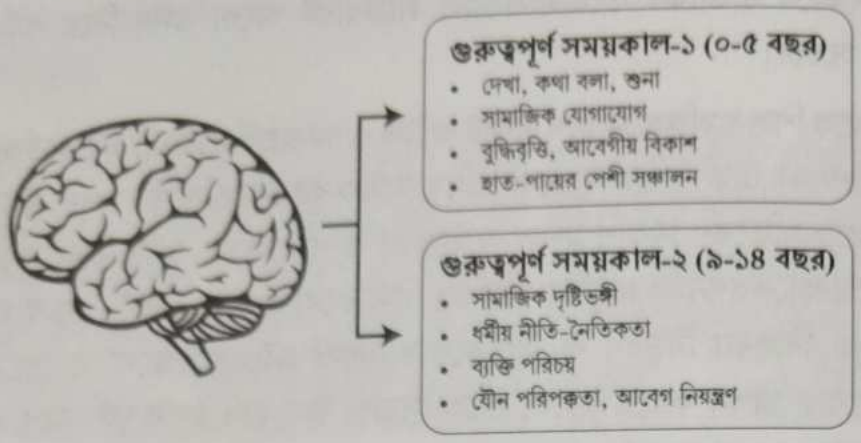
মস্তিষ্ক বিকাশে স্বাভাবিক বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়ারই অংশ। এসব নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়েছে।

নবজাতক শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশ একটি জটিল ও চমকপ্রদ প্রক্রিয়া। এটি গর্ভকাল থেকেই শুরু হয় এবং শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কের বিকাশ মূলত অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে, যা নিউরাল কানেকশন বা স্নায়ুবিক সংযোগ গঠন করে। প্রথমে, একটি শিশু জন্মায় প্রায় ১০০ বিলিয়ন নিউরন বা মস্তিষ্ককোষ নিয়ে। এই কোষগুলো পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে থাকে, যাকে সিনাপ্স বলা হয়। প্রথম দুই বছরে এই সিনাপ্সগুলো দ্রুত গড়ে ওঠে, প্রায় ১৫,০০০ সংযোগ প্রতি কোষে তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে শিশুর মস্তিষ্ক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দেয় এবং বিভিন্ন দক্ষতা যেমন দেখা, শোনা, কথা বলা, ও চলাফেরার ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

নবজাতকের মস্তিষ্ক দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং জীবনের প্রথম ৫ বছর মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়কালে মস্তিষ্কে অপ্রয়োজনীয় সংযোগগুলো ঝরে যায় (প্রুনিং), এবং ব্যবহৃত সংযোগগুলো আরও মজবুত হয়। এর ফলে শিশু শিক্ষার ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বিকাশ লাভ করে। মস্তিষ্কের এই প্রক্রিয়া চালাতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়, ফলে নবজাতক শিশুর দেহের ৯৭ শতাংশ শক্তি মস্তিষ্ক বিকাশে ব্যয় হয়[১৬]।

মস্তিষ্ক বিকাশের ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের (৯-১৪ বছর) জন্য এই সময়কালকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ডেভেলপমেন্টাল উইন্ডো' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই বয়সে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, যা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মস্তিষ্কের পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে[১৭]।

শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ গর্ভকাল থেকেই শুরু হয় এবং জীবনের প্রথম পাঁচ বছরকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ডেভেলপমেন্টাল উইন্ডো হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর, ৯-১৪ বছর বয়সকে দ্বিতীয় উইন্ডো হিসেবে ধরা হয়, যেখানে যৌন পরিপক্কতা, আত্মপরিচয়, এবং আবেগীয় ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশ পায়। এই সময়ের মস্তিষ্কের পরিবর্তনগুলো অনেকাংশে জীবনের ভিত্তি গঠন করে।



ছবি: শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল বা উন্নয়নমূলক উইন্ডো রয়েছে। এই দুটো উইন্ডোতে নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতার বিকাশ ঘটে, যা জীবনের পরবর্তী ধাপের মৌলিক ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করে।

এই বয়সে কিশোর-কিশোরীদের হরমোনের পরিবর্তনের ফলে আবেগপ্রবণতা বেড়ে যায় এবং তারা ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বা বিভিন্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করে। এক্ষেত্রে তাদের চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা বিকশিত হয়। তবে, ভুল ধারণা বা নেতিবাচক পরিবেশে থাকলে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

শিশু-কিশোরদের জীবনের খুব সংবেদনশীল মস্তিষ্ক বিকাশের সময়ে পাঠ্যপুস্তক, কার্টুন, ড্র্যাগস এবং বিনোদন ইন্ড্রাস্ট্রির মাধ্যমে এলজিবিটি তথা লিঙ্গবৈচিত্র্য নিয়ে নিয়মিত বোম্বার্টমেন্ট, প্রচার এবং প্রসার স্বাভাবিকভাবেই তাদের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান করে তোলার কথা। লিসা লিটম্যান এবং সুজানা ডিয়াজ ও জে. মাইকেল বেইলি গবেষণার মাধ্যমে সোস্যাল কন্টাজিওন তত্ত্বকে স্পষ্টত সমর্থন করে। তাদের স্টাডি ফাইন্ডিংস ট্রান্সজেন্ডার থিংকট্যাংক মেনে নিতে পারেনি, এবং এগুলো জার্নাল পেপার পেপার থেকে প্রত্যাহার করতে এলজিবিটি গ্রুপ চাপ প্রয়োগ করেছে। ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্টরা স্টাডির যে দুর্বলতাকে সামনে এনে পুরো বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, সেই একই যুক্তিতে ট্রান্সজেন্ডারদের পক্ষে যায় এমন সব গবেষণা মৌলিকভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি তাদের জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ার চিকিৎসা প্রটোকলও প্রশ্নবিদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে[১৮]।

References

1. Gender identity clinic. Tavistock and Portman https://tavistockandportman.nhs.uk/services/gender-identity-clinic-gic/(2023).
2. Staff, D. M. Gender Dysphoria Cases Rise 1,500% Among Teenage Girls in Sweden. Decision Magazine https://decisionmagazine.com/gender-dysphoria-cases-rise-1500-among-teenage-girls-in-sweden/ (2020).
3. Denmark Joins the List of Countries That Have Sharply Restricted Youth Gender Transitions. https://segm.org/Denmark-sharply-restricts-youth-gender-transitions.
4. More people seeking gender-affirming care at younger age: study. https://nypost.com/2023/06/28/more-people-seeking-gender-affirming-care-at-younger-age-study/.
5. Gender dysphoria. Wikipedia (2024).
6. Joyce, H. Trans: When Ideology Meets Reality. (Oneworld Publications, London, 2021).
7. Acocella, J. Creating Hysteria: Women and Multiple Personality Disorder. (Jossey-Bass, San Francisco, 1999).
8. Largest study to date confirms overlap between autism and gender diversity. The Transmitter: Neuroscience News and Perspectives https://www.thetransmitter.org/spectrum/largest-study-to-date-confirms-overlap-between-autism-and-gender-diversity/ (2020).
9. Roberts, A. L., Glymour, M. M. & Koenen, K. C. Does maltreatment in childhood affect sexual orientation in adulthood? Arch Sex Behav 42, 161–171 (2013).
10. Littman, L. Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PLoS One 13, e0202330 (2018).
11. Diaz, S. & Bailey, J. M. RETRACTED ARTICLE: Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases. Arch Sex Behav 52, 1031–1043 (2023).
12. Twenge, J. M., Wells, B. E., Le, J. & Rider, G. N. Increases in Self-identifying as Transgender Among US Adults, 2014–2022. Sex Res Soc Policy (2024) doi:10.1007/s13178-024-01001-7.
13. Association of Media Coverage of Transgender and Gender Diverse Issues With Rates of Referral of Transgender Children and Adolescents to Specialist Gender Clinics in the UK and Australia | Pediatrics | JAMA

Network Open | JAMA Network. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768726.

14. We created the first-ever searchable database of 259 LGBTQ characters in cartoons that bust the myth that kids can't handle inclusion. https://www.insider.com/lgbtq-cartoon-characters-kids-database-2021-06.

15. Nelken-Zitser, J. By championing self-expression, 'RuPaul's Drag Race' has encouraged a generation of young LGBTQ+ fans to come out. Business Insider https://www.businessinsider.com/rupauls-drag-race-helped-lgbtq-teens-to-come-out-2021-1.

16. National Research Council (US) and Institute of Medicine (US) Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. (National Academies Press (US), Washington (DC), 2000).

17. Innocenti, U. O. of R.-. The Adolescent Brain: A Second Window of Opportunity. UNICEF-IRC https://www.unicef-irc.org/article/1750-the-adolescent-brain-a-second-window-of-opportunity.html.

18. Transgender Research: Five Things Every Parent and Policy-Maker Should Know©. Ascend https://weascend.org/resource/transgender-research-five-things-every-parent-and-policy-maker-should-know/.

বাংলাদেশ ভয়ংকর সামাজিক বিপর্যয়ের অপেক্ষায়

দুই যুগ আগে ব্র্যাকের নেতৃত্বে শুরু হওয়া পশ্চিমা যৌন-বিকৃতির সামাজিকীকরণের মিশন বাংলাদেশে সফলতার মুখ দেখছে, দেশে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছি যখন পায়ুসঙ্গমের মতো পরিবার এবং সমাজ বিধ্বংসী ঘৃণিত যৌন বিকৃতি সমাজের গণ্যমান্য লোকদের কাছে নৈতিক ইস্যু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। দেশের সুশীল সমাজ, মূলধারার গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রখ্যাত লেখক, সমাজসেবী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া মানুষগুলো সমকামী অধিকার আদায়ের দাবি উঠাচ্ছে।

১৯৫২ সালে সমকামিতাকে মানসিক রোগ হিসাবে ডিএসএম ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৩ সালে লবিং গ্রুপের চাপে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯০ সালে সমকামিতাকে স্বীকৃতি দেয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক হিসেবে গ্রহণ করে।

যেহেতু এটাকে জন্মগত অধিকার হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সমকামী মানুষদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করারও অনৈতিক বিষয় হিসেবে মনে করা হয়। সমকামীদের মানসিক রোগী হিসেবে চিকিৎসা করার প্রচেষ্টাকে পশ্চিমা দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে- Conversion therapy is banned since it is against nature!। বিষয়টি এমন হয়ে গেছে যে, যারা পায়ুসঙ্গমবাদে বিশ্বাস করে না, তাদেরই এখন মানসিক রোগী হিসেবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তাদের চিকিৎসা নেয়া দরকার বলে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

LGBTQ+ সংক্রান্ত যেসব পলিসি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে সমকামিতা সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে যেসব পলিসিগত পরিবর্তন হয়েছে-

১. বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টে আবেদন ফর্মে সেক্স শব্দের পরিবর্তে জেন্ডার শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে লিঙ্গ পরিচয় হিসেবে (আইটেম নং# ২০)। আমাদের অসচেতনতার সুযোগে এত বড় পরিবর্তন করা হয়েছে যা অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'দৈনিক সমকাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা শঙ্কিত করার মতো বিষয়। পত্রিকাটি এই শিরোনামে–'*ট্রান্সজেন্ডার-তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষায় আলাদা আইন দরকার*-জানায়- 'ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের রাজনৈতিক বিষয়ক প্রথম সচিব কর স্টোটেন বলেন, বাংলাদেশ সরকার ট্রান্সজেন্ডার এবং তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষকে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ থেকে এগিয়ে আছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়। নো পাসপোর্ট ভয়েস-এর ট্রান্সজেন্ডার অধিকারবিষয়ক শুভেচ্ছা দূত হো চি মিন ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে'।

২. লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মোড়কে পাঠ্যক্রমে সমকামিতা মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক বিতর্ক তৈরী হয়। পশ্চিমা দাতা সংস্থার লবিং এর ফলে কম্প্রিহেনসিভ যৌন শিক্ষার প্রাথমিক বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে।

৩. ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা সংসদে গৃহিত হওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন আছে।

৪. ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভুক্তকরণে ভোটার নিববন্ধন ফর্মে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফর্মে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

৬. ট্রান্সজেন্ডারদের চাকুরির সুযোগ তৈরী করতে ২০২২ সালে আয়কর মওকুব করার নীতি গ্রহণ করে। ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিকীকরণের উদ্যোগ হিসেবে সমকামী গ্রুপের লবিং-এর ফলে (হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মাঝে কনফিউশান ও বিভ্রান্তি তৈরী করে) কর্মক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার নিয়োগ দিলে ৫% আয়কর মওকুব করার সিদ্ধান্ত। কোনো কোম্পানি এই সুযোগ নিতে হলে বছরে কমপক্ষে ১০০ জন ট্রান্সজেন্ডার চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে

৭. জাতীয় কিশোর স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় (The National Adolescent Health Strategy ২০১৭-২০৩০) LGBTQ+ ইস্যুকে যুক্ত করা হয়েছে[১]। জাতিসংঘের LGBTQ+ প্রমোটকারী সংস্থা UNFPA, UNICEF এবং WHO সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

We in UNFPA, UNICEF and WHO hereby commit to support the implementation of this strategy and its action plan by providing technical assistance to the Government of Bangladesh to, ensure evidence based interventions, maintain the quality of care and strengthen the health system to guarantee the wellbeing and development of adolescents. We are of the conviction that this strategy will provide the necessary guidance and underscore the directions that need to be taken by both Government and non-government actors to meet the health needs of all adolescents of Bangladesh.

Iori Kato
UNFPA Representative, a.i.

N. Paranietharan
WHO Representative

Edouard Beigbeder
UNICEF Representative

৮. সরকারি মহিলা হোস্টেলে ট্রান্সজেন্ডার নারীকে (জন্মগত পুরুষ) সিট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯. নারী হয়েও ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ হিসেবে রেলওয়েতে চাকুরিতে স্থলাভিষিক্ত করার কথা উঠে এসেছে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিবেদনে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে বন্ধু সোশ্যাল (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ ও ২০২২ এর তথ্যানুসারে) এবং অন্যান্য সংস্থার লবিংয়ের ফলে ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা

* বৈষম্যবিরোধী আইনের ড্রাফটে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ ঢোকানো হয়েছে
* সাইকোলজিক্যাল সোস্যাইটির পলিসিতে যৌন সংখ্যালঘু টার্ম অন্তর্ভুক্ত
* বাংলাদেশ ব্যাংকে ইনক্লুসিভ ফিনান্স কনসেপ্ট ঢুকিয়েছে
* বিনোদনে জয়জয়কার- সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ট্রান্সটক নামে বন্ধু সোশ্যালের বিশেষ অনুষ্ঠান
* বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পলিসির মাধ্যমে LGBTQ+ বান্ধব ঘোষণা--ব্র্যাকের সব প্রতিষ্ঠান

* গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে জেন্ডার ট্রেইনিং
* সব বড় ইয়ুথ প্লাটফর্ম দখলে নিয়েছে (জাগো ফাউন্ডেশন, ভলান্টিয়ার বাংলাদেশ)
* ট্রান্সজেন্ডার মাদ্রাসা-মসজিদ বিশ্ব ও লোকাল মিডিয়ায় স্বাভাবিকীকরণ
* LGBTQ+দের জন্য লিগ্যাল হেল্পলাইন তৈরি করেছে (বন্ধু সোশ্যাল)।
* সমকামী ও অন্যান্য বিকৃতকামীদের 'মানবাধিকারের' ব্যাপারে পাঁচশোর বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে 'সংবেদশনশীল' করে তুলেছে বন্ধু।
* সিলেট হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৯০টি 'সংলাপ অনুষ্ঠান' হয়েছে, যেখানে মোট ১৬২০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেছে। এসব সংলাপে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে 'ট্র্যান্সজেন্ডার এবং হিজড়াদের অন্তর্ভুক্তির' কথা বলা হয়েছে।
* স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ৭৪ জনের বেশি স্টাফকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে সবক দেয়া হয়েছে
* ট্র্যান্সজেন্ডারদের মূল ধারার চাকরির বাজারে সুযোগ দেয়ার জন্য চেইম্বার অফ কমার্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বাংলাদেশের ব্যাংকের কাছে অ্যাডভোকেসি করেছে
* বাংলাদেশ মেডিকাল স্টুডেন্ট সোসাইটি (বিএমএসএস) এর সাথে মিলে তরুণ চিকিৎসকদের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে কাজ করেছে।
* রোহিঙ্গা ক্যাম্পে LGBTQ+ মতবাদের ধ্যানধারণার সবক দেয়া হচ্ছে
* নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা নিজেদের সমকামী যৌনতার কারণে যৌনাঙ্গ ও মলদ্বারের বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। এদের সহজে চিকিৎসা দেয়ার জন্য অনলাইন এবং অফলাইন পরামর্শের ব্যবস্থা করেছে বন্ধু।
* মেয়েদের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় পুরুষ (ট্রান্সজেন্ডার) বিজয়ী
* প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ট্রান্সজেন্ডার স্কলারশীপ চালু করে ২০২১ সালে (৮০-১০০% স্কলারশীপ)-

* এপেক্স এবং পাঠাও কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে ৫০ জন ট্রান্সজেন্ডারকে জব দেয়া হয়

সমকামিতা সামাজিকীকরণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়

১। LGBTQ+ সামাজিকীকরণে সামাজিক কাঠামো দ্রুত ভেঙ্গে পড়বে

পশ্চিমা যৌন বিকৃতি সামাজিকীকরণে সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিল করা হলে পুরো সামাজিক কাঠামো দ্রুত ভেঙ্গে পড়বে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো অত্যন্ত দূর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। গত ৫০ বছরেও রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমতাবস্থায় পায়ুসঙ্গম অধিকার কায়েম হলে পশ্চিমা অর্থায়ন এবং সহযোগিতায় যুবসমাজে পরিবারবিধ্বংসী সমকামিতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।

LGBTQ+ মতবাদ নারী এবং পুরুষের মাঝে বিয়ের মাধ্যমে গড়া উঠা পরিবার ধারণাকে অস্বীকার করে। প্রচলিত পরিবারের ধারণা বা কাঠামো সমাজে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এটি মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার ভিত্তি তৈরি করে এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রাখে। পরিবার শুধুমাত্র সদস্যদের অর্থনৈতিক ও শারীরিক সুরক্ষা দেয় না; বরং এটি সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা, এবং পারস্পরিক সহানুভূতির শিক্ষাও দেয়।

একটি সুসংগঠিত পরিবার শিশুদের সুরক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে যা তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। পরিবার কাঠামো মূলত সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সদস্যরা একে অপরের প্রতি সমর্থন এবং আস্থা প্রদান করে। এছাড়াও, পরিবারের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়, যা সমাজের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, প্রচলিত পরিবার কাঠামোতে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাও নিশ্চিত করা হয়, কারণ পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে প্রয়োজনীয় সময়, সহায়তা ও উদ্দীপনা দিয়ে থাকে। পরিবার একটি নির্ভরযোগ্য সামাজিক কাঠামো তৈরি করে, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একতা বজায় থাকে, যা একাকিত্ব এবং মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক।

২। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে তৈরী হবে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা-

বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়ায় নারী এবং পুরুষের পরিচয়কে জন্মগত না করে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, একজন পুরুষ নিজেকে নারী হিসেবে বিবেচনা করলে সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে নারী হিসেবে মেনে নেবে। এই ধারণাটি পশ্চিমা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের খসড়া আইন (তৃতীয় চ্যাপ্টার-অধিকার সুরক্ষা- উত্তরাধিকার) অনুসারে-" ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি কর্তৃক অনুসৃত ধর্ম অনুসারে তাহার জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ হইবে। যথা- ক) ট্রান্সজেন্ডার ম্যানের জন্য উত্তরাধিকারের অংশ পুরুষের অংশের অনুরূপ হইবে; খ) ট্রান্সজেন্ডার উইম্যানের জন্য উত্তরাধিকারের অংশ নারীর অংশের অনুরূপ হইবে"। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ হানাহানি, মারামারি, বিশৃঙ্খলা হয় সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে। দেশের প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় মূলনীতির আলোকে নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের দেশের জন্য মত অত্যন্ত দুর্বল সামাজিক এবং আইনী ব্যবস্থায় এলজিবিটি সামাজিকীকরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব কত যে ভয়ংকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়কে উপেক্ষা করা হলে সামাজিক ভারসাম্য কার্যত ভেঙ্গে পড়বে।

৩। নারীরা বৈষম্যের শিকার হবে- নারীরা যাতে বৈষ্যমের শিকার না হয় সেজন্য নারীদের জন্য জব সেক্টরে নির্দিষ্ট কোটা সিস্টেম রয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার নারীরা (অর্থাৎ জন্মতগত পুরুষ) সেই পজিশনগুলো দখল করবে। খেলাধুলায় ইতিমধ্যে নারীদের পুরুষ্কারগুলো ট্রান্সজেন্ডাররা নারীরা দখল করছে যা নিয়ে বিশ্বে অনেক বিতর্ক হচ্ছে।

৪। নারীরা জেলখানায়, হোস্টেল, টয়লেটে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঝুঁকিতে পড়বে

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ট্রান্সজেন্ডার নারী (অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ) কোন হলে সিট পাবে? ক্যাডেট কলেজ, আর্মি ব্যারাকে কেউ ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিলে তার স্থান কোথাও হবে? তারা কোন টয়লেট ব্যবহার করবে? দিন দিন এই সমস্যাগুলো পশ্চিমা সমাজে প্রকট হয়ে উঠছে। ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে মেয়েদের টয়লেট-লকার রুম ব্যবহার করার প্রাইভেসি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়েছে প্রকৃত মেয়েরা।

৫। জনস্বাস্থ্য সমস্যা আরো ভয়ানক হবে

এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে LGBTQ+ গোষ্ঠীর মানুষদের বিভিন্ন রোগ এবং অপরাধপ্রবণতার (মাদকাসক্ত, শিশু যৌন নির্যাতন) ঝুঁকি অনেক বেশি। এগুলো আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এইডস, মাংকি পক্স, হেপাটাইসি-বি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইত্যাদি সংক্রমিত রোগ ছাড়াও ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বেশী। বাংলাদেশের প্রায় ১০-১২% মানুষ ডায়াবেটিস, ২০% হৃদরোগে ভুগছে যা মোকাবিলা করা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। সমকামিতা সামাজিকীরণে এই অবস্থা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে দেশে সমকামী পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডার (তৃতীয় লিঙ্গ) জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের হার বাড়ছে[২]। ২০১৭ সালে পুরুষ সমকামীদের এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার হার ছিল শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। একই সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে ২০১৭ সালে এইচআইভি আক্রান্তের হার ছিল শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ।

References

1. National-Strategy-for-Adolescent-Health-2017-2030.pdf.

2. SAMAKAL. সমকামী পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ: গবেষণা. সমকামী পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ: গবেষণা https://tinyurl.com/5dym3txr

জনরোষে LGBTQ+ আন্দোলন বিপাকে

LGBTQ+ বান্ধব প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রত্যাহার

LGBTQ+ গোষ্ঠীর সামাজিকীকরণে লক্ষ্যে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে "Diversity, Equity, and Inclusion" (DEI) নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির অধীনে কর্মক্ষেত্রে LGBTQ+ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ট্রান্সজেন্ডার এবং নন-বাইনারি পরিচয়দানকারী লোকদের পছন্দের সর্বনামে (Preferred Gender Pronouns) সম্বোধন করতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করা হয়। DEI নীতির আওতায় LGBTQ+ কর্মীদের জন্য বিশেষ সুবিধা, যেমন স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সহায়তার ব্যবস্থাও থাকে। এছাড়াও, এই নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছর প্রাইড মাস উদযাপন করে, যা LGBTQ+ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং স্বীকৃতিকে তুলে ধরে।

গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে কোভিডের পর থেকে LGBTQ+ সামাজিকীকরণের ইস্যুতে কর্পোরেট কোম্পানীগুলো DEI নীতির আলোকে বাড়াবাড়ি শুরু করে। LGBTQ+ সামাজিকীকরণের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছেন তাদেরকে চাকুরিচ্যুতও করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আমেরিকায় জনরোষ তৈরী হয়।

২০২৩ সালে সমকামীদের প্রাইড মাস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমেরিকার বিখ্যাত ব্র্যান্ড–'Target' তাদের পণ্য (টি-শার্ট, সাঁতারের পোশাক, এবং গৃহস্থালি সামগ্রী) LGBTQ+ সম্প্রদায়কে সমর্থন করে ডিজাইন করে। শিশুদের প্রোডাক্টের মাধ্যমে LGBTQ+ প্রমোট করার প্রচেষ্টাকে আমেরিকার রক্ষণশীল গোষ্ঠী সমালোচনা করেন। এই ঘটনা ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক জনরোষ তৈরী করে। এর প্রতিবাদ হিসেবে Target পণ্য বয়কটের আহবান জানানো হয়। এই আহবানে সাধারণ মানুষ সাড়া দেয়ার কারণে কোম্পানিটি অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক চাপে পড়ে যার ফলে ১৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়[১]।

LGBTQ+ সামাজিকীকরণের বিরুদ্ধে জনরোষের কারণে পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি বড় ব্র্যান্ড তাদের LGBTQ+ DEI নীতি বাতিল করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বোয়িং, ফোর্ড মোটর, টয়োটা মোটর কর্পোরেশন, ট্র্যাক্টর সাপ্লাই, হার্লে-ডেভিডসন, লো'স, জন ডিয়ার এবং ব্রাউন-ফোরম্যান। সম্প্রতি বোয়িং সমালোচনার মুখে পড়ে, যেখানে ইলন মাস্ক ইঙ্গিত করে বলেন যে সংস্থাটি যাত্রীর সুরক্ষার চেয়ে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি তথা LGBTQ+ নিয়ে বেশি মনোযোগী। এই সমালোচনার ফলশ্রুতিতে জনগণের চাপের কারণে বোয়িং DEI নীতি প্রত্যাহার করে।

আমেরিকায় LGBTQ+ সমর্থন কমেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে যে, LGBTQ অধিকারের প্রতি জনসমর্থন ৭ পয়েন্ট কমেছে (৭১% থেকে কমে ৬৪% হয়েছে), যা সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তনকে তুলে ধরছে। Public Religion Research Institute (PRRI)-এর তথ্য অনুযায়ী, LGBTQ অধিকারে সমর্থন গত কয়েক বছরে বেড়েছে, তবে এই সাম্প্রতিক হ্রাস মূলত রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এটি মূলত ধর্মীয় স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নীতিমালা, এবং LGBTQ ইস্যু নিয়ে চলমান সাংস্কৃতিক বিতর্কের ফলস্বরূপ।

ইউরোপ এবং রাশিয়ায় LGBTQ+ বিরোধিতা

২০২২ সালে LGBTQ+ ইস্যু ইতালির রাজনীতির পট-পরিবর্তন করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এন্টি-জেন্ডার (pro-family) নির্বাচনী প্রচারণায় বলেন [২]- "Yes to the natural family, no to the LGBT lobby, yes to sexual identity, no to gender ideology...!"

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হন [৩]। ঘটনা যেভাবে মোড় নেয়- একজন ছেলে ধর্ষক হিসেবে জেলে যাওয়ার আগে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিয়ে ট্রান্স মেয়ে হয়। এ কারণে তাকে মেয়েদের জেলে রাখা হয়। পরে সেখানে গিয়ে আবার রুমমেট মেয়েকে ধর্ষণ করে! স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে কট্টর মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি সেই ধর্ষককে ট্রান্স নারী বলে সম্বোধন করেন। এতে জনগণ ক্ষেপে যায় এবং এর ফলে তিনি পদত্যাগ করেন।

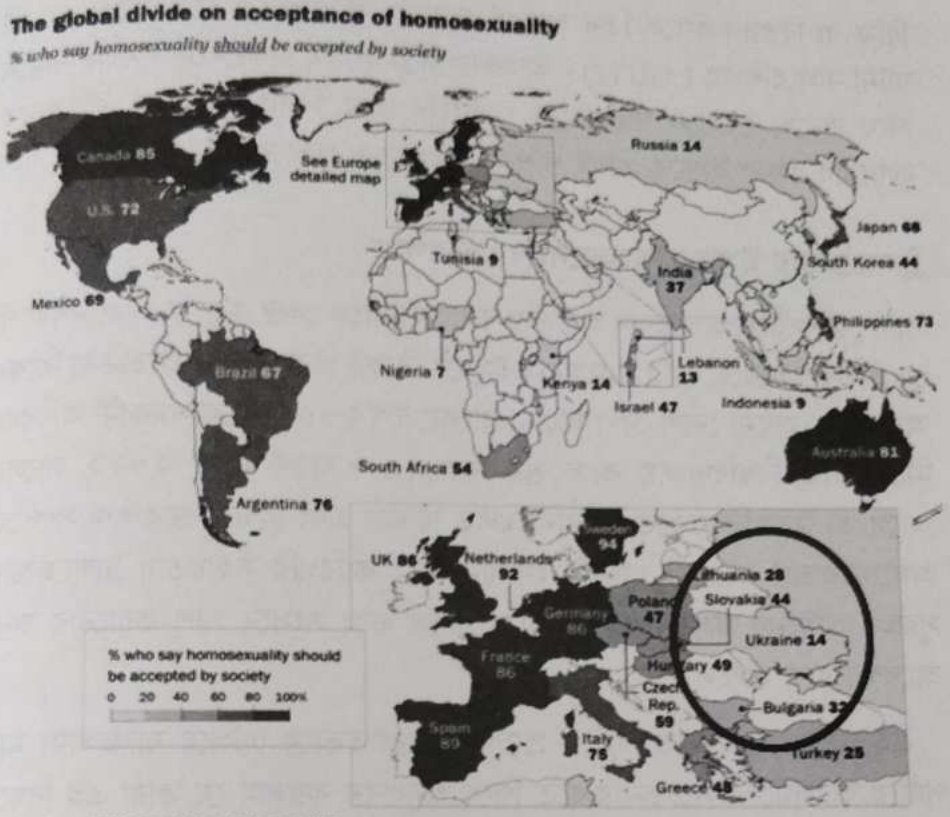
হাঙ্গেরীতে শিশু জন্মহার অনেক কমে গেছে। এটির মোকাবেলায় হাঙ্গেরি পরিবারিক মূল্যবোধ বা প্রো-ফ্যামিলি নীতি গ্রহণ করেছে যার আলোকে ট্রান্সজেন্ডারদের আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (Hungary Court Closes Door on Transgender Legal Recognition[৪]। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার স্টাডিজ পড়ানো নিষিদ্ধ করেছে।

যে পূর্ব ইউরোপ এক সময় সমকামী অধিকারের তীর্থ ভূমি ছিল, এখন সেখানে জনসমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে (Eastern Europe was once a world leader on gay rights. Then it ran out of scapegoats)।[৫]

পোলান্ড সরকারও ফ্যামিলি চার্টার নীতির আলোকে LGBTQ+-এর বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে (Polish president issues campaign pledge to fight 'LGBT ideology)[৬]। বুলগেরিয়া এবং রাশিয়াতে সমকামী/LGBTQ+-এর প্রতি জনসমর্থন কমে যথাক্রমে ৩২% এবং ১৪% হয়েছে। রাশিয়া LGBTQ+ কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে (Putin signs expanded anti-LGBTQ laws in Russia, in latest crackdown on rights)[৭]। সম্প্রতি জর্জিয়ার সংসদ LGBTQ+ অধিকার সীমিত করার পক্ষে ভোট দিয়েছে[৮]।

আফ্রিকায় বিরোধিতা বেড়েছে

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে LGBTQ+ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে কঠোর আইন ও নীতি প্রবর্তন হয়েছে, যা পশ্চিমা দেশগুলিতে উদ্বেগ তৈরী করেছে। ২০২৪ সালে ঘানায় পাস হওয়া একটি আইনে সমকামী সম্পর্ক এবং LGBTQ+ অধিকার প্রচারের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনটি দেশটির সংস্কৃতিগত মূল্যবোধের ইস্যুতে তৈরী করা হয়েছে[৯]। কেনিয়াতে আইন-প্রণেতারা একটি নতুন বিল নিয়ে আলোচনা করছে, যা সমকামিতা ও LGBTQ+ অধিকার প্রচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করবে। এছাড়া, উগান্ডা, নাইজেরিয়া, এবং সুদানে LGBTQ+ বিরোধী মনোভাব আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।



Source: Spring 2019 Global Attitudes Survey. Q31.
PEW RESEARCH CENTER

সমকামিতার প্রসারের বিরুদ্ধে মালেশিয়ার কঠোর অবস্থান

২০২৩ সালে সুইস ঘড়ি ব্র্যান্ড Swatch-এর প্রাইড কালেকশন নিয়ে মালয়েশিয়ায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই কালেকশনে LGBTQ+ অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য রঙধনু-থিমযুক্ত ডিজাইনগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। মে মাসে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ Swatch এর বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৬৪টি প্রাইড কালেকশনের ঘড়ি জব্দ করে। সরকার এই ঘড়িকে 'সামাজিক নীতিমালা' বিরোধী বলে দাবি করে এবং জানায় যে, এগুলো দেশের আইন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় Swatch মালয়েশিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে মামলা করে। তাদের যুক্তি ছিল যে প্রাইড থিমযুক্ত ঘড়িগুলো মূলত অন্তর্ভুক্তির প্রতীক এবং এগুলো রাজনৈতিকভাবে উস্কানিমূলক নয়। পরে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে দেয় যে, এ ধরনের প্রাইড-থিমযুক্ত পণ্য

বিক্রি বা বিতরণ করলে তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা হতে পারে১০। এই ঘটনা মালয়েশিয়ায় LGBTQ+ অধিকার নিয়ে কঠোর অবস্থানকে পুনরায় সামনে নিয়ে আসে, যেখানে সমকামিতা বেআইনি এবং নির্বাচনের সময় ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ রক্ষার ইস্যুতে প্রায়ই পশ্চিমা সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিরোধিতা করা হয়।

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে বাংলাদেশে তোলপাড়

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সারাদেশব্যাপী যে প্রতিবাদ হয়েছে, তা LGBTQ+ ইস্যুতে বিশ্বেই বিরল। এমন প্রতিক্রিয়া বিশ্বের আর অন্য কোনো দেশে দেখা যায়নি। বাংলাদেশে ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করলেও সাধারণ মানুষ ২০২২ সালের আগে তা উপলব্ধি করতে পারেনি। মূলত হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দ সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে। পশ্চিমা অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তায় ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সংসদে পাশ করানোর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল।

এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঠ পর্যায়ে আলিমদের সচেতন করতে গিয়ে অনুধাবন করলাম যে তারা এই বিষয়ে কথা বলে সরকারের রোষানলে পড়তে চান না, গ্রেফতার আতঙ্ক তাদের মধ্যে কাজ করত।

নারী দিবস উপলক্ষে এক ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টকে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দিতে বাঁধা দেওয়ার পর ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি দেশে ভাইরাল হয়ে যায়। এর মাস দু'য়েক পর ব্র্যাকের খণ্ডকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাব এক সেমিনারে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে আলোচনা করার সময় শরীফ থেকে শরীফার গল্পটি ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান। সেই সেমিনারে আমার বক্তব্যও ভাইরাল হয়েছিল।

অতঃপর, আসিফ মাহতাবকে চাকরিচ্যুত করার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। একই ইস্যুতে আমার প্রতিষ্ঠান (আইইউবি) আমাকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের কারণে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। শরীফার গল্পের পাতার ছিঁড়ে প্রতিবাদ সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে, ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে একটি নাটক প্রচারিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ভাইরাল হয়, যার কারণে বাংলাদেশের ওয়ালটন কোম্পানি জনপরিসরে দুঃখ প্রকাশ করে এবং সেই অভিনেতাও ক্ষমা চান। এরপর আড়ংয়ের শিশুদের পাঞ্জাবীতে সমকামিতার প্রতীক ব্যবহার করার ইস্যুটি আবারও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়, এবং ব্র্যাক ও বিকাশকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। পপুলার ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বনফুল মিষ্টির ব্র্যান্ড LGBTQ+ ইস্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়। LGBTQ+ নিয়ে জনসম্পৃক্ততা নীতি পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

References

1. Target Sheds $14 Billion in Value on Retail Uncertainty, LGBTQ Backlash. The Business of Fashion https://www.businessoffashion.com/news/retail/target-sheds-14-billion-in-value-on-retail-uncertainty-lgbtq-backlash/ (2023).
2. Who is Giorgia Meloni? The rise to power of Italy's new far-right PM - BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-63351655?fbclid=IwAR14ipv9USSaDpuAdGL_XViXtTWS3ERP6a2PwB9jZr700vXxlUvWBGPF0JU.
3. Archive, V. A. & feed, G. author R. Scotland's Nicola Sturgeon quits amid anger at transgender law. https://nypost.com/2023/02/15/scotlands-nicola-sturgeon-quits-amid-anger-at-transgender-law/ (2023).
4. Hungary Court Closes Door on Transgender Legal Recognition. Human Rights Watch https://www.hrw.org/news/2023/02/09/hungary-court-closes-door-transgender-legal-recognition (2023).
5. Eastern Europe was once a world leader on gay rights. Then it ran out of scapegoats | CNN. https://edition.cnn.com/2021/07/01/europe/lgbtq-rights-hungary-eastern-europe-intl-cmd/index.html.
6. Walker, S. Polish president issues campaign pledge to fight 'LGBT ideology'. The Guardian (2020).
7. Chernova, I. K., Anna. Putin signs expanded anti-LGBTQ laws in Russia, in latest crackdown on rights. CNN https://www.cnn.com/2022/12/05/europe/russia-lgbtq-propaganda-law-signed-by-putin-intl/index.html (2022).
8. Georgia's parliament approves law curbing LGBTQ rights. Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2024/9/17/georgias-parliament-

approves-law-curbing-lgbtq-rights.

9. Ghana: Supreme Court Upholds Colonial-Era Anti-LGBT Law | Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2024/07/29/ghana-supreme-court-upholds-colonial-era-anti-lgbt-law (2024).

10. Malaysia Threatens Prison for Possession of LGBTQ-Themed Swatch Watches. https://thediplomat.com/2023/08/malaysia-threatens-prison-for-possession-of-lgbtq-themed-swatch-watches/.

বাংলাদেশে সমকামিতা প্রতিরোধ কৌশল

LGBTQ+ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যার একমাত্র পরিণতি মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করা। এই মতবাদ ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। সমকামিতার ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনার শুরুতে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামিক স্কলাররা 'জাতীয় মুফতি বোর্ড'-এর পক্ষ থেকে দলীলসমৃদ্ধ বিস্তারিত ফতোয়া প্রকাশ করা হয় (০৬ জানুয়ারি ২০২৪)[১]। এটি আল কাউসার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত ফতোয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে-

"ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ (ঈমান পরিপন্থী)। যা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির চরম বিকৃতি এবং তাঁর দেয়া শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহর বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। একইসাথে তা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ, সুস্থ রুচিবোধ পরিপন্থী ও সমাজ বিধ্বংসী মতবাদ। বিকৃত ও সুস্থ রুচিবোধ পরিপন্থী এ মতবাদটি ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক পর্যায়ের হারাম ও ভয়াবহ কবীরা গুনাহ এবং ভয়ংকর কুফরি মতবাদ। শরীয়তে যেখানে নারী-পুরুষের পরস্পর বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বন করাকেই লানত করা হয়েছে সেখানে ট্রান্সজেন্ডারবাদে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যই নয়; বরং নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত লিঙ্গপরিচয়কেই পরিবর্তন করে দেয়া হচ্ছে। এটা যে ভয়াবহ গযব ও লানতের কাজ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।"

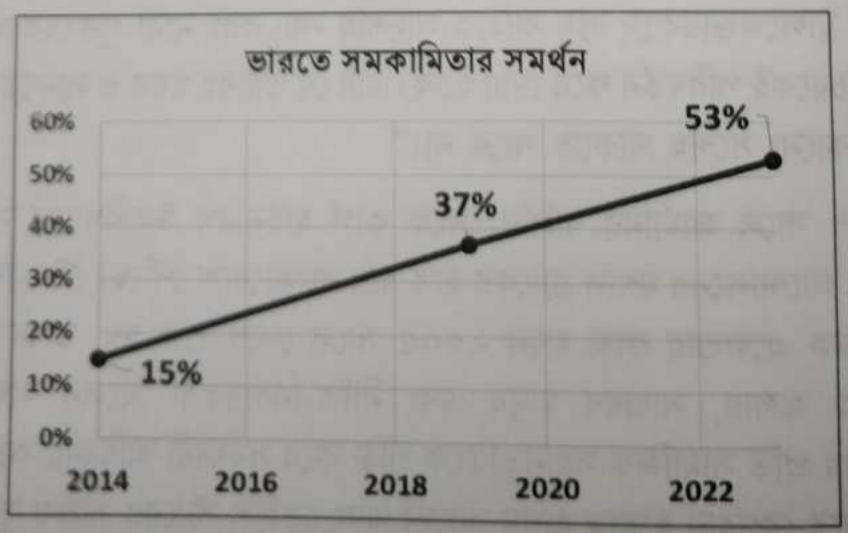
১৯৬৭ সালে জার্মানির বার্লিন থেকে কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের সমকামী অধিকার আন্দোলনের মশাল ব্র্যাকের হাত ধরে বাংলাদেশে পৌঁছে। যৌন-বিকৃতির এই বৈশ্বিক এজেন্ডার কাজ যখন ২০০৫ সালে দেশে শুরু হয়, তখন দেশের ইসলামিক স্কলার, সাধারণ মানুষ এবং নীতি-নির্ধারকরা ছিলেন অন্ধকারে। হিজড়াদের প্রতি সামাজিক সহানুভূতিকে পুঁজি করে সমকামী অধিকার আন্দোলন জনপরিসরে বেগবান হয়েছে প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের সক্রিয় ভূমিকায়।

এর ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা সংস্থার সহযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি হয়, এবং সেটি ২০২৪ সালের শুরুর দিকে সংসদ অধিবেশনে আইনে পরিণত হওয়ার কথা ছিল।

সমকামী-বান্ধব সমাজ তৈরির লক্ষ্যে ব্র্যাক এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার (যেমন ইউনিসেফ) উদ্যোগে লবিং-এ ২০১২ সালে পাঠ্যপুস্তকে কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন অন্তর্ভুক্তির প্রাথমিক কাজ শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে যৌন শিক্ষার কার্যক্রম যৌন বৈচিত্র্যের আড়ালে আরও বিস্তৃত হয়। সপ্তম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বইতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ (শরীফ থেকে শরীফার গল্প) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো এই ইস্যুতে ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় মূলত সারা দেশে মানুষ সমকামিতা নিয়ে প্রথম সজাগ হতে শুরু করে।

বাংলাদেশের জন্য শঙ্কার বিষয়ঃ ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

ভারতীয় সংস্কৃতি বাংলাদেশের জন্য শঙ্কার বিষয়। সমকামিতা নিয়ে সামাজিক পটপরিবর্তনের প্রভাব সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের সমাজে পড়তে পারে। আমেরিকার পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভারতে সমকামিতার প্রতি সমর্থন ছিল মাত্র ১৫%, এবং ২০১৮ সালে সমকামিতা বৈধ হওয়ার পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭%[২]। ২০২৩ সালে এই হার আরও বেড়ে ৫৩%-এ পৌঁছেছে[৩]। ভারতের নাটক ও সিনেমাগুলো সমকামিতায় পূর্ণ, যা পশ্চিমা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির সাথে পাল্লা দিচ্ছে।



সমকামিতা বৈধ হওয়ার পর ভারতীয় বিনোদন ইন্ড্রাস্ট্রি LGBTQ+ সামাজিকীকরণে এত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে যে বলিউডকে এই ক্ষেত্রে হলিউডের সাথে তুলনা করা শুরু হয়েছে। শুরুতে সমকামী চরিত্র নিয়ে সামালোচনা হলেও সময়ের সাথে সাথে তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা শুরু হয় [৪]। ভারতীয় বিনোদন মিডিয়া সমকামিতা ইতিবাচক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশী মডেল ভারতে নির্মিত সিনেমায় সমকামী চরিত্রে অভিনয় করে মিডিয়াতে কিছুটা সমালোচনার মুখে পড়লেও সমকামী চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী নিজেকে তৃপ্ত মনে করেন। মিডিয়ার শিরোনামে বলা হয়– 'ঘনিষ্ঠ সমকামী চরিত্রে অভিনয় করে তৃপ্ত বাঁধন'। এই সমালোচনায় বাঁধনের পক্ষ নিয়ে সাবেক অভিনেত্রী বন্যা মির্জা অন্য মিডিয়া কর্মীদের বলেন- '*আপনারাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন সমকামী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য*'[৫]

Bloomberg

Netflix, Bollywood and India's Biggest Companies Take a Stand for LGBTQ Inclusion

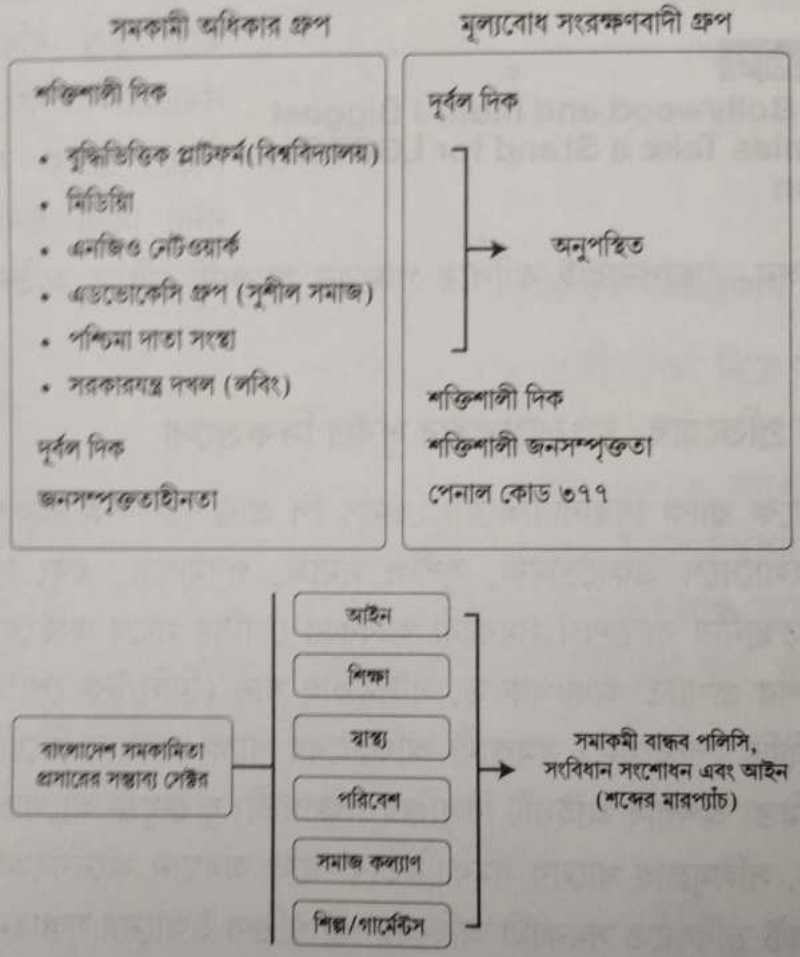
সমকামিতা প্রতিরোধ- বাংলাদেশের দূর্বল দিকগুলো

গত দুই দশকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে একাডেমিয়া, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সমকামী অধিকার গোষ্ঠীর সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি দেশের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান (যিনি টক শো'র মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন) সমকামী অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং তিনি সমকামিতা অপরাধ আইনটি বিলুপ্তির পক্ষপাতী। যুক্তিযুক্ত আলোচনার জন্য সুপরিচিত ড. সলিমুল্লাহ খানের সমকামিতার পক্ষে অবস্থান অনেককেই বিস্মিত করেছে। নিকট ভবিষ্যতে সমকামী অধিকারপন্থী শক্তির উত্থানের সম্ভাবনা দিয়েছে এবং এর ফলে সমকামিতা প্রতিরোধের বিষয়টি বড় একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে

প্রফেসর সলিমুল্লাহ খানের
এলজিবিটি সমর্থন বিষয়ক বক্তব্য
স্মার্টফোনে QR Code স্ক্যান করে
ইউটিউবে ভিডিও দেখা যাবে

আবির্ভূত হচ্ছে। তাই এটির প্রতিরোধ কৌশল নির্ধারণের আগে আমাদের দুর্বলতা এবং শক্তিমত্তার জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

বাংলাদেশে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাত সক্রিয়, যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সমাজকল্যাণ, এবং গার্মেন্টস শিল্প অন্যতম। অন্যদিকে, সমাজের মূল্যবোধ রক্ষায় আমাদের শক্তির জায়গায় দুটি বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে—মাঠ পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততার সুযোগ এবং সমকামিতা অপরাধ আইন (ধারা ৩৭৭) অক্ষুণ্ণ রাখা।



সমকামিতা নিয়ে বিষয়গুলোতে সচেতনতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে

১। শব্দের মারপ্যাঁচ সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতা

বর্তমানের অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেয়ার পরপর জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দাতা সংস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের কথা বার বার উঠাচ্ছেন। সমাজের সব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি শব্দটি সচরাচর ব্যবহার করা হলেও LGBTQ+ গোষ্ঠী এই শব্দটিকে নিজেদের অন্তর্ভুক্তির জন্য সুকৌশলে ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের প্রধান দাবী করলেন অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র। সাম্প্রতিককালে দেখা গেল মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তির আড়ালে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ বাংলাদেশে অফিস প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তাব করেছে। এই সংস্থার মানবাধিকার প্রশ্নে অন্যতম প্রধান কাজ করে সমকামিতা নিয়ে বৈষম্য কমানো এবং সমকামিতা অপরাধ আইনটি বাতিল করা।

শুনতে ইতিবাচক মনে হলেও মানবাধিকার, সমতা, বৈচিত্র্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যৌন সংখ্যালঘু এবং অন্তর্ভুক্তি (Inclusive)- এই শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকারান্তরে LGBTQ+ প্রসারের ব্যবহার করা হয়। নতুন সরকারের অধীনে আইন এবং সংবিধানের সংস্কার করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় যেন কৌশলে LGBTQ+ সমর্থনে শব্দকে ঢাল না বানাতে পারে এজন্য আমাদের সচেতনতা জরুরী।

সমকামিতার জড়িত শব্দের মারপ্যাঁচ নিয়ে সচেতনতার জন্য বইয়ের শেষে চেকলিস্ট যুক্ত করা হয়েছে।

শব্দের মারপ্যাঁচ কেইস স্টাডি ০১- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা

অন্তর্বর্তী সরকার বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে করার উদ্যোগ নিয়েছে। মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বিচারিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করে দেশে-বিদেশে কুখ্যাতি অর্জন করেছে এই ট্রাইব্যুনাল। সে কারণে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ সংশোধনের উদ্যাগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর বাসস-এর খবর অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের আইনে আটটি বিষয়ে সংশোধনী আনার খসড়া প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "সংশোধনের খসড়ায় আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধের

সংজ্ঞায় গুম ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা যুক্ত করা... প্রস্তাব করা হয়েছে।" খসড়া প্রস্তাব তুলে ধরা সিনিয়র আইন সচিবের বরাতে আরো বলা হয়েছে "এই সংশোধনীর মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় গুম, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন দাসত্ব, জোর করে যৌনকর্ম, জোর করে গর্ভধারণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আগের আইনে ছিল না।"

স্পষ্টতই লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (gender-based violence) ও অন্যান্য যৌন অপরাধকে আইনের বিচারিক আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিকট অতীতে আমাদের দেশে স্বৈরাচারী সরকার আমলে এ ধরণের অপরাধ হওয়ার অভিযোগ শোনা যায়নি। তারপরও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই হয়ত এসব অপরাধকে ট্রাইব্যুনালের বিচারিক এখতিয়ারভুক্ত করা হচ্ছে। যৌন অপরাধের বিচার আমাদের প্রচলিত আইনেও সুযোগ রয়েছে। এখানে widespread and systematic (ব্যাপক ও পদ্ধতিগত) অপরাধের বিচার উদ্দেশ্য। তবে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে 'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা' বা ইংরেজিতে gender-based violence বলতে কী বুঝানো হচ্ছে।

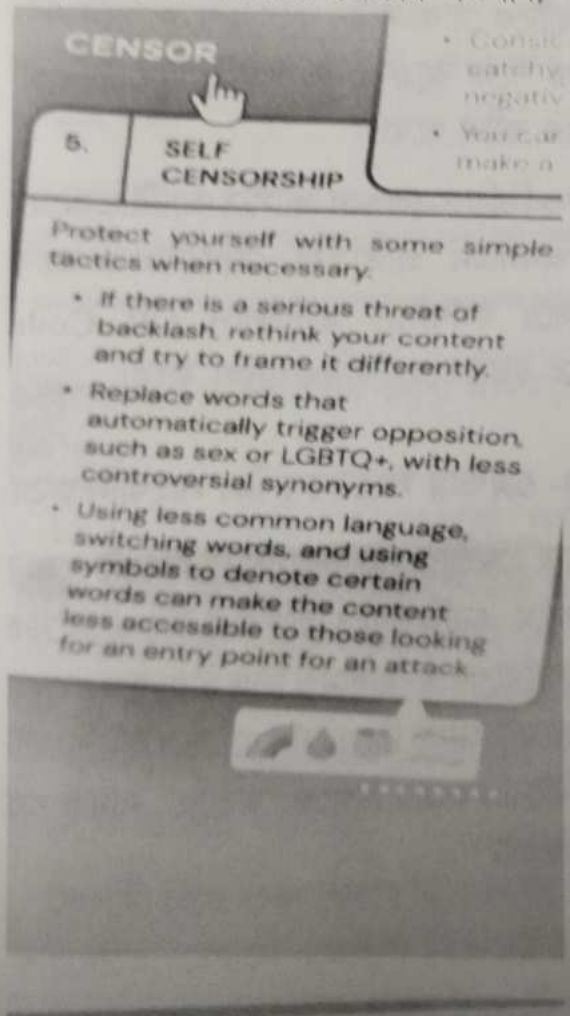
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনটি মূলত নেদারল্যান্ডসের দি হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) মূল সনদ ১৯৯৮ সালের 'রোম সংবিধি'কে অনুসরণ করেই সংশোধন করা হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। উদ্দেশ্য হলো বিচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও মানবাধিকার নীতি মেনে চলা।

রোম সংবিধিতে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিভিন্ন যৌন অপরাধের বিচার এর সুযোগ রয়েছে। Article 7 (1) (g) অনুযায়ী Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; এগুলো আইসিসিতে বিচারযোগ্য অপরাধ। দৃশ্যত সেসকল যৌন অপরাধ বা সহিংসতাই এখন ১৯৭৩ এর আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

এ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে খসড়া আইনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (gender-based violence) নামে নতুন অপরাধের সংযোজন প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু রোম সংবিধিতে gender-based violence নামে কোনো অপরাধ নেই। তবে gender persecution বলে একটি অপরাধের উল্লেখ আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ

ইত্যাদি কারণে persecution (মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ) এর মতোই জেন্ডার পারসিকিউশন একটি অপরাধ। অধিকন্তু, (Article 7 (3))-এ জেন্ডারের সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়েছে এভাবে- "For the purpose of this Statute, it is understood that the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above." তার মানে সেখানে জেন্ডার বলতে সুনির্দিষ্টভাবে জৈবিক (বায়োলজিক্যাল) নারী ও পুরুষ- অর্থাৎ শুধুমাত্র দুটি লিঙ্গকে বুঝানো হয়েছে, এর বাইরে কিছু নয়।

'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা' বা (gender-based violence) বলতে জেন্ডার এর সংজ্ঞাই (অর্থাৎ জৈবিক নারী-পুরুষ দুটি মাত্র লিঙ্গ) এ সংশোধনীতে বুঝানো হচ্ছে। সংশোধনী পাস করার আগে অবশ্যই সেটি স্পষ্ট করতে হবে এবং আইনে স্পষ্টভাষায় সেটির উল্লেখ থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যেন "লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা"র আড়ালে জেন্ডার মতবাদ/ ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা LGBTQ+কে বৈধতার সুযোগ যাতে ভবিষ্যতে তৈরী না হয় সেদিক সচেতনতা জরুরি।



আপডেট: পলিসিতে সেই শব্দটি পরবর্তীতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শব্দের মারপ্যাঁচ কেইস স্টাডি ০২- ব্র্যাকের জেন্ডার জাস্টিস কর্মশালা

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Governance and Development Program জেন্ডার জাস্টিস অ্যাক্টিভিস্টদের বিরুদ্ধে অনলাইন প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়

কিভাবে ভাষার সূক্ষ্ম ব্যবহার করে সমকামিতার প্রচার চালানো যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এখানে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনার আড়ালে সমকামী অ্যাক্টিভিজমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে "জেন্ডার" বলতে সাধারণত নারী এবং পুরুষকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু ব্র্যাক তাদের জেন্ডার পলিসির আলোকে LGBTQ+ অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রশিক্ষণের নমুনাসমূহ থেকে কিছু উদাহরণ:

* গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকলে বিষয়বস্তুর পুনর্বিবেচনা করুন এবং তা ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করুন।
* এমন শব্দ পরিহার করুন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিরোধিতা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন যৌনতা বা LGBTQ+; এর পরিবর্তে কম বিতর্কিত সমার্থক শব্দ ব্যবহার করুন।
* কম প্রচলিত ভাষা বা এমন শব্দ ব্যবহার করুন যা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। এতে নির্দিষ্ট শব্দকে প্রতীক (যেমন LGBTQ প্রতীক) দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব, যা বিষয়টিকে বোঝা কঠিন করে তুলতে পারে এবং আগ্রহীদের পক্ষে আক্রমণের পয়েন্ট খুঁজে আক্রমণ করা আরও কঠিন হবে।



প্রাসঙ্গিক ভিডিও-জেন্ডার জাস্টিস অ্যাক্টিভিস্টদের বিরুদ্ধে অনলাইন প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা। স্মার্টফোনে OR Code স্ক্যান করে ইউটিউবে ভিডিও দেখা যাবে।

শব্দের মারপ্যাঁচ কেইস স্টাডি ০৩- জেন্ডার সংবেদনশীল সাংবাদিকতা

এলজিবিটি মূলধারায়ন করতে মিডিয়ায় জেন্ডার সংবেদশনশীল বিষয়টি জোর দেয়া হচ্ছে। বিদেশী দাতা সংস্থার মাধ্যমে এনজিওরাও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে অনেক বছর ধরে। পশ্চিমা দেশগুলোর মত বাংলাদেশের গণমাধ্যমও লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দের ব্যবহার গ্রহণ করা শুরু করেছে। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেল ইনিশিয়েটি (এমআরডিআই)। 'সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতার দিগন্তে জেন্ডার' নামক পথ খোঁজার নির্দেশিকা তৈরী করেছে এনজিওটি[৬]।

২। মানবাধিকারের ইসলামি ভাষ্য ও সমকামিতা

মানবাধিকার ধারণার পশ্চিমা বয়ান নিয়ে শুরু থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অঞ্চলে গুরুতর আপত্তি ছিল। যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বিশ্বের অনেক দেশ তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, এই ধারণা মূলত পশ্চিমা সমাজের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত। কিন্তু পশ্চিমা প্রভাব ও ক্ষমতার মাধ্যমে মানবাধিকারকে সর্বজনীন বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে, মানবাধিকার পশ্চিমা বিশ্বে নব্য মার্কিন উপনিবেশবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব শুরু থেকেই এই ধারণার বিরোধিতা করে আসছে। একইভাবে, পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে মানবাধিকার ধারণা অধিকারের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং দায়িত্ব-কেন্দ্রিক।

[৯] কিছু শব্দ এবং বিকল্প

সাধারণভাবে এড়িয়ে চলুন	তার বদলে ব্যবহার করতে পারেন
নারী-পুরুষ	মানুষ, ব্যক্তি
ছেলে-মেয়ে	সন্তান, ব্যক্তি
সভাপতি (মহিলা সভাপতি)	সভাপ্রধান
মহোদয় (মহোদয়া)	সুধী, উপস্থিত সকলে, সম্বোধন হিসেবে সুহৃদ, বন্ধু, শ্রদ্ধাভাজন
ম্যাডাম, স্যার	সম্মানিত সুধী, সম্বোধন হিসেবে সুহৃদ, বন্ধু, শ্রদ্ধাভাজন...
ছেলেবেলা	ছোটবেলা, শিশুকাল
গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড, ছেলেবন্ধু বা মেয়েবন্ধু	বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সঙ্গী, বিশেষ বন্ধু, নিকটসঙ্গী, জীবনসঙ্গী, জুটি...
ছাত্র	শিক্ষার্থী
গায়ক	সংগীতশিল্পী
লেখক [৫]	গল্পকার, ঔপন্যাসিক, রচয়িতা, কবি, প্রবন্ধকার
কাপুরুষ বা কাপুরুষতা	ভীরু, ভীরুতা
দলপতি, দলনেতা	দলপ্রধান

[৪] ইংরেজিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের পরিচিতিবাচকতা বোঝাতে 'পারসন' ব্যবহৃত হয়। বাংলায় 'পারসন' বো 'পুরুষ' ব্যবহৃত হয়: উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ। অর্থাৎ যথাক্রমে আমি-আমরা, তুমি-তে সে-তারা, রহিমা-রহিম—সবাই 'পুরুষ'!

[৫] গায়ক, লেখক, অধ্যাপক—এ ধরনের কিছু শব্দ সব লিঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাও যুক্তিসংগত হতে পারে ।

১৯৮১ সালে আফ্রিকার দেশগুলো "আফ্রিকায় মানবাধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সনদ" গ্রহণ করে, যা দায়িত্ব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে। বিভিন্ন সময় এ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্ক হয়েছে, তবে মূল প্রশ্নটি এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পশ্চিমা পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতি, পশ্চিমা মিডিয়া, এনজিওগুলোর প্রচারণা এবং বহুজাতিক কোম্পানির অর্থায়ন মানবাধিকার ধারণার পশ্চিমা বয়ানকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামী বিশ্বে মানবাধিকার নিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে ১৯৯০ সালে কায়রোতে, যেখানে ওআইসি (ইসলামিক কনফারেন্স অর্গানাইজেশন) "কায়রো ঘোষণা" গ্রহণ করে। এই ঘোষণা ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে মানবাধিকারের একটি

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। যদিও এর আগে মাওলানা মওদুদী ও অন্যান্য ইসলামিক চিন্তাবিদগণ পশ্চিমা ও ইসলামী মানবাধিকার ধারণার বিস্তর পার্থক্য নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তবুও পশ্চিমা সমালোচকরা কায়রো ঘোষণাকে কঠোর সমালোচনার মুখে ফেলে।

মুসলিম দেশগুলো কায়রো ঘোষণা গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এর ফলে, কায়রো ঘোষণা বাস্তবায়িত না হয়ে কাগজে-কলমে মানবাধিকার হিসেবে রয়ে গেছে।

এরপর ২০০২ সালে আরব লীগ মানবাধিকার বিষয়ে আরব সনদ ঘোষণা করে, কিন্তু রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসকদের অনাগ্রহের কারণে এটিও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ২০১১ সালে ওআইসি জাতিসংঘে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০২১ সালে কায়রো ঘোষণাকে সংশোধন করে একটি নতুন ঘোষণা গৃহীত হয়, যা কিছু ইসলামী মূল্যবোধ বাদ দিলে প্রায় ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের ঘোষণার প্রতিলিপি মাত্র। তবে এই নতুন ঘোষণায়ও সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।

সারকথা এবং বাংলাদেশের করণীয়-

* সমকামিতা ও জেন্ডার পরিচয়বাদ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
* এই আন্দোলনের মূল উৎস আধুনিক পশ্চিমা রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। তবে এই আন্দোলনের সর্বজনীনতার দাবি অত্যন্ত প্রশ্নসাপেক্ষ এবং এর প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।
* অনেক অপশ্চিমা দেশ তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক মানবাধিকার ঘোষণা জারি করেছে, যার মধ্যে ১৯৯০ সালে গৃহীত ওআইসির কায়রো ঘোষণা অন্যতম।
* বাংলাদেশ, যা ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র, সেখানে মানবাধিকার দর্শন মূলত কায়রো ঘোষণার দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব, বাংলাদেশে মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে সমকামিতা ও জেন্ডার পরিচয়বাদ প্রতিষ্ঠা বা প্রচারণার জন্য বিশেষ কোন সুযোগ নেই।

৩। বাংলাদেশের সংবিধান সমকামিতা বিরোধী

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" দিয়ে শুরু হয়েছে, যা একটি ন্যারেটিভ তৈরি করতে সহায়ক হতে পারে। অনুচ্ছেদ ২ক অনুযায়ী, ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম। রাষ্ট্রধর্ম বাতিলের জন্য হাইকোর্টে রিট করা হলেও, হাইকোর্ট তা খারিজ করেছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিপক্ষে রাষ্ট্রধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে সেকুলার পক্ষের বিভিন্ন অপপ্রচার রয়েছে, যেমন: "ধর্ম তো ব্যক্তির জন্য, রাষ্ট্র কি নামাজ-রোজা করবে নাকি?" এসব নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। যেমন রাষ্ট্র কথা বলতে পারে না, তবুও তো রাষ্ট্রভাষা রয়েছে। তাছাড়া, পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানেই রাষ্ট্রধর্মের বিধান রয়েছে।

সংবিধানে শুধু ইসলাম নয়, অন্যান্য ধর্মের অধিকারও স্বীকৃত। ট্রান্সজেন্ডারবাদ শুধু ইসলামের নয়, সব ধর্মমতের বিরোধী। অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী, রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেজন্য মদ, জুয়া নিষিদ্ধ এবং পতিতাবৃত্তির মতো কর্মকাণ্ড নির্মূল করা উচিত ছিল। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, এখন ট্রান্সজেন্ডার বৈধতার মাধ্যমে সমকামিতার প্রচলন করার চিন্তাভাবনা অগ্রহণযোগ্য। আইন করে লিঙ্গ পরিবর্তন চিকিৎসা বৈধ করা কি সংবিধানসম্মত হতে পারে? অথচ পেনাল কোড ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৭ অনুযায়ী, সমকামিতা সরাসরি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দেশীয় সমাজ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ অনুযায়ী, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষা করা। এ দেশের মানুষের সংস্কৃতি কখনোই সমকামিতা নামক বিকৃতিকে গ্রহণ করেনি, করবেও না। এ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষা এবং বিকৃত সংস্কৃতির প্রবেশ প্রতিহত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তদুপরি, ইসলাম এ দেশের নব্বই শতাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচারিক ধর্ম; তাই তাদের জাতীয় সংস্কৃতি কখনোই ইসলাম-বিরোধী হতে পারে না।

সমতা ও বৈষম্য (অনুচ্ছেদ ২৭-২৯): নারী-পুরুষ ছাড়া তৃতীয় কোনো লিঙ্গের স্বীকৃতি সংবিধানবিরোধী। সংবিধানে নারী-পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো লিঙ্গের কথা উল্লেখ নেই। যদি স্বীকৃতি দিতে হয়, তবে প্রথমে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সংবিধানে এমন কোনো বিকৃতি প্রবেশের চেষ্টা হলে তা জনগণ মানবে না। অতএব, কথিত ট্রান্সজেন্ডারদের সাথে বৈষম্যের প্রশ্নই অবান্তর।

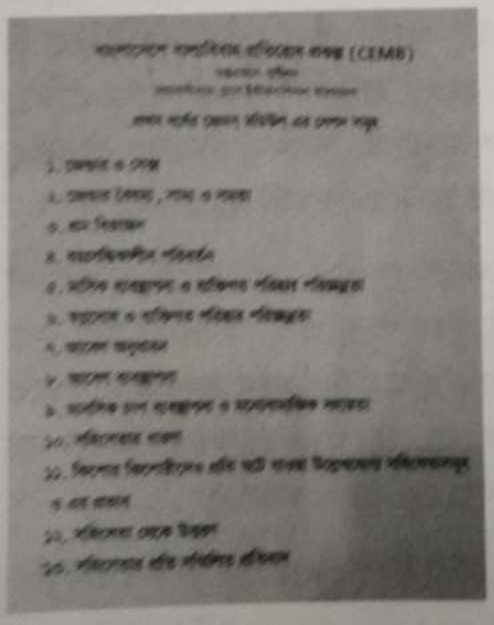
বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৯): নিজ নিজ মতামত ও

চিন্তা প্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত। তাই লেখালেখি ও বলার ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে চাপ দেয়া যেতে পারে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় অধিকার ও প্রচারের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪১): প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। ইসলামের বিধান প্রচার করা সাংবিধানিক অধিকার। তাছাড়া ফতোয়া মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ফতোয়া দেয়ার অধিকারও সংরক্ষিত। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফতোয়া বাস্তবায়নের চেষ্টা করা যাবে না।

৪। জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের আড়ালে সমকামিতা

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate change) বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হিসেবে শনাক্ত হওয়ায় এই ফিল্ডে পশ্চিমা দাতা সংস্থাগুলো প্রচুর অর্থায়ন করছে। এই সুযোগে উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু নিয়ে অর্থায়নে LGBTQ+ ইস্যুকে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈরী আবহাওয়ায় সমকামী গোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় আরো বেশী বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। জলবায়ু ন্যায্যতা এবং সমতার যুক্তিতে LGBTQ+কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে তেমন পরিচিত নয় এমন একটি এনজিওর কেইস উপস্থাপন করছি। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে জনজীবনে যে সমস্যা তৈরী হয়, সেগুলো নিরসনে সহযোগিতা করে 'সুশীলন' এনজিও। দেশে জনপরিসরে অপরিচিত হলেও অনেক পশ্চিমা সংস্থা 'সুশীল'নকে অর্থায়ন করে যা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রজেক্টের আড়ালে সুশীলন প্লান ইন্টারন্যাশনালের নেতৃত্বে তৈরী করা যৌন শিক্ষার জেমস কারিকুলামও শিক্ষা দিচ্ছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রকল্পে! জেমস কারিকুলাম নিয়ে যৌন-শিক্ষা পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।



৫। ইসলামের নামে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের কৌশল!

সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রথম নিবন্ধিত সংস্থা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক আহমেদ সালেহ ভুটানে আয়োজিত (পারো, ভুটান, ৪-৭ অক্টোবর ২০২২) এক সম্মেলনে জানান যে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারদের ব্যবহার করে মসজিদ ও মাদ্রাসার আড়ালে বাংলাদেশে সমকামিতার মূলধারাকরণ করার চেষ্টা চলছে। ভাবা যায়, ইসলামের ব্যানারে LGBTQ+ স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা! ৬ নভেম্বর ২০২০ সালে 'দাওয়াতুল কুরআন তৃতীয় লিঙ্গের মাদ্রাসা'র যাত্রা শুরু হয়, যা বিশ্বমিডিয়ায় প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মাদ্রাসা হিসেবে ব্যাপক আলোচিত হয়। সমাজে হিজড়াদের প্রতি সহানুভূতি কাজে লাগিয়ে সুকৌশলে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারিত করা হচ্ছে। মাত্র ১০ মাসের মধ্যে একই ব্যক্তির মাধ্যমে ২৬টি ট্রান্সজেন্ডার মাদ্রাসা চালু করা হয়[৭]। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, একই চক্র দেশের বিভিন্ন জেলায় ৬০টি ট্রান্সজেন্ডার মাদ্রাসা পরিচালনা করছে। ২০২৪ সালের এপ্রিলে এএফপির ব্যুরো চিফ (বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রেস সচিব) ময়মনসিংহে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মসজিদ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে LGBTQ+ গ্রুপ মাঠপর্যায়ে হিজড়াদের কথা বলে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বাংলাদেশে প্রসার করছে যা বন্ধু সোশ্যালের দাবীকে প্রমাণ করে।

Facts and Figures

Initiatives to diverse SOGIESC inclusion

- Hijra and Transgender people are getting social recognition by mass awareness and sensitization by the Bandhu and other CBOs
- Diverse SOGIESC people are getting access to justice through a network of Bandhu, other CSOs (BLAST, NLASO, ASK) and lawyers Community.
- Religious schools specialized for Hijra and Transgender community for mainstreaming

মাদ্রাসা শিক্ষায় বাড়ছে তৃতীয় লিঙ্গ

সানজুন আহমেদ

প্রকাশ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১, ১২:০০ এএম আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, ১১:৩৭ পিএম

অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং যুব-সমাজকে কেন্দ্র করে যৌন শিক্ষা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে যেখানে অনেক বাহ্যিক ইসলামি পোষাক

পরিহিত ছেলে এবং মেয়েদের অসচেতনতার কারণে অংশগ্রহণ করছে। এর মাধ্যমেও LGBTQ+ উদ্যোগ ইসলামের মাধ্যমে স্বাভাবিকীকরণে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আলিম এবং পিতামাতাদের এসব বিষয় সচেতনতা কাম্য।

৬। পুরস্কার বা স্বীকৃতির মোহ একটি ফাঁদ হতে পারে!

দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতির লাভের প্রতি এক ধরণের মোহ পরিলক্ষিত হয়। এটি প্রায়শই রাজনৈতিক বা কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। পুরস্কার বা স্বীকৃতির মাধ্যমে এনজিও বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উদীয়মান ব্যক্তিদের নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজে লাগাতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি সাধারণত ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতি একধরনের মানসিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, যা অনেক সময় তাদের অন্যায় কার্যক্রমের বিরুদ্ধেও নৈতিক প্রতিবাদ করার সাহসকে দুর্বল করে ফেলে। কারণ, এমন কিছু বলার অর্থ হতে পারে নিজের অর্জিত স্বীকৃতি বা পুরস্কারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। এটি বিশেষত দক্ষিণ এশীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক একটি বিষয়।

উদাহরণস্বরূপ, জাগো ফাউন্ডেশনের কর্ণধার ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। তবে, পরবর্তীতে পশ্চিমা সংস্থাগুলোর অর্থায়ন এবং প্রশংসা তাদের কর্মকাণ্ডে এমন কিছু কার্যক্রম যুক্ত করেছে যার মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডাও থাকে। জাগো ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে শব্দের মারপ্যাঁচ ব্যবহার করে তথ্য ডকুমেন্ট করা হয়েছে। একইভাবে, ব্র্যাকের 'আমরা নতুন নেটওয়ার্ক' (Amra Notun Network) এবং 'সমতন্ত্র' নামক প্ল্যাটফর্ম যৌন শিক্ষা কার্যক্রম কমিউনিটি পর্যায়ে তরুণদের মাধ্যমে পরিচালিত করে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমা অর্থায়নে দেশে পরিচালিত প্রায় সব যুব কার্যক্রমে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবেশ) সরাসরি বা প্রচ্ছন্নভাবে এলজিবিটি এজেন্ডা জড়িত থাকে।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এনজিও সমকামী অধিকারের প্রচারে পুরস্কার প্রদান করে কমিউনিটিতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। তাদের প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এই ধরণের তথ্য উল্লেখ রয়েছে। এই কারণেই বিষয়টি গভীরভাবে মূল্যায়ন এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

৭। LGBTQ+ প্রতিরোধের মালেশিয়া থেকে অনুপ্রেরণা

সমকামিতা ইস্যুটি এতটাই সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে যে উচ্চশিক্ষিত অনেক মুসলিম এবং নীতিনির্ধারক পশ্চিমাদের চাপের মুখে নিজেদের অবস্থান হারিয়ে ফেলতে পারেন। মানসিকভাবে দৃঢ় থাকার জন্য মালয়েশিয়াকে উদাহরণ হিসেবে রাখা যেতে পারে। মালয়েশিয়ার সরকার শুধুমাত্র LGBTQ অধিকারসমূহ স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং এর বিরুদ্ধে সাহসী পদক্ষেপ নিতেও পিছপা হয়নি। ২০২৩ সালে LGBTQ+দের প্রাইড মাস (জুন) উপলক্ষ্যে বিখ্যাত সোয়াচ ব্র্যান্ডের ঘড়িতে LGBTQ+ ফ্ল্যাগের প্রতীক ব্যবহার করা হয়। মালয়েশিয়ার সরকার এ বিষয়ে কঠোর সতর্কতা জারি করে জানায়, এই LGBTQ+ প্রতীকযুক্ত ঘড়ি ক্রয় করলে তাকে ৩ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

সমকামিতা প্রতিরোধে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়

১। সমকামিতা অপরাধ আইনটি (৩৭৭) অক্ষুণ্ন রাখা

২০০৭ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রথম ওয়ার্কশপেই সমকামী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে পেনাল কোড ৩৭৭-কে চিহ্নিত করা হয়। যখন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই আইনটি বাতিল করে সমকামিতাকে বৈধতা দেয়, তখন বাংলাদেশেও এ আইন বাতিল করা যায় কিনা, তা নিয়ে ২০০৯ সালে বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ-এর মাধ্যমে জাতিসংঘ ২০০৯, ২০১৩, এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকারকে আইনটি বাতিলের জন্য চাপ দেয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় খোলার উদ্যোগে আবারও জনপরিসরে এই আইনটি আলোচনায় আসে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে পেনাল কোড ৩৭৭ বাতিল করে সমকামিতাকে বৈধ করা।

নতুন করে সমকামিতাবিরোধী আইন প্রণয়নে উগান্ডা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে। সম্প্রতি ইরাক ও ঘানা সমকামিতা অপরাধ আইন তৈরিতে পশ্চিমা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে হস্তক্ষেপের কারণে বর্তমানে LGBTQ+-বিরোধী নতুন আইন তৈরি প্রায় অসম্ভব। বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত এই আইনটি বাংলাদেশে কখনো প্রয়োগ করা হয়নি। LGBTQ+ গ্রুপ এই আইনটিকে "পারমাণবিক বোমা"র সাথে তুলনা করে, যা ২০০৯ সালের ব্র্যাক মিটিং-এ আলোচিত হয়।

সমকামিতা অপরাধ আইনটি অত্যন্ত সংবেদনশীল, এবং এ বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা তৈরি হওয়ায় সমকামী সমর্থক গ্রুপ এই আইনটি বাইপাস করার জন্য অন্যান্য আইন সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন এবং ধর্ষণের সংজ্ঞা পরিবর্তনের মতো উদ্যোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন প্রথম আলো এবং বন্ধু সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত "হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষা" (১১ সেপ্টেম্বর ২০২২) শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন-

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আমাদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,

পুরোনো দণ্ডবিধি থেকে শুরু করে সব জায়গায়ই বাইনারি লিঙ্গের বাইরে চিন্তা করা হচ্ছে না (অর্থাৎ তিনি সমকামী বা লিঙ্গবৈচিত্র্যতার কথা বলছেন)। আমাদের আইনি কাঠামোতে ট্রান্সজেন্ডার মানুষের কথা একেবারেই নেই। ট্রান্সজেন্ডার মানুষেরা কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক প্লেসে অনেক ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার হন। আইনি সুরক্ষা না থাকায় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। গবেষণায় এসেছে, আইনের ৩৭৭ ধারাটি তাঁদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ আইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন। আমাদের একটি আলাদা ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন প্রয়োজন।

২। জনসম্পৃক্ততা তৈরীর অপার সম্ভাবনা

ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ জে. ডি. আনউইন ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত "Sex and Culture" গ্রন্থে ৮৬টি সভ্যতার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, যেখানে তিনি সমাজের যৌন আচরণ ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। গবেষণার উপসংহারে আনউইন দেখান, যেসব সমাজ কঠোর যৌন নীতি মেনে চলে—বিশেষত একগামিতা এবং বিবাহপূর্ব যৌন সংযম—সেগুলো সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। আনউইনের মতে, সংযম মানুষের শক্তিকে গঠনমূলক সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সহায়তা করে। তিনি আরও বলেন, কোনো সমাজ এই নীতিগুলো শিথিল করলে, তারা সামষ্টিক উন্নয়ন থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত আনন্দের দিকে মনোযোগ দেয়, ফলে সমাজ পতনের দিকে ধাবিত হয়।

বিভিন্ন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে সমকামিতা বিদ্যমান থাকলেও এটাকে এখনো গুনাহ বলে মনে করা হয়, অধিকার নয়। বর্তমানে কিছু পশ্চিমা অর্থায়নকৃত সংগঠন এবং স্থানীয় এনজিও সমকামিতার প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে মাঠপর্যায়ে নানা কৌশল গ্রহণ করছে, যা সরকার ও জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাবের সুযোগ নেয়।

২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৫০,০০০-এর বেশি মসজিদ ছিল, যা গত এক দশকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩ লাখের বেশি বলে ধারণা করা হয়। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজে প্রতিটি মসজিদে যদি ২০০ জন করে অংশগ্রহণ করে, তাহলে প্রায় ৬ কোটি মানুষ সাপ্তাহিকভাবে জুম্মায় অংশ নেন। LGBTQ+ গোষ্ঠী সমাজে যে প্রভাব তৈরির চেষ্টা করছে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ সচেতন হলে এক সপ্তাহের জুম্মার খুতবার মাধ্যমে তার চেয়ে বেশি প্রভাব তৈরি করতে পারেন।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএইড-এর অর্থায়নে সারা বাংলাদেশে সমতা প্রকল্পের মোড়কে এলজিবিটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। জেলা ভিত্তিক আইনজীবী সমিতিকে টার্গেট করে হিজড়াদের প্রতি সামাজিক সহানুভূতিকে ব্যবহার করে এলজিবিটি স্বাভাবিকীকরণের নেটওয়ার্ক তৈরী হয়েছে। এই বিষয়ে হিজড়াদের আড়ালে ট্রান্সজেন্ডারের উত্থান পরিচ্ছেদে সমতা প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩। গবেষণা, ট্রেইনিং এবং মনিটরিং

LGBTQ+ আন্দোলনের সাফল্যের মূলে রয়েছে গবেষণা ভিত্তিক তথ্য তৈরী করা যা পলিসি এবং আইন তৈরীতে নৈতিক ভিত্তি তৈরী করে। কমিউনিটিভিত্তিক জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। LGBTQ+ গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত ভাষা ও কৌশল পরিবর্তন করে, যা মনিটর করতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ওয়াচডগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। তথ্যভিত্তিক সচেতনতা কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

References

1. শরীয়তের দৃষ্টিতে
 ট্রান্সজেন্ডার ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ
 একটি প্রামাণ্য ফতোয়া. https://www.alkawsar.com/bn/article/3633/.
2. Kent, J. P. and N. The Global Divide on Homosexuality Persists. Pew Research Center https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/ (2020).
3. Miner, S. G. and W. Across Asia, views of same-sex marriage vary widely. Pew Research Center https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/11/27/across-asia-views-of-same-sex-marriage-vary-widely/ (2023).
4. Bollywood Movies Promoting LGBTQ After 377 Dilutions. - Asiana Times. https://asianatimes.com/bollywood-movie-promoting-lgbtq-after-377-dilution/ (2022).
5. আপনারাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন 'সমকামী' চরিত্র করার জন্য: বন্যা মির্জা | Bonya Mirza | Badhon | News.
6. Media Resources Development Initiative | MRDI. https://mrdibd.org/.
7. মাদ্রাসা শিক্ষায় বাড়ছে তৃতীয় লিঙ্গ. দেশ রূপান্তর https://tinyurl.com/2mh8z9jm
8. bdnews24.com. Country has 250,399 mosques: minister. Country has 250,399 mosques: minister https://bdnews24.com/bangladesh/country-has-250399-mosques-minister.

চেকলিস্ট

চেকলিস্ট-১-গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও রেফারেন্স।

স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিআর কোড (QR code) স্ক্যান করে ভিডিও (ইউটিউব) লিংক পাওয়া যাবে

১। কার্টুনের মাধ্যমে সমকামিতা শেখাচ্ছে ব্র্যাক || Debunking SRHR	
২। ব্র্যাক মামা সেক্স নামক কার্টুনে হস্তমৈথুন শেখাচ্ছে	
৩। ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের কনডম ব্যবহার শেখাচ্ছে	

৪। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে এলজিবিটি বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য নিয়ে কর্মশালা	
৫। যৌন শিক্ষার নামে বাংলাদেশে যা শেখানো হচ্ছে || বিবিসি বাংলা (জেমস কারিকুলাম)	
৬। প্রফেসর সলিমুল্লাহ খানের এলজিবিটি সমর্থন বিষয়ক বক্তব্য	

চেকলিস্ট-২- কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্সের পিডিএফ

কিআর কোড (QR code) স্ক্যান করে পিডিএফ গুগল ড্রাইভের লিংক পাওয়া যাবে। উল্লেখ যে ব্র্যাক এবং বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অনলাইন থেকে সরিয়ে ফেলা ডকুমেন্টও আছে।

https://tinyurl.com/58zjwj8m



চেকলিস্ট ৩- সমকামিতা নিয়ে শব্দের মারপ্যাঁচ বুঝতে শব্দের লিস্ট

নীতি-নির্ধারণী, সংবিধান, আইনি সংস্করণের সময় এই শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা হলে বুঝতে হবে শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে এলজিবিটি/সমকামিতা/যৌন অধিকারের কথা বলা হচ্ছে।

বাংলা	ইংরেজি
লিঙ্গ	Gender
যৌন-বৈচিত্র্য	Gender identity
লিঙ্গ-বৈচিত্র্য	Sexual orientation
যৌন স্বাস্থ্য	SRHR
যৌন সংখ্যালঘু	CSE (Sexual Education)
যৌনশিক্ষা	MSM (Man sex with man)
প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	SOGI
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী	Leaving no one behind
কাউকে বাদ দিয়ে নয়	Gender minority
যৌন অধিকার	Gender diverse
লিঙ্গ বৈষম্য	Gender based violence
লিঙ্গ সমতা	Third gender
জেন্ডার ভায়োলেন্স	Diversity
অন্তর্ভুক্তিমূলক	Inclusive

চেকলিস্ট ৪- কিছু পরিভাষার সহজ ব্যাখ্যা

এলজিবিটিকিউ (LGBTQ++)- এটি একটি ছাতা বা "আমব্রেলা টার্ম," যেখানে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার ছাড়াও আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই ছাতার নিচে অ্যাসেক্সুয়াল (Asexual) ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যারা যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন না। তবে, তারা যৌনসঙ্গীকে খুশি রাখতে শারীরিকভাবে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হতে পারেন, যদিও এতে তেমন কোনো আনন্দ অনুভব করেন না। তারা নিজেদের সাধারণত low sexual

dysfunction-এর রোগী মনে করেন না। মোট কথা, সমকামিতা আন্দোলনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ সংযোজন করা হয়, আবার পুরাতন শব্দগুলোর ব্যাখ্যা ও সীমাও পরিবর্তিত হয়। সমকামী গোষ্ঠী নিজেদেরকে সংখ্যায় বেশি দেখাতে সাধারণ জীবনযাপন করা মানুষদেরও একই ছাতার নিচে আনার চেষ্টা করে, যা তাদের রাজনৈতিক কৌশলের একটি অংশ।

এলজিবিটিকিউ-এর বিভিন্ন পরিচিতি:

লেসবিয়ান- দুই নারীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ ও সম্পর্ক; অর্থাৎ সমকামী নারী।

গে (Gay)- দুই পুরুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণ ও সম্পর্ক; অর্থাৎ সমকামী পুরুষ।

বাইসেক্সুয়াল- যারা উভকামী, অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন। আমেরিকার এলজিবিটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৬০% নিজেদের বাইসেক্সুয়াল হিসেবে পরিচয় দেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, নারীদের মধ্যে উভকামী হওয়ার প্রবণতা বেশি।

ট্রান্সজেন্ডার- একজন পুরুষ নিজেকে নারী মনে করতে পারেন বা একজন নারী নিজেকে পুরুষ মনে করতে পারেন।

ট্রান্সসেক্সুয়াল: একটি মেডিকেল টার্ম, যা তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যারা অস্ত্রোপচার বা হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে নতুন জেন্ডার পরিচয় গ্রহণ করেন। সব ট্রান্সসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার হতে পারেন, তবে সব ট্রান্সজেন্ডার ট্রান্সসেক্সুয়াল নন।

কুইয়ার (Queer)- আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাখ্যায়, এটি ট্রান্সজেন্ডার, এলজিবিটি এবং নন-বাইনারি পরিচয়ের প্রতিশব্দ হতে পারে। এরা প্রচলিত লিঙ্গ পরিচয় (পুরুষ বা নারী) নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যদিও নিজের পরিচয় এখনও নির্ধারণ করেননি। এদের মধ্যে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। বাইসেক্সুয়াল, প্যানসেক্সুয়াল, এবং অ্যাজেন্ডারও কুইয়ারের অন্তর্ভুক্ত।

নন-বাইনারি (Non-binary)- এমন ব্যক্তিদের বোঝায়, যারা নিজেদের লিঙ্গ পরিচয়কে প্রচলিত বাইনারি শ্রেণিবিভাগে (পুরুষ বা নারী) এর মধ্যে

সীমাবদ্ধ মনে করেন না। নন-বাইনারি ব্যক্তিরা নিজেদেরকে পুরুষ বা নারী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন না; বরং তারা নিজেদের পরিচয়কে এই দুই ধারণার বাইরে অবস্থানকারী কিছু হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রকাশভঙ্গি: বাহ্যিক বেশভূষা, আচরণ বা চিন্তায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি প্রকাশ পেতে পারে। 'নন-বাইনারি' একটি ছাতাশব্দ, যা বাইনারি লিঙ্গ ধারণার বাইরে থাকা বিভিন্ন পরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের অভিজ্ঞতা ও পরিচয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে।

ট্রান্সম্যান- ট্রান্সম্যান বলতে বোঝায়, যিনি মেয়ে থেকে ছেলে হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ, জৈবিকভাবে ও জন্মগতভাবে তিনি নারী। ট্রান্সম্যানরা নিজেদের শুধুমাত্র Men হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন।

ট্রান্সউইম্যান- ছেলে থেকে মেয়ে ঘোষণা দিয়েছেন। ট্রান্সউইম্যানরা নিজেদের শুধুমাত্র Women হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন।

প্যানসেক্সুয়াল (Pansexual)- প্যানসেক্সুয়াল বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি যে কোনো লিঙ্গ বা জেন্ডারের প্রতি যৌন, রোমান্টিক বা মানসিক আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন। এ ধরনের আকর্ষণ লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ, প্যানসেক্সুয়াল ব্যক্তি নারী, পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার, নন-বাইনারি ইত্যাদি সব জেন্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। প্যানসেক্সুয়ালিটি যৌন আকর্ষণকে লিঙ্গের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখার ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

প্যানজেন্ডার (Pangender)- প্যানজেন্ডার বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি একাধিক জেন্ডার পরিচয় ধারণ করেন বা মনে করেন যে তাদের জেন্ডার পরিচয় সীমাহীন এবং সব জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্যানজেন্ডার ব্যক্তি তাদের লিঙ্গ পরিচয়কে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গ বা জেন্ডারে সীমাবদ্ধ মনে করেন না। তারা মনে করেন, তাদের মধ্যে বিভিন্ন লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন- সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বলতে একজন মানুষের যৌন রুচিকে বোঝায়। এটি নারী ও পুরুষের যৌন আকর্ষণ (বিষমকামী) ছাড়াও সমলিঙ্গ বা উভয় লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন শব্দটি ব্যবহার করা হলে স্বাভাবিকভাবেই সমকামিতার

বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। যৌনতার এই শ্রেণীবিন্যাসের পথিকৃৎ কার্ল উলরিখস হাইরিখস।

জেন্ডার ইকুয়ালিটি- লিঙ্গ সমতা বলতে সমকামীদের অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লিঙ্গ (Gender)- বর্তমানে লিঙ্গ বা জেন্ডার বলতে সমকামী পরিচয়ের ধারণাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইন্টারসেক্স (Intersex)- বাংলায় এটিকে আন্তঃলিঙ্গ বলা হয়। এরা সাধারণত লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বা জন্মগত লিঙ্গ ত্রুটিসম্পন্ন (হরমোনাল বা জেনেটিক) হয়ে থাকেন।

হিজড়া- হিজড়া শব্দটি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত এবং এটি ইংরেজি পরিভাষায় অনুবাদ করা যায় না। হিজড়া বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়, যারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত। তবে সমকামী অ্যাক্টিভিস্টরা এই সংজ্ঞা মানতে নারাজ এবং তারা হিজড়াদের একটি সংস্কৃতি বলে দাবি করেন। হিজড়া সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয়, ভিক্ষা করা, গুরুর অধীনে থাকা ইত্যাদি নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড পালন করা। ট্রান্সজেন্ডাররাও হিজড়া হতে পারেন। এনজিও ও সুশীল সমাজ হিজড়াদের প্রতি মানুষের সামাজিক সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করছে।

তৃতীয় লিঙ্গ- প্রথাগত নারী ও পুরুষরা ছাড়া বাকী সব পরিচয়গুলো তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্গত। গে, লেসিবিয়ান, ট্রান্সজেন্ডারসহ সব লিঙ্গ বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারি সংখ্যা অনুসারে তৃতীয় লিঙ্গ বলতে হিজড়া বুঝানো হলেও এনজিও এবং সুশীলরা এটা মানতে নারাজ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) সমাজ- এই শব্দটি ইতিবাচক মনে হলেও বর্তমানে বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের আড়ালে সমকামী বা এলজিবিটি অধিকারের প্রচারে এটি ব্যবহার করা হয়। একইভাবে ডাইভার্সিটি এবং ইকুয়ালিটি শব্দগুলোও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ১৯৭৬ সালে জামালপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ঘোষেরপাড়া, মেলান্দহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ২৪ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা এবং বায়োমেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য সেক্টরে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ড. হোসেন National University of Singapore-এ ছয় বছরব্যাপী পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেন, যেখানে তিনি জেব্রাফিশের লিঙ্গ পরিবর্তন (Female to Male Transformation) নিয়ে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি DUKE-NUS Graduate Medical School এবং Singapore Cancer Centre-এ পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। সিঙ্গাপুরে প্রায় ১১ বছর গবেষণার উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বাংলাদেশে ফিরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে বায়োটেক ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স-ডিসিপ্লিনে সহযোগী অধ্যাপক এবং অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনারারি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে জড়িত আছেন। ড. হোসেন গত ১২ বছর ধরে থ্যালাসেমিয়া, শিশুদের স্থূলতা, ডেঙ্গু, এবং ক্যান্সারের মতো অবহেলিত জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণা করছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, এবং সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে তিনি গত ২৮ বছর ধরে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। করোনা মহামারির সময় তিনি জনপ্রিয় গণমাধ্যম এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিনির্ধারণ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ড. হোসেন দুটি বইয়ের লেখক: 'সন্তান প্রতিপালনে এ যুগের চ্যালেঞ্জ' এবং 'বিসিএস নাকি বিদেশে উচ্চশিক্ষা?'